ভয়াল ভৌতিক

—এতে আছে—

দীনেন্দ্রকুমার রায়ের

পিশাচ পুরোহিত

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের

বিশালগড়ের দুঃশাসন

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের

কায়াহীনের কাহিনী

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির

৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ

আষাঢ়, ১৩৭১

জুন, ১৯৬৩

জুন, ১৯৮৩

প্রকাশ করেছেন

অমিয়কুমার চক্রবর্তী

৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট

কলকাতা-৭৩

ছেপেছেন—

কান্নাহীনের কাহিনী

মলয়কুমার দত্ত

বলয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৬, নবীন কুণ্ডু লেন

কলকাতা-৯

বিশালগড়ের দুঃশাসন

বৈদ্যনাথ ঘোষ

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেস

৪১/১, হিদারাম ব্যানার্জী লেন

কলকাতা-১২

পিশাচ পুরোহিত

বিজয়চন্দ্র চন্দ্র

শ্রীজগদ্ধাত্রী প্রেস

শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন

কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ এঁকেছেন

বাবলু বর্মন

যত ভৌতিক গল্পের সঙ্কলন বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে তার প্রায় সবগুলোই বিভিন্ন লেখকের একটা করে গল্প নিয়ে। এ বই কিন্তু তার ব্যতিক্রম। এতে আছে দুই দিক্‌পাল সাহিত্যিকের দুটি রোমহর্ষক পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস, আর একটি গল্পগ্রন্থ যার আসন চিরন্তন সাহিত্যের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত।

'বিশালগড়ের দুঃশাসন,' 'পিশাচ পুরোহিত' আর 'কায়াহীনের কাহিনী'—এই তিনটি ভয়ঙ্কর গ্রন্থ নিয়ে 'ভয়াল ভৌতিক'। আতঙ্কের এহেন সমন্বয় বাংলা সাহিত্যে অভূতপূর্ব, এবং নিঃসন্দেহে অপূর্ব।

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'বিশালগড়ের দুঃশাসন' যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন তা পাঠকের শুধু মনোহরণ করা নয়, কম্পিত ও রোমাঞ্চিত করে তুলেছিল। হেমেন্দ্রকুমার ছিলেন মূলত কবি ও বয়স্কদের লেখক। কিন্তু যে ক্ষণে তিনি ছোটদের জন্যে কলম ধরলেন, ছোটদের সাহিত্যে অত্যন্ত শুভ ক্ষণ সেটা—তখন থেকেই বলতে গেলে শুরু হল কিশোর সাহিত্যে অ্যাডভেঞ্চারের সূত্রপাত।

'বিশালগড়ের দুঃশাসন' যে কাহিনীর ভাবধারার উপর গড়ে উঠেছে তা হল ব্র্যাম স্টোকারের বিখ্যাত বই 'ড্র্যাকুলা'। ট্রানসিলভানিয়ার এক লৌকিক কাহিনীর ভিত্তিতে ব্র্যাম স্টোকার কাউণ্ট ড্র্যাকুলাকে নায়ক করে এই ভয়াল উপন্যাসটি লেখেন। কাউণ্ট ড্র্যাকুলার মৃত্যু হয়েছে বহু বছর আগে, কিন্তু সারা রাত ঘুরে ঘুরে বাদুড়ের বেশে মানুষের রক্তপান করে তিনি বীভৎসভাবে বেঁচে আছেন মৃত্যুকে অস্বীকার করে। মূল বইটি বিশাল,—অকারণ দৃশ্যে, বহু অবান্তর কথায় ভারাক্রান্ত। হেমেন্দ্রকুমারের প্রয়োজন ছিল শুধু ড্র্যাকুলার কাঠামো-টার, সেইটুকু নিয়েই তিনি তাঁর নিজের জগতে ফিরে আসেন। এই অসামান্য ভয়ঙ্কর কাহিনী ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয়ে ক্রমে বেগবতী নদীর স্রোত লাভ করে আতঙ্ক, উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ, হৃৎকম্প বুকে করে দুর্বার গতিতে এগিয়ে ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছেছে। বর্ণনায়, ভাষায়, শব্দ-নৈপুণ্যে, এ রচনা অসামান্য।

'বিশালগড়ের দুঃশাসনে'র পাশে 'পিশাচ পুরোহিত' যেন মণিকাঞ্চন যোগ। 'পিশাচ পুরোহিত'ই একমাত্র উপন্যাস যার সঙ্গে 'বিশালগড়ের

দুঃশাসনে'র তুলনা চলতে পারে। দীনেন্দ্রকুমার রায়ের রচনার পরিচয় সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।—অসংখ্য সুললিত লোমহর্ষক ও পল্লীচিত্র ইত্যাদি গ্রন্থ আজও বাংলা সাহিত্যে আগ্রহের সঙ্গে পঠিত হয়। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, দীনেন্দ্রকুমারের গ্রন্থটি রচিত প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময়ে, আর হেমেন্দ্রকুমারের গ্রন্থটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে। অথচ বিভীষিকা ও আতঙ্কের সুর দুটিতে একই রকম ভাবে কানায় কানায় ভরা। এর কারণ সম্ভবত এই যে, ভয় জিনিসটি চিরন্তন, সর্ব দেশের ও সর্ব কালের। 'পিশাচ পুরোহিতে'র নায়ক নরেন সেন ইংল্যাণ্ডে গিয়ে যখন শিল্পী হিসেবে খ্যাতিমান হয়েছে তখন সে মিশরীয় পুরোহিত রা-তাইয়ের কবলে পড়ে। পুরোহিতটি একটি শয়তান। ইউরোপীয় সভ্যতার উপর তার প্রচণ্ড আক্রোশ, কারণ তা মিশরের সভ্যতা ধ্বংস করে চলেছে। তাই সে প্রতিহিংসা-বশে মারাত্মক প্লেগের বীজাণু ছড়িয়ে পশ্চিমী সভ্যতা ধ্বংস করতে চায়। হতভাগ্য শিল্পী সেন পাকচক্রে তার হাতে পড়ে নিজের অজান্তে এই ভয়ঙ্কর চক্রান্তে জড়িয়ে পড়ে। এক হিংস্র ভয়াল কাহিনী।

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কায়াহীনের কাহিনী' ছয়টি ভৌতিক গল্পের এক অপূর্ব সমারোহ। অলৌকিক গল্পে এমন রূপকথার আমেজ যে-কোন দেশের সাহিত্যে বিরল। বাংলা সাহিত্যে নিশির ডাক নিয়ে আর কোন গল্প লেখা হয়েছে কি না সন্দেহ। 'হরতনের গোলাম' আর 'বাঁশির ডাক' যথাক্রমে যক্ষের আর নিশির ডাকের কাহিনী; এ দুটির তুলনা নেই। তাঁর কৌতূহলী মন সে প্রেতলোক সম্বন্ধে অনেক খবর রাখত তার প্রমাণ 'কঙ্কালের টঙ্কার' গল্পে আছে। গা-ছমছমে পরিবেশ দিয়ে শুরু হয়ে গল্পটি শেষ পর্যন্ত শেষ হয়েছে কৌতুকের মধ্যে।

ভয়ের সঙ্গে মানুষের পরিচয় তার সৃষ্টির লগ্ন থেকেই। কিন্তু মানুষ ভয় করতে ভালবাসে, এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। রবীন্দ্রনাথের শিশু বলেছিল, 'ভয় করতে ভালবাসি তোমায় বুকে চেপে।' এ চিরন্তন সত্য,—আর সেইজন্যেই ভৌতিক গল্প মানুষের এত প্রিয়।

কার্ত্তিক মজুমদার

পিশাচ পুরোহিত

দীনেন্দ্রকুমার রায়

মুখবন্ধ

নরেন্দ্র সেনের পিতা যত্নপতি সেনকে আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছিলাম। যত্নপতি আমার পিতৃবন্ধু ছিলেন। তিনি যখন দেশে ছিলেন তখন সর্বদাই আমাদের বাড়ি বেড়াইতে আসিতেন, এবং তিনি তাঁহার সুদীর্ঘ গোঁফজোড়াটায় তা দিয়া, ভাঁটার মত গোল গোল চক্ষুদুটি পাকাইয়া দৈবাৎ আমাদের দিকে চাহিলে আমাদের প্রাণবিহঙ্গ ক্ষুদ্র দেহ-পিঞ্জরের মধ্যে ছটফট করিয়া উঠিত। তাই তাঁহাকে আমাদের বাড়ি আসিতে দেখিলেই পাড়া ছাড়িয়া পলায়ন করিতাম। তাঁহার সুদীর্ঘ সবল দেহযষ্টি ও 'শালপ্রাংশু মহাভুজ' দেখিয়া মনে হইত, পূর্বজন্মে তিনি পঞ্চপাণ্ডবের এক পাণ্ডব—বোধহয় মধ্যম পাণ্ডব ছিলেন, এবং এই কলিযুগে ভীমের গদা তাঁহার হাতের লাঠিতে পরিণত হইয়াছে। আজকাল অস্ত্র আইনের যেরূপ কড়াকড়ি, তাহাতে এতদিন সেনজা বাঁচিয়া থাকিলে ও সেই লাঠি ব্যবহার করিলে বোধহয় তাঁহাকে অস্ত্র-আইনের আমলে আসিতে হইত।

অতি শৈশবে যত্নপতিবাবুকে দেখিয়া তাঁহার আকার প্রকার সম্বন্ধে আমার মনে যে ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল তাহাই বলিলাম। বয়স একটু অধিক হইলে আর তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। তিনি মিশর যুদ্ধের সময় কমিসারিয়টের চাকরি লইয়া আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবগণের অসম্মতিতেই মিশরে যাত্রা করিয়াছিলেন।

পৌত্তলিকতার প্রতি যত্নপতিবাবুর বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না, তিনি [illegible]ও পক্ষপাতী ছিলেন না; তাঁহার যৌবনকালে স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে কলিকাতার আদি ব্রাহ্ম সমাজ বঙ্গের বহু ধর্মপ্রাণ চিন্তাশীল ব্যক্তিকে তৎপ্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল; স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি

প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মাগণের ন্যায় যদুপতিবাবুও আদি ব্রাহ্ম সমাজের উদার ধর্মভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি ইংরাজি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন; সমুদ্র পার হইলেই যে জাতি যায় এ বিশ্বাস তাঁহার ছিল না, এবং সেকেলে লোক হইলেও সমাজচ্যুতিকে তিনি ভয়ানক বিপদ বলিয়া মনে করিতেন না। এ অবস্থায় এক পুরুষেই বড় লোক হইবার আশায় কমিসারিয়টের চাকরি লইয়া তিনি যে সমুদ্রপারে যাত্রা করিবেন, ইহা বিস্ময়ের নহে।

মিশর দেশ হইতে তাঁহার সুদীর্ঘ প্রবাসকালের মধ্যে তিনি একবার কি দুইবার বাড়ি আসিয়াছিলেন। শেষবার বাড়ি আসিয়া তিনি নরেনকে সঙ্গে লইয়া যান। নরেন আমাদের সমবয়স্ক ও সহপাঠী ছিল। যখন তাহার মা বাঁচিয়া ছিলেন তখন আমরা সর্বদা তাহাদের বাড়ি যাইতাম, তাহার মাকে মায়ের মত ভালবাসিতাম ও ভক্তি করিতাম, তিনিও আমাকে ঠিক নরেনের মতই স্নেহ করিতেন। মাসের মধ্যে দশ পনেরো দিন বাড়িতে না খাইয়া তাঁহার কাছে খাইতাম। তাঁহার স্নেহের কথা মনে হইলে এখনও চোখে জল আসে, বাড়ির বাহিরে এমন স্নেহ আর কাহারও নিকট পাই নাই। তাঁহার মত সতী-লক্ষ্মী রমণীও জীবনে অধিক দেখি নাই।

স্বামীর মিশর যাত্রার পর সেই সাধ্বী নানা দুশ্চিন্তায় অত্যন্ত ম্রিয়মান হইয়া পড়িলেন; ভাবিয়া ভাবিয়া অস্থিচর্মসার হইয়া শেষে শয্যা লইলেন। আর উঠিলেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর নরেনদের বাড়িতে প্রায়ই যাইতাম না। যাইতে ইচ্ছা হইত না, একজনের অভাবেই তাহাদের বাড়ি নিরানন্দময় ও অন্ধকার হইয়াছিল। মাতৃশোকে নরেনও দিন দিন শুকাইয়া উঠিতে লাগিল। বাড়িতে তাহার যত্ন করিবার লোক তেমন কেহ ছিল না; বিধবা বৃদ্ধা পিসি ও দূরসম্পর্কীয় এক কাকা ভিন্ন বাড়িতে তাহার অন্য কোন অভিভাবক ছিল না।

শুনিয়াছিলাম পত্নীবিয়োগে যদুপতিবাবু অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন, অধিক বয়সে স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায়, বিশেষত একটি পুত্র

বর্তমান থাকায় তিনি আর বিবাহ করেন নাই। স্ত্রীর মৃত্যুর পর একবার বাড়ি আসিয়া, সংসারের বিলি বন্দোবস্ত করিয়া তিনি মাতৃহীন নরেনকে লইয়া পুনর্বার সুদূর প্রবাসে যাত্রা করিলেন, তখন নরেনের বয়স পনের কি ষোল বৎসর। নরেন তখন গ্রাম্য বিদ্যালয়ে এণ্ট্রান্স পড়িত। যদুপতিবাবু বোধহয় মনে করিয়াছিলেন পুত্রটি তাঁহার নিকটে থাকিলে তিনি পত্নীবিয়োগ-শোক কতকটা ভুলিতে পারিবেন।

নরেনের সহিত সেই আমার ছাড়াছাড়ি, তাহার পর আর কখনও তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই; তবে, যদুপতিবাবু সেই সুদূর প্রবাস হইতে মধ্যে-মধ্যে আমার পিতাকে যে পত্র লিখিতেন, তাহাতেই নরেনের সংবাদ পাইতাম। কিছুদিন পরে শুনিতে পাইলাম, চিত্রবিদ্যায় নরেনের অসাধারণ অনুরাগ দেখিয়া তাহাকে চিত্রবিদ্যায় পারদর্শী করিবার জন্য যদুপতিবাবু তাহাকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়াছেন। নরেন দেশে থাকিতে আমাদের হেডমাস্টার মাধববাবু বলিতেন, নরেন অল্প বয়সেই যে-রকম সুন্দর চিত্র আঁকিতে পারে তাহা দেখিয়া বোধ হয়, অভ্যাস রাখিলে ও সুশিক্ষা পাইলে কালে সে একজন বিখ্যাত আর্টিস্ট হইবে। সে সময় সুবিখ্যাত চিত্রকর রবি বর্মার চিত্র বঙ্গদেশে আমদানি হয় নাই, চিত্র সম্বন্ধে জনসাধারণের তেমন অভিজ্ঞতাও ছিল না, চিত্রবিদ্যা যে যথেষ্ট সম্মানজনক বা অর্থকরী বিদ্যা, আমাদের পল্লী অঞ্চলের লোকের তখন সে ধারণা ছিল না। নরেনের পিতা নরেনকে চিত্রবিদ্যা শিখাইবার জন্য বিলাতে পাঠাইয়াছেন, এ কথা শুনিয়া আমাদের গ্রামের মুরুব্বিরা বিস্ময়ে হতজ্ঞান হইলেন, এবং সন্ধ্যাকালে মজলিস করিয়া বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে গম্ভীরভাবে মত প্রকাশ করিলেন, 'যদুপতির বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে! যদি তাহার ঘটে একবিন্দুও বুদ্ধি থাকিত তাহা হইলে সে ছেলেকে জজ ম্যাজিস্টর করিবার জন্য বিলাতে না পাঠাইয়া ছবি আঁকা শিখিতে কখনই বিলাতে পাঠাইত না; ইহাতে ইহকাল পরকাল উভয়ই নষ্ট!'

কিন্তু এই প্রতিকূল সমালোচনায় যদুপতিবাবুর বা নরেনের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হইল না। ইংলণ্ডে কিছুকাল চিত্র-বিদ্যা শিখিয়া চিত্রাঙ্কণে সে বেশ যশস্বী হইয়া উঠিল, এমন কি তাহার অঙ্কিত দুইখানি চিত্র সম্বন্ধে ইংলণ্ডের কয়েকখানি প্রসিদ্ধ সংবাদ-পত্রে যথেষ্ট প্রশংসাও বাহির হইল। তাহার এই প্রশংসায় আমরা বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম, বিলাতে গিয়া একজন বাঙালী যুবক চিত্রাঙ্কণী প্রতিভার পরিচয় দিয়া জন-সমাজে যশস্বী হইয়াছে, ইহাতে আমরা অত্যন্ত গৌরব অনুভব করিলাম। গ্রাম্য বিজ্ঞেরা কিন্তু তখনও বলিতে লাগিলেন, 'চিত্তির করা আর এমন কী কঠিন কাজ ?'—অর্থাৎ ইচ্ছা করিলেই যেন সকলেই 'র‍্যাফেল' হইতে পারে। আমাদের পল্লী-সমাজে তখন জমিদারের নায়েবী ও নীল কুঠীর দেওয়ানী লাভ মনুষ্য জীবনের চরম লক্ষ্য ছিল, সুতরাং চিত্রকরের খ্যাতি বেনে বনে মুক্তা ছড়াইবার মত বৃথা হইল।

কিছুকাল পরে যদুপতিবাবু জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়া মিশরেই প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর নরেনের সম্বন্ধে আমরা আর কোন কথা শুনিতে পাই নাই, প্রকৃতপক্ষে সেই সময় হইতেই নরেনের সহিত আমাদের সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। আমাদের আশা ছিল, যদুপতিবাবু যদি চাকরি ছাড়িয়া বৃদ্ধ বয়সে দেশে আসিয়া বসেন, তাহা হইলে নরেন কখনো-না-কখনো একবার পিতৃ-ভিটায় উপস্থিত হইতেও পারে ;—কিন্তু যদুপতিবাবুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সে আশা বিলুপ্ত হইল।

কলেজে লেখাপড়া ছাড়িয়া মা সরস্বতীর নিকট বিদায় লইয়া অফিসে চাকরি আরম্ভ করিবার কিছু দিন পরে একদিন একখানি ইংরাজি সংবাদপত্র-পাঠে জানিতে পারিলাম, নরেন বিলাতে এক ইহুদীর মেয়ে বিবাহ করিয়াছে। এই যুবতীর অগাধ পৈতৃক অর্থ আছে, নরেন এখন সেই বিপুল অর্থের অধিকারী। বিবাহের পর সে চিত্রানুশীলন ত্যাগ করিয়া তাহার পত্নীকে লইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহা কেহই জানে না, ইংলণ্ডে তাহার বন্ধু-মহলে

জনরব, কোনও দারুণ মনঃকষ্টে সে পত্নীকে লইয়া বিবাগী হইয়া গিয়াছে।

সংবাদ-পত্রে যে সকল কথা পাঠ করা যায়, অনেক সময় তাহার পনের আনা অতিরঞ্জিত। বাল্যকালে নরেনের সহিত আমার প্রগাঢ় প্রণয় ছিল, তাহার মনের ভাব আমি যেমন জানিতাম অন্য কেহই তেমন জানিত না। তাহার হৃদয়ে ভোগলালসা বড় প্রবল ছিল। ভোগস্পৃহার অঙ্কুর যৌবন কালে বিকসিত হইবারই সম্ভাবনা; তথাপিও সে কোন্ দুঃখে যৌবনে যোগী সাজিল? যদি তাহার সংসার ত্যাগেরই সঙ্কল্প ছিল, তাহা হইলে সে বাছিয়া বাছিয়া ইহুদী-কুবেরের কন্যার প্রেমে পড়িল কেন, আর কী ভাবিয়াই বা তাহাকে বিবাহ করিল? এইরূপ বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া হঠাৎ তাহার বুদ্ধিবিকার ঘটিল কেন তাহা কোনও মতে বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া বড় ধাঁধায় পড়িলাম; সংবাদ-পত্রের সংবাদে তেমন আস্থা স্থাপন করিতে পারিলাম না।

শেষে আমার কৌতুহল পরিতৃপ্তির জন্য এক উপায় অবলম্বন করিলাম। কলিকাতায় কলেজে অধ্যয়ন কালে নিবারণচন্দ্র সিংহ আমার সহপাঠী ছিলেন; তিনি বি. এ. পাশ করিয়া ব্যারিস্টার হইবার জন্য বিলাত গিয়াছেন। তাঁহার পিতা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের একজন প্রধান উকিল; নিবারণ ব্যারিস্টার হইয়া আসিয়া তাঁহার বিস্তীর্ণ পসার-প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবে, এই আশায় তিনি নিবারণকে বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন।

নিবারণ ইংলণ্ড হইতে মধ্যে-মধ্যে আমাকে পত্র লিখিতেন। লণ্ডনেই নিবারণের সহিত নরেনের পরিচয় হয়; ক্রমে তাঁহাদের বন্ধুত্ব গাঢ় হইয়াছিল। নিবারণের পত্রেই নরেনের সকল খবর পাইতাম। কিন্তু এদিকে অনেক দিন নিবারণের কোনও পত্র পাই নাই, আমিও তাঁহাকে পত্রাদি লিখি নাই। কলেজ ছাড়িয়া চাকরি আরম্ভ করিয়া পত্র লিখিবার অভ্যাস অনেক কমিয়া গিয়াছিল, শখের খাতিরে পত্র ব্যবহারের অবসরও বড় ছিল না।

কিন্তু নরেন সেনের খবর না লইলে চলিতেছে না ভাবিয়া নিবারণকে একখানি পত্র লিখিলাম। জানিতাম এ পত্রের উত্তর পাইবই, তাই পত্রের উত্তরের আশায় আমি দিন গণিতে লাগিলাম।

প্রায় দুই মাস পরে উত্তর পাইলাম। নিবারণ লিখিয়াছিলেন '* * * নরেন সেনের সম্বন্ধে তুমি যে সকল কথা জানিতে চাহিয়াছ তাহা তোমাকে জানাইবার উপায় দেখিতেছি না, কারণ আমি নিজেই বিশেষ কিছু জানি না, ইদানী অনেক দিন তাহার সহিত সাক্ষাৎ নাই। তবে জনরব শুনিতেছি, ইংলণ্ডে অত্যন্ত প্লেগ হওয়ায় ভয়ে সে এ দেশ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। একটি সুন্দরী ইহুদী যুবতীর প্রেমে পড়িয়া সে বোধহয় তাহার বন্ধু বান্ধবদের ভুলিয়া গিয়াছে। এই যুবতীর সহিত শীঘ্রই তাহার বিবাহ হইবে, এইরূপ জনরব শুনিয়াছিলাম, কিন্তু বিবাহ হইয়াছে কি না তাহা জানিতে পারি নাই। যদি সে বিবাহ করিয়া থাকে তাহা হইলে রাস্কেল আমাদের মত স্বদেশীর বন্ধুদের বরযাত্রীর নিমন্ত্রণ না করিয়া বড় অন্যায় করিয়াছে। কিন্তু এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণেও পেট ভরিয়া লুচি সন্দেশ খাইবার আশা নাই, সুতরাং আক্ষেপের বিশেষ কারণ দেখি না, তবে, হতভাগা দেশত্যাগের পূর্বে আমাদের দেখা দিয়া গেল না কেন, তাহাই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। সত্য কথা বলিতে কি, নরেন সেনের সৌভাগ্য দেখিয়া একটু হিংসা হয়; তাহার কপাল বড় জোরের। সে যে যুবতীর প্রেমে পড়িয়াছে, তাহার পিতার দশ পনের লক্ষ টাকার সম্পত্তি আছে। যুবতীর পিতার অন্য সন্তানাদি নাই, সুতরাং বুঝিতেই পারিতেছ, এই বিপুল অর্থ নরেন সেনের ভোগে লাগিবে। একদিন আমি সেই যুবতীটিকে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। এমন পরীর মত সুন্দরী জীবনে আর দেখিয়াছি কি না স্মরণ হয় না। ইংলণ্ডে আসিয়া বড় বড় লর্ডের ঘরের অনেক সুন্দরী কুমারীকে দেখিয়াছি, কিন্তু তাহারা এই ইহুদী-সুন্দরীর পদতলেও দাঁড়াইবার যোগ্য নহে। সে রূপ দেখিয়া চক্ষু শীতল হয়,

তোমাদের সুরবালা চন্দ্রহাসিনী প্রাণতোষিণী ফুলকুমারীদের আর মনে ধরে না।

'নরেন সেন ইদানী বহু দিন হইতে আমাদের সঙ্গে বড় একটা মিশিত না, সময়ের অভাবে কি না ঠিক বলিতে পারি না; ভাল 'পেণ্টার' বলিয়া খ্যাতি লাভ করায় এখানকার অনেক উচ্চপদস্থ ও সম্ভ্রান্তবংশীয় ইংরাজের সহিত তাহার পরিচয় ও বন্ধুত্ব হইয়াছিল। অনেক বড়-বড় মজলিসে, নাচে, ডিনারে তাহার নিমন্ত্রণ হইত।

'নরেন সেনকে মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু তাহার বর্তমান ঠিকানা জানা না থাকায় এই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারি নাই। ভবিষ্যতে যদি তাহার কোনও সংবাদ পাই তাহা তোমাকে জানাইব। আপাতত তোমার কৌতূহল দূর করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম।'

এই পত্র পাইবার পর ছয় সাত মাসের মধ্যে নিবারণের আর কোন পত্র পাই নাই। নানা কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকায় নরেন সেনের অদ্ভুত জীবনের ইতিহাস জানিবার আগ্রহও অনেকটা কমিয়া আসিয়াছিল, ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন বিলাতী মেলে নিবারণের এক পত্র ও সেইসঙ্গে বঙ্গভাষায় লিখিত একতাড়া কাগজ পাইলাম। ব্যগ্রভাবে অগ্রে নিবারণের পত্রখানি পাঠ করিয়া তাহার পর সেই কাগজের তাড়ায় মনঃসংযোগ করিলাম। প্রথমে মনে করিয়াছিলাম দৈনিক কাজ-কর্ম শেষ করিয়া অবসর-কালে মধ্যে মধ্যে এই তাড়াটি পাঠ করা যাইবে। নিষ্কর্মা হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া সেই 'মহাভারত' পাঠ করা আমার অসাধ্য!

নিবারণের পত্রপাঠে বুঝিতে পারিয়াছিলাম, সেই তাড়াটি আমার বাল্যবন্ধু নরেন সেনের স্বলিখিত প্রবাস-জীবনের ইতিহাস। পড়িতে পড়িতে তাহা এত কৌতূহলোদ্দীপক ও বিস্ময়াবহ বোধ হইল যে, আরম্ভ করিয়া আর ছাড়িতে পারিলাম না। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া প্রথম হইতে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পাঠ করিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইলাম। পাঠ-শেষে ভাবিলাম, এমন অদ্ভুত অসম্ভব অবিশ্বাস্য কাহিনী কে বিশ্বাস করিবে? ইহা সত্য, না রহস্যজনক গল্প মাত্র?

যাহা হউক, প্রথমে নিবারণের পত্রখানিই উদ্ধৃত করি :

মিঃ নিবারণচন্দ্র সিংহের পত্র

বন্ধুবরেষু,

আজ তোমাকে এ পত্রে যে ঘটনার কথা লিখিতেছি, সে তিন চারি মাস পূর্বের কথা। মাস মনে না থাকিলেও, তাহা যে বর্ষার দিন ইহা বেশ স্মরণ আছে। সেদিন সকাল হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল; সমস্ত দিন টুপ-টুপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, এবং উদ্দাম বায়ুহিল্লোল এক-একবার মুক্ত বাতায়ন-পথে আমার নির্জন গৃহ-কক্ষে প্রবেশ করিয়া হৃৎকম্প উপস্থিত করিতেছিল। আমি কোন রকমে বাহিরের কাজ শেষ করিয়া সেদিন একটু সকালে বাসায় ফিরিয়াছিলাম, এবং একখানি আরাম কেদারায় শ্রান্ত দেহভার ন্যস্ত করিয়া একখানি নূতন উপন্যাস পাঠে মনঃসংযোগ করিয়াছিলাম। সেই উপন্যাসখানির নাম কী, এবং হল কেন্, মেরী করেলি, বা রাইডার হ্যাগার্ড,--কাহার প্রণীত উপন্যাস, সে কথা এত দিন পরে স্মরণ করিয়া বলিতে পারিব না; তবে এটুকু মনে আছে যে, সন্ধ্যার সময়েও আমি সেই পুস্তকখানি বন্ধ করিতে পারি নাই। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইবার পূর্বেই ভৃত্য টেবিলের উপর বাতি রাখিয়া গেল। আমি টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বাতির আলোকে সেই চিত্তাকর্ষক উপন্যাসের আর একটি নূতন পরিচ্ছেদে মনঃসংযোগ করিলাম।

সন্ধ্যার পর হইতেই দুর্যোগ বাড়িয়া উঠিয়াছিল; সে রাত্রে ঘরের বাহির হইবার চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র। সে সময় কেহ যে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে পারে এরূপ আমার ধারণা ছিল না। কিন্তু রাত্রি প্রায় আট ঘটিকার সময় আমার ভৃত্য দরজা ঠেলিয়া ধীরে ধীরে আমার সম্মুখে আসিয়া বলিল, 'একটি নিগ্রো যুবক এইমাত্র আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে; সে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে, আপনাকে খবর দিতে বলিল।'

এমন বাদলার দিনে রাত্রি আটটার সময় একটা নিগ্রো হঠাৎ কোথা হইতে কী জন্য আমার কাছে আসিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না; আমার সঙ্গে যে কোনও নিগ্রোর আলাপ পরিচয় আছে, তাহাও স্মরণ হইল না।

আমি ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তাহার নাম শুনিয়াছ? আমার কাছে তাহার কী আবশ্যক?'

ভৃত্য বলিল, 'তাহার নাম ব্যাগুম্যান; কি জন্য সে এখানে আসিয়াছে তাহা আমাকে বলে নাই; তবে সে আপনার সঙ্গে একবার দেখা করিবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে।'

লোকটা ভিক্ষুক নাকি? অনেক ভবঘুরে ভিক্ষুক ভদ্রলোকের সঙ্গে এইভাবে সাক্ষাৎ করিতে চায়, এবং নিজের দুরবস্থা জানাইয়া ভিক্ষার উমেদারি করে।—আমি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া ভৃত্যকে বলিলাম, 'তাহাকে বল এখন আমার দেখা করিবার অবসর নাই, এখন দেখা হইবে না; যদি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার বিশেষ আবশ্যক থাকে, তাহা হইলে কাল সকালে সে যেন আসিয়া দেখা করে।'

দুই তিন মিনিট পরে ভৃত্য পুনর্বার আসিয়া বলিল, 'সে বলিতেছে, আজ রাত্রের ট্রেনেই তাহাকে এডিনবরা যাইতে হইবে, এইজন্য আজ রাত্রেই আপনার সহিত তাহার দেখা করা আবশ্যক; আপনার নিকট তাহার অত্যন্ত জরুরি কাজ আছে, একবার দেখা না করিলেই নয়; সে একথাও বলিল—যদি তোমার মনিব আমার সঙ্গে আজ দেখা করিতে না চান, তাহা হইলে তাঁহাকে বলিও, আমি তাঁহার বন্ধু মিঃ নরেন সেনের নিকট হইতে আসিয়াছি।—একথা শুনিলে তিনি আমার সঙ্গে দেখা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।'

অনেক দিন হইতে নরেন সেনের কোন সংবাদ পাই নাই, সে এখন কোথায় তাহাও জানি না; সুতরাং তাহাকে পত্র লিখিবারও উপায় নাই। আজ এমন সময়ে হঠাৎ একজন অপরিচিত নিগ্রো

তাহার নিকট হইতে কী সংবাদ লইয়া আসিয়াছে জানিবার জন্য বড়ই কৌতূহল হইল, লোকটির সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না; তাহাকে আমার নিকট উপস্থিত করিবার জন্য ভৃত্যকে আদেশ করিলাম।

ভৃত্য অবিলম্বে একটি দীর্ঘকায় মলিন পরিচ্ছদধারী নিগ্রো যুবককে আমার সম্মুখে লইয়া আসিল। যুবকটি আমাকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইলে বসিবার জন্য আমি তাহাকে একখানি চেয়ার দেখাইয়া দিলাম। সে চেয়ারে বসিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, 'আমি এই অসময়ে আসিয়া বোধহয় আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাইলাম, আমার অপরাধ মার্জনা করিবেন; কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি।'

আমি বলিলাম, 'ভৃত্যের মুখে শুনিলাম, তুমি আমার বন্ধু নরেন সেনের নিকট হইতে আসিয়াছ; এ কথা সত্য কি? আমি অনেক দিন আমার বন্ধুর কোন সংবাদ পাই নাই।'

আগন্তুক বলিল, 'হাঁ, আমি তাঁহার নিকট হইতেই আসিতেছি।

আমি বলিলাম, তিনি আমার স্বদেশবাসী, এদেশে অনেক দিন তাঁহার সহিত একত্র কাটাইয়াছি; এখন তিনি কোথায় আছেন?'

আগন্তুক বলিল, 'সে কথা আমি আপনাকে বলিতে পারিব না।'

আমি সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিলাম; ঈষৎ বিরক্তিভরে বলিলাম, 'তোমার এ কথার অর্থ কী?'

আগন্তুক বলিল, 'অর্থ এই যে, তাঁহার বর্ত্তমান ঠিকানা আপনাকে বলিবার হুকুম নাই।'

আমি বলিলাম, 'তবে তুমি আমার কাছে কী জন্য আসিয়াছ?'

আগন্তুক বলিল, 'মিঃ সেন আমাকে এক বাণ্ডিল কাগজ দিয়া বলিয়া দিয়াছেন, তাহা যেন আমি স্বয়ং আপনার হস্তে প্রদান করি। আমি সেই কাগজগুলি আনিয়াছি; তাহা লইয়া আপনি আমাকে একখানি রসিদ দেন।'

নিগ্রোটা তাহার পুরু কোটের পকেট হইতে লাল ফিতা দিয়া

বাঁধা এক বাণ্ডিল কাগজ বাহির করিয়া টেবিলের উপর আমার সম্মুখে রাখিল।

আমি ক্ষণকাল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলাম, তাহার পর আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমার নামটি কী ?'

আগন্তুক বলিল, 'আমার নাম ব্যাগুম্যান।'

আমি ফাইল হইতে একখানি কাগজ টানিয়া লইয়া লিখিলাম—

'প্রিয় নরেন !

আজ সন্ধ্যার সময় ব্যাগুম্যান নামক একটি নিগ্রো যুবকের নিকট এক-তাড়া কাগজ পাইলাম ; এই কাগজগুলিতে কী আছে তাহা এখনও দেখা হয় নাই। ব্যাগুম্যানের মুখে শুনিলাম, কাগজ-তাড়াটি আমাকে প্রদান করিবার জন্য তুমি তাহাকে এখানে পাঠাইয়াছ। সে ইহার রসিদ চাহে, তাই তোমাকে ইহার প্রাপ্তি-সংবাদ দিলাম।

'আমি ব্যাগুম্যানের নিকট তোমার বর্তমান ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ; কিন্তু শুনিলাম, সে কথা নাকি তাহার বলিবার হুকুম নাই। তাহার এ কথার অর্থ বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। তুমি আমার বহু দিনের বন্ধু ; সুখে, দুঃখে বহু দিন উভয়ে একত্র কাটাইয়াছি ; তখন আমাদের পরস্পরের নিকট গোপন করিবার কোন কথাই ছিল না ; কিন্তু কিছুদিন হইতে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইলে, কিন্তু কি জন্য কোথায় যাইতেছ, তাহা প্রকাশ করিলে না, এমন কি, যাইবার পূর্বে বিদায় লইবারও অবসর পাইলে না! ইহা বড়ই বিচিত্র ব্যাপার। তুমি এখন কোথায় আছ, কী করিতেছ, তাহাও জানাইতে অনিচ্ছুক। তুমি যে ইহুদী যুবতীকে ভালবাসিয়াছিলে, তাহাকে বিবাহ করিয়াছ কি না, বিবাহ হইয়া থাকিলে কবে কোথায় বিবাহ হইয়াছে, তাহা জানিতে পারি নাই। আমাদের মত বন্ধুকে এ সকল কথা জানাইলে কী ক্ষতি ? আমি এ সকল রহস্যের মর্মোদ্ঘাটন করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। যদি তুমি দেশান্তরে গিয়া কোনরূপে বিপন্ন হইয়া থাক, তবে সে কথা তোমার প্রিয় বন্ধুর গোচর

করা কি কর্তব্য নহে? যদি তোমার কোন প্রকার সাহায্যের আবশ্যক হয়, আমি প্রাণপণে তাহা করিতে প্রস্তুত আছি; প্রবাসে আমাদের স্বদেশীয় বন্ধুগণের পরস্পরের উপর নির্ভর করাই উচিত। যদি তোমার কোন গুপ্ত কথা থাকে, তাহা যতই গোপনীয় হউক আমার নিকট প্রকাশ করিলে তোমার কোন অপকারের আশঙ্কা নাই; আমার বিশ্বাস প্রত্যেক বন্ধুই বন্ধুর উপর এতটুকু আস্থা স্থাপন করিতে পারে।'

পত্র-শেষে নাম স্বাক্ষর করিয়া পত্রখানি লেফাপায় পুরিয়া তাহা ব্যাগুম্যানের হস্তে প্রদান করিলাম।

ব্যাগুম্যান পত্রখানি পকেটে ফেলিয়া চেয়ার হইতে উঠিল। আমি তাহাকে পুনর্বার বলিলাম, 'আমার বন্ধুর ঠিকানাটি জানিবার জন্য আমার বড়ই আগ্রহ হইয়াছিল।'

ব্যাগুম্যান বলিল, 'ইহা খুব স্বাভাবিক; আপনার বন্ধু অনেক সময় আপনার কথা বলেন; কিন্তু যে কথা আপনার নিকট প্রকাশ করা নিষিদ্ধ, তাহা আপনাকে কিরূপে বলিব?'

আমি বলিলাম, 'তাহা না হয় না বলিলে, কিন্তু আমার বন্ধু বেশ সুখে আছেন কি না, তাঁহার দিন বেশ আনন্দে ও শান্তিতে কাটিতেছে কি না, এ কথা বলিতে বোধহয় তোমার আপত্তি নাই। এটুকু জানিতে পারিলেই আমি সুখী হইব।'

ব্যাগুম্যান বলিল, 'আপনারা সাধারণত যাহাকে সুখ বলেন, ভাগ্যবিড়ম্বনায় তিনি তাহাতে বঞ্চিত, তাঁহার জীবন মহা অশান্তিতে পূর্ণ; তিনি বুদ্ধির দোষে অনিচ্ছাক্রমে যে মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন, জীবনের অবশিষ্ট কাল সেই পাপের কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন।'

নরেন এমন কী পাপ করিয়াছে যে, সে-জন্য জীবনব্যাপী প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক? আমার মনে হইল, মোহে ভুলিয়া বিদেশিনীর পাণিগ্রহণ করিয়া বোধহয় সে এখন অনুতপ্ত হইয়াছে, তাহার জীবন মহা অশান্তিতে কাটিতেছে।

আমি পুনর্বার ব্যাঙম্যানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মিঃ সেনের স্ত্রী তাঁহার কাছে আছেন তো? স্বামী স্ত্রীতে কোন বিরোধ নাই তো?'

ব্যাঙম্যান বলিল, 'আমি আপনার এ প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারিব না; আমার কাজ শেষ হইয়াছে, আমি এখন চলিলাম।'

আমি বলিলাম, 'আমার আর একটি মাত্র প্রশ্ন আছে; তাঁহার সহিত ভবিষ্যতে আমাদের সাক্ষাতের আশা আছে কি? আর কি কখনও তাঁহার কোন পত্রাদিও পাইব না?'

ব্যাঙম্যান বলিল, 'না, তাঁহার সহিত জীবনে আপনাদের সাক্ষাতের আশা নাই; তিনি আপনাকে বলিতে বলিয়াছেন, আপনি যেন মনে করেন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। এ অবস্থায় তাঁহার চিঠি-পত্র পাইবার আশা আপনাদের পক্ষে দুরাশা মাত্র।'

ব্যাঙম্যান আমাকে অভিবাদন করিয়া সেই কক্ষ হইতে প্রস্থান করিল।

অনেক ক্ষণ পর্যন্ত আমার সেই মৃদু দীপালোকিত নির্জন কক্ষে বসিয়া এই অদ্ভুত রহস্যের কথা চিন্তা কারলাম; কিন্তু কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। অন্যমনস্কভাবে নৈশ ভোজন শেষ করিয়া পুনর্বার যখন আমার পাঠগৃহে প্রবেশ করিলাম, তখন মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল, সূচীভেদ্য গাঢ় কৃষ্ণ মেঘে সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন হইয়াছিল; গগনের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিদ্যুতের লেলিহান জিহ্বা ঘূর্ণমান আলোক-চক্রের ন্যায় মুহুর্মুহু তরঙ্গায়িত হইতেছিল, এবং সুগম্ভীর বজ্রনাদে শ্রবণ বধির হইতেছিল। সেই ঘনঘটাচ্ছন্ন অন্ধকার রাত্রে সুদূর প্রবাসের একটি নির্জন গৃহে বর্তিকার মৃদু আলোকে আমি আমার বন্ধুর প্রেরিত কাগজের তাড়াটি খুলিয়া বসিলাম। এই পাণ্ডুলিপিতে না-জানি কী অদ্ভুত বিবরণ লিখিত আছে, ভাবিয়া আমার মন দারুণ উদ্বেগ ও কৌতূহলে অধীর হইয়া উঠিল। পাণ্ডুলিপির প্রথম পৃষ্ঠা খুলিয়াই দেখিতে পাইলাম, তাহা বন্ধুর অনিন্দ্যসুন্দর

সুপরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে পূর্ণ; পাণ্ডুলিপিখানির আদ্যোপান্ত বঙ্গভাষায় লিখিত। সেইসঙ্গে একখানি পত্রও গ্রথিত দেখিলাম; অগ্রে সেই পত্রখানি আগ্রহভরে পাঠ করিলাম। তাহাতে এইরূপ লিখিত ছিল:

'প্রিয়বরেষু,

হঠাৎ তুমি আমার নিকট হইতে এরূপ একখানি পত্র পাইবে, তাহা বোধহয় তোমার স্বপ্নের অগোচর। কিন্তু স্বপ্নের অগোচর অনেক কাণ্ডও আমাদের এই সুখদুঃখপূর্ণ পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে নিত্য ঘটিতেছে। অতএব আমার এই পত্রখানি দেখিয়া বিস্মিত বা বিচলিত হইও না।

ইংলণ্ড হইতে জাহাজ ভাসাইয়া যখন উদ্দেশ্যহীনভাবে অনন্ত মহাসমুদ্রে যাত্রা করি, তখন এ কথা একবারও মনে হয় নাই যে, জীবনে তোমাকে পত্র লিখিতে পারিব। ইংলণ্ড হইতে চিরবিদায় লইবার পূর্বে তোমার ন্যায় প্রিয় বন্ধুর সহিত কেন দেখা করিয়া আসি নাই, এ প্রশ্ন তোমার মনে উদিত হওয়াই স্বাভাবিক। আমার এই বিচিত্র ব্যবহারে তোমার মনে যে দুঃখ ও অভিমানের সঞ্চার হইয়াছে, তাহাও আমি বুঝিতে পারিয়াছি; কিন্তু কেন যে দেখা করি নাই এক কথায় তাহার কৈফিয়ৎ দিতে পারিব না। আমার প্রেরিত এই পাণ্ডুলিপি যদি তুমি ধৈর্য ধারণ কারয়া পাঠ কারতে পার, তাহা হইলে ইংলণ্ড হইতে আমার আকস্মিক অন্তর্ধানের কারণ হয়ত বুঝিতে পারিবে; সুতরাং সে সম্বন্ধে এখানে স্বতন্ত্র আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

তুমি জান চিত্র-শিল্পে সাফল্য লাভই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল; সেই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য আমি ইংলণ্ডে গিয়াছিলাম; ফ্রান্স দেশেও কিছুকাল বাস করিয়াছি। ইচ্ছা ছিল ভবিষ্যতে সুযোগ পাইলে ইটালীর ফ্লরেন্স, জর্মনীর মিউনিক ও চিত্রশিল্পের অন্যান্য পীঠস্থানে পদার্পণ করিয়া শিক্ষা সম্পূর্ণ করিব; কিন্তু মানুষ এক ভাবিয়া কাজ আরম্ভ করে, তাহার ফল অন্যরূপ হয়। সুদীর্ঘ কাল অনন্য মনে শিল্প-সাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া আমি যে আংশিক

রূপে সাফল্য লাভ করিয়াছিলাম, তাহা তোমার অজ্ঞাত নহে। তুমি জান আমার অঙ্কিত কয়েকখানি তৈলচিত্র ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত সমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছিল ; ইংলণ্ডের সাধারণ চিত্রশালায় আমার অঙ্কিত দুইখানি চিত্র সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। ইউরোপে শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্বক স্বদেশবাসিগণের সম্মুখে যদি কখনও চিত্রশিল্পের মহিমময় আদর্শ সংস্থাপন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার এই তুচ্ছ জীবন ধন্য হইত।

কিন্তু যে উচ্চ আকাঙ্ক্ষায় এতদিন আমার হৃদয় পূর্ণ ছিল, সে আকাঙ্ক্ষা আমার আর নাই, এখন আমার জীবন সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে প্রধাবিত। কেন এরূপ হইল, এই পরিবর্তনের কারণ কী, তাহা এই পাণ্ডুলিপি পাঠ করিলেই তুমি বুঝিতে পারিবে। তুমি আমার সম্বন্ধে যাহাই ভাব, দয়া করিয়া আমাকে ভুল বুঝিও না। তোমাদের হয়ত বিশ্বাস, একটি ইহুদী যুবতীর প্রেমে পড়িয়াই আমি অধঃপাতে গিয়াছি। তোমাদের বোধহয় ধারণা, সেই যুবতী তাহার পিতার বিপুল ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারিণী। কিন্তু আমার অধঃপতনের কারণ স্বতন্ত্র। তুমি শুনিলে বিস্মিত হইবে, আমার প্রিয়তমা রেবেকার পিতা মৃত্যুকালে তাহার জন্য একটি কপর্দকও রাখিয়া যান নাই। আমার পিতা কমিসেরিয়টে চাকরি করিয়া বহু অর্থ উপার্জন করিলেও তিনিও বিশেষ কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম, চিত্রশিল্পের আলোচনায় যে অর্থোপার্জন হইবে তাহাতেই গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্বাহ করিতে পারিব ; কিন্তু ঘটনাচক্রে পড়িয়া সে পথও ত্যাগ করিতে হইয়াছে। এখন ভগবানই আমার একমাত্র সহায়। কিন্তু মহা পাপে আমার জীবন কলঙ্কিত, বোধহয় ভগবানের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিবারও আমার অধিকার নাই! ভীষণ অনুতাপানলে আমার হৃদয় প্রতিমুহূর্তে তিল তিল করিয়া দগ্ধ হইতেছে, মৃত্যুর পূর্বে যে শান্তিলাভ করিব, পরেও শান্তিলাভের আশা করি না।

সুপরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে পূর্ণ; পাণ্ডুলিপিখানির আদ্যোপান্ত বঙ্গভাষায় লিখিত। সেইসঙ্গে একখানি পত্রও গ্রথিত দেখিলাম; অগ্রে সেই পত্রখানি আগ্রহভরে পাঠ করিলাম। তাহাতে এইরূপ লিখিত ছিল:

"প্রিয়বরেষু,

হঠাৎ তুমি আমার নিকট হইতে এরূপ একখানি পত্র পাইবে, তাহা বোধহয় তোমার স্বপ্নের অগোচর! কিন্তু স্বপ্নের অগোচর অনেক কাণ্ডও আমাদের এই সুখদুঃখপূর্ণ পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে নিত্য ঘটিতেছে। অতএব আমার এই পত্রখানি দেখিয়া বিস্মিত বা বিচলিত হইও না।

ইংলণ্ড হইতে জাহাজ ভাসাইয়া যখন উদ্দেশ্যহীনভাবে অনন্ত মহাসমুদ্রে যাত্রা করি, তখন এ কথা একবারও মনে হয় নাই যে, জীবনে তোমাকে পত্র লিখিতে পারিব। ইংলণ্ড হইতে চিরবিদায় লইবার পূর্বে তোমার ন্যায় প্রিয় বন্ধুর সহিত কেন দেখা করিয়া আসি নাই, এ প্রশ্ন তোমার মনে উদিত হওয়াই স্বাভাবিক। আমার এই বিচিত্র ব্যবহারে তোমার মনে যে দুঃখ ও অভিমানের সঞ্চার হইয়াছে, তাহাও আমি বুঝিতে পারিয়াছি; কিন্তু কেন যে দেখা করি নাই এক কথায় তাহার কৈফিয়ৎ দিতে পারিব না। আমার প্রেরিত এই পাণ্ডুলিপি যদি তুমি ধৈর্য ধারণ কারয়া পাঠ কারতে পার, তাহা হইলে ইংলণ্ড হইতে আমার আকস্মিক অন্তর্ধানের কারণ হয়ত বুঝিতে পারিবে; সুতরাং সে সম্বন্ধে এখানে স্বতন্ত্র আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

তুমি জান চিত্র-শিল্পে সাফল্য লাভই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল; সেই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য আমি ইংলণ্ডে গিয়াছিলাম; ফ্রান্স দেশেও কিছুকাল বাস করিয়াছি। ইচ্ছা ছিল ভবিষ্যতে সুযোগ পাইলে ইটালীর ফ্লরেন্স, জর্মনীর মিউনিক ও চিত্রশিল্পের অন্যান্য পীঠস্থানে পদার্পণ করিয়া শিক্ষা সম্পূর্ণ করিব; কিন্তু মানুষ এক ভাবিয়া কাজ আরম্ভ করে, তাহার ফল অন্যরূপ হয়। সুদীর্ঘ কাল অনন্য মনে শিল্প-সাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া আমি যে আংশিক

রূপে সাফল্য লাভ করিয়াছিলাম, তাহা তোমার অজ্ঞাত নহে। তুমি জান আমার অঙ্কিত কয়েকখানি তৈলচিত্র ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত সমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছিল ; ইংলণ্ডের সাধারণ চিত্রশালায় আমার অঙ্কিত দুইখানি চিত্র সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। ইউরোপে শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্বক স্বদেশবাসিগণের সম্মুখে যদি কখনও চিত্রশিল্পের মহিমময় আদর্শ সংস্থাপন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার এই তুচ্ছ জীবন ধন্য হইত।

কিন্তু যে উচ্চ আকাঙ্ক্ষায় এতদিন আমার হৃদয় পূর্ণ ছিল, সে আকাঙ্ক্ষা আমার আর নাই, এখন আমার জীবন সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে প্রধাবিত। কেন এরূপ হইল, এই পরিবর্তনের কারণ কী, তাহা এই পাণ্ডুলিপি পাঠ করিলেই তুমি বুঝিতে পারিবে। তুমি আমার সম্বন্ধে যাহাই ভাব, দয়া করিয়া আমাকে ভুল বুঝিও না। তোমাদের হয়ত বিশ্বাস, একটি ইহুদী যুবতীর প্রেমে পড়িয়াই আমি অধঃপাতে গিয়াছি। তোমাদের বোধহয় ধারণা, সেই যুবতী তাহার পিতার বিপুল ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারিণী। কিন্তু আমার অধঃপতনের কারণ স্বতন্ত্র। তুমি শুনিলে বিস্মিত হইবে, আমার প্রিয়তমা রেবেকার পিতা মৃত্যুকালে তাহার জন্য একটি কপর্দকও রাখিয়া যান নাই। আমার পিতা কমিসেরিয়টে চাকরি করিয়া বহু অর্থ উপার্জন করিলেও তিনিও বিশেষ কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম, চিত্রশিল্পের আলোচনায় যে অর্থোপার্জন হইবে তাহাতেই গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্বাহ করিতে পারিব ; কিন্তু ঘটনাচক্রে পড়িয়া সে পথও ত্যাগ করিতে হইয়াছে। এখন ভগবানই আমার একমাত্র সহায়। কিন্তু মহা পাপে আমার জীবন কলঙ্কিত, বোধহয় ভগবানের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিবারও আমার অধিকার নাই! ভীষণ অনুতাপানলে আমার হৃদয় প্রতিমুহূর্তে তিল তিল করিয়া দগ্ধ হইতেছে, মৃত্যুর পূর্বে যে শান্তিলাভ করিব, পরেও শান্তিলাভের আশা করি না।

তোমাকে আমার পাপ-জীবনের কাহিনী লিখিয়া পাঠাইলাম। আমার মনের গুরুভার কিঞ্চিৎ লঘু করিবার আশাতেই এরূপ করিলাম। শুনিতে পাই নিজের পাপের কথা গোপন না করিয়া তাহা জনসমাজে প্রকাশ করিলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। এ কথা সত্য কি না বলিতে পারি না; কিন্তু আমি ইহা সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করি। এইজন্যই তোমার নিকট আমার একটি অনুরোধ আছে। তুমি আমার প্রিয় বন্ধু, আমাকে তুমি যথেষ্ট স্নেহ কর; তোমার নিকট আমার শেষ অনুরোধ, তুমি আমার এই পাণ্ডুলিপিখানি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিও। ইহা পুস্তকরূপে প্রকাশিত হইলে আমার স্বদেশবাসিগণ বুঝিতে পারিবেন, তাঁহাদের স্বদেশীয় একটি তরলমতি যুবক প্রবাসে একজন নরপিশাচের কুহক জালে বিজড়িত হইয়া অজ্ঞাতসারে কী ভীষণ দুষ্কর্ম করিয়াছে; এবং জীবনের উচ্চ আশা কিরূপে ব্যর্থ করিয়া জীবন্মৃতভাবে কালযাপন করিতেছে!

আর, অন্যে আমাকে ক্ষমা করুক না করুক, আশা করি তুমি আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধ মার্জনা করিবে। আমি যে অজ্ঞাতবাসে যাত্রা করিয়াছি, সেখান হইতে আর আমার প্রত্যাগমনের আশা করিও না। মনে করিও, আমি ইহলোকে বর্তমান নাই, পৃথিবীর সহিত আমার সকল সম্বন্ধ শেষ হইয়াছে। স্মরণ রাখিও, পৃথিবীতে আমার ন্যায় হতভাগ্য ও দুঃখী আর কেহই নাই। তোমার এই জীবন্মৃত বন্ধুর কথা কখনও কখনও স্মরণ করিও; ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

তোমার হতভাগ্য বন্ধু
নরেন সেন

পত্রখানি পাঠ সমাপ্ত করিয়া আমি বন্ধু-প্রেরিত পাণ্ডুলিপিতে মনঃসংযোগ করিলাম। বাহিরে ঝড়ের তুমুল শব্দ, কিন্তু আমার রুদ্ধদ্বার-কক্ষমধ্যে টেবিলে সংরক্ষিত ঘড়িটির অবিশ্রান্ত টিক-টিক শব্দ ভিন্ন অন্য শব্দ ছিল না। পাণ্ডুলিপিখানি যখন পড়িতে আরম্ভ করিলাম, তখন রাত্রি সাড়ে দশটা বাজিতে দশ মিনিট বাকি আছে। সমস্ত রাত্রিএকাসনে বসিয়া বিনিদ্রভাবে একখানি পুস্তক পাঠ করা সহজ

নহে; কিন্তু আশ্চর্যের কথা, ইহাতে আমি বিন্দুমাত্রও শ্রান্তি অনুভব করি নাই; মুহূর্তের জন্যও আমার নিদ্রাকর্ষণ হয় নাই।

আমি জীবনে অনেক কৌতূহলোদ্দীপক রোমাঞ্চকর বিচিত্র উপন্যাস পাঠ করিয়াছি; ইংরাজী ফরাসী ও জর্মন ভাষায় কত বিভিন্ন ভাবের ও অদ্ভুত ঘটনাপূর্ণ উপন্যাস পাঠ করিয়াছি তাহার সংখ্যা নাই। উপন্যাস-জগতে ফরাসী সাহিত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী নাই, ইংরাজী ও জর্মন সাহিত্যও এ বিষয়ে হীন নহে; কিন্তু সত্য কথা বলিতে কা, নরেন সেনের প্রেরিত পাণ্ডুলিপির ন্যায় কৌতূহলোদ্দীপক অদ্ভুত কাহিনী পূর্বে কোনও ভাষায় পাঠ করিয়াছি বলিয়া মনে হইল না; কিন্তু মিথ্যা বলিয়া মনে করিবারও উপায় নাই।

পাঠ-শেষে অনেকক্ষণ চিন্তাকুল চিত্তে বসিয়া রহিলাম। তাহার পর উঠিয়া পূর্বদিকের বাতায়ন খুলিয়া দেখিলাম, আকাশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে. কোনও দিকে মেঘের চিহ্নমাত্র নাই; পূর্বাকাশের বহু উর্দ্ধে একটি বিগতজ্যোতি তারকা প্রভাত-কল্পা শর্বরীর নিষ্প্রভ দীপালোকের ন্যায় স্তিমিত নেত্রে উষাগমের আভাস জ্ঞাপন করিতেছিল।

নরেন সেনের প্রেরিত পাণ্ডুলিপিখানি আজ তোমাকে ডাকে পাঠাইতেছি; শীঘ্র ইহা কোনও প্রেসে ছাপিতে দিবে। এখানে বাঙ্গলা বহি ছাপিবার সুযোগ থাকিলে তোমার উপর আর এ ভার চাপাইয়া তোমাকে বিপন্ন করিতাম না। নরেন তোমার বাল্যবন্ধু, আশা করি তুমি অন্তত তাহার প্রতি কর্তব্যের অনুরোধেও সন্তুষ্ট চিত্তে এই ভার গ্রহণ করিবে। আমি শীঘ্রই বোধহয় দেশে ফিরিব, দেশে ফিরিয়া যেন পুস্তকখানি মুদ্রিত দেখিতে পাই।

তোমার স্নেহমুগ্ধ

এন. সিংহ

প্রথম পরিচ্ছেদ

নরেন সেনের আত্মকাহিনী

আমি বাল্যকাল হইতে প্রবাসী। আমি এক-পুরুষে প্রবাসী নহি, আমার পিতাও সুদীর্ঘকাল সুদূর প্রবাসে কাল যাপন করিয়াছিলেন; তিনি মিশর যুদ্ধের সময় 'কমিসেরিয়টে' চাকরি লইয়া তাঁহার মুরুব্বি কোন ইংরাজ সেনাপতির সহিত মিশর দেশে যাত্রা করেন। এই চাকরি করিতে করিতে সেই দেশেই তাঁহার মৃত্যু হয়। সে অনেক দিনের কথা।

সেকালে যাঁহারা 'কমিসেরিয়েটে' চাকরি লইয়া প্রবাসে যাত্রা করিতেন, তাঁহারা দুই চারি বৎসর চাকরি করিয়াই বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিতেন। আমার পিতা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান ছিলেন, কমিসেরিয়টের চাকরিতে তিনি তেমন অধিক অর্থ সঞ্চয় করিতে না পারিলেও অর্থাভাবে তাঁহাকে কোনও দিন কষ্ট পাইতে হয় নাই। ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মানুষের অদৃষ্টে সকল সুখ একসঙ্গে জোটে না; কিছুদিনের মধ্যেই আমার মাতৃবিয়োগ হইল। মৃত্যুকালে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ না হওয়ায় তিনি বড় অশান্তিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। আমার বয়স তখন প্রায় ষোল বৎসর।

পিতা প্রবাসে বসিয়াই আমার জননীর মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিলেন। নিদারুণ পত্নী-শোক, তাহার উপর আমার জন্য তিনি বড়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, কারণ দেশে আমার উপযুক্ত অভিভাবক কেহই ছিল না। তিনি কিছুদিনের জন্য স্বদেশে গিয়া আমাকে লইয়া মিশর দেশে যাত্রা করিলেন। তারপর আমি প্রায় পাঁচ বৎসরকাল পিতার সহিত সেখানে বাস করিয়াছিলাম; জন্মভূমিতে আর কখনও পদার্পণ করি নাই।

বাল্যকাল হইতেই চিত্রবিদ্যায় আমার বড় অনুরাগ ছিল।

মিশরে অবস্থানকালে আমি সযত্নে এই শিল্পের অনুশীলন করিয়াছিলাম, কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে আমি তেমন উন্নতি করিতে পারি নাই। অবশেষে আমার একুশ বৎসর বয়সের সময় পিতার অনুমতি লইয়া চিত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্য আমি ইংলণ্ডে যাত্রা করি। ইহার তিন বৎসর পর মিশরে জ্বর রোগে পিতার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। তাঁহার কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইয়া আমি ইংলণ্ড হইতে মিশরে যাত্রা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার শয্যা-প্রান্তে উপস্থিত হইবার পূর্বেই তিনি নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া দিব্যধামে প্রস্থান করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার সঞ্চিত নগদ টাকা-কড়ির কী ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা জানিতে পারি নাই, নগদ টাকাও বিশেষ কিছু পাই নাই; তবে তিনি যে বিশ হাজার টাকার জীবন-বীমা করিয়াছিলেন, সেই টাকাগুলি পরে আমার হস্তগত হইয়াছিল। মিশরে অবস্থানকালে অনেক টাকা ব্যয় করিয়া তিনি তাঁহার গৃহে সেই দেশের অনেক দুর্লভ ও মূল্যবান প্রাচীন সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকের নিকট সেই সকল সামগ্রীর যথেষ্ট মূল্য থাকিলেও বাজারে কোন মূল্য ছিল না। মিশর হইতে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন কালে আমি সেই সকল সামগ্রীর অধিকাংশই সেখানে নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় করিয়া আসি; কেবল পিতার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় কয়েকটি সামগ্রী ইংলণ্ডে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম। তাহাতেই আমার ভবিষ্যৎ সর্বনাশের সূচনা হইয়াছিল; কিন্তু সে কথা পরে বলিব।

কয়েক বৎসর পূর্বে ইংলণ্ডে—বিশেষতঃ রাজধানী লণ্ডন নগরে যে ভয়ঙ্কর মড়ক উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার কথা বোধহয় তুমি এত শীঘ্র বিস্মৃত হও নাই। ভীষণ প্লেগে কত লোকের বাস্তুভূমি শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে এখনও হৃদয় অবসন্ন হয়। ইংলণ্ডের অসংখ্য পরিবার আত্মীয়-বিয়োগ শোকে হাহাকার রবে চতুর্দিক পূর্ণ করিয়াছিল, গৃহে ও শ্মশানে কোনও পার্থক্য ছিল না;

যেদিকে দৃষ্টি পড়িত, সেইদিকেই স্তূপীকৃত মৃতদেহ, পূতিগন্ধে বায়ুমণ্ডল দূষিত।—ইংলণ্ডের সেই ঘোর দুর্দিনে প্লেগে আমার জীবনান্ত হইলেই আমার পক্ষে ভাল ছিল; কিন্তু বিধাতা তখন আমার অদৃষ্টে মৃত্যু লেখেন নাই; তাই এখন মৃত্যুযন্ত্রণা অপেক্ষাও অসহ্য যন্ত্রণা দিবারাত্রি সহ্য করিতে হইতেছে।—সেই কথা বলিবার জন্যই আজ লেখনী ধারণ করিয়াছি।

আমি আমার জীবনের এই আখ্যায়িকায় যে সময়ের কথা বলিতেছি, ইউরোপে তখনও প্লেগ দেখা দেয় নাই। তখন বোধহয় মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহ; মনে আছে, ইংলণ্ডের হাড়ভাঙা শীত তখন অনেকটা কম; সেই সময় একদিন রাত্রে আমি আমার চিত্রশালায় বসিয়া আমার অঙ্কিত কয়েকখানি চিত্র পরীক্ষা করিতেছিলাম; তন্মধ্যে একখানি চিত্র লণ্ডনের সাধারণ চিত্রশালায় পাঠাইবার কথা ছিল, সেখানি 'মহাভিঃনিষ্ক্রমণ' অর্থাৎ বুদ্ধদেবের সংসার-ত্যাগের চিত্র। সিদ্ধার্থ গভীর রাত্রে পরিজনবর্গের অজ্ঞাতসারে রথে আরোহণ পূর্বক পিতৃ-রাজধানী কপিলাবস্তু ত্যাগ করিয়াছিলেন; নিশাশেষে তিনি পিতৃ-রাজ্যের সীমাপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া রথ হইতে অবতরণ পূর্বক স্বীয় তরবারি দ্বারা মস্তকের নিবিড় কুন্তলরাশি ছেদন করিতেছেন; সারথি ছন্দক অদূরে দণ্ডায়মান হইয়া ভীতি-বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে রাজপুত্রের অদ্ভুত কার্য নিরীক্ষণ করিতেছেন; উষালোকে পূর্বাকাশ লোহিতাভ; দূরস্থ অরণ্যানী ও গিরিশ্রেণীর ধূসর বর্ণের উপর সেই লোহিত আভা ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে, সিদ্ধার্থের পরম সুন্দর দেবোপম বদনমণ্ডলেও তাহা প্রতিফলিত হইতেছে; এবং তাঁহার পদপ্রান্ত-প্রসারিত কুহেলিকাসমাচ্ছন্ন বঙ্কিমকায়া গিরিনদী যেন ঐন্দ্রজালিকের মায়াদণ্ড-স্পর্শে অন্ধকারের অবগুণ্ঠন ধীরে ধীরে অপসারিত করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে।—ইহাই চিত্রের বিষয়। এই চিত্রখানি আমি মনের মত করিয়া আঁকিয়াছিলাম, এবং তাহা এমন সুন্দর হইয়াছিল যে এই চিত্র অঙ্কিত করিয়া আমার মনে অহঙ্কারের সঞ্চার হয় নাই, ইহাও বলিতে পারি

না। অন্তত বুদ্ধদেব সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট চিত্র কোনও প্রতিভাবান চিত্রকর এ পর্যন্ত অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এইরূপ বোধ হয় না।

আমার হাতের কাজ শেষ হইলে আমার মাথায় কি খেয়াল চাপিল, সেই রাত্রেই আমি লণ্ডনের রাজপথে বাহির হইয়া পড়িলাম। সমস্ত দিন একাকী ঘরে বসিয়া থাকিয়া মনটা বড়ই দমিয়া গিয়াছিল, তাই একটু ঘুরিয়া আসিবার ইচ্ছা হইল। একবার মনে হইল তোমাদের বাসায় যাই, কিন্তু আর এক স্থানে আটকাইয়া পড়িলাম; আমার বাসার অদূরে আমার একটি বন্ধু বাস করিতেন, তাঁহাকে তুমি চিনিতে পার; তাঁহার নাম মিঃ বাম্‌ব্রিজ। তাঁহার বাসায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তিনি থিয়েটারে যাইবার জন্য সাজিতেছেন। তিনি মহা আগ্রহে আমাকেও তাঁহার সঙ্গে থিয়েটারে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

বন্ধুর অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিলাম না। তাঁহার সহিত একটি থিয়েটারে উপস্থিত হইলাম; কিন্তু কেন বলিতে পারি না, সেদিন অভিনয় আমার ভাল লাগিল না। বন্ধু নিবিষ্ট চিত্তে অভিনয় দেখিতে লাগিলেন, আমি সেখান হইতে বাহির হইয়া একটি চুরুট ধরাইয়া তাহা টানিতে টানিতে উদ্দেশ্যহীনভাবে পদব্রজে রাজপথ দিয়া চলিতে লাগিলাম।

আমি অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে চলিতেছিলাম, চলিতে চলিতে দেখিলাম, টেম্‌স্‌ নদীর ধারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। নদীতীরস্থ বাঁধের উপরে উঠিয়া দেখিলাম, নদীর নৈশ দৃশ্য অতি মনোহর, নদীবক্ষস্থ বিভিন্ন আকারের শত শত যানে শত শত আলোক জ্বলিতেছে; নৈশ কুজ্ঝটিকার ভিতর দিয়া তাহা দূর গগনবর্তী শত শত নক্ষত্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। আমি রাস্তার মোড় ঘুরিয়া সেই বাঁধের উপর দিয়া 'ক্লিয়োপেট্রার নিডল'র নিকট উপস্থিত হইলাম। আমার পশ্চাতে রেলের গাড়ি হুস-হুস শব্দে বাঁধের উপর দিয়া চলিয়া গেল।

রাজপথে তখন পথিকগণের গতিবিধি ছিল না। আমি একাকী একটি আলোক-স্তম্ভে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া অন্যমনস্কভাবে নদীর দিকে চাহিতেছি; এমন সময় আমার বোধ হইল, সেই বাঁধের অদূরবর্তী নদীগর্ভে যেন কোনও লোক একবার আর্তনাদ করিয়া উঠিল; বোধ হইল কোন লোক হঠাৎ জলে পড়িয়া গিয়া প্রাণভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিল। আমি সেই শব্দ শুনিবামাত্র এক লম্ফে নদীর কিনারায় গিয়া দাঁড়াইলাম। সেখানে একটি জেঠি ছিল, সেই জেঠিটি নদীর মধ্যে কিছু দূর পর্যন্ত প্রসারিত। উচ্চ বাঁধের আলোক-স্তম্ভ হইতে গ্যাসের আলোক নদীজলে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল; সেই আলোকে দেখিতে পাইলাম, একজন লোক প্রায় দশ বার হাত দূরে জলে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে, এবং যখন ভাসিয়া উঠিতেছে, তখন অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে জলের উপর দুই হাত তুলিয়া 'আমাকে বাঁচাও,' বলিয়া চিৎকার করিতেছে। আমি সেই বিপন্ন লোকটিকে জলের ভিতর হইতে কিরূপে তুলিব, কিরূপে তাহার প্রাণরক্ষা করিব, প্রথমে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া ক্ষণকাল কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম; দেখিলাম, লোকটি নাকানি চুবানি খাইতে খাইতে জেঠির অগ্রভাগে উপস্থিত হইয়াছে। আমি আর মুহূর্ত-মাত্র বিলম্ব না করিয়া বেগে জেঠির মাথায় গিয়া দাঁড়াইলাম।

সেখান হইতে জলে লাফাইয়া পড়িবার উদ্যোগ করিতেছি, মনে করিতেছি লোকটি এইবার ভাসিয়া উঠিলেই জলে লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিব; এমন সময় একখানি মেঘের অন্তরাল হইতে কৃষ্ণপক্ষের খণ্ডচন্দ্রের মৃদু আলোকে নদীবক্ষ বিকীর্ণ হইল; সেই অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে যাহা দেখিলাম, তাহা দেখিয়া আমি জলে লাফ দিয়া পড়িব কি, আমার হাত পা যেন আড়ষ্ট হইয়া গেল, নড়িবার পর্যন্ত শক্তি রহিল না! দেখিলাম, সেই মগ্নপ্রায় লোকটি জেঠির একটি শিকল ধরিয়া প্রাণের দায়ে জেঠির উপরে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, আর একটি লোক জেঠির উপরে দাঁড়াইয়া জলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া একখানি লাঠির খোঁচা দিয়া তাহাকে জলের মধ্যে ঠেলিয়া

ফেলিতেছে। লাঠির খোঁচা খাইয়া সেই মগ্নপ্রায় লোকটি আর জেঠির উপর উঠিবার চেষ্টা করিতে পারিল না, শিকল ছাড়িয়া দিল, এবং মুহূর্তমধ্যে জলে ডুবিয়া গেল। তাহার পর জোয়ারে সে কোথায় ভাসিয়া গেল, আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।

যে লোকটা লাঠির খোঁচায় তাহাকে জলে ফেলিয়া দিয়াছিল, এতক্ষণ পরে সে জেঠির উপর সোজা হইয়া দাঁড়াইল এবং মনের আনন্দে হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে হাসি যেন মানুষের হাসি নহে, যেন তাহা পিশাচের অট্টহাস্য! তাহার সেই হাসি শুনিয়া আমার অন্তরাত্মা পর্যন্ত শিহরিয়া উঠিল। লোকটার পৈশাচিক আচরণ দেখিয়া রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। দুই হস্তে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া তীব্র স্বরে বলিলাম, 'তুমি মানুষ, না পিশাচ? তুমি ইচ্ছা করিলে যাহাকে অনায়াসে জেঠির উপর টানিয়া তুলিতে পারিতে, যাহার প্রাণ রক্ষায় সমর্থ হইতে, তাহাকে তুমি লাঠির খোঁচা দিয়া জলে ডুবাইয়া মারিলে! এইভাবে একজন লোকের প্রাণ বধ করিতে তোমার মনে বিন্দুমাত্র কষ্ট হইল না, কষ্ট হওয়া দূরে থাক, তুমি এই ভয়ানক নিষ্ঠুরের কাজ করিয়া মনের আনন্দে হা হা করিয়া হাসিলে! মানুষ যে এমন নিষ্ঠুর হইতে পারে, তাহা জানিতাম না!'

সে, মানুষ অথবা পিশাচ যাহাই হউক আমার আক্রমণে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না; অবলীলাক্রমে আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দৃঢ় মুষ্টিতে আমার দক্ষিণ হস্ত চাপিয়া ধরিল, তাহার পর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল।

তাহার সেই ক্রূর দৃষ্টিপাতে আমি বিহ্বল হইয়া পড়িলাম, বায়ুপ্রবাহ-সঞ্চালিত বেতস পত্রের ন্যায় আমার সর্বাঙ্গ থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, আমার মাথা ঘুরিয়া উঠিল।

কেন এরূপ হইল তাহা বুঝিতে পারিলাম না, বৈদ্যুতিক ব্যাটারির সচল অবস্থায় তাহা স্পর্শ করিলে হাত যেমন অবশ ও আড়ষ্ট হইয়া যায়, সেই ব্যক্তির স্পর্শে আমার দেহের অবস্থাও সেইরূপ হইল। কোন মনুষ্যের অঙ্গ-স্পর্শে আর কখনও আমি এমন ভাব অনুভব করি

নাই। আমি সভয়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তাহার চক্ষু-তারকা জলন্ত অঙ্গারের মত জলিতেছে। আমি চেষ্টা করিয়াও তাহার চক্ষু হইতে দৃষ্টি ফিরাইতে পারিলাম না ; (তাহার সেই ভীষণ নির্মম অন্তর্ভেদী দৃষ্টি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি ভুলিব না। আমার সাধ্য হইলে আমি সেই নর-পিশাচকে ধাক্কা দিয়া জেটির উপর হইতে নদী-গর্ভে নিক্ষেপ করিতাম, কিন্তু তখন আমার সে শক্তি ছিল না, যেন সে মন্ত্রবলে আমাকে জড়বৎ করিয়া ফেলিয়াছিল।)

এই লোকটি কোন্ দেশের অধিবাসী, তাহা তাহার আকার দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম না ; তবে সে যে ইউরোপীয় নহে, তাহা তাহার বর্ণ ও পরিচ্ছদ দেখিয়া বুঝিতে পারা গেল। তাহার দেহ অত্যন্ত শীর্ণ, বার্ধক্যভরে কিঞ্চিৎ কুব্জ। তাহার ললাট ও গণ্ডস্থলের চর্ম কুঞ্চিত ; অস্থির উপর চর্মের আবরণ ভিন্ন তাহার দেহে যে মাংসের অস্তিত্ব আছে, এরূপ অনুমান হইল না। হস্তিদন্ত-নির্মিত কোন বস্তু দীর্ঘকাল ব্যবহার করিলে তাহার বর্ণ যেমন ঈষৎ পীতাভ হয়, এই লোকটির মুখের বর্ণও সেইরূপ। একটি কৃষ্ণবর্ণ স্থূল ও সুদীর্ঘ কোটে তাহার শীর্ণ দেহ আবৃত, পায়জামার উপর এই কোটটি তাহার জানু পর্যন্ত বিলম্বিত ছিল, তাহার মস্তকে একটি দীর্ঘাকৃতি চূড়াদার মোগলাই টুপি। মিশর দেশে এইরূপ পরিচ্ছদধারী লোক অনেক দেখিয়াছি ; অনেক আরবকেও এইরূপ পরিচ্ছদে সজ্জিত দেখা যায় ; সুতরাং অনুমান হইল, এই ব্যক্তি হয় আরব, না হয় মিশর দেশবাসী। তাহার ওষ্ঠে নিষ্ঠুরতা ও দৃঢ়তা অঙ্কিত, তাহার দৃষ্টি সর্পের দৃষ্টির ন্যায় ক্রূর। তাহার বয়স কত, রাত্রে তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না ; বয়স সম্ভবত আশি নব্বই হইতে পারে, একশত বলিলেও অসঙ্গত হয় না।

লোকটি দুই তিন মিনিট কাল দৃঢ় মুষ্টিতে আমার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া রাখিয়া আমার হাত ছাড়িয়া দিল, এবং আমাকে সরিয়া দাঁড়াইবার জন্য ইঙ্গিত করিল ; সূত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় আমি তৎক্ষণাৎ সরিয়া দাঁড়াইলাম। তখন সে আমার মুখের উপর

কটাক্ষপাত করিয়া, তাহার হস্তস্থিত কৃষ্ণবর্ণ সুদীর্ঘ যষ্টিতে ভর দিয়া ঈষৎ [illegible]ভাবে জেঠি হইতে ধীরে ধীরে নামিয়া গেল; তাহার পর অন্ধকারের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত জড়ের ন্যায় জেঠির উপর দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার ললাট ঘর্মাপ্লুত হইয়া উঠিয়াছিল; অঙ্গুলি দ্বারা ললাটের ঘর্ম অপসারিত করিয়া কিছুকাল স্তম্ভিতভাবে নদীর দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাহার পর জেঠি হইতে অবতরণ করিয়া বাসায় চলিলাম।

এই অদ্ভুত বৃদ্ধের সহিত সেই [illegible]। এই আমার প্রথম সাক্ষাৎ; কিন্তু প্রথম হইলেও ইহা শেষ সাক্ষাৎ নহে।—সে কথা ক্রমে জানিতে পারিবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মার্চমাসের এক শুক্রবারে মধ্যাহ্ন কালে আহারাদি শেষ করিয়া আমি আমার চিত্রশালায় একখানি নতুন ছবি অঙ্কিত করিবার আয়োজন করিতেছিলাম; এমন সময় বহির্দেশ হইতে সেই কক্ষের দ্বারে কে করাঘাত করিল। তখন আমার সহিত কাহারও দেখা করিতে আসিবার কথা ছিল না; কে আসিয়াছে দেখিবার জন্য দ্বার খুলিলাম, দেখিলাম আমার প্রাচীন বন্ধু মিঃ জর্জ বাকস্টার স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাগণকে লইয়া আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। মিঃ বাকস্টার লণ্ডনে বাস করেন না, লণ্ডনের কয়েক মাইল দূরে কোনও পল্লীতে তাঁহার বাস; তিনি মধ্যে মধ্যে লণ্ডনে সপরিবারে বেড়াইতে আসিতেন। অক্সফোর্ডে তাঁহার পুত্রের সহিত আমার বন্ধুত্ব হইয়াছিল, সেই উপলক্ষে আমি কখনও কখনও তাঁহাদের বাড়ি যাইতাম; কিন্তু তাঁহারা লণ্ডনে আসিয়া এ পর্যন্ত কোনদিন আমার বাসায় পদার্পণ করেন নাই; তবে, তাঁহারা আমার ঠিকানা জানিতেন।

জর্জ বাকস্টার প্রকাণ্ড জোয়ান, তাঁহার দেহ দৈর্ঘ্যে প্রায় সাড়ে চারি হাত হইবে। তাঁহার মুখখানি লাল, চক্ষুদুটি নীল, কেশগুলি

অতিরিক্ত স্বর্ণাভ। তাঁহার দেহে অসামান্য বল; কিন্তু বোধহয় তিনি নিজের বলের পরিমাণ বুঝিতেন না, কারণ বন্ধু-বান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ হইলে করকম্পনকালে তিনি তাঁহাদের হাত ধরিয়া এমন জোরে ঝাঁকুনি দিতেন যে, হাতে পাঁচ দিন বেদনা থাকিত। তাঁহার স্ত্রী খর্বকায়া, অনেক বয়স হইলেও তাঁহাকে দেখিয়া যুবতী বলিয়া বোধ হইত; এমন কি, তাঁহার বড় মেয়েটি অপেক্ষাও তাঁহাকে অল্পবয়স্কা দেখাইত। মিঃ বাকস্টারের পুত্র অক্সফোর্ডে পড়িত, তাঁহার হৃদয় বড় ধর্মপ্রবণ; ঘোড়দৌড়, ফুটবল, শিকার প্রভৃতি ব্যায়ামে তাহার অনুরাগ ছিল না, এজন্য তাহার পিতা তাহাকে অপদার্থ মনে করিতেন; ভাবিতেন সে কখনও মানুষ হইতে পারিবে না। তাঁহার কন্যাদ্বয় মেরী ও ইথেল বালিকা বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করিত, ছুটির সময় কখনও কখনও বাড়ি আসিত। তাহারা ভাল পিয়ানো বাজাইতে ও গান করিতে পারিত। কিন্তু কর্তাটি সে রসে বঞ্চিত ছিলেন, গান বাজনা তাঁহার ভাল লাগিত না; তবে তাঁহার থিয়েটার দেখিবার শখ ছিল।

মিঃ বাকস্টার সশব্দে আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়া সহাস্যে বলিলেন, 'যাহোক, এবার তোমাকে পাকড়াইয়াছি! লণ্ডনে মধ্যে মধ্যেই আসি, কিন্তু তোমার সঙ্গে একবারও সাক্ষাৎ হয় না।'—তাহার পর তিনি সস্নেহে আমার হাত ধরিয়া এমন ঝাঁকুনি দিলেন যে, হাতখানা পাঁচ মিনিটকাল অবশ হইয়া রহিল। কিন্তু তিনি আমার শোচনীয় অবস্থার প্রতি লক্ষ না করিয়া বলিলেন, 'ব্যাপার কী বল দেখি? এমন গলির মধ্যে কি ভদ্রলোকে বাসা করে! গাড়ি হইতে নামিয়া আধ ঘণ্টা কাল তোমার বাসা খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রান হইয়াছি, শেষে একটা চামারের ছেলে আমাকে তোমার বাসা দেখাইয়া দিল।'

আমি হাসিয়া বলিলাম, 'চিত্রবিদ্যায় আমি কিরূপ বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছি, ইহাতেই তাহা বুঝিতে পারিতেছেন; একটা সামান্য চামারের ছেলে পর্যন্ত আমার বাসা চেনে। আমার

বাসার সন্ধানে আপনাদের হয়রান হইতে হইয়াছে শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলাম।'

মিঃ বাকস্টার বলিলেন, 'এখন তোমাকে কী করিতে হইবে শোন। প্রথমে আমাদের সঙ্গে সাধারণ চিত্রশালায় যাইবে; সেখানে তোমার যে ছবি দিয়াছ, সংবাদপত্রে তাহার বড় প্রশংসা বাহির হইয়াছে, আমরা সেই ছবি দেখিতে চাই। সেখান হইতে ফিরিয়া আমাদের সহিত সান্ধ্য ভোজন শেষ করিবে; তাহার পর সকলে মিলিয়া একত্র থিয়েটারে যাওয়া যাইবে। তোমার কোনরকম ওজর আপত্তি শুনিব না। আমরা পল্লীগ্রামের লোক, আমাদের সর্বদা শহরে আসা ঘটে না; কিন্তু যখন শহরে আসিয়াছি, তখন একটু আমোদ প্রমোদে সময়টা কাটাইতে হইবে। চারি পাঁচ মাস পরে তোমার সঙ্গে দেখা, আজ যে তোমাকে সহজে ছাড়িব, তাহা মনে করিও না।'

মিসেস বাক্স্টার ও তাঁহার কন্যাদ্বয় কর্তার কথার প্রতিধ্বনি করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'না না, আজ উঁহাকে সহজে ছাড়া হইবে না।'

অগত্যা আমাকে তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে হইল। গাড়িতে উঠিয়া প্রথমে আমরা সাধারণ চিত্রশালায় যাত্রা করিলাম। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, অনেক ভদ্রমহিলা ও পুরুষ বিভিন্ন সময়ের বিখ্যাত চিত্রকরগণের অঙ্কিত ও সুশৃঙ্খলাক্রমে সংরক্ষিত চিত্রগুলি দেখিতেছেন। আমার অঙ্কিত দুইখানি চিত্র সকলেরই খুব ভাল লাগিয়াছিল। মিঃ বাকস্টার তাহা দেখিয়া এত আনন্দিত হইলেন যে, আদর করিয়া সবলে আমার পিঠ চাপড়াইলেন; আমি অতি কষ্টে তাঁহার সেই আনন্দের বেগ বরদাস্ত করিলাম।

মিঃ বাক্স্টারের সহিত চিত্রশালার বিভিন্ন গ্যালারির মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে এক স্থানে আসিয়া আমার সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, চারিদিক অন্ধকার বোধ হইল; শেষে দাঁড়াইয়া থাকিতে কষ্ট হওয়ায় একখানি বেঞ্চির উপর বসিয়া পড়িলাম। হঠাৎ কেন এইরূপ হইল,

বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু দুই এক মিনিটের মধ্যেই প্রকৃতিস্থ হইয়া একবার চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম; কিছু দূরে দেখিতে পাইলাম, একটি বৃদ্ধ লাঠির উপর ভর দিয়া নত দেহে আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহাকে দেখিবামাত্র মনে পড়িল, কয়েক দিন পূর্বে রাত্রিকালে নদীতীরে জেটির উপর যে বৃদ্ধের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এ সেই। সেদিন রাত্রে অস্ফুট চন্দ্রালোকে তাহার মুখ ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই, আজ দিবালোকে তাহার চোখ মুখ ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবার সুবিধা পাইলাম। পৈশাচিকতা ও ধূর্ততা তাহার মুখে পরিস্ফুট; সেই বৃদ্ধকে দেখিয়া কেবল যে আমিই অভিভূত হইয়াছিলাম, এরূপ নহে; তাহার কি এক অজ্ঞাত শক্তি ছিল বলিতে পারি না, কিন্তু দেখিলাম, দর্শকগণ সকলেই ত্রস্তভাবে তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিতে লাগিল; বিষধর সর্প দেখিলে লোকে যেভাবে সরিয়া দাঁড়ায়, তাহাকে দেখিয়াও সকলে ঠিক সেইভাবে সরিয়া যাইতে লাগিল।

বৃদ্ধ চলিতে চলিতে হঠাৎ পশ্চাতে চাহিয়া যেন কাহারও প্রতীক্ষায় একবার লাঠির উপর ভর দিয়া দাঁড়াইল; অল্পক্ষণ পরে একটি সুন্দরী তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। যুবতীটিকে দেখিয়াই বুঝিলাম, তিনি ইহুদীর কন্যা; কিন্তু এমন সুন্দরী আমি জীবনে কখনও দেখি নাই; যেন শাপভ্রষ্টা দেব-কন্যা। যুবতীর দেহ সমুন্নত; পরিপুষ্ট দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি সুগঠিত, মুখখানির কোথাও কোন খুঁত নাই। তাঁহার মস্তকে সুকৃষ্ণ নিবিড় কুন্তলদাম; পরিচ্ছদটি যেমন সুদৃশ্য সেইরূপ সুরুচি-ব্যঞ্জক, তাহা তাঁহার দেহে সুন্দর মানাইতেছিল। তাঁহার সুবঙ্কিম কৃষ্ণবর্ণ ভ্রূযুগলের নিচে ভাবময় দীপ্তিশীল প্রশস্ত চক্ষুদুটি দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

আমি চিত্রকর, মনুষ্য-মুখের ভাব-বৈচিত্র্য লক্ষ করাই আমার কাজ; চিত্রকরেরা মানুষের মুখ দেখিয়াই অনেক সময় তাহার চরিত্রগত বিশেষত্ব নির্ণয় করেন; মুখের ভাব দেখিয়া হৃদয়ের ভাব বিশ্লেষণ করেন। আমি মুগ্ধ নেত্রে কিছুকাল সেই যুবতীর মুখের

দিকে চাহিয়া রহিলাম; তাঁহার মুখ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, কোন গভীর দুঃখে ও বেদনায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ; পূর্ণিমার চন্দ্র শরতের মেঘে আচ্ছন্ন হইলে যেমন দেখায়, দুঃখের মেঘে ঢাকা তাঁহার তরুণ সুন্দর মুখখানি সেইরূপ দেখাইতেছিল। এমন অপরূপ লাবণ্যবতী রূপসীর এই নবীন বয়সে এমন কী দুঃখ, জানিতে কৌতূহল হইল। কিন্তু কিরূপে সেই যুবতীর মনঃকষ্টের পরিচয় পাইব? পথে চলিতে চলিতে প্রত্যহই তো কত লোক দেখিতে পাই, তাহাদের মুখ দেখিয়া কত সময় তাহাদের অন্তর্নিহিত বেদনার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি; কিন্তু কয়জনের শোক দুঃখ বা বেদনার কথা জানিবার জন্য এমন আগ্রহ হয়?

যে সকল পুরুষ ও রমণী চিত্রদর্শন উপলক্ষে সেই চিত্রশালায় সমাগত হইয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই সবিস্ময়ে সেই যুবতীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। পূর্বোক্ত বৃদ্ধটি যুবতীকে সঙ্গে লইয়া চিত্রশালার বিভিন্ন গ্যালারিতে ঘুরিতে ঘুরিতে অদৃশ্য হইল।

মিঃ বাকস্টারের জ্যেষ্ঠা কন্যা মেরী এতক্ষণ পরে আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'মিঃ সেন, ঐ যে বৃদ্ধটি গেল, তাহার মুখের দিকে লক্ষ করিয়াছেন কি? ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষের মুখ যে এমন পৈশাচিকতাপূর্ণ হইতে পারে, না দেখিলে তাহা বিশ্বাস করিতাম না।'

আমি বলিলাম, 'এ কথা সত্য; মানুষের মুখে এমন হিংস্র ও ক্রুর ভাব আর কখনও দেখি নাই; লোকটা কে? দেখিয়া ইউরোপীয় বলিয়া বোধ হয় না; আমাদের এশিয়াখণ্ডেও এমন কদাকার মুখ অত্যন্ত বিরল।

মেরী বলিল, 'লোকটা কে তাহা জানি না, জানিবার বড় আগ্রহ নাই। এমন মুখ পুনর্বার দৃষ্টিপথে পতিত না হওয়াই সৌভাগ্যের বিষয় মনে করি।'

ইতিমধ্যে মিঃ বাকস্টার গ্যালারির অন্য দিক হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে আমার কাছে আসিয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন, 'সেন, মিনিট দুই পূর্বে একটি পরমা সুন্দরী মেয়েকে সঙ্গে লইয়া একটা বুড়ো এই দিক

দিয়া গিয়াছে, দেখিয়াছ? লোকটার মুখ কী ভয়ঙ্কর বিশ্রী! তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হঠাৎ আমার বুকের মধ্যে এমন ঝাঁকুনি লাগিয়াছে যে, আমি কিছুতেই সামলাইয়া উঠিতে পারিতেছি না।'

মিসেস বাক্‌স্টার বলিলেন, 'উহার সঙ্গে যে যুবতীটিকে দেখিলাম, সে আশ্চর্য সুন্দরী, কিন্তু তাহাকে বড়ই বিমর্ষ বোধ হইল; এই যুবতী বুড়োটার কে জানিতে আগ্রহ হয়।'

ছোট মেয়ে ইথেল বলিল, 'সে বোধহয় বুড়োর নাতনী।'

মিঃ বাকস্টার বলিলেন, 'নাতনী কেন, আমার বোধহয় মেয়েটি ঐ বুড়োর নাতির নাতনী। বুড়োটা কি এ কালের লোক? উহার বয়সের গাছ পাথর নাই। তুমি কী বল, মিঃ সেন?'

আমি তাঁহার এই প্রশ্নের কি উত্তর দিয়াছিলাম স্মরণ নাই। অল্পক্ষণ পরে চিত্রশালা হইতে বাহির হইয়া বন্ধুগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। তাঁহারা কিছুতেই ছাড়িবেন না, বলিলেন, একত্র আহারাদি করিয়া থিয়েটারে যাইতে হইবে।—অনেক কষ্টে তাঁহাদের হাত ছাড়াইয়া বাসায় ফিরিলাম। পথে চলিতে চলিতে সেই অদ্ভুত বৃদ্ধ ও তাহার সঙ্গিনী যুবতীর কথা পুনঃ পুনঃ আমার মনে পড়িতে লাগিল; তাহাদের চিন্তা কোনক্রমেই মন হইতে দূর করিতে পারিলাম না।

বাসায় ফিরিয়া আরাম-কেদারায় বসিয়া একখানি পুস্তকে মনঃসংযোগের চেষ্টা করিলাম, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। দেখিলাম, সেই পুস্তকের কালো কালো অক্ষরের ভিতর দিয়া যেন সেই বৃদ্ধের পৈশাচিক মূর্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে! ক্রমাগত তাহার কথাই মনে হইতে লাগিল। মন হইতে সেই ভাব দূর করিবার জন্য অনেকক্ষণ পর্যন্ত বহু চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারিলাম না; যতই বিষয়ান্তরে মনোনিবেশের চেষ্টা করি, ততই সেই বৃদ্ধের বিকট মূর্তি আমার মানস-নেত্রের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে।

হঠাৎ মনে হইল, মধ্যাহ্নের ডাকে চিঠিপত্র কি আসিয়াছে দেখা হয় নাই। চিঠিগুলি খুলিয়া দেখিলাম দুইখানি নিমন্ত্রণ-পত্র

আসিয়াছে ; একখানি নাচের ও অন্যখানি গান শুনিবার নিমন্ত্রণ-পত্র। সেদিন আমার নাচে যোগ দিবার ইচ্ছা ছিল না ; মনে হইল, কিছুকাল গান শুনিয়া আসিলে মনের চাঞ্চল্য দূর হইতে পারে ; তাই আমি পোশাক পরিয়া গানের মজলিসে চলিলাম। মার্কুইস অব্ বেকেনহাম সেইদিন সন্ধ্যার পর তাঁহার গানের মজলিসে যোগদান করিবার জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

রাত্রি নয়টার সময় রিজেন্ট স্ট্রীটে বেকেনহাম ভবনে উপস্থিত হইলাম ; দ্বার-প্রান্তে লেডী বেকেনহামের সহিত সাক্ষাৎ হইল ; তাঁহাকে নমস্কার করিয়া প্রকাণ্ড ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিলাম। এই পরিবারটি গীতবাদ্যে বড়ই অনুরক্ত। ইংলণ্ডের অনেক গীতবাদ্যে খ্যাতনামা গায়ক ও গায়িকার সহিত তাঁহাদের পরিচয় আছে। গীতবাদ্যে উৎসাহ দানের জন্য তাঁহারা প্রতি বৎসর প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন।

ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিয়া সৌভাগ্যক্রমে একটি পরিচিত ভদ্রলোককে সেই কক্ষের এক প্রান্তে উপবিষ্ট দেখিতে পাইলাম। তিনি লেডী বেকেনহামের দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় ও বেহালায় একজন ওস্তাদ। আমি তাঁহার পাশে গিয়া একখানি চেয়ার দখল করিয়া বসিলাম।

সাময়িক দুই একটি কথাবার্তার পর সেই বন্ধুটি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আজ এই মজলিসে যে নবাগত যুবতীটি বেহালা বাজাইবেন, তাঁহার পরিচয় জানেন কি ?'

আমি বলিলাম, 'না, আমি তাঁহাকে চিনি না।'

বন্ধুটি বলিল, 'লেডী বেকেনহাম বলিতেছিলেন, এই যুবতীর বেহালায় চমৎকার হাত, বড় বড় পুরুষ বেহালাবাদককে তাঁহার নিকট হার মানিতে হয়। প্যারিসে এই যুবতীর সহিত লেডী বেকেনহামের পরিচয় হয়,—তিনি তাঁহার রূপ গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসেন।'

কি কারণে বলিতে পারি না, হঠাৎ আমার মনে হইল,

চিত্রশালায় সেই কদাকার বৃদ্ধের সহিত যে যুবতীটিকে দেখিয়াছিলাম ইনি কি তিনি ?

অতঃপর আমি বন্ধুটিকে বলিলাম, 'এই যুবতী যখন লেডী বেকেনহামের অতিথি, তখন বোধহয় তাঁহার সহিত আপনার আলাপ হইয়াছে ?'

বন্ধু বলিলেন, 'না, এখন পর্যন্ত সে সুবিধা ঘটিয়া উঠে নাই। শুনিয়াছি একটা বানর-মুখো বুড়ো এই যুবতীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায়,—এক মুহূর্ত তাঁহাকে চক্ষুর আড়ালে যাইতে দেয় না। এমন সুন্দরী যুবতীকে এ রকম জানোয়ারের সঙ্গে বেড়াইতে দেখিয়া অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন।

আমি বলিলাম, 'আপনার কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে পূর্বে তাহাদের কোথায় দেখিয়াছি। বৃদ্ধটির বয়স বোধহয় একশো বৎসরেরও উপর।'

বন্ধু বলিলেন, 'তাহা হইলে যুবতীর সঙ্গে না বেড়াইয়া সেই বুড়োর এতদিন কবরে বিশ্রাম গ্রহণ করাই উচিত ছিল। আপনি তাহাদের কোথায় দেখিয়াছেন ?'

আমি বলিলাম, 'তাহাদের উভয়কে সাধারণ চিত্রশালায় দেখিয়াছি। যুবতীটি সত্যই বড় সুন্দরী। দেখিয়া অনুমান হইয়াছিল তিনি ইংরাজের কন্যা নহেন।'

বন্ধু বলিলেন, 'না, তিনি ইহুদীর মেয়ে। শুনিয়াছি তিনি অনেক দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন, ইংরাজীও বেশ ভাল বলিতে পারেন।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সেই বৃদ্ধটি কোন্ দেশের লোক ? তাহাকে দেখিয়া ইউরোপের লোক বলিয়া বোধ হয় না।'

বন্ধু বলিলেন, 'তাহার পরিচয় কিছুই জানি না, তাহার জীবন রহস্যাবৃত। তাহার সম্বন্ধে কেহ কোন খাঁটি খবর দিতে পারে না। এই যুবতীর সহিতই বা তাহার কী সম্বন্ধ, তাহাও সাধারণের অজ্ঞাত।'

বন্ধুর কথা শেষ হইতে না হইতেই লেডী বেকেনহাম সেই যুবতীকে সঙ্গে লইয়া ড্রইংরুমে প্রবেশ করিলেন। সেই সুসজ্জিত

কক্ষে বিদ্যুতের উজ্জ্বল প্রভায় যুবতীর রূপ যেন দ্বিগুণ বর্ধিত হইল। লেডী বেকেনহামও সুন্দরী, কিন্তু এই যুবতীর রূপের সহিত তাঁহার রূপের তুলনা হয় না। সুন্দরীদ্বয়ের পশ্চাতে সেই কদাকার বৃদ্ধ ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিল। বহুসংখ্যক রূপবান যুবক ও রূপসী যুবতীর মধ্যে সেই বৃদ্ধকে আরও অধিক কদাকার বোধ হইতে লাগিল। যেমন হংসের সভায় কাক আসিয়া বসিলেন। আমি কালা বাঙালী, সাহেবী পরিচ্ছদে আমাকে সেই শুভ্র নরনারীর মজলিসে দেখিয়া ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাকের সহিত আমার তুলনা চলিতে পারিত; কিন্তু তোমরা জান, পিশাচের মুখের আদর্শ লইয়া ভগবান আমার মুখ গঠন করেন নাই। দেখিলাম, বৃদ্ধ এবার কালো মখমলের খুব জমকালো পোশাক পরিয়া আসিয়াছে, তাহার দেহে লম্বা পার্শি কোট, মাথায় লাল রংএর চুড়াদার আরবী টুপি। সে লাঠিতে ভর দিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া একখানি চেয়ার অধিকার করিয়া বসিল এবং চেয়ারে ঠেস দিয়া জোরে জোরে হাঁপাইতে লাগিল; বোধ হইল গাড়ি হইতে নামিয়া এইটুকু আসিতেই সে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছে। বৃদ্ধ উপবেশন করিলে তাহার সঙ্গিনী যুবতী গৃহস্বামিনীর ইঙ্গিতে আর একখানি চেয়ারে বসিলেন।

সেদিন সেই মজলিসে আর একজন বিখ্যাত বেহালাদার নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন; তিনি বেহালার একজন ওস্তাদ বলিয়া লণ্ডনের সম্ভ্রান্ত সমাজে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। গৃহস্বামিনীর ইঙ্গিতে তিনিই প্রথমে বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। আমি বেহালা শুনিব কি, বিহ্বল দৃষ্টিতে সেই বৃদ্ধের মুখের দিকেই চাহিয়া রহিলাম, অন্য বিষয়েও মনঃসংযোগ করিতে পারিলাম না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমার মাথা গরম হইয়া উঠিল, ললাটে স্থূল ঘর্মবিন্দু সঞ্চিত হইল; আমি আর বসিয়া থাকিতে না পারিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলাম।

আমার পার্শ্বোপবিষ্ট বন্ধুটি সহসা আমাকে উঠিতে দেখিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি উঠিলেন যে?'

তিজনানায় সেই কদাকার বৃদ্ধের সহিত যে যুবতীটিকে দেখিয়াছিলাম, ইনি কি তিনি ?

অতঃপর আমি বন্ধুটিকে বলিলাম, 'এই যুবতী যখন লেডী বেকেনহামের অতিথি, তখন বোধহয় তাঁহার সহিত আপনার আলাপ হইয়াছে ?'

বন্ধু বলিলেন, 'না, এখন পর্যন্ত সে সুবিধা ঘটিয়া উঠে নাই। শুনিয়াছি একটা বানর-মুখো বুড়ো এই যুবতীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায়,—এক মুহূর্ত তাঁহাকে চক্ষুর আড়ালে যাইতে দেয় না। এমন সুন্দরী যুবতাকে এ রকম জানোয়ারের সঙ্গে বেড়াইতে দেখিয়া অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন।

আমি বলিলাম, 'আপনার কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে পূর্বে তাহাদের কোথায় দেখিয়াছি। বৃদ্ধটির বয়স বোধহয় একশো বৎসরেরও উপর।'

বন্ধু বলিলেন, 'তাহা হইলে যুবতীর সঙ্গে না বেড়াইয়া সেই বুড়োর এতদিন কবরে বিশ্রাম গ্রহণ করাই উচিত ছিল। আপনি তাহাদের কোথায় দেখিয়াছেন ?'

আমি বলিলাম, 'তাহাদের উভয়কে সাধারণ চিত্রশালায় দেখিয়াছি। যুবতীটি সত্যই বড় সুন্দরী। দেখিয়া অনুমান হইয়াছিল তিনি ইংরাজের কন্যা নহেন।'

বন্ধু বলিলেন, 'না, তিনি ইহুদীর মেয়ে। শুনিয়াছি তিনি অনেক দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন, ইংরাজীও বেশ ভাল বলিতে পারেন।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সেই বৃদ্ধটি কোন্ দেশের লোক ? তাহাকে দেখিয়া ইউরোপের লোক বলিয়া বোধ হয় না।'

বন্ধু বলিলেন, 'তাহার পরিচয় কিছুই জানি না, তাহার জীবন রহস্যাবৃত। তাহার সম্বন্ধে কেহ কোন খাঁটি খবর দিতে পারে না। এই যুবতীর সহিতই বা তাহার কী সম্বন্ধ, তাহাও সাধারণের অজ্ঞাত।'

বন্ধুর কথা শেষ হইতে না হইতেই লেডী বেকেনহাম সেই যুবতীকে সঙ্গে লইয়া ড্রইংরুমে প্রবেশ করিলেন। সেই সুসজ্জিত

কক্ষে বিদ্যুতের উজ্জ্বল প্রভায় যুবতীর রূপ যেন দ্বিগুণ বর্ধিত হইল। লেডী বেকেনহামও সুন্দরী, কিন্তু এই যুবতীর রূপের সহিত তাঁহার রূপের তুলনা হয় না। সুন্দরীদ্বয়ের পশ্চাতে সেই কদাকার বৃদ্ধ ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিল। বহুসংখ্যক রূপবান যুবক ও রূপসী যুবতীর মধ্যে সেই বৃদ্ধকে আরও অধিক কদাকার বোধ হইতে লাগিল। যেমন হংসের সভায় কাক আসিয়া বসিলেন। আমি কালা বাঙালী, সাহেবী পরিচ্ছদে আমাকে সেই শুভ্র নরনারীর মজলিসে দেখিয়া ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাকের সহিত আমার তুলনা চলিতে পারিত; কিন্তু তোমরা জান, পিশাচের মুখের আদর্শ লইয়া ভগবান আমার মুখ গঠন করেন নাই। দেখিলাম, বৃদ্ধ এবার কালো মখমলের খুব জমকালো পোশাক পরিয়া আসিয়াছে, তাহার দেহে লম্বা পার্শি কোট, মাথায় লাল রংএর চুড়াদার আরবী টুপি। সে লাঠিতে ভর দিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া একখানি চেয়ার অধিকার করিয়া বসিল এবং চেয়ারে ঠেস দিয়া জোরে জোরে হাঁপাইতে লাগিল; বোধ হইল গাড়ি হইতে নামিয়া এইটুকু আসিতেই সে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছে। বৃদ্ধ উপবেশন করিলে তাহার সঙ্গিনী যুবতী গৃহস্বামিনীর ইঙ্গিতে আর একখানি চেয়ারে বসিলেন।

সেদিন সেই মজলিসে আর একজন বিখ্যাত বেহালাদার নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন; তিনি বেহালার একজন ওস্তাদ বলিয়া লণ্ডনের সম্ভ্রান্ত সমাজে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। গৃহস্বামিনীর ইঙ্গিতে তিনিই প্রথমে বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। আমি বেহালা শুনিব কি, বিহ্বল দৃষ্টিতে সেই বৃদ্ধের মুখের দিকেই চাহিয়া রহিলাম, অন্য বিষয়েও মনঃসংযোগ করিতে পারিলাম না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমার মাথা গরম হইয়া উঠিল, ললাটে স্থূল ঘর্মবিন্দু সঞ্চিত হইল; আমি আর বসিয়া থাকিতে না পারিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলাম।

আমার পার্শ্বোপবিষ্ট বন্ধুটি সহসা আমাকে উঠিতে দেখিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি উঠিলেন যে?'

আমি বলিলাম, 'আমার বড় গরম বোধ হইতেছে, বারান্দায় একটু বেড়াইব।'

আমি পাশের একটি দ্বার দিয়া প্রশস্ত বারান্দায় উপস্থিত হইলাম। বারান্দার নিচেই পুষ্পোদ্যান। ভায়োলেট, হাস্-না-হানা, গোলাপ প্রভৃতি কুসুমের মিশ্র গন্ধ বায়ুতরঙ্গে ভাসিয়া আসিয়া আমার মস্তিষ্ক শীতল করিতে লাগিল।

আমি কোনও প্রয়োজনে বারান্দায় আসিয়াছি মনে করিয়া একটি সুবেশধারী ভৃত্য আমার নিকট উপস্থিত হইয়া সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার কিছু চাই কি?'

আমি বলিলাম, 'ড্রয়িংরুমে বড় গরম, সেইজন্য বাহিরে আসিয়াছি। আমাকে এক গ্লাস জল দাও।'

আদেশমাত্র ভৃত্য তুষার-শুভ্র স্ফটিক পাত্রে জল লইয়া আসিল, সেই শীতল জল চোখে মুখে দিয়া আমি অনেকটা সুস্থ হইলাম। তাহার পর ড্রয়িংরুমে প্রত্যাবর্তন করিলাম।

ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, পূর্বে যে সাহেবটি বেহালা বাজাইতেছিলেন, তাঁহার বাজনা শেষ হইয়াছে। অল্পক্ষণ পরে বৃদ্ধের সঙ্গিনী একখানি ছোট টেবিলের উপর হইতে তাঁহার বেহালাখানি লইয়া ধীরে—অতি ধীরে বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে বেহালার সুর তেমন স্পষ্ট খুলিল না; সে সুর নববিবাহিতা বঙ্গ-বধূর সলজ্জ পদ-সঞ্চালনের ন্যায় অতি মৃদু, অতি সঙ্কোচপূর্ণ; বোধ হইল যুবতীর হাত কাঁপিতেছে, বেহালায় গান ফুটিতেছে না। সে স্বর যেন বহু দূরের সঙ্গীতালাপের মত, ঠিক পরিচিত নহে; অথচ সম্পূর্ণ অপরিচিতও নহে। অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখিতে দেখিতে যুবতীর সেই সঙ্কোচপূর্ণ ভাব দূর হইল; সহসা উপলমুক্ত জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় বেহালার সুগম্ভীর সুমিষ্ট ধ্বনি সেই সুপ্রশস্ত কক্ষটি পূর্ণ করিয়া ফেলিল; বেহালা অতি করুণ স্বরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া হৃদয়ের অব্যক্ত বেদনা প্রকাশ করিতে লাগিল। এমন বেহালা আমি জীবনে শুনি নাই। ছড়ের মৃদু স্পর্শে বেহালার প্রত্যেক তন্ত্রী কম্পিত হইয়া

হৃদয়ের গভীর দুঃখ, দৈন্য, ব্যাকুলতা ও নিরাশা পরিব্যক্ত করিতে লাগিল ; শুনিয়া বোধ হইল, যেন কোনও পতিত আত্মা পাপপঙ্কে বিলুণ্ঠিত হইয়া, মুক্তির আশায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাহারও আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছে। সে নিরাশা, সে আকুলতা, সে বিষাদ ও বেদনা মনুষ্যের ভাষায় ব্যক্ত হইবার নহে।—শ্রোতৃবৃন্দ নিস্তব্ধভাবে বসিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই মোহন সঙ্গীত শুনিতে লাগিলেন। সেই মজলিসে সমজদার শ্রোতার অভাব ছিল না ; অনেকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বেহালাদারগণের বেহালা শ্রবণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিলেন, বেহালায় এমন নৈপুণ্য তাঁহারা আর কখনও দর্শন করেন নাই।

বেহালা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ধীরে ধীরে নীরব হইল ; কিন্তু তখনও তাহার স্বর-লহরী আমাদের কর্ণমূলে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। আমাদের মনে হইল, যাহা দেখিতেছি তাহা ইন্দ্রজাল মাত্র ; যাহা শুনিতেছি তাহা স্বপ্নবৎ অলীক !

বেহালা থামিল, কিন্তু কাহারও মুখ হইতে একটিও প্রশংসাধ্বনি উত্থিত হইল না। সকলেই নির্বাক, নিস্তব্ধ, যেন মোহাচ্ছন্ন। ইহাতেই বুঝিতে পারিলাম, সেই অপূর্ব সঙ্গীতের প্রভাব শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয় কিভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছিল।

যুবতী উঠিয়া টেবিলের উপর বেহালা রাখিয়া নত মস্তকে শ্রোতৃবৃন্দকে অভিবাদন করিলেন।

বেহালা শেষ হইলে একজন খ্যাতনামা পিয়ানো-বাদক পিয়ানো বাজাইতে আরম্ভ করিল, কিন্তু বেহালার পর পিয়ানো আর তেমন জমিল না ;—যেন পোলাওয়ের পর শাকান্ন ভোজন। তথাপি পিয়ানো শুনিয়া সকলেই বাহবা দিলেন।

পিয়ানো শেষ হইলে গৃহকর্ত্রীর অনুরোধে যুবতী উঠিয়া আবার বেহালা ধরিলেন, এবং অতি ক্ষিপ্র হস্তে দ্রুত তালে বেহালা বাজাইতে লাগিলেন। এবার আর বেহালায় পূর্বের মত শোকাচ্ছন্ন, নিরাশাজড়িত ব্যথিত হৃদয়ের ক্রন্দনোচ্ছ্বাস ধ্বনিত হইল না ; অপূর্ব

মূর্ছনায় তাহার প্রতি তন্ত্রী কম্পিত হইতে লাগিল। বেহালা যেন নাচিয়া নাচিয়া তাহার স্বচ্ছন্দভাবে হৃদয়ের অনন্ত আশা, প্রবল আকাঙ্ক্ষা, প্রচণ্ড উন্মাদনা ও বিপুল উৎসাহ পরিব্যক্ত করিতে লাগিল। বেহালার সেই স্বরে শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ও হর্ষে, উৎসাহে আপ্লুত হইল। ধন্য সাধনা, ধন্য শিক্ষা!—পূর্বে আমরা করুণ স্বরে যেরূপ অভিভূত হইয়াছিলাম, এবার তাহার আনন্দোচ্ছ্বাসে সেইরূপ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বোধ হইল, পৃথিবীর কোথাও কোনও দুঃখ, দৈন্য, অপূর্ণতা নাই; যেন সমগ্র বিশ্ব উদ্দাম সুখস্রোতে অনন্তের অভিমুখে ভাসিয়া যাইতেছে, এবং সৌরকর-সমুজ্জ্বল অনন্ত কোটি জীবের আবাসভূমি এই বিপুলা পৃথ্বী নিবিড় আনন্দে মহাবেগে স্বীয় পুলকপূর্ণ কক্ষপথে আবর্তিত হইতেছে।

হঠাৎ বেহালা বন্ধ হইল; যুবতী পুনর্বার শ্রোতৃবর্গকে অভিবাদন-পূর্বক টেবিলের উপর বেহালা রাখিয়া আসন গ্রহণ কারলেন। আমি কয়েক মুহূর্ত জড়ের ন্যায় নিস্পন্দভাবে বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বারান্দায় আসিলাম; অনন্তর সেখান হইতে কয়েক মিনিট পরে সিঁড়ির ঘরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, মার্কুইস ও লেডী বেকেনহাম সেখানে দণ্ডায়মান হইয়া সুমিষ্ট হাস্যে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক-দিগকে বিদায় করিতেছেন।

লেডী বেকেনহাম আমাকে দেখিবামাত্র সহাস্যে বলিলেন, 'মিঃ সেন, কেমন বেহালা শুনিলেন? তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন তো? আসুন, এই অসাধারণ প্রতিভাশালিনী যুবতীর সহিত আপনার পরিচয় করিয়া দিই।—ইঁহার নাম কুমারী রেবেকা কোহেন।'

যুবতীর সহিত আমার পরিচয় হইল। আমি ক্ষুদ্র বাঙালী চিত্রকর; এই ইউরোপ-বিখ্যাত, অপূর্ব সঙ্গীত-নিপুণা, সুর-সুন্দরীর ন্যায় সৌন্দর্যময়ী, জ্বলন্ত প্রতিভা-শিখারূপিণী যুবতীর সহিত বিশেষ পরিচয় কী হইবে? বেহালায় তাঁহার অপূর্ব নিপুণতার প্রশংসা করিয়া শিষ্টাচারসঙ্গত দুই একটি কথায় আলাপ শেষ করিলাম। যুবতী ক্ষণকাল কৌতূহলপূর্ণ কাতর দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে

চাহিয়া আমাকে ধন্যবাদ দিলেন। তাঁহার সেই কৌতূহল বা কাতরতার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। লেডী বেকেনহাম আমার পাশে সরিয়া আসিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, 'মিঃ সেন, মিঃ রা-তাই বলিতেছিলেন, আপনার সহিত পরিচয় হইলে তিনি অত্যন্ত সুখী হইবেন; আপনি পূর্বদেশের লোক, তিনিও প্রাচ্য ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমার বিশ্বাস, তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া আপনি সুখী হইবেন।'

লেডী বেকেনহামের কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধ আমাদের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল। আমি যে কি বলিব, হঠাৎ স্থির করিতে পারিলাম না।

আমাকে নীরব দেখিয়া বৃদ্ধ বলিল, 'আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইল, ইহাতে বড়ই সুখী হইলাম। আশা করি শীঘ্রই আপনার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ পরিচয়ের সুযোগ পাইব। আজ এখানকার সাধারণ চিত্রশালায় প্রাচীন মিশর দেশের একখানি সুন্দর পৌরাণিক চিত্র দেখিয়া আমি এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, চিত্রকরের পরিচয় জানিতে আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছিল। বিস্তর অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিলাম, সেই চিত্রখানি আপনারই অঙ্কিত। শুনিলাম আপনি এশিয়াখণ্ডের লোক, কিন্তু আপনি এই চিত্রে যে ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, একালের চিত্রকরগণের পক্ষে তাহা অসাধ্য মনে হয়; কোন বিদেশী চিত্রকর যে এমন নিখুঁতভাবে ইহা অঙ্কিত করিতে পারেন, চিত্রখানি না দেখিলে আমি তাহা বিশ্বাস করিতাম না; কারণ, স্থান কাল পাত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা না থাকিলে এরূপ চিত্র অঙ্কিত করা অসম্ভব। আপনি এই চিত্রের বিষয়টি কোথায়, কিরূপে সংগ্রহ করিয়াছিলেন?'

আমি বলিলাম, 'আমার পিতা মিশর-প্রবাসী বাঙালী; আমি তাঁহার সঙ্গে দীর্ঘকাল মিশরে বাস করিয়াছিলাম, তাঁহার নিকট মিশর সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি; সেই সূত্রে ইংরাজ বা

অন্যান্য বৈদেশিক পর্যটকগণের অজ্ঞাত বহু বিচিত্র তথ্যও অবগত হইয়াছি। মিশর দেশ সম্বন্ধে আপনারও বোধহয় যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে?'

বৃদ্ধ শুভ্র দন্তশ্রেণী বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, 'আমি স্বয়ং মিশরবাসী; কিন্তু কেবল স্বদেশ বলিয়া নহে, পৃথিবীর সকল দেশ সম্বন্ধেই আমার কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আছে; আশা করি একদিন আপনাকে সে পরিচয় দিতে পারিব। যাহা হউক, আজ আমি বড় পরিশ্রান্ত হইয়াছি, রাত্রিও অধিক হইতেছে, আজিকার মত বিদায়।'

বৃদ্ধ আমাদের অভিবাদন করিয়া, রেবেকাকে সঙ্গে লইয়া ধীরে ধীরে সোপান-শ্রেণী অতিক্রম করিল। আমিও চিন্তাকুল চিত্তে বাসায় ফিরিলাম।

মিশরদেশীয় এই বৃদ্ধের নাম রা-তাই। তাহার ন্যায় অতি বৃদ্ধ মিশরবাসী কেন ইংলণ্ডে আসিয়াছে? এই ইহুদী যুবতী রেবেকা কোহেনকে সঙ্গে লইয়াই বা সে কেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে? উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কী? এই বিদেশী বৃদ্ধ ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত সমাজে কোন্ গুণে এরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে?—অনেক চিন্তা করিয়াও আমি এ সকল রহস্য ভেদ করিতে পারিলাম না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাসায় ফিরিয়া ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম, রাত্রি বারটা বাজিয়া গিয়াছে; কিন্তু অত রাত্রেও শয্যায় শয়ন করিতে ইচ্ছা হইল না; আমি আমার চিত্রশালায় একখানি চেয়ারে বসিয়া সিগারেট টানিতে লাগিলাম। সেই কক্ষটিতে মিশরদেশীয় নানা পৌরাণিক চিত্র সজ্জিত ছিল; তন্মধ্যে কতগুলি আমার পিতার সংগৃহীত, কয়েকখানি আমার অঙ্কিত। এই সকল চিত্র ব্যতীত একটি কাচের আলমারির মধ্যে মিশরদেশীয় একটি 'মমি' সুদৃশ্য আধারে সংরক্ষিত ছিল।

মমি কি পদার্থ, তাহা সকলের জানা না থাকিতে পারে। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে যখন ইউরোপ ল আমেরিকা অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল, সভ্যতার সহিত যখন তাহাদের আদৌ পরিচয় হয় নাই, সেই প্রাচীন যুগে এশিয়া খণ্ডে কেবল ভারতবর্ষ, ও আফ্রিকার প্রাচীন মিশর দেশ সভ্যতা ও উন্নতির সর্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিল। সভ্যতার সেই আদি যুগে মিশরদেশে সম্ভ্রান্ত ও খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ পরলোক গমন করিলে তাঁহাদের মৃতদেহ ভূগর্ভে সমাহিত বা দাহ না করিয়া নানাপ্রকার মসলার সাহায্যে তাহা অবিকৃত রাখা হইত; কিরূপে যে সেইগুলিকে স্থায়িত্ব দান করা হইত তাহা নিরূপণ করা দুরূহ, কিন্তু দ্রব্যগুণে সেই সকল দেহ কোনও কালে পচিবার বা বিকৃত হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। জাদুঘরে মৃতের দেহাবশেষ যেভাবে সজ্জিত থাকে, মমিগুলিও স্থানে স্থানে সেইভাবে সজ্জিত থাকিত। মৃতদেহ বলিয়া কেহ তাহার প্রতি ঘৃণা করিত না, জনসাধারণ তাহা অতি পবিত্র বস্তু বলিয়াই মনে করিত।

সহস্র সহস্র বৎসর পরে এখনও মিশরে এই সকল মমি বর্তমান

আছে; তাহা মিশরের প্রাচীন যুগের বিস্মৃতপ্রায় পুরাবৃত্তের মূক সাক্ষী। কত পণ্ডিত, কত দার্শনিক, কত ঐতিহাসিক ও কত রাজার মৃতদেহ যে এইভাবে যুগান্ত-পূর্ব হইতে প্রাচীন মিশরের নানা ভগ্ন-স্তূপের গর্ভে সংরক্ষিত রহিয়াছে, তাহা কে বলিবে? আমার পিতা মিশর দেশে অবস্থানকালে যে সকল অদ্ভুত ও দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কয়েকখানি চিত্র ও এই মমিটি আমি সযত্নে সেখান হইতে ইংলণ্ডে লইয়া গিয়াছিলাম।

আমি সিগারেট টানিতে টানিতে আমার কাচের আলমারির অভ্যন্তরস্থিত সেই মমিটির দিকে একবার চাহিলাম; হঠাৎ আমার বোধ হইল, যেন সেই বহুকালের মৃত নির্বাক মমি সহসা বাক্‌শক্তি লাভ করিয়া আমাকে বলিতেছে, 'ওরে ঊনবিংশ শতাব্দীর ক্ষুদ্র মানুষ, তোর পিতা আমাকে এক দুর্বৃত্তের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া স্বীয় বাসগৃহে স্থাপন করিয়াছিল, আমার শান্তিসুখ হরণ করিয়াছিল, সেই অপরাধে প্রবাসে তাহার মৃত্যু হইয়াছে; তুই আমাকে বহু সাগর উপসাগর অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর অন্য প্রান্তে এই দেশে লইয়া আসিয়াছিস, আমার চির-আকাঙ্ক্ষিত শান্তি নষ্ট করিয়াছিস; তোকে অবিলম্বে এই দুষ্কর্মের প্রতিফল লাভ করিতে হইবে।'

আমি সেই মধ্য রাত্রে আমার নির্জন গৃহকক্ষে মৃতের মুখ-নিঃসৃত এই অভিশাপবাণী শ্রবণ কারয়া স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিলাম; অনেক দিন পরে আমার পিতার কথা মনে পড়িল। মিশর হইতে আসিবার সময় তাঁহার একখানি পকেট-বহি আমি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলাম, এই পকেট-বহিতে আমার পিতার সংগৃহীত দ্রব্যাদির বিবরণ,—কবে কোথায় কিরূপে তিনি কোন্ দ্রব্য সংগৃহীত করিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিত ছিল। এতদিন পরে এই মমিটির ইতিহাস জানিবার জন্য আমার বড় আগ্রহ হইল। আমি আমার টেবিলের দেরাজ খুলিয়া সেই পকেট-বহিখানি বাহির করিলাম; বহিখানি খুলিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে তাহার মধ্যে একখানি পুরু কাগজ পাইলাম। কাগজখানি অত্যন্ত পুরাতন; এত পুরাতন যে, তাহা জীর্ণ ও বিবর্ণ

হইয়া গিয়াছিল ; সেই কাগজখানিতে মিশরীয় ভাষায় এই মমির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত ছিল। কাগজখানি খুলিয়া যাহা পাঠ করিলাম তাহাতে জানিতে পারিলাম ইহা রা-মীস নামক একজন মিশরীয় পুরোহিতের মমি। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে, যৎকালে মিশরদেশে ফারো রাজবংশ রাজত্ব করিতেন, সেই সময়ে রা-মীস তাহাদের কুল-পুরোহিত পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল ; কুহক বিদ্যাতে এই রাজপুরোহিতের অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল।

আমি একাগ্র চিত্তে রাজপুরোহিতের জীবনের অদ্ভুত ইতিহাস পাঠ করিতেছি, এমন সময় আমার পশ্চাতে দ্বার-সন্নিকটে যেন কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইলাম। আমি কাগজখানি হাতে লইয়াই উঠিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলাম ; কিন্তু যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না, আমি আর পদমাত্রও অগ্রসর হইতে পারিলাম না।—আমার বেশ স্মরণ আছে, সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াই আমি দ্বারের অর্গল রুদ্ধ করিয়াছিলাম, তথাপি কি উপায়ে বলিতে পারি না, পূর্ববর্ণিত বৃদ্ধ রা-তাই কক্ষমধ্যে দ্বার-সন্নিধানে দণ্ডায়মান হইয়াছে। দেখিলাম, সে দাঁড়াইয়া হাঁপাইতেছে, যেন দীর্ঘ পথ দ্রুত চলিয়া আসিয়া অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছে। সেই মধ্য-রাত্রে আমার গৃহকক্ষে আচম্বিতে তাহাকে সমাগত দেখিয়া আমার বাক্‌স্ফূর্তি হইল না ; আমি তাহার দিকে চাহিয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান রহিলাম।

আমাকে নির্বাক দেখিয়া রা-তাই দুই-এক পদ অগ্রসর হইয়া আমাকে সম্বোধন পূর্বক বলিল, 'মিঃ সেন, আজ অসময়ে আপনার গৃহে অনধিকার প্রবেশ করিয়া আপনার শান্তির ব্যাঘাত উৎপাদন করিয়াছি, আমার এ অপরাধ মার্জনা করিবেন ; কিন্তু আমি স্বেচ্ছাক্রমে এই অন্যায় কার্য করি নাই। আজ কিছুকাল পূর্বে পথ-ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম, পথ হারাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আপনার বাসার সম্মুখে আসিয়া পড়ি ; দেখিলাম আপনার দরজা খোলা, তাই আপনার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছি ; ভাগ্যে কোনও অপরিচিত

লোকের গৃহে উপস্থিত হই নাই। কিন্তু আপনার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, আমার আগমনে আপনি বিরক্ত হইয়াছেন।'

লোকটার কথা শুনিয়া কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম না। সে রাস্তা ভুলিয়া এই দ্বিপ্রহর রাত্রে আমার ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা? কোনও নির্লজ্জ তস্করেরও বোধহয় এরূপ কৈফিয়ত দিতে সাহস হইত না। বিশেষতঃ আমার দরজা খোলা ছিল, একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা; উন্মত্ত না হইলে এই শীত-প্রধান দেশে এত রাত্রে দরজা খুলিয়া বায়ু সেবনে কাহার প্রবৃত্তি হয়? —কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন উত্থাপন না করিয়া আমি বৃদ্ধকে বলিলাম, 'আমি ভারতবাসী, বিদেশী হইলেও আপনি আমার অতিথি, অতিথি সর্বস্থানে ও সর্বকালে আমাদের আদরের পাত্র, এ অবস্থায় আপনার আকস্মিক আবির্ভাবে আমি হতবুদ্ধি হইয়া যদি অভ্যর্থনায় ত্রুটি করিয়া থাকি, তাহা হইলে আপনি আমার সেই অপরাধ মার্জনা করিবেন। আপনি বসুন।'

রা-তাই চেয়ারে না বসিয়া আমাকে বলিল, 'আমার অনধিকার প্রবেশে আপনি বিরক্ত হন নাই শুনিয়া সুখী হইলাম; আপনার সঙ্গে কয়েক ঘণ্টামাত্র পূর্বে আমার যে সামান্য আলাপ হইয়াছিল তাহার খাতিরে এত রাত্রে আপনার উপর জুলুম করিতে আসা যে অত্যন্ত বেয়াদপি, তাহা আমি বুঝিতে না পারি এমন নহে। এইরূপ শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ কাজ করিয়া আমি আপনার নিকট লজ্জিত হইয়াছি।'

এরূপ লজ্জা মন্দ নহে! কিন্তু সে প্রসঙ্গে কোনও কথা না বলিয়া আমি অন্য কথা তুলিলাম; বলিলাম, 'আপনি বলিতেছেন কয়েক ঘণ্টা পূর্বে আমার সহিত আপনার পরিচয়,—কিন্তু ইহার পূর্বেও একদিন রাত্রে স্থানান্তরে আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এ কথা কি আপনার স্মরণ হয় না?'

রা-তাই বলিল, 'ইহার পূর্বেও আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল নাকি? সে কথা তো আমার মনে পড়ে না; আর আমার যে বয়স, এ-বয়সে সকল কথা স্মরণ থাকিবে, আপনি এরূপ আশা করিবেন না।'

এই বৃদ্ধই সেদিন নদীতীরে জেঠির উপর দাঁড়াইয়া এক ব্যক্তিকে জলে ডুবাইয়া মারিয়াছে, আমি তাহা-স্বচক্ষে দেখিয়াছি ; সেজন্য তাহাকে তীব্র ভর্ৎসনাও করিয়াছি। এমন গুরুতর কথা সে এত শীঘ্র ভুলিয়া গেল! ইহা কি সম্ভব? না, সে বিস্মৃতির ভান করিতেছে? যাহা হউক, আমি স্থির করিলাম আজ যখন ইহাকে নির্জনে পাইয়াছি —তখন সহজে ছাড়িব না ; অন্ততঃ সে কি অভিসন্ধিতে এই দুষ্কর্ম করিয়াছিল তাহা জানিতে হইবে। সুতরাং আমি তাহাকে বলিলাম, 'মিঃ রা-তাই, আপনি এত অল্পদিনের মধ্যে এই গুরুতর কথা ভুলিয়া যাইতে পারেন, ইহা সহজে বিশ্বাস হয় না। সেদিন রাত্রিকালে নদীতীরে জেঠির উপর দাঁড়াইয়া লাঠির খোঁচায় একটি হতভাগ্যকে জলে ঠেলিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহার পর আর সে তীরে উঠিতে পারে নাই, বোধহয় ডুবিয়া মরিয়াছে। এমন গুরুতর ঘটনা এই কয়দিনের মধ্যেই আপনি বিস্মৃত হইয়াছেন, ইহা বিস্ময়ের কথা বটে! আমি সে সময় জেঠির উপর দাঁড়াইয়া ছিলাম, এই দুষ্কর্মের জন্য আপনাকে তিরস্কারও করিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি তাহাতে লজ্জিত হন নাই, অধিকন্তু এই পৈশাচিক কার্য করিয়া আপনাকে হাসিতেই দেখা গিয়াছিল।'

রা-তাই বলিল, 'হাঁ কথাটা এখন মনে পড়িয়াছে বটে ; কিন্তু আমি এই কার্য করিয়া যে কী অন্যায় করিয়াছি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। যে লোকটিকে আমি ডুবাইয়া মারিয়াছিলাম বলিতেছেন, সে আত্মহত্যা করিবার অভিপ্রায়ে ঝাঁপ দিয়াছিল, মৃত্যুর পূর্বে কয়েকদিন সে আহারাভাবে বড় কষ্ট পাইয়াছিল। তাহার জীবন ধারণের বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। যদি সে জলে ডুবিয়া না মরিত, তাহা হইলে অন্য কোনও উপায়ে সে আত্মহত্যা করিত; দু'দিন পরে মরিত, না হয় দু'দিন আগে মরিয়াছে, ইহাতে কাহার কি ক্ষতিবৃদ্ধি? সে বাঁচিয়া থাকিলে তাহার যন্ত্রণার ভার আরও বর্ধিত হইত, সুতরাং মৃত্যুই তাহার মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়, এ বিষয়ে আমি তাহাকে সাহায্য করিয়া তাহার বন্ধুর কার্য

করিয়াছি। আপনি বলিলেন, আমাকে হাসিতে দেখিয়াছিলেন। যদি হাসিয়া থাকি, তাহা হইলে তাহাতেই বা কাহার কি ক্ষতি ?'

আমি বলিলাম, 'আপনার যুক্তি বড় চমৎকার, কিন্তু যুক্তি যেমনই হউক কাজটা বড় গর্হিত হইয়াছিল।'

রা-তাই বলিল, 'আপনার নিকট যাহা গর্হিত বোধ হইবে তাহাই যে সর্ব[illegible] গর্হিত, ইহা আমি স্বীকার করি না। দয়া জিনিসটা ভাল, কিন্তু পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই দয়ার ব্যভিচার দেখিতে পাই, অযোগ্যকে কখনও দয়া করিতে নাই। আপনারা যে ঈশ্বরকে পরম কারুণিক বলেন, তাঁহার পর্যন্ত দয়া নাই। মানুষ স্ব-স্ব কর্মের ফলস্বরূপ সংসারে সুখ শান্তি লাভ করে, এবং ভ্রান্ত হইয়া মনে করে ঈশ্বরের দয়ায় তাহার এই সুখ শান্তি। বলবান পৃথিবীর সর্বত্রই দুর্বলকে ধরিয়া ভক্ষণ করিতেছে। নিরুপায় দুর্বল আর্তনাদ করিয়া প্রবলের করে আত্মসমর্পণ করে, আপনাদের করুণাময় সেই দুর্বলকে রক্ষা করেন কি ? দুর্বল ভেক বলবান সর্পের খাদ্য। ভেকেরই বা কি অপরাধ, আর সাপগুলাই বা কি পুণ্য অর্জন করিয়াছে ? উভয়ের মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ বর্তমান, ইহা সকলই অখণ্ডনীয় নিয়তির বিধান। এই বিধান বলেই আজ প্রবল ইউরোপ দুর্বল এশিয়া ও আফ্রিকাকে প্রায় গ্রাস করিয়াছে। করুণাময় পরমেশ্বর তাঁহার সৃষ্ট কোটি কোটি মনুষ্যের দুঃখ দুর্গতি দেখিয়াও কি তাহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতেছেন ?—কিন্তু এখন অনেক রাত্রি হইয়াছে, আপাততঃ এ সকল তর্কের সময় নাই। আপনি যে লোকটার কথা বলিতেছিলেন, তাহার ন্যায় নরাধম পৃথিবীতে প্রায় দেখা যায় না। সম্ভ্রান্ত বংশে তাহার জন্ম, বাল্যে সে পরম সুখে প্রতিপালিত হইয়াছিল, চেষ্টা করিলে সে সমাজের অলঙ্কারস্বরূপ হইতে পারিত; কিন্তু সে কখনও মানুষ হইবার চেষ্টা করে নাই। যৌবনের আরম্ভেই সে অসৎ পথে যায়; মাতাল ও ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া পড়ে, এবং পিতা মাতার বাক্স ভাঙিয়া নিত্য টাকা চুরি করিতে থাকে। তাহার দুর্ব্যবহারে তাহার পিতা মাতা এমন মনোবেদনা পাইয়াছিলেন যে, তাঁহারা অকালে ভগ্ন হৃদয়ে প্রাণত্যাগ

করেন ; একটি পরমা সুন্দরী সুশীলা যুবতীর সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল, পুত্র কন্যাও হইয়াছিল ; কিন্তু এই নর-পশু এক দিনের জন্যও তাহাদের প্রতিপালন-ভার গ্রহণ করে নাই। তাহার পিতার দুই এক জন পদস্থ বন্ধু তাহার চাকার করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু খাটিয়া খাইতে পারিবে না বলিয়া সে চাকরি গ্রহণ করে নাই। চৌর্যবৃত্তি দ্বারা উদর পূর্ণ করিতে হইলেও বুদ্ধি বিবেচনা ও সাহস চাই, কিন্তু এ সকল তাহার কিছুই ছিল না ; যতদিন সে বাঁচিয়া ছিল, দুঃখপূর্ণ কলঙ্কময় ভারবহ জীবম বহন করিয়াছিল। ভিক্ষার আশায় লোকের দ্বারস্থ হইলে দয়া করিয়া কেহ তাহাকে ভিক্ষা দিত না ;—অবশেষে তাহার অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা আপনার অজ্ঞাত নহে।'

রা-তাইয়ের কথা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইলাম ; বলিলাম, 'আপনি লণ্ডনে অধিক দিন আসেন নাই, অল্প সময়ের মধ্যে সেই লোকটির সম্বন্ধে এত কথা আপনি কিরূপে জানিলেন ?'

রা-তাই বলিল, 'অনেকের অনেক কথাই আমার সুপরিজ্ঞাত। আপনার সহিত আমার নূতন পরিচয় মাত্র, কিন্তু আপনার জীবনের যে সকল ঘটনা অন্য কোনও ব্যক্তি অবগত নহে, আপনি আমার নিকট তাহাও জানিতে পারেন। কিন্তু এখন সে সকল কথার আবশ্যক নাই ; আপাততঃ একটা কাজের কথা বলি। আপনার হাতে যে কাগজখানা দেখিতেছি, উহাতে কী লেখা আছে ?'

আমি বলিলাম, 'আমার পিতা মিশর দেশে অবস্থান কালে কোথা হইতে একটা মমি সংগ্রহ করিয়াছিলেন ; তাঁহার মৃত্যুর পর অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে সেই মমিটিও আমি এখানে লইয়া আসিয়াছি। এই কাগজখানিতে সেই মমির জীবনের ইতিহাস লিখিত আছে ; আজ হঠাৎ এই বিবরণটি পাঠ করিবার জন্য আমার বড় আগ্রহ হওয়ায় উহা পুরাতন কাগজ-পত্রের ভিতর হইতে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি।'

রা-তাই এতক্ষণ পরে চেয়ারে বসিল। আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কাগজখানা একবার দেখিতে পাই কি ?'

আমি বিনা বাক্যব্যয়ে সেই কাগজখানি তাহার হাতে প্রদান করিলাম ; সে তাহা আলোকের কাছে ধরিয়া নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিতে লাগিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তাহার চক্ষু হইতে যেন অগ্নিশিখা বাহির হইতেছে! সে পাঠ শেষ করিয়া আবেগভরে অস্ফুটস্বরে কি বলিল ; তারপর দন্ত কড়-মড় করিয়া চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিল, এবং চক্ষুদুটি কপালে তুলিয়া উত্তেজিতভাবে আমাকে বলিল, 'সেই মমি কোথায়, শীঘ্র আমাকে দেখাও!'

আমি তাহার ভাব দেখিয়া বিস্ময়ে ও ভয়ে অভিভূত হইলাম। আমি কোনও কথা বলিবার পূর্বেই সে কটমট করিয়া কক্ষের চতুর্দিকে একবার চাহিল, এবং যে আলমারির মধ্যে মমিটা ছিল, এক লম্ফে তাহার মিকট গিয়া দাঁড়াইল . সেখানে দাঁড়াইয়া সে প্রায় পাঁচ মিনিট অনিমিষ দৃষ্টিতে সেই মমির দিকে চাহিয়া রহিল। সে সময় তাহার মুখের যে ভাব হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া আতঙ্কে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল।

রা-তাই হঠাৎ আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া আমাকে সম্বোধন পূর্বক বলিল, 'ওরে হতভাগা, এক নরাধম ইংরাজ এই পবিত্র দেহ ইহার বিশ্রামাগার হইতে চুরি করিয়া নিজ গৃহে লইয়া গিয়াছিল , তাহার নিকট হইতে তোর পিতা ইহা ক্রয় করে। তোর এত স্পর্ধা যে, দেবতার অপমান করিয়া, মিশর দেশের সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন কারয়া পুরোহিতের পবিত্র দেহ সাগরপারে আনিতে সাহস ককিয়াছিস! এই অপরাধের জন্য তোকে ভীষণ শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে। পাপের প্রায়শ্চিত্তের আর অধিক বিলম্ব নাই।'

ক্রোধে রা-তাইয়ের সর্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল, তাহার রক্তশূন্য শুষ্ক মুখ পিশাচের মুখের ন্যায় ভীষণ আকার ধারণ করিল। সে তাহার ঘূর্ণিত নেত্র মমির দিকে ফিরাইয়া বলিল,'অনন্ত শক্তির আধার-স্বরূপিণী, সভ্যতার আদি জননী. পৃথিবীর মুকুটমণি মাতৃভূমি মিশর, তোমার কি দারুণ অধঃপতনই না ঘটিয়াছে! দাম্ভিক বৈদেশিকেরা

অতিথির ছদ্মবেশে তোমার দ্বারে উপস্থিত হইতেছে, তাহার পর তোমার সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া জাহাজ ভাসাইয়া দেশান্তরে প্রস্থান করিতেছে। তাহাদের নিকট দেবতা পুরোহিত কারও পরিত্রাণ নাই! কিন্তু এই নিদারুণ অপমানের প্রতিশোধের সময় সমাগতপ্রায়, সেই দুর্দিনে বালক, বৃদ্ধ, বনিতা, অপরাধী ও নিরপরাধ কেহই রক্ষা পাইবে না!'

রা-তাইয়ের এইরূপ উত্তেজিত ভাব দেখিয়া ও অসংলগ্ন কথা শুনিয়া আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে বসিয়া রহিলাম, এক এক বার মনে হইল, লোকটা বোধহয় ক্ষিপ্ত। এই গভীর রাত্রে একাকী তাহার সম্মুখে বসিয়া থাকা নিরাপদ নহে। কিন্তু অল্লক্ষণ পরেই তাহার সম্পূর্ণ ভাবান্তর লক্ষ কারলাম। সে অপেক্ষাকৃত সংযতভাবে আমাকে বলিল, 'মিঃ সেন, আপনার অপমান করা বা আপনার মনে কষ্ট দেওয়া আমার ইচ্ছা নহে, আমার কথায় যদি আপনি হৃদয়ে আঘাত পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার রূঢ়তা মার্জনা করিবেন। আমি জানি আপনার পিতা ইংরাজের অধীনে চাকরি লইয়া মিশর দেশে গিয়াছিলেন, এবং তাঁহার মনিবদের অনুকরণে মিশরের অনেক প্রাচীন মহার্ঘ দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। একালে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই কতকগুলো স্বদেশত্যাগী নিরুপায় ভবঘুরে বৈদেশিক ঘুরিয়া বেড়ায়। অনধিকার চর্চায় তাহাদের বড় আনন্দ, তাহারা প্রত্নতত্ত্বানুশীলনের নাম করিয়া কত প্রাচীন রাজ্যের পুরাতন কীর্তি ধ্বংস করিয়াছে, প্রাচীন যুগের কত পবিত্র স্মৃতি-চিহ্ন স্থানান্তরিত করিয়াছে, কত শবাধার নষ্ট, উৎখাত ও স্থানভ্রষ্ট কারয়া তাহাদের অসংযত কৌতূহল চরিতার্থ করিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। হিন্দুস্থানের লোক হইয়াও তোমার পিতা এই সকল ইতর তস্করের বিকৃত আদর্শের অনুকরণ করিয়াছিলেন, ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? এই সকল বিদেশী তস্করের কার্যের সহিত আমার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নাই। অতীতের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন আমার জাতীয় শিক্ষা, বিভিন্ন দেশ পর্যটন করিয়া, নানা জাতীয়

লোকের সংস্পর্শে আসিয়া, এই বৃদ্ধ বয়সেও আমি আমার জাতীয় শিক্ষা জাতীয় রুচি পারত্যাগ করিতে পারি নাই।'

আমি ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে বলিলাম, 'তা না করিতে পারেন, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে আপনার বক্তব্য বিষয়টি একটু ভদ্রতার সঙ্গে বলিলে বোধহয় আপনার জাতীয় শিক্ষা ও জাতীয় রুচি নষ্ট হইত না।'

রা-তাই বলিল, 'একথা সত্য, কিন্তু, আমার ন্যায় বৃদ্ধ কোন বিশেষ কারণে হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিলে, মনের ভাব গোপন করিয়া ভদ্রভাবে বক্তব্য বিষয় বলিবে, আপনি এরূপ আশা করিতে পারেন না; বয়স অধিক হইলে মানুষের বাক্যের সংযম স্বভাবতঃই অন্তর্হিত হয়। আপনি আমার কথা মন্দভাবে লইবেন না, কোন দুরভিসন্ধিতেও আমি আপনার নিকট উপস্থিত হই নাই। আপনি হয়ত বিশ্বাস করিবেন না, কিন্তু আমি বুঝিতেছি, আপনার অদৃষ্ট আমার অদৃষ্টের সহিত অদৃশ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ, সেই শৃঙ্খল সুদৃঢ় লৌহশৃঙ্খল অপেক্ষা সহস্র গুণ দৃঢ়তর। আপনি আমার অনেক কাজে লাগিবেন, অন্ততঃ সে জন্যও আপনার বিরাগ উৎপাদন করা আমার অকর্তব্য; আমি অনেক অপ্রিয় কথা বলিলাম, ইহাতে আপনি ক্ষুণ্ণ হইবেন না।'

আমি বলিলাম, 'আপনার কথায় ক্ষুণ্ণ হই বা না হই, অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি, ইহা অস্বীকার করিব না। আমার অদৃষ্ট আপনার অদৃষ্টের সহিত অদৃশ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ, এ কথার মর্ম কি বুঝিতে পারিলাম না।'

রা-তাই বলিল, 'এখন তাহা আপনার বুঝিবার আবশ্যক দেখি না, ভবিষ্যতের কথা অবগত হওয়া সর্বত্র সুখের বিষয় নহে, কিন্তু আপনি ব্যস্ত হইবেন না, যথাসময়ে আপনি সকল কথাই জানিতে পারিবেন।'

এই সকল কথা বলিবার সময় রা-তাই যেভাবে আমার দিকে চাহিতেছিল, তাহার সেই দৃষ্টিপাতে ভয়ে আমার বুকের মধ্যে কাঁপিতে লাগিল। তাহার চক্ষু দুটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় জ্বল-জ্বল

করিতেছিল ; ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্র শিকার লক্ষ করিয়া তাহার উপর লাফাইয়া পড়িবার সময় তার চক্ষুতেও বোধহয় এইরূপ অস্বাভাবিক দীপ্তি দেখিতে পাওয়া যায়। লোকটার ভাব দেখিয়া ও তাহার এই-সকল অসংলগ্ন কথা শুনিয়া তাহার বুদ্ধির প্রকৃতিস্থতায় পূর্বে আমার যে সন্দেহ হইয়াছিল, তাহা দৃঢ়তর হইল। এমন উন্মাদের সহিত একত্র এভাবে রাত্রিবাস করা কোন কারণেই বাঞ্ছনীয় নহে, আমি বড় অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিলাম ; কি করিয়া যে তাহাকে বিদায় করিব তাহা ভাবিয়া পাইলাম না।

আমাকে নির্বাক দেখিয়া রা-তাই হাসিয়া বলিল, 'আপনি আমাকে উন্মাদ মনে করিতেছেন, কিন্তু সত্যই আমি কি প্রকৃতির লোক তাহা বুঝিতে আপনার এখনও সময় লাগিবে।—এখন একটি কাজের কথা বলি শুনুন। যদি আপনি ভবিষ্যতে কোন বিপদে পড়িতে না চান, নিরাপদে ও শান্তিতে কালযাপন করা যদি আপনার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে এই মমিটি আমার হস্তে সমর্পণ করুন।'

বৃদ্ধের আবদার শুনিয়া রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল ; ইচ্ছা হইতে লাগিল পদাঘাতে তাহাকে তাহার প্রগল্‌ভতার উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করি, কিন্তু সে ইচ্ছা কার্যে পরিণত করিলাম না ; উত্তেজিত স্বরে বলিলাম, 'আপনি এই লোভ সংবরণ করুন ; আমি আমার পরলোকগত পিতার স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ মিশর দেশ হইতে যে সামগ্রী বহু যত্নে লইয়া আসিয়াছি, আপনার ভয় প্রদর্শনে তাহা হস্তান্তরিত করিব না, ইহা আপনি স্থির জানিবেন।'

রা-তাই বলিল, 'এই মমিতে আপনার অপেক্ষা আমার আবশ্যক লক্ষগুণ অধিক। ইহার সন্ধানে আমি গত বিশ বৎসর কাল পৃথিবীর কোন্ দেশ না ঘুরিয়াছি ? কিন্তু এত দিন ইহার সন্ধান পাই নাই ; দৈবক্রমে গতকল্য জানিতে পারিয়াছি, ইহা আপনার নিকটে আছে। আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত এই মমিটি আমাকে প্রদান না করিবেন, ততক্ষণ আপনি মনে শান্তি পাইবেন না।'

তাহার এ কথার পর আমি আর তাহার সহিত অনর্থক

বাকবিতণ্ডা না করিয়া সংক্ষেপে বলিলাম, 'এই মমি আমি প্রাণান্তেও হস্তচ্যুত করিব না। এ সম্বন্ধে আপনি পুনর্বার আমাকে অনুরোধ করিবেন না।'

আমার কথা শুনিয়া রা-তাই নিস্তব্ধ ভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার চক্ষুতে পুনর্বার সেই অস্বাভাবিক দীপ্তি দেখিতে পাইলাম, বুঝিলাম, আমার শেষ কথা শুনিয়াও সে তাহার সঙ্কল্প ত্যাগ করে নাই; কিরূপে মমিটি হস্তগত করিবে, বসিয়া বসিয়া বোধহয় সে তাহারই ফন্দী স্থির করিতেছে। হঠাৎ আমাকে আক্রমণ করাও তাহার পক্ষে কিছুমাত্র বিচিত্র নহে।

অল্পক্ষণ পরে আমি সহজ স্বরে বলিলাম, 'মিঃ রা-তাই, আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না; এজন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। রাত্রি অনেক হইয়াছে, আজ আমি বড়ই পরিশ্রান্ত, আপনি আর আমার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাইবেন না; আপনি বিদায় গ্রহণ করিলেই অনুগৃহীত হইব।'

আমার এই কথার পর আর সেখানে বসিয়া থাকা বোধহয় সে সঙ্গত মনে করিল না; চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। বাতির আলোটা তাহার মুখের উপর পড়িয়াছিল, সেই আলোকে তাহার পৈশাচিক মুখচ্ছবি দেখিয়া আবার আমি আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলাম। স্বীকার করি সে বৃদ্ধ; কিন্তু কেন বলিতে পারি না, তাহার ভাব ভঙ্গী দেখিয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছিল, সে সিংহের ন্যায় বলবান; মনুষ্য-মূর্তিতে পিশাচ। এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই আমি একটু সাবধানে সরিয়া দাঁড়াইলাম।

রা-তাই দণ্ডায়মান হইয়া আমাকে বলিল, 'আমি আপনাকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছি, ইহাতে আপনি অসন্তুষ্ট হইবেন না; আপনার কোন ক্ষতি করিবার আমার ইচ্ছা নাই। এই মমিটা আপনার এইরূপ প্রিয় বস্তু, ইহা পূর্বে জানিলে আমি কখনই ইহা আপনার নিকট চাহিতাম না। যাহা হউক, আপনি যখন আমাকে নিরাশ করিয়া বিদায় দিতে উৎসুক হইয়াছেন, তখন আর আপনার বিশ্রামে ব্যাঘাত

করিবার আমার ইচ্ছা নাই ; এখন আমার প্রার্থনা, আপনি আমার রূঢ়তা বিস্মৃত হইয়া প্রসন্ন মনে আমাকে বিদায় দান করুন।'

রা-তাই দ্বারপ্রান্তে অগ্রসর হইয়া বিদায়সূচক কর-কম্পনের জন্য তাহার শিরাবহুল শীর্ণ ও বিবর্ণ দক্ষিণ হস্তখানি আমার সম্মুখে প্রসারিত করিল, আমি একটু ইতস্ততঃ করিয়া তাহার হাতে হাত দিলাম। দেখিলাম, তাহার হাতখানি বরফের মত শীতল। যাহার দেহে নিরন্তর শোণিত প্রবাহিত হইতেছে, তাহার দেহ কি এত শীতল হইতে পারে ? তাহার কর-কম্পনমাত্র আমার সর্বাঙ্গে যেন বিদ্যুৎ-প্রবাহের সঞ্চার হইল, আমি ব্যগ্রভাবে হাতখানি টানিয়া লইবামাত্র সেই নরপ্রেত উভয় হস্তে আমার গলা চাপিয়া ধরিয়া আমাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিল, তাহার পর আমার বক্ষের উপর চাপিয়া বসিল।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই সঙ্কটজনক অবস্থার কথা আমার স্মরণ থাকিবে। আমি তখন আত্মরক্ষার চেষ্টা করিব কি, ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া পড়িলাম, আমার সর্বাঙ্গ থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। বৃদ্ধ তাহার অস্থিময় উভয় হস্তে সজোরে আমার কণ্ঠনালী চাপিয়া ধরিয়া তীব্র দৃষ্টিতে আমার চক্ষুর দিকে চাহিয়া রহিল ; বোধ হইল তাহার চক্ষু হইতে বিদ্যুৎশিখা বাহির হইয়া আমার চক্ষুতে প্রবেশ করিতেছে! অল্পক্ষণের মধ্যেই আমার সর্বাঙ্গ অসাড় হইয়া গেল ; তাহার যে হস্ত দুই মিনিট পূর্বে তুষারের ন্যায় শীতল বোধ হইয়াছিল, ক্রমে তাহা উত্তপ্ত লৌহদণ্ডের ন্যায় অসহ্য হইয়া উঠিল। তাহার পর আমার অনুভবশক্তি বিলুপ্ত হইল, আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। অবশেষে আমি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রভাতে আমার জ্ঞানসঞ্চার হইল ; বিহঙ্গের কূজনে, প্রাতঃসূর্যের আলোকসম্পাতে গৃহপ্রান্তর পথে পথিকগণের পদশব্দে আমি জাগরিত হইয়া উঠিয়া বসিলাম ; রাত্রে শয্যায় শয়ন করিয়া দ্বারপ্রান্তে ম্যাটিং-

এর উপর কেন পড়িয়া ছিলাম, তাহা সহসা স্মরণ হইল না ; সুতরাং অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া আমি পূর্বরাত্রির সমস্ত ঘটনা মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলাম। রাত্রের দুর্ঘটনা একটি অপ্রীতিকর স্বপ্নমাত্র বলিয়া বোধ হইল। আমি উঠিয়া সেই কক্ষের চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম, দেখিলাম, যে জিনিসটি যেখানে যেভাবে রাখিয়া-ছিলাম, তাহা সেইভাবেই সজ্জিত আছে, কোন সামগ্রীই স্থানচ্যুত হয় নাই, গৃহের দ্বার পর্যন্ত ভিতর হইতে রুদ্ধ ; কিন্তু আমার শরীরের অবস্থা দেখিয়া বড় দুঃখ হইল ; শরীর অত্যন্ত দুর্বল, মাথা ভার, মন উৎসাহহীন,—সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইলে যেরূপ হয় দেহ সেইরূপ অবসন্ন। এক রাত্রির মধ্যে আমার এত পরিবর্তন কেন হইল, বুঝিতে পারিলাম না। নানা চিন্তা করিতেছি, এমন সময় বাহির হইতে দরজায় কে আঘাত করিল। আমি দরজা খুলিয়া দেখিলাম, পুলিশের একজন ইন্‌স্পেকটর একটি কন্‌স্টেবল সঙ্গে লইয়া আমার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আছেন।

ইন্‌স্পেকটর আমার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনিই কি মিঃ সেন? এত সকালে আসিয়া আপনার নিদ্রার ব্যাঘাত করিয়াছি, আমার এ ত্রুটি মার্জনা করিবেন। বিশেষ আবশ্যকানুরোধেই আমাকে আপনার নিকট আসিতে হইয়াছে ; আপনাকে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?'

রাত্রের সেই দুর্ঘটনার পর প্রভাতে পুলিশের চরের এইরূপ আকস্মিক আবির্ভাবে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম, ব্যাপার কি, বুঝিতে পারিলাম না ; কিন্তু বিস্ময় দমন করিয়া ইন্‌স্পেকটরকে বলিলাম, 'আপনি যাহা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন ; ভিতরে আসিয়া বসুন।'

ইন্‌স্পেকটর আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়া একখানি চেয়ারে উপবেশন করিলে আমি দরজা বন্ধ করিলাম ; কনস্টেবলটা বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল।

আমি ইন্‌স্পেকটরকে বলিলাম, 'আপনার সহিত আমার পরিচয়

নাই, কোনও ফৌজদারী হাঙ্গামারও খবর রাখি না, এ অবস্থায় আপনি আমার নিকট কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছেন বুঝিতে পারিতেছি না।'

ইন্‌স্পেকটর বলিলেন, 'এই গলির মধ্যে পাশের একটা দোকানে গতকল্য রাত্রে একজন লোক খুন হইয়াছে; কত রাত্রে এই কাণ্ড ঘটিয়াছে তাহা ঠিক জানা যায় নাই, তবে আমাদের অনুমান, রাত্রি ১২টা হইতে ১টার মধ্যে এই কাণ্ড ঘটিয়াছে। যে ব্যক্তি খুন হইয়াছে, বিটের কন্‌স্টেবল তাহার আর্তনাদ শুনিতে পায় নাই; এইজন্য অনুমান হয়, হত্যাকারী তাহাকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া তাহার গলা চাপিয়া ধরিয়াছিল, তাহার পর তাহাকে হত্যা করিয়াছে। বিস্ময়ের কথা এই যে, যে ঘরে খুন হইয়াছে, সেই ঘরের সদর দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করা ছিল; আমরাই প্রথমে সেই দরজা ভাঙিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করি। ইহাতে বুঝিতে পারা যাইতেছে, হত্যাকারী সেই গৃহের পশ্চাতের দ্বার দিয়া পলায়ন করিয়াছে। সেই দোকানের পশ্চাদ্ভাগে আর একটি ছোট গলি আছে, বিটের কন্‌স্টেবল রাত্রি একটার পর ও দুইটার পূর্বে সেই গলি দিয়া একজন লোককে যাইতে দেখিয়াছিল, কিন্তু তাহাকে দেখিয়া কন্‌স্টেবলের মনে কোন সন্দেহ না হওয়ায়, সে তাহার গতিরোধ করে নাই। কন্‌স্টেবলের নিকট ইহাও জানিতে পারা গিয়াছে যে, সেই লোকটা আপনার এই ঘরের দিকে আসিয়াছিল। আপনার একজন প্রতিবেশী অল্লক্ষণ পূর্বে আমাকে বলিয়াছেন, আপনার এই ঘরে কাল সমস্ত রাত্রি আলো জ্বলিয়াছে, সাসির ভিতর দিয়া তাহা তিনি দেখিয়াছিলেন। রাত্রে আপনার এখানে কোন লোক আসিয়াছিল কি না, এবং আপনি নিকটে কোথাও কোন গণ্ডগোল শুনিয়াছিলেন কি না, আপনার নিকট তাহাই জানিতে আসিয়াছি।'

ইন্‌স্পেকটরের কথা শুনিয়া আমার মনে পড়িল, রাত্রি প্রায় একটার সময় রা-তাই হঠাৎ আমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছিল। সে যে আমার নিকট মমিটা চাহিয়াছিল, এতক্ষণ পরে স্বপ্নের ন্যায় তাহা

আমার মনে পড়িল। আমি আলমারির দিকে চাহিয়া দেখিলাম, আলমারিতে মমি নাই, তাহার সুদৃশ্য আধারটি পর্যন্ত অদৃশ্য হইয়াছে।—বুঝিলাম, সেই দুরাত্মাই আমাকে সংজ্ঞাহীন করিয়া মমি চুরি করিয়া পলাইয়াছে। আমার গৃহে সে অপহরণের অভিপ্রায়ে আসিয়াছিল, এবং আবশ্যক হইলে সে আমাকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইত না, সম্ভবতঃ আমার প্রতিবেশী দোকানদারের হত্যাকাণ্ডও তাহার দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে। বোধহয় দোকানীকে খুন করিয়াই রা-তাই আমার ঘরে আসিয়াছিল, বৃদ্ধ খুব দ্রুত আসিয়াছিল বলিয়া হাঁপাইতেছিল। তাহার সকল কথাই আমার মনে পড়িল ; কিন্তু কোন কথাই বলিলাম না।

আমাকে নির্বাক দেখিয়া ইন্‌স্পেকটর বলিলেন, 'মহাশয়, আমার প্রশ্ন শুনিয়া আপনি এত কি ভাবিতেছেন ? আমার সময় অত্যন্ত মূল্যবান, আপনি এ সম্বন্ধে কি জানেন, শীঘ্র বলিলে বাধিত হইব।'

যদি আমি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ থাকিতাম, তাহা হইলে বোধহয় রা-তাই সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতাম সকল কথাই তাঁহার গোচর করিতাম ; কিন্তু কি কারণে বলিতে পারি না—আমার বাগিন্দ্রিয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল, আমি তাঁহাকে কোন কথাই বলিতে পারিলাম না, আমার জিহ্বা যেন তালুর ভিতর বাধিয়া গেল ! এমন কি, রা-তাই যে আমার গৃহে আসিয়া আমাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিয়া আমার একটি প্রিয় দ্রব্য চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে, সেই কথাটিও ইন্‌স্পেকটরকে বলিতে পারিলাম না ; যেন কোনও অজ্ঞাত শক্তি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে নীরব রাখিল। ইচ্ছা না থাকিলেও আমি পরিষ্কার মিথ্যা কথা বলিলাম ; ইন্‌স্পেকটরকে জানাইলাম, রাত্রে কাহাকেও আমি আমার ঘরের দিকে আসিতে দেখি নাই, কোন গণ্ডগোলও শুনিতে পাই নাই। পরমেশ্বর জানেন, এই মিথ্যা কথা বলিয়া আমার মনে কিরূপ তীব্র অনুতাপের সঞ্চার হইয়াছিল ; কিন্তু সে সময় যদি প্রকৃত কথা জানিবার জন্য কেহ আমাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইত, তাহা হইলেও তাহাকে সত্য

কথা বলিতে পারিতাম না। ইন্‌স্পেকটর আমার কথা শুনিয়া হতাশ-ভাবে প্রস্থান করিলেন।

ইন্‌স্পেকটর প্রস্থান করিবার পর আমার ইচ্ছা হইল আমি তাঁহাকে পুনর্বার ডাকিয়া সকল কথা খুলিয়া বলি, হত্যাকারীর সন্ধান বলি। কিন্তু আমার সেই ইচ্ছা কার্যে পরিণত করিতে পারিলাম না; স্পষ্ট বুঝিলাম, আমার ইচ্ছার বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা নাই। কিন্তু কেন এমন হইল? কোনও লোক যে অন্যের ইচ্ছাকে এভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, এরূপ আমার ধারণা ছিল না। আমি ক্ষোভে, ঘৃণায়, লজ্জায় অভিভূত হইয়া উভয় হস্তে মুখ ঢাকিলাম, ভাবিতে লাগিলাম, সত্যই কি আমার এমন শোচনীয় অধঃপতন ঘটিয়াছে? শেষে আমাকে মিথ্যাবাদী পর্যন্ত হইতে হইল! একদিন পূর্বেও আমি মনে করি নাই, সহসা আমার জীবন এভাবে অভিশাপ-গ্রস্ত হইবে। আমি তো জীবনে কাহারও প্রতি শত্রুতাচরণ করি নাই, তবে কেন অকারণে আমাকে এরূপ মনঃপীড়া পাইতে হইল?

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গেল, যথা সময়ে ভৃত্য হোটেল হইতে আমার খানা লইয়া আসিল, কিন্তু আমার বিন্দুমাত্র ক্ষুধা ছিল না। জোর করিয়া কিছু খাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু খাদ্যসামগ্রী আমার গলায় বাধিয়া গেল, কিছুই মুখে রুচিল না। আমি বসিয়া বসিয়া পূর্ব রাত্রের হত্যাকাণ্ডের কথা ভাবিতে লাগিলাম; যতই চিন্তা করিলাম, ততই আমার মনে রা-তাইয়ের প্রতি সন্দেহ ঘনীভূত হইয়া উঠিল। ইহা তাহারই কার্য বলিয়া আমার প্রতীতি জন্মিল। রা-তাই আমার গৃহে প্রবেশ করিয়া আমার সামগ্রী অপহরণ করিয়াছিল, নরহত্যা করিয়া আমার গৃহে আশ্রয় লইয়াছিল, কিন্তু তাহাকে যে ধরাইয়া দিব, বা পুলিশের নিকট তাহার দুষ্কর্মের কথা প্রকাশ করিব, আমার সে শক্তি নাই। এমন দুর্ভাগ্য ও বিড়ম্বনার বিষয় আর কি হইতে পারে?

আমি চেয়ার হইতে উঠিয়া বাতায়নের নিকট দণ্ডায়মান হইলাম;

জানালা খুলিয়া দেখিলাম, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে ; বাহ্য প্রকৃতি আমার অন্তঃপ্রকৃতির ন্যায় নিরানন্দময়। অতঃপর আমি সেই কাচের আলমারির নিকট উপস্থিত হইলাম, দেখিলাম তাহার ভিতর হইতে কেবল মমিটিই অদৃশ্য হইয়াছে, অন্য সকল সামগ্রী যেভাবে ছিল ঠিক সেইভাবেই আছে। মমিটি বিলক্ষণ ভারী ছিল, রা-তাইয়ের ন্যায় অশীতিপর বৃদ্ধ এরূপ একটি ভারী দ্রব্য আধারটি-সহ কিরূপে বহন করিয়া লইয়া গেল, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ইন্‌স্পেকটর আমার ঘরে আসিবার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত সেই কক্ষের দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ ছিল ; সুতরাং আমি মনে করিলাম, রা-তাই আমাকে অজ্ঞান করিয়া সম্মুখের দ্বার রুদ্ধ করিয়া হয়ত পশ্চাতের দ্বার দিয়া মমি লইয়া পলায়ন করিয়াছে, কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, পশ্চাতের দ্বারও পূর্ববৎ রুদ্ধ ; এ অবস্থায় সে কোন্‌ পথে গৃহত্যাগ করিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত আমার নিকট অদ্ভুত রহস্যপূর্ণ বোধ হইতে লাগিল, আমি স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিলাম। একবার আমার সন্দেহ হইল, বোধহয় রাত্রে আমি দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি ; কিন্তু রা-তাইয়ের আবির্ভাব ও আমার প্রতি তাহার বিচিত্র ব্যবহার যদি স্বপ্নই হয়, তাহা হইলে মমিটা কোথায় গেল? আমি সঙ্কল্প করিলাম, যেমন করিয়া হউক, রা-তাইয়ের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া আমার সন্দেহ দূর করিব ; সে যে এরূপ দুষ্কর্ম করিয়া নিরাপদে দেশান্তরে পলায়ন করিবে, তাহা কখনই হইবে না, তাহার দুষ্কর্মের প্রতিফল দিতে হইবে।

কিন্তু রা-তাই কোথায় বাস করে, তাহা আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ; কিরূপে তাহার ঠিকানা সংগ্রহ করিব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম ; মনে হইল লেডী বেকেনহাম হয়ত তাহার ঠিকানা জানিতেও পারেন, কারণ গানের মজলিসে তিনি তাহাকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

লেডী বেকেনহামের সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে আমি পোশাক পরিয়া বাসা হইতে বাহির হইলাম ; বৃষ্টিটা তখন ধরিয়া আসিয়াছিল,

মেঘ-নির্মুক্ত সূর্যের আলোকে চতুর্দিক হাসিতেছিল ; আমি একখানি গাড়ি ভাড়া করিয়া লেডা বেকেনহামের গৃহাভিমুখে ছুটিলাম। তাঁহার গাড়ি-বারান্দায় উপস্থিত হইয়া ভৃত্যের মুখে শুনিতে পাইলাম, তিনি বাড়িতেই আছেন। আমি গাড়ি হইতে নামিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম।

লেডী বেকেনহাম আমাকে দেখিয়া যেন কিছু বিস্মিত হইলেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মিঃ সেন, আপনার কি অসুখ হইয়াছে? আপনাকে অত্যন্ত অসুস্থ দেখাইতেছে।'

আমি বলিলাম, 'ও কিছুই নয়, নানা কারণে আমার মন আজ বড় ভাল নাই।—একটি অনুগ্রহ প্রার্থনায় এই অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি।'

লেডী বলিলেন, 'কি করিতে হইবে অসঙ্কোচে বলুন, আমি সাধ্যানুসারে সাহায্য করিব।'

আমি বলিলাম, 'কাল সন্ধ্যার সময় যে বৃদ্ধটি নিমন্ত্রিত হইয়া আপনার গৃহে আসিয়াছিলেন, তাঁহার ঠিকানাটি জানিতে ইচ্ছা করি।'

লেডী বলিলেন, 'কাল সন্ধ্যার পর আমাদের মজলিসে অনেক বৃদ্ধ উপস্থিত ছিলেন, আপনি কাহার ঠিকানা চান? আপনি কি মিঃ রা-তাইয়ের ঠিকানা জানিতে আসিয়াছেন?'

আমি বলিলাম, 'হাঁ, আপনার অনুমান যথার্থ; কাল আপনি তাঁহার সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু লোকটির বিশেষ পরিচয় জানিতে পারি নাই; তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইয়াছিল, তিনি অত্যন্ত অদ্ভুত প্রকৃতির লোক।'

লেডী বলিলেন, 'এই মিশরবাসী ভদ্রলোকটির প্রকৃতি বড়ই অদ্ভুত, বিশেষতঃ তাঁহার চাহনি কেমন অসহ্য মনে হয়; এমন খিটখিটে অসামাজিক অরসিক বৃদ্ধকে আমাদের গানের মজলিসে নিমন্ত্রিত করিবার ইচ্ছা ছিল না; তবে তাঁহার সঙ্গিনী যুবতীটিকে আমাদের মজলিসে বেহালা বাজাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করায় অগত্যা তাঁহার অভিভাবক এই বৃদ্ধটিকেও নিমন্ত্রণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এই বৃদ্ধ সেই যুবতীর কিরূপ অভিভাবক ? যদি মিঃ রা-তাই মিশরবাসী ও রেবেকা কোহেন ইহুদীকন্যা না হইতেন, তাহা হইলে আমি মনে করিতাম, রা-তাই তাঁহার পিতামহ।'

লেডী বেকেনহাম হাসিয়া বলিলেন, 'না, উঁহাদের মধ্যে সেরূপ কোনও সম্বন্ধ নাই। রেবেকার জীবনের ইতিহাস যেমন শোচনীয় সেইরূপ বিচিত্র ; তাঁহার পিতা প্যারিসের একজন মহা সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য বণিক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ন্যায় অমিতব্যয়ী লোক পৃথিবীতে আর কয়জন আছে বলিতে পারি না। রেবেকার শৈশব কালে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। বাল্যকাল হইতেই গীতবাদ্যে তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ; তাঁহার পিতা বহু অর্থব্যয়ে অনেক বড় বড় ওস্তাদ রাখিয়া সযত্নে তাঁহাকে গীতবাদ্য শিক্ষা দিয়াছিলেন। রেবেকা যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিলে তাঁহার পিতা সলোমন কোহেনের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর জানিতে পারা যায় তিনি তাঁহার বিষয় সম্পত্তি সমস্তই উড়াইয়া গিয়াছেন, এমন কি,বাস্তুভিটাটা পর্যন্ত রেহানে আবদ্ধ। পিতার মৃত্যুর পর আত্মীয়বন্ধুহীনা রেবেকা একাকিনী সংসার-সমুদ্রে ভাসিতে লাগিলেন ; বড় বড় মজলিসে গান বাজনা করিয়া যাহা পাইতেন, তাহাতেই কোনরূপে তাঁহার জীবিকা নির্বাহ হইত। তাহার পর কবে কিরূপে রা-তাইয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল, আর কেনই বা এই বিদেশী বৃদ্ধ তাঁহার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিলেন, ইহা আমার অজ্ঞাত। শুনিয়াছি রা-তাই মহা ধনবান ব্যক্তি, তাঁহাকে একটু বাতিকগ্রস্ত বোধ হয় ; তবে তিনি গীতবাদ্য বড় ভালবাসেন ; গীতবাদ্যে রেবেকার পারদর্শিতা দেখিয়াই বোধহয় তাঁহার প্রতি বৃদ্ধের দয়া হইয়াছিল। এখন তাঁহারা উভয়ে একত্র বাস করেন। রা-তাই রেবেকার পিতামহের সমবয়স্ক লোক না হইলে কুৎসাপ্রিয় লোকেরা নিশ্চয়ই তাঁহার নানাপ্রকার দুর্নাম রটাইত। যাহা হউক, বৃদ্ধ রা-তাই রেবেকার ভার গ্রহণ করিয়া তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য অনেক বিখ্যাত সঙ্গীত-শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গত পাঁচ বৎসর হইতে রেবেকা রা-তাইয়ের আশ্রয়েই বাস করিতেছেন।'

লেডী বেকেনহামের কথা শুনিয়া নানা নূতন চিন্তায় আমার হৃদয় পূর্ণ হইল। আমি এই অল্প সময়ের মধ্যেই রা-তাইয়ের প্রকৃতির যে পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি কেবল পরোপকারের বশবর্তী হইয়াই যে সে রেবেকাকে আশ্রয় দান করিয়াছে, ইহা কখনই সম্ভব নহে ; কিন্তু তাহাদের ঘনিষ্ঠতার প্রকৃত কারণ কি, আমি তাহা নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

ক্ষণকাল চিন্তার পর লেডী বেকেনহামকে বলিলাম, 'এই যুবতীর জীবনের ইতিহাস অত্যন্ত বিচিত্র। এই সকল কথা শুনিয়া মিঃ রা-তাইয়ের সহিত ভাল করিয়া আলাপ করিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে। তাঁহার ঠিকানাটি জানিতে পারিলে বড়ই অনুগৃহীত হইতাম।'

লেডী বেকেনহাম বলিলেন, 'কিন্তু তাঁহার ঠিকানাটি আমারও জানা নাই ; মিঃ রা-তাই কখন কোন্ ঠিকানায় থাকেন, তাহা প্রায় কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না ; তবে আপনাকে একটু সন্ধান বলিয়া দিতে পারি, আপনি বোধহয় স্যর জর্জ ম্যাক্সওয়েলকে জানেন ?'

আমি বলিলাম, 'আপনি এখানকার মিউজিয়মের অধ্যক্ষের কথা বলিতেছেন কি ? তাঁহার সহিত আমার বিলক্ষণ পরিচয় আছে ; তিনি অনেক দিন মিশরে বাস করিয়াছিলেন, এই উপলক্ষে আমার পিতার সহিত তাঁহার যথেষ্ট বন্ধুত্ব হইয়াছিল, তখন তিনি "নাইট" হন নাই।'

লেডী বেকেনহাম বলিলেন, 'আপনি তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করুন, বোধহয় তিনি আপনাকে মিঃ রা-তাইয়ের বর্তমান ঠিকানা বলিতে পারিবেন। আমি রা-তাইকে যে নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাইয়াছিলাম তাহা স্যর জর্জের বাড়িতেই প্রেরিত হইয়াছিল।'

লেডী বেকেনহামকে ধন্যবাদ দিয়া আমি উঠিব, এমন সময় তিনি বলিলেন, 'মিঃ সেন, আপনাকে বড়ই অসুস্থ বোধ হইতেছে, আপনি একজন ভাল ডাক্তারকে দিয়া শরীর পরীক্ষা করাইবেন। বিদেশে আসিয়াছেন, সময়ে সাবধান না হইলে হয়ত কঠিন রোগে আক্রান্ত হইবেন, তখন বিপদের সীমা থাকিবে না।'

আমি একটু হাসিলাম, এবং তাঁহার সৎপরামর্শের জন্য পুনর্বার তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম। আমার রোগ কোথায়, তাহা আমি ভালই জানিতাম ; ডাক্তারের চিকৎসায় মানসিক ব্যাধির প্রতিকার অসম্ভব।

গাড়ি-বারান্দায় আমার গাড়ি দাঁড়াইয়া ছিল ; কোচম্যানকে জাদুঘরে গাড়ি হাঁকাইতে বলিলাম। মিউজিয়ম সেখান হইতে অধিক দূরে নহে, সেখানে আমার সর্বদাই গতিবিধি ছিল।

স্যর জর্জের অফিসে উপস্থিত হইয়াই তাঁহার সাক্ষাৎলাভে বিলম্ব হইল না। প্রাচীন মিশর সম্বন্ধে স্যর জর্জের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল ; তিনি বড় সৌখীন লোক, তাঁহার আর্থিক অবস্থাও উত্তম ; সদাশয় বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল ; দীন দুঃখী ও বিপন্ন ব্যক্তিকে অনেক সময়েই তিনি অর্থ-সাহায্য করিতেন।

স্যর জর্জ আমাকে দেখিয়া সহাস্যে হাত বাড়াইয়া দিলেন, তাহার পর বলিলেন, 'সেন, এদিকে অনেক দিন তোমাকে দেখি নাই, কিন্তু তোমার কথা মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাই ; সম্প্রতি তোমার একখানি ছবির খুব প্রশংসা বাহির হইয়াছে।'

আমি সবিনয়ে বলিলাম, 'ইহাতেই বুঝিতেছেন প্রশংসাটা কিরূপ সহজলভ্য।'

স্যার জর্জ হাসিয়া বলিলেন, 'এখন কাজের কথা বল, বিশেষ কোন কাজ না থাকিলে এমন অসময়ে এখানে আসিতে না।—তোমাকে এত কাহিল দেখিতেছি কেন ?'

সকলেই আমাকে কাহিল দেখিতেছে! ব্যাপার কি ? কিন্তু স্যর জর্জের নিকট কোন কথা না ভাঙিয়া আমি বলিলাম, 'আমার বিশেষ কোন অসুখ নাই ; আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি, কিন্তু আমার প্রশ্নে আপনি বিস্মিত হইবেন না।'

স্যর জর্জ তাঁহার সোনার চশমার ভিতর দিয়া বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি এমন গুরুতর কথা জিজ্ঞাসা করিবে যে, এত ভণিতা করিতেছ ?'

আমি বলিলাম, 'সম্প্রতি লণ্ডন শহরে একটি বিদেশী বৃদ্ধের

আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে আপনি যাহা কিছু জানেন, শুনিতে ইচ্ছা করি।'

স্যর জর্জ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কোন্ বৃদ্ধের কথা বলিতেছ বুঝিতে পারিলাম না।'

আমি বলিলাম, 'তাহার নাম রা-তাই, শুনিয়াছি সে মিশর দেশের লোক।'

আমার কথা শুনিয়া স্যর জর্জ নির্বাক ভাবে আমার দিকে ক্ষণ-কাল চাহিয়া রহিলেন; সহসা তাঁহার প্রফুল্ল মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল, তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু আত্মসংবরণ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি এই লোকটির পরিচয় জানিবার জন্য কেন ব্যস্ত হইয়াছ?'

আমি বলিলাম, 'আপাতত আমি আপনার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিব না; আপনি যদি তাহার সম্বন্ধে কোনও কথা জানেন, তবে তাহা আমার গোচর করিলে অত্যন্ত অনুগৃহীত হইব; আশা করি আপনি আমাকে এ অনুগ্রহে বঞ্চিত করিবেন না।'

স্যর জর্জ সহসা চেয়ার হইতে উঠিয়া চঞ্চলভাবে সেই কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিলেন; কয়েক মিনিটকাল তাঁহাকে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন দেখিলাম। তাহার পর তিনি আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'দেখ সেন, আমি তোমার পিতৃবন্ধু, তোমাকে যথেষ্ট স্নেহ করি; সেইজন্য তোমাকে বলিতেছি এই ব্যক্তির পরিচয় জানিবার জন্য তুমি বিন্দুমাত্র উৎসুক হইও না। সাবধান, যদি মঙ্গল চাও, তবে জীবনে কখনও তাহার ছায়া স্পর্শ করিও না; সে যেদিকে থাকিবে, সেদিক দিয়াও যাইও না। যদি তোমার দুর্ভাগ্য-ক্রমে কখনও তাহার কবলে নিপতিত হও, তাহা হইলে তোমার সর্বনাশ হইবে, তোমার ইহ পরকাল সমস্তই নষ্ট হইবে; কেহ তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। এই ব্যক্তি সর্পের ন্যায় খল, শয়তানের ন্যায় অন্যের অনিষ্টকারী; তাহার হৃদয় পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন, সে হৃদয়ে দয়া মায়া, স্নেহ মমতা প্রভৃতি সুকোমল বৃত্তির স্থান

নাই। তাহার প্রকৃতি কিরূপ ভীষণ, ভাষায় তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব; তবে এইমাত্র জানিয়া রাখ, তুমি কোনও কারণে তাহার কবলে নিপতিত হইয়াছ এ কথা শুনিলে আমি যতদূর মর্মাহত হইব, তোমার মৃত্যু-সংবাদেও বোধহয় আমার তত কষ্ট হইবে না। এই মিশরবাসী বৃদ্ধ রা-তাইকে আমি শয়তানের অপেক্ষাও অধিক ভয় করি।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মিশর দেশেই কি উহার জন্ম ?'

স্যর জর্জ বলিলেন, 'হাঁ, মিশর দেশে প্রাচীন ফারো রাজবংশের পুরোহিত কুলে তাহার জন্ম ; এই বংশ অতি প্রাচীন, এমনকি, তিন সহস্রাধিক বৎসর পূর্বেও মিশরে এই বংশের অস্তিত্ব বর্তমান ছিল।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তাহার সম্বন্ধে আপনি আর কি জানেন ?'

স্যর জর্জ বুকের উপর উভয় হস্ত রাখিয়া আমার সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন ; তাঁহার হাতের উপর আমার দৃষ্টি পড়িল, দেখিলাম তাঁহার হাত দুখানি কাঁপিতেছে। আমি সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম।

স্যর জর্জ অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোনও কথা বলিলেন না ; শেষে জড়িত স্বরে বলিলেন, 'এই অদ্ভুত বৃদ্ধের সম্বন্ধে আমি আর যাহা জানি, তাহা তোমার নিকট প্রকাশ করা আমার সাধ্যাতীত ; সে সকল কথা জীবনে কাহাকেও বলিতে পারিব না। তুমি আমার পরম স্নেহের পাত্র হইলেও আমি তোমার এই কৌতূহল নিবারণে অসমর্থ। এ সম্বন্ধে তুমি আমাকে আর কোন প্রশ্ন করিও না, করিলে তাহার উত্তর পাইবে না।'

আমি বলিলাম, 'আমার প্রশ্নে আপনি যে কেন এত বিচলিত হইয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিতেছি না, আমি অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াই এ সকল কথা জানিবার জন্য আপনার নিকট আসিয়াছিলাম ; অনাবশ্যক কৌতূহল পরিতৃপ্তি আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি যে কিরূপ বিপন্ন হইয়াছি, তাহা আপনাকে বুঝাইতে পারিব না ; এই ব্যাপারের উপর আমার সম্মান ও সুনাম সকলই নির্ভর করিতেছে।'

স্যর জর্জ স্থিরভাবে আমার কথা শুনিলেন, কিন্তু কোনও উত্তর দিলেন না। তিনি টেবিলের উপর হইতে একখানি খবরের কাগজ তুলিয়া লইয়া তাহার পাতাগুলি উল্টাইয়া দেখিতে লাগিলেন; শেষে সেই কাগজের একটি প্রবন্ধ চিহ্নিত করিয়া তাহা আমাকে পাঠ করিতে দিলেন। দেখিলাম, সেই প্রবন্ধটি পূর্ববর্ণিত দোকানদারের রহস্যপূর্ণ হত্যার বিবরণ। পুলিশ এই হত্যার রহস্যভেদের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া যাহা জানিতে পারিয়াছিল, এই সংবাদ-পত্রে সেই বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধটি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলাম, তাহাতে আমার বিশেষ কোন প্রসঙ্গ নাই। আমি কাগজখানি টেবিলের উপর রাখিয়া স্যর জর্জের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, 'ইহা পড়িয়া আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।'

স্যর জর্জ বলিলেন, 'কিন্তু আমি সকলই বুঝিয়াছি; কাল রাত্রে যে দোকানদারটি হত হইয়াছে, সে তোমার প্রতিবেশী; একজন সাক্ষীর মুখে প্রকাশ, সে একটি লোককে মধ্য রাত্রে সেই হত ব্যক্তির ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়াছিল; সাক্ষী তাহাকে পরে তোমার বাসায় প্রবেশ করিতেও দেখিয়াছিল। আমার বিশ্বাস, এই দুর্ঘটনা উপলক্ষেই তুমি আমার কাছে রা-তাইয়ের কথা জানিতে আসিয়াছ।'

আমি জিজ্ঞাসা কারলাম, 'রা-তাইয়ের সহিত এই হত্যাকাণ্ডের কোন সংস্রব থাকিতে পারে, আপনার মনে কি এরূপ সন্দেহ হইয়াছে?'

স্যর জর্জ বলিলেন, 'তোমার কৌতূহল নিবৃত্তি করা আমার অসাধ্য।'

দেখিলাম স্যর জর্জের নিকট হইতে কোনও কথা বাহির করা অসম্ভব; তখন তাঁহাকে বলিলাম, 'এ কথা আপনি না বলুন, এই বৃদ্ধের ঠিকানাটি কি, তাহা বোধহয় অনায়াসেই আমাকে বলিতে পারেন। লেডী বেকেনহামের নিকট শুনিয়াছি আপনি তাহার ঠিকানা জানেন।'

স্যর জর্জ বলিলেন, 'আমি তাহার যে ঠিকানা জানিতাম, তাহা তোমার জানিয়া কোন লাভ নাই।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কেন ?'

স্যর জর্জ বলিলেন, 'সে আজ প্রত্যুষে তাহার সঙ্গিনীকে লইয়া ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়াছে ; এ অবস্থায় তাহার লণ্ডনের ঠিকানা লইয়া তুমি কি করিবে ?'

স্যর জর্জের কথা শুনিয়া আমি হতাশভাবে বসিয়া রহিলাম।

স্যর জর্জ আমাকে বলিলেন, 'তুমি যে আশায় আমার নিকট আসিয়াছিলে তাহাতে নিরাশ হইয়াছ দেখিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। রা-তাই যে পুনর্বার এদেশে প্রত্যাগমন করিবে তাহার সম্ভাবনা অতি অল্প, তুমি আর অনর্থক তাহার সন্ধানে ঘুরিও না ; তাহার কথা বিস্মৃত হওয়াই তোমার পক্ষে মঙ্গল।'

আমি বলিলাম, 'তাহার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ না হইলে আমি শান্তিলাভ করিতে পারিব না ; তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে যদি আমার সর্বনাশ হয়, তাহাতেও আমার আপত্তি নাই ; আমি যে তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য উৎসুক, আপনি এইরূপ মনে করিবেন না ; তবে যেরূপেই হউক, আমাকে একবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেই হইবে ; কিরূপে আমার এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে আপনি তাহার উপায় বলিয়া দিতে পারেন না ?'

স্যর জর্জ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'যদি কিছু উপায় করিতে পারি, পরে তোমাকে জানাইব।'

স্যর জর্জের নিকট বিদায় লইয়া বাসায় ফিরিলাম। কয়েক ঘণ্টা পরে মিউজিয়মের একজন দ্বারবান আমাকে একখানি কার্ড দিয়া গেল। স্যর জর্জ তাহাতে পেন্সিল দিয়া লিখিয়াছেন, 'যাহার ঠিকানা জানিবার জন্য তুমি ব্যস্ত হইয়াছ, ইটালি দেশের নেপল্‌স্ নগরে কার্লো এঞ্জেলোটি নামক একজন মুসাবিদানবিশের নিকট তাহার সন্ধান পাইবে। নেপল্‌সের সান্ কার্লো থিয়েটারের বাড়ির পাশে এই মুসাবিদানবিশের আড্ডা।'

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইটালি দেশ ইউরোপের নন্দন কানন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভারতের ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর ও ইউরোপের ইটালি তুলনার যোগ্য। কত কবি, কত ঐতিহাসিক, কত চিত্রকর কত কাল হইতে দৃশ্য-বৈচিত্র্যের রম্য নিকেতন, চিত্রশিল্পের সুশোভন লীলাকুঞ্জ, নানা ঐতিহাসিক ঘটনার চিরস্মরণীয় রঙ্গভূমি, ইউরোপের গৌরব-স্বরূপিণী ইটালির মহিমা স্ব-স্ব প্রতিভার উজ্জ্বল আলোকে অঙ্কিত করিয়াছেন; আমি বাঙালী চিত্রকর, ইটালির কথা আর নূতন করিয়া কি বলিব?

প্রাকৃতিক দৃশ্য-বৈচিত্র্যে নেপল্‌স্ নগর ইটালির অনেক নগর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কিন্তু যাঁহারা গ্রীষ্মকালে নেপল্‌সে বাস করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন, সে সময় সেখানে বাস করা কিরূপ বিড়ম্বনাজনক; গ্রীষ্মকালে ভারতের রাজস্থানে, গুর্জরে ও অন্যান্য মরুময় প্রদেশে বাস করা যেরূপ কষ্টকর হইয়া উঠে, সে সময় নেপল্‌স্ নগরে বাস করাও অনেকটা সেইরূপ কষ্টকর। দেশ-পর্যটকেরা সে সময় প্রায় নেপল্‌সে যাইতে চান না; কিন্তু দায়ে পড়িলে সকলই করিতে হয়। আমি যখন রা-তাইয়ের সন্ধানে নেপল্‌সে যাত্রা করি, তখন গ্রীষ্মকাল; জুন; জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আমি নেপল্‌সে উপস্থিত হইলাম।

রাত্রি প্রায় একটার সময় নেপল্‌সের রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেন থামিলে আমি আমার লগেজ লইয়া পূর্বপরিচিত একটা হোটেলের আশ্রয় লইলাম। আমার মনে অশান্তি ও উদ্বেগের সীমা ছিল না; যতক্ষণ পর্যন্ত রা-তাইয়ের সাক্ষাৎ না পাই, ততক্ষণ আমার শান্তি-লাভের আশা নাই।

হোটেলে উপস্থিত হইয়া সুকোমল শয্যায় আমার শ্রান্ত দেহ প্রসারিত করিলাম বটে, কিন্তু আমার নিদ্রাকর্ষণ হইল না; শয্যায় পড়িয়া আমি ক্রমাগত এপাশ-ওপাশ করিতে লাগিলাম। দ্বিতর

চেষ্টাতে নিদ্রাকর্ষণ না হওয়ায় আমি বিরক্ত হইয়া শয্যাত্যাগ পূর্বক দ্বার খুলিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। তখন শুক্ল পক্ষ, জ্যোৎস্না-পুলকিতা নিশীথিনীর শোভা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। এমন মনোহর রাত্রি ইংলণ্ডে সচরাচর দেখা যায় না। মেঘহীন নির্মল আকাশে পূর্ণপ্রায় শশধর হাসিতেছিলেন, এবং সেই উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে সুবিস্তীর্ণ নগরী মোহাচ্ছন্ন বোধ হইতেছিল। আমার সম্মুখেই বন্দর; অনেকক্ষণ পর্যন্ত মুগ্ধ নেত্রে বন্দরের নৈশ শোভা নিরীক্ষণ করিলাম। দূরে সুপ্রসিদ্ধ আগ্নেয়গিরি বিসুভিয়স উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান; গিরি-শৃঙ্গগুলি চন্দ্রালোকে গগন-বিলম্বিত ধূসর মেঘস্তরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। প্রকৃতির এই দৃশ্য-বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হইলাম, কিছুকালের জন্য আমার মনের সন্তাপ দূর হইল। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই রা-তাইয়ের সঙ্গিনী রেবেকার অনিন্দ্যসুন্দর প্রতিভা-প্রদীপ্ত মুখখানি আমার চিত্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; মনে হইতে লাগিল, তিনি যেন করুণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া আমার সহায়তা প্রার্থনা করিতেছেন। তাঁহার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, তাঁহার বেহালার সেই সুললিত সুমধুর ঝঙ্কার আমার কর্ণকুহরে পুনঃ-পুনঃ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। রেবেকা এখন যে নগরে অবস্থান করিতেছেন, আমিও সেই নগরে আসিয়াছি মনে করিয়া আমার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল।

প্রায় এক ঘণ্টা কাল আমি সেই বারান্দায় দণ্ডায়মান রহিলাম। নৈশ সমীরণ প্রবাহে আমার উত্তপ্ত মস্তক অপেক্ষাকৃত শীতল হইলে আমি শয়ন-কক্ষে প্রত্যাবর্তন পূর্বক শয্যায় শয়ন করিলাম। তাহার পর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এমন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইলাম যে পরদিন বেলা নয়টার পূর্বে আর নিদ্রাভঙ্গ হইল না।

নিদ্রাভঙ্গে শয্যা ত্যাগ করিয়া আমি তাড়াতাড়ি বেশ পরিবর্তন পূর্বক কিছু আহার করিয়া মুসাবিদানবিশ এঞ্জেলোটির সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িলাম। 'সান্ কার্লো' থিয়েটার আমার হোটেল হইতে অধিক দূরে নহে, একখানি গাড়ি ভাড়া করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই সেখানে উপস্থিত হইলাম। স্যর জর্জ ম্যাক্সওয়েলের স্বহস্তলিখিত

কার্ডখানি আমার পকেটেই ছিল, আমি তাহা বাহির করিয়া এঞ্জেলো-টির সন্ধানে থিয়েটারের চতুর্দিকে একবার ঘুরিয়া দেখিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলাম না।

ঘুরিতে ঘুরিতে পথের এক স্থানে দেখিলাম একটি অল্পবয়স্ক যুবক দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সিগারেট টানিতেছে ; অগত্যা তাহাকেই এঞ্জেলো-টির কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। যুবক আমার প্রশ্নে অবাক হইয়া ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, সেই তপ্তকাঞ্চন-বর্ণাভ ইটালীয় যুবক আমার ন্যায় কৃষ্ণকায় বাঙালীকে দেখিয়া কাফ্রি নিগ্রো কি আর কিছু মনে করিল বলিতে পারি না ; কিন্তু সে দুই-তিন মিনিট কাল এমন বিস্মিত হইয়া রহিল যে, তাহার হাতের সিগারেটটি নির্বাণোন্মুখ হইয়াছে, ইহাও সে চিন্তা করিবার অবসর পাইল না। তাহার পর সে আমার আপাদ-মস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন ?'

আমি বলিলাম, 'আপাততঃ আমি লণ্ডন হইতে আসিতেছি।'

যুবক সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়া একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, 'আপনি নিশ্চয়ই ইংরাজ নহেন ?'

আমি বলিলাম, 'না, আমি ইণ্ডিয়ার লোক।'

যুবক জিজ্ঞাসা করিল, 'ইণ্ডিয়া কোন্ দেশ ?'

আমি যদি নূতন ইউরোপে আসিতাম, তাহা হইলে হয়ত এই অর্বাচীন যুবকের অজ্ঞতায় বিস্মিত হইতাম ; কিন্তু ইউরোপের জন-সাধারণ প্রাচ্য ভূখণ্ডের অধিবাসিদের সম্বন্ধে কিরূপ অজ্ঞ তাহা আমার অগোচর ছিল না, সুতরাং এই যুবকের কৌতূহলে বিস্ময়ের পরিবর্তে আমার মনে বিরক্তির সঞ্চার হইল, আমি বলিলাম, 'তোমার কাছে সে পরিচয় দিবার এখন আমার সময় নাই, তুমি এই লোকটির কোন খবর জান কি না তাহাই আমাকে বল ; বিশেষ প্রয়োজনে আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।'

যুবক নিঃশেষিত-প্রায় সিগারেটের গোড়াটা মাথা ভিঙাইয়া দূরে নিক্ষেপ পূর্বক আমাকে বলিল, 'ও নামের কোনও লোক এখানে নাই।'

ইতিমধ্যে আর একটি যুবক—সম্ভবতঃ পূর্বোক্ত যুবকের কোন ব্রাদার—সেইখানে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'উনি কী চান ?'

পূর্বোক্ত যুবকটি বলিল, 'এঞ্জেলোটি কাহার নাম ? উনি তাহার সহিত একবার দেখা করিতে চান।'

'সে আবার কে ?' এইমাত্র বলিয়া সেই যুবকটিও চলিয়া গেল।

আমি হতাশ হইয়া আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলাম। পথে আর একটি দীর্ঘাকৃতি কৃশকায় যুবকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল, তাহাকে দেখিয়া সে কোন ভদ্রলোকের খানসামা কি ফেরিওয়ালা, ঠিক বুঝিতে পারিলাম না ; সে আমার মুখের দিকে চাহিতেই আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এখানে এঞ্জেলোটি নামক মুসাবিদানবিশ কোথায় থাকে বলিতে পার ?'

যুবক বলিল, 'পারি।'

কেন বলিতে পারি না, তাহার কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না ; আমার মনে হইল আমাকে কৃষ্ণকায় বৈদেশিক দেখিয়া সে আমার সঙ্গে পরিহাস করিতেছে। কালো রং দেখিলে ইউরোপের মুটে মজুরগুলা পর্যন্ত পরিহাসের প্রলোভন সংবরণ করিতে পারে না। আমি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি তাহাকে চেন তো ?'

যুবক বলিল, 'বোধহয় চিনি, কারণ এই ভদ্রলোকটি আমার কাকা, অর্থাৎ আমার বাপের ছোট ভাই।'

যুবকের এই রসিকতায় আমি একটু বিরক্ত হইলাম ; সে কি আমার সঙ্গে রহস্য করিতেছে ? হয়ত রহস্য না হইতেও পারে, ইউরোপের অনেক লোক কাকা দূরের কথা নিজের বাপকেও চেনে না !

যাহা হউক, আমি কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া তাহাকে বলিলাম, 'তুমি যখন এঞ্জেলোটির ভাইপো, ও তাহাকে চেন বলিতেছ, তখন বোধ করি তাহার ঠিকানাটি বলিতে তোমার আপত্তি নাই !'

নেপল্‌সের নিম্ন শ্রেণীর লোকগুলা অত্যন্ত লোভী, কিছু না পাইলে নিঃস্বার্থভাবে তাহারা কাহারও কোন উপকার করে না। দেখিলাম

এই যুবকটিও সেই প্রকৃতির ; সে আমার কথা শুনিয়াই তাহার দক্ষিণ হস্তটি পকেট হইতে বাহির করিয়া আমার সম্মুখে প্রসারিত করিল, বলিল, 'কিছু দিতে পারিবেন ? পারিশ্রমিক পাইলে আমি আপনাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইতে পারি ; আমার ব্যাগার খাটিবার অবসর নাই; সময় বড় মূল্যবান সামগ্রী।'

এঞ্জেলোটির সহিত সাক্ষাতের জন্য অর্থব্যয়ে আমার আপত্তি ছিল না, লণ্ডন হইতে এ পর্যন্ত আসিতে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়াছি ; তাহার হস্তেও কিছু প্রদান করিলাম। সে তাহা পকেটে ফেলিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া একটা গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। নেপল্‌স্ শহরের ছোট ছোট গলিগুলির মত নোংরা গলি বোধ হয় ব্রহ্মাণ্ডে কোথাও নাই ; সেই সঙ্কীর্ণ গলির দুই দিকে চার পাঁচতলা বাড়ি সূর্যকিরণ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে ; অধিকাংশ বাড়ির সম্মুখেই বারান্দা বাহির করা, গলির উভয়-পার্শ্বস্থ মুখোমুখি দুইটি বারান্দার মধ্যস্থ ব্যবধান এত সঙ্কীর্ণ যে, এক বারান্দা হইতে লাফাইয়া অনায়াসে অন্য বারান্দায় যাওয়া যায়। প্রায় সকল বাড়ির নিচের তলায় নানাবিধ পণ্য দ্রব্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকান।

এই গলি দিয়া কিছু দূর চলিয়া আমরা একটি কানা গলির মধ্যে প্রবেশ করিলাম ; সেই গলির শেষ প্রান্তে যে বাড়িটি ছিল, তাহার নিচের তলাতেও একটি ছোট দোকান দেখিলাম ; এই দোকানে নানাপ্রকার পুরাতন বাদ্যযন্ত্র বিক্রয়ের জন্য সজ্জিত ছিল।

যুবক সেই দোকানের সম্মুখে আসিয়া আমাকে বলিল, 'ইহাই এঞ্জেলোটি খুড়োর দোকান।'

আমি বলিলাম, 'এ যে দেখিতেছি বাজনার দোকান! আমি জানিতাম, এঞ্জেলোটি মুসাবিদানবিশের কাজ করে।'

যুবক বলিল, 'এঞ্জেলোটি খুড়ো পূর্বে মুসাবিদানবিশি করিতেন, এটি তাঁহার ভাইয়ের দোকান ; তাঁহার সেই ভাইটি অল্প দিন পূর্বে মারা যাওয়ায় এঞ্জেলোটি খুড়ো মুসাবিদা ছাড়িয়া এখন বাজনা বিক্রয়ে মন দিয়াছেন। বেহালা বলুন, ফ্লুট বলুন, হার্মোনিয়ম বলুন, এমন

কি, জয়ঢাক পর্যন্ত সকল বাদ্যযন্ত্র এখানে যত সস্তায় পাইবেন, এই ইটালি রাজ্যে আর কোনও দোকানে তত সস্তায় পাইবেন না।'

যুবকটি বোধহয় আমাকে বাদ্যযন্ত্রের ক্রেতা মনে করিয়াছিল; যাহা হউক, সে আমার জন্য যে পরিশ্রম করিয়াছিল, তাহার দক্ষিণা স্বরূপ তাহার হস্তে আর কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া তাহাকে সেখান হইতে বিদায় করিলাম। তারপর সেই ক্ষুদ্র দোকানে প্রবেশ করিয়াই আমার চক্ষু স্থির! দোকানখানির মধ্যে দাঁড়াইবার পর্যন্ত স্থান নাই; দেখিলাম, রাশি রাশি পুরাতন বিবর্ণ নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র স্থানে স্থানে স্তূপীকৃত রহিয়াছে; চারিদিকের দেওয়ালে, এমন কি, সেই ঘরের আড়া বরগায় পর্যন্ত বাদ্যযন্ত্র ঝুলিতেছে। ঘরের এক কোণে একটি ক্ষুদ্র টেবিলের সম্মুখে একখানা হাতবিহীন চেয়ারে বসিয়া একটি বৃদ্ধ মনোযোগের সঙ্গে কি লিখিতেছিল। বৃদ্ধটি খর্বকায়, তাহার মাথায় টাক, শ্বেত চামরের মত সাদা সুদীর্ঘ দাড়ি আবক্ষ প্রসারিত।

আমাকে দোকানে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বৃদ্ধ কলম হাতে লইয়াই উঠিয়া দাঁড়াইল; আমার দিকে মিট্‌মিট্ করিয়া চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'মহাশয় কি চান?'

আমি বৃদ্ধকে বলিলাম, 'আমি সিগনর এঞ্জেলোটির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। ইংলণ্ডে শুনিয়াছিলাম, তিনি সান্ কার্লো থিয়েটারের কাছে বসিয়া মুসাবিদা লেখেন।'

বৃদ্ধ বলিল, 'আমারই নাম এঞ্জেলোটি। আপনি আমার যে পরিচয় পাইয়াছিলেন, তাহাই আমার ঠিক পরিচয়; আমি ঐ ঠিকানায় থাকিয়া বহু দিন মুসাবিদানবিশি করিয়াছি; কিন্তু সম্প্রতি আমার কনিষ্ঠ সহোদরের মৃত্যু হওয়ায় আমাকে অগত্যা সেই সম্মানের কাজটি ছাড়িয়া এই দোকানের ভার লইতে হইয়াছে। আমার এই দোকানে বেহালা, ফ্লুট, বিউগিল্ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র যত সস্তায় পাইবেন, পুরাতন বাদ্যযন্ত্র এত সস্তায় এ শহরের আর

কোথাও পাইবেন না; ব্যাণ্ডের সকল সরঞ্জামই আমি রাখি; আপনার কি চাই?'

গোরা বাদ্যকর দলের জয়ঢাক বাহকের আকৃতির সহিত আমার আকৃতির কোন সামঞ্জস্য ছিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু লোকটার দোকানদারীতে আমার হাসি পাইল; আমি কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া বলিলাম, 'আপনি যে মুসাবিদানবিশি করিতেন, তাহা খুব সম্মানের কাজ ছিল; তবে দরকার পড়িলে মানুষকে সকলই করিতে হয়, আপনার এই স্বাধীন ব্যবসায়টি অসম্মানের কাজ নহে। যাহা হউক, আমি কোনও বাদ্যযন্ত্র ক্রয়ের অভিপ্রায়ে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসি নাই; একটি কথা জানিবার জন্য ইংলণ্ড হইতে এত দূরে আসিয়াছি।'

বৃদ্ধ মাথা নাড়িয়া বলিল, 'হাঁ, সে দেশের কথা আমি জানি। ইংলণ্ড মস্ত দেশ, সেখানে বিস্তর ধনী; আমার অনেক মক্কেলের চিঠি-পত্র সে দেশে যাইত; সে দেশের দুই চারি জন বড় লোকের সঙ্গেও আমার বন্ধুত্ব আছে। কিন্তু আপনাকে দেখিয়া তো ইংরাজ বলিয়া বোধ হইতেছে না; আপনার নিবাস কি আফ্রিকায়?'

লোকটা বোধহয় আমাকে কাফ্রি মনে করিয়াছিল।

আমি বলিলাম, 'আমার মিবাস ইস্ট ইণ্ডিয়ায়।'

বৃদ্ধ সম্ভবতঃ ইণ্ডিয়ার নাম এই প্রথম শুনিল; জিজ্ঞাসা করিল, 'সে আবার কোন্ মুলুক?'

আমি বলিলাম, 'সে অনেক দূরের পথ, কিন্তু আপাততঃ আমি ইংলণ্ড হইতেই আসিতেছি; আপনার কাছে একজন লোকের ঠিকানা জানিতে চাই; তিনি ইংলণ্ডেই ছিলেন, কয়েক দিন পূর্বে ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়াছেন।'

বৃদ্ধ বলিল, 'তিনি আপনার স্বদেশী না ইংরাজ?'

আমি বলিলাম, 'না, তিনি আমার স্বদেশী নহেন, ইংরাজ নহেন, তিনি যে এখন কোথায় তাহাও জানি না; তবে ইংলণ্ডে শুনিয়া আসিয়াছি, আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিলে সেই ভদ্রলোকটির সন্ধান পাইব।'

আমার কথা শুনিয়া বৃদ্ধ টেবিলের উপর কলমটি রাখিয়া মিনিট দুই ধরিয়া উভয় করতলে চক্ষু ডলিল, তাহার পর আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'সেই লোকটির নাম কি? আমার জানা থাকিলে আপনি নিশ্চয়ই তাঁহার ঠিকানা পাইবেন।'

আমি ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম, 'তাঁহার নাম রা-তাই, তিনি মিশর দেশের লোক।'

যদি আমি এঞ্জেলোটির নিকট শয়তানের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিতাম, তাহা হইলেও সে বোধহয় এতদূর বিস্মিত হইত না। রা-তাইয়ের নাম উচ্চারণ করিবামাত্র এঞ্জেলোটি ত্রস্ত ভাবে দুই হাত দূরে সরিয়া গেল, এবং ভীতি-বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে প্রায় দুই মিনিটকাল আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার পর অস্ফুট স্বরে বলিল, 'রা-তাই? না, এ নামের কোন লোককে আমি জানি বলিয়া মনে হইতেছে না।'

তাহার মুখের ভাব দেখিয়াই আমি বুঝিতে পারিলাম রা-তাই তাহার অপরিচিত নহে; কিন্তু কেন যে সে আমার নিকট এ কথা স্বীকার করিতেছে না, তাহা বুঝিতে পারিলাম না; তথাপি যদি কৌশলক্রমে তাহার নিকট হইতে কোনও কথা বাহির করিয়া লইতে পারি এই আশায় তাহাকে বলিলাম, 'আপনি তাঁহাকে নিশ্চয়ই চেনেন, বোধ হয় স্মরণ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, একবার ভাল করিয়া মনে করিয়া দেখুন।'—স্যর জর্জ ম্যাক্সওয়েলের কার্ডখানি আমার পকেটে ছিল, তাহা বাহির করিয়া এঞ্জেলোটির হাতে দিয়া বলিলাম, 'এই দেখুন ইংলণ্ডের জাদুঘরের অধ্যক্ষ স্বহস্তে এই কার্ডে লিখিয়া দিয়াছেন, আপনার নিকট মিঃ রা-তাইয়ের সন্ধান মিলিবে; তাঁহার মত বড় লোক যে না জানিয়া-শুনিয়া এ কথা লিখিয়াছেন, ইহা সম্ভব নহে।'

বৃদ্ধ এঞ্জেলোটি স্যর জর্জ ম্যাক্সওয়েলের কার্ডখানি চশমার ভিতর দিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত পাঠ করিল, তাহার পর মুখ তুলিয়া বলিল, 'হাঁ এ তো দেখিতেছি আমারই নাম বটে! কিন্তু আমি যে এই

ভদ্রলোককে চিনি, বা তাঁহার ঠিকানা জানি, তিনি এ কথা কিরূপে জানিলেন? আমি আপনার কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারিব না, তবে আপনি ভদ্রলোক, কষ্ট করিয়া এত দূর আসিয়াছেন, আপনাকে একেবারে নিরাশ করাও আমার উচিত নয়, আপনি আপনার নাম ও ঠিকানা আমার কাছে রাখিয়া যান, আপনি যাঁহাকে খুঁজিতেছেন, যদি দৈবাৎ তাঁহার সন্ধান পাই তাহা হইলে আপনাকে সংবাদ দিব, ইহার অধিক কিছুই বলিতে পারি না।'

বুঝিলাম এগ্লেলোটি রা-তাইয়ের ঠিকানা জানে, কিন্তু যে কারণেই হউক সে তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহে। সুতরাং আমি আর এ সম্বন্ধে পীড়াপীড়ি করিলাম না, সেই কার্ডের উপরই আমার নাম ও ঠিকানা পেন্‌সিল দিয়া লিখিয়া এগ্লেলোটির কাছে রাখিয়া আসিলাম।

সেই দোকান হইতে বাহির হইয়া নানা পথে ঘুরিতে ঘুরিতে আমি হোটেলে ফিরিতেছি, এমন সময় আমার পশ্চাতে একখানি ঘোড়ার গাড়ির ঘর্ঘর শব্দ শুনিতে পাইলাম। মুখ ফিরাইয়া দেখি, একজোড়া প্রকাণ্ড ওয়েলার একখানি সুদৃশ্য ব্রুহাম লইয়া আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। আমি অন্যমনস্ক ভাবে যাইতেছিলাম, সাবধান না হইলে হয়ত গাড়িখানা আমার ঘাড়ে আসিয়া পড়িত; আমি এক লম্ফে ফুটপাথে গিয়া দাঁড়াইলাম। এমন উৎকৃষ্ট ব্রুহামের আরোহীটি কিরূপ লোক দেখিবার জন্য আমি কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে গাড়ির ভিতরে চাহিলাম। কি আশ্চর্য, দেখিলাম সেই ব্রুহামে রা-তাইয়ের সঙ্গিনী রেবেকা কোহেন একাকিনী বসিয়া আছেন; রেবেকাও সে সময় গাড়ি হইতে মুখ বাড়াইয়াছিলেন, তিনি আমাকে দেখিতে পাইলেন। আমাকে দেখিয়া তিনি যে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছেন, তাহা তাঁহার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম; কিন্তু ব্রুহামখানি নক্ষত্রবেগে ছুটিতেছিল, দুই মিনিটের মধ্যেই তাহা অদৃশ্য হইল। আমি কিংকর্তব্য-বিমূঢ় ভাবে সেই ফুটপাথেই দাঁড়াইয়া রহিলাম; বুঝিলাম, রেবেকা যখন এই

নগরেই আছেন, তখন তাঁহার অভিভাবক রা-তাই নেপল্‌স্ ছাড়িয়া অন্যত্র যায় নাই। আমার আশা হইল, যেমন করিয়াই হউক রা-তাইকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব। একবার তাহার সাক্ষাৎ পাইলে তাহাকে সহজে ছাড়িব না।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, সেবার আমি যে সময় নেপল্‌সে গিয়াছিলাম, বৎসরের সে সময় বিদেশীরা প্রায়ই সেখানে পদার্পণ করেন না; সুতরাং সে সময় হোটেলে বিদেশী যাত্রীর তেমন ভিড় ছিল না; সেই প্রকাণ্ড হোটেলটা প্রায় খালি পড়িয়া ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমি এঞ্জেলোটির দোকান হইতে হোটেলে ফিরিয়া আহারাদির পর ভাবিতেছি—অপরাহ্লটা কিভাবে কাটাইব, এমন সময় একটি লোক আমাকে একখানি লেফাপা দিয়া গেল। আমি ব্যগ্রভাবে তাহা খুলিয়া দেখিলাম সকালে এঞ্জেলোটিকে যে কার্ডখানি দিয়া আসিয়াছিলাম, তাহাই সে ফেরৎ পাঠাইয়াছে; সেই কার্ডের অপর পৃষ্ঠায় লিখিত ছিল, 'মিঃ সেন যাঁহার ঠিকানা জানিবার জন্য উৎসুক, তাঁহার সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা থাকিলে তিনি যেন অদ্য অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় পম্পির ভগ্ন মন্দিরে একাকী উপস্থিত থাকেন; কোনও লোক সঙ্গে লইয়া যাইলে তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে না।'

এই কথাগুলির নিম্নে কাহারত নাম স্বাক্ষরিত না থাকিলেও, যথাস্থানে উপস্থিত হইলে আমি যে রা-তাইয়ের সাক্ষাৎ পাইব, ইহা আমার বিশ্বাস হইল।

ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম, তখন বেলা একটা বাজিয়া গিয়াছে। আমার হোটেল হইতে পম্পির ধ্বংসাবশেষ কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত, ঘোড়ার গাড়িতে ও ট্রেনে সেখানে গমন করা যায়। কিন্তু এই গরমে ট্রেন অপেক্ষা একখানা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিয়া যাওয়াই অপেক্ষাকৃত আরামদায়ক হইবে মনে করিলাম। কিছুকাল বিশ্রামের পর প্রায় তিনটার সময় একখানি ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিয়া পম্পি-অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

নানা পথে ঘুরিতে ঘুরিতে বেলা চারিটার কিছু পূর্বে পম্পি নগরের ভগ্নস্তূপের নিকট উপনীত হইলাম ; এবং গাড়িখানি বিদায় করিয়া একজন পথ-প্রদর্শকের সাহায্যে নির্দিষ্ট ভগ্ন মন্দিরে উপস্থিত হইয়া রা-তাইয়ের প্রতীক্ষায় একটি শিলাখণ্ডে উপবেশন করিলাম। ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম, চারিটা বাজিতে তখনও কয়েক মিনিট বিলম্ব আছে।

স্থানটি অত্যন্ত নির্জন, প্রকৃতি অত্যন্ত নিস্তব্ধ, গাছের একটি পাতাও নড়িতেছিল না ; দূরে নীলাভ গিরিশ্রেণীর উন্নত শৃঙ্গগুলি গগনতল চুম্বন করিতেছিল ; এবং প্রায় অর্ধ মাইল দূরস্থ রেলপথ দিয়া যে সকল ট্রেন যাইতেছিল, তাহাদের গম্ভীর শব্দ প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল।

ঘড়িতে যখন কাঁটায় কাঁটায় চারিটা, সেই সময় আমার পশ্চাৎ-বর্তী শিলাখণ্ডের অন্তরাল হইতে কে বলিল, 'মিঃ সেন, নমস্কার, আপনাকে দেখিয়া বড় সুখী হইলাম ; আশা করি ভাল আছেন।'

আমি উঠিয়া ফিরিয়া চাহিলাম, দেখিলাম রা-তাই আমার পশ্চাতে দণ্ডায়মান।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রা-তাইকে সম্মুখে দেখিয়াই মুহূর্ত-মধ্যে আমার সকল সঙ্কল্প যেন নদীর প্রবল স্রোতে বালির বাঁধের মত ভাসিয়া গেল, আমার সাহস ও দৃঢ়তা অন্তর্হিত হইল ; কি বলিয়া যে প্রথমে তাহার সহিত কথা আরম্ভ করিব, তাহা খুঁজিয়া পাইলাম না। রা-তাই বোধহয় আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিল, আমি কোনও কথা বলিবার পূর্বেই সে বলিল, 'আমার অনুমান হইতেছে, স্যর জর্জ ম্যাক্সওয়েলের

'নিকট সন্ধান জানিয়া আপনি নেপল্সে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, কিন্তু আপনাকে এখানে দেখিয়া আমি বিন্দুমাত্র বিস্মিত হই নাই ; যেদিন লেডী বেকেনহামের গৃহে আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়—সেইদিনই আমি জানিতাম, সপ্তাহকাল-মধ্যে ঠিক এই স্থানে আপনার সহিত আমার পুনর্বার সাক্ষাৎ হইবে।'

রা-তাইয়ের মুখে এই অবিশ্বাস্য কথা শুনিয়া আমি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না, উত্তেজিত ভাবে বলিলাম, 'মিঃ রা-তাই, ইতিপূর্বে আপনি আমাকে প্রতারিত করিবার বিলক্ষণ সুবিধা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া বাহাদুর দেখাইবার জন্য কতকগুলা নূতন মিথ্যা কথা বলিতে কেন এত ব্যস্ত হইয়াছেন? তবে স্যর জর্জ ম্যাক্সওয়েলের নিকট আপনার বর্তমান ঠিকানার সন্ধান পাইয়াছি, এ কথা অস্বীকার করি না ; তাঁহার নিকটেই আমি সর্বপ্রথম জানিতে পারি আপনি ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়াছেন।'

আমার কথা শুনিয়া রা-তাই বলিল, 'মিঃ সেন, তুমি বালক মাত্র, তাই আমার কথা তুমি অসম্ভব মনে করিতেছ, বিশ্বাসের অযোগ্য ভাবিতেছ। তুমি হিন্দুস্থানের লোক, অল্প বয়সে ইউরোপে আসিয়া তোমার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে, ইংরাজের বাহ্যিক চাকচক্যের অনুকরণ করিতে শিখিয়াছ ; জড়বিদ্যার বাহিরে যে অন্য বিদ্যা আছে, সে বিদ্যা যে জড়বিদ্যা অপেক্ষা লক্ষগুণে গরীয়সী, তোমার ইহা কল্পনা করিবার শক্তি নাই ; কিন্তু তোমার জানা উচিত—সুদীর্ঘ কালের সাধনায় মানুষ এমন শক্তি লাভ করিতে পারে, যাহার সাহায্যে সে ভূত ভবিষ্যতের সকল ঘটনাই নখ-দর্পণে দেখিতে পায়। তোমাদের দেশের প্রাচীন যুগের মুনি ঋষিগণের তপঃশক্তির কথা তুমি কি বিস্মৃত হইয়াছ? তুমি বোধহয় জান না, প্রাচীন হিন্দু ও প্রাচীন মিশরবাসী একই জাতি, একই বংশে তাহাদের উৎপত্তি, তাহারা একই মহাতরুর দুই বিভিন্ন শাখা। সভ্যতার আদি যুগে কেবল হিন্দুস্থান নহে, আমাদের মিশর দেশেও তপস্যাপরায়ণ বহু ব্যক্তি এই অলৌকিক শক্তি লাভে ধন্য হইয়াছিলেন। যাহা হউক, তোমার

সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে সকল কথা হইবে না; এখানে বসিয়াই আলাপ করা যাউক।'

সেই বিধ্বস্তপ্রায় ভগ্ন মন্দিরের অনেকগুলি প্রস্তর-স্তূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে নিপতিত ছিল, রা-তাই এক খণ্ড প্রস্তরের উপর উপবেশন করিল, তাহার পর লাঠিখানি পাশে রাখিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিল, 'শেষবার যখন তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়, সে সময় এত শীঘ্র তুমি আমার সন্ধানে বাহির হইবে এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ কর নাই; সুতরাং বুঝিতে হইবে তুমি পরে এই সঙ্কল্প স্থির করিয়াছ। কিজন্য আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছ বল।'

আমি বলিলাম, 'আপনার কথা শুনিয়া মনে হইতেছে. আপনি সে কালের মুনি ঋষির ন্যায় সর্বজ্ঞ, সুতরাং আমি যে কেন আপনার কাছে আসিয়াছি আমি না বলিলেও বোধহয় আপনি তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন।'

রা-তাই বলিল, 'মিঃ সেন, তুমি আমার সম্বন্ধে বড়ই ভুল বুঝিয়াছ। দুর্ভাগ্যক্রমে এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, যাহা হইতে এরূপ ভ্রান্ত ধারণা তোমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছে। এই সকল ঘটনার জন্যই তুমি আমাকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না, আমাকে তোমার হিতৈষী বন্ধু মনে না করিয়া শত্রুবোধে ঘৃণা করিতেছ। যাহা হউক, তোমার কী বলিবার আছে প্রথমে বল; যদি আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকে তাহা শুনিলে আমি আমার নির্দোষিতা প্রতিপন্ন করিতে পারিব। পূর্বে তুমি একবার আমার বিরুদ্ধে নরহত্যার অভিযোগ আনিয়াছিলে, কিন্তু সে ব্যাপারের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। এখন তোমার অভিযোগ কি? মিঃ সেন, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার বয়স যে কত তাহা বোধহয় তোমার অনুমান করিবার শক্তি নাই; এ বয়সে নূতন শত্রু সৃষ্টি করিবার আগ্রহ হয় না। অদৃষ্ট-বিড়ম্বনায় জীবনে অনেক যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছি, যাহাদের বন্ধু মনে করিয়াছি তাহারা আমার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া

আমাকে শত্রু মনে করিয়াছে। তোমার বয়স অল্প হইলেও তুমি বুদ্ধিমান, আশা করি আমার কথাগুলি তুমি স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবে। আমার ধনের অভাব নাই, মহা সম্ভ্রান্ত শক্তিশালী বন্ধুবান্ধবেরও অভাব নাই; পৃথিবী সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট বহুদর্শিতা জন্মিয়াছে; আমার যে শক্তি আছে, সেই শক্তির সহিত যদি তোমার শক্তির মিলন হয় তাহা হইলে আমরা দুইজন প্রাচ্য ভূখণ্ড-বাসী এই শক্তির বলে সমগ্র ইউরোপকে স্তম্ভিত করিয়া দিতে পারি।'

রা-তাইয়ের কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, সে আমার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য উৎসুক হইয়াছে; কিন্তু ইহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। তাহাকে বলিলাম, 'মিঃ রা-তাই, সর্বাগ্রে আপনাকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, আপনি ভদ্রলোকের বন্ধু হইবার অযোগ্য নহেন। যদি আমি আপনার সম্বন্ধে কোন অন্যায় ধারণা পোষণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে সেজন্য শতবার আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব। আপনি কি জানেন, যে রাত্রে আমরা লেডী বেকেনহামের মজলিসে উপস্থিত ছিলাম, সেই রাত্রে আমার একজন প্রতিবেশী দোকানদার অত্যন্ত নৃশংসভাবে নিহত হইয়াছিল?'

রা-তাই বলিল, 'হাঁ, সংবাদপত্রে আমি এই হত্যাকাণ্ডের কথা পাঠ করিয়াছি; কিন্তু আমার নিকট হঠাৎ এ কথা উত্থাপনের কারণ কি? আমি হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিলাম, ইহাই কি তোমার বিশ্বাস?'

আমি বলিলাম, 'সেদিন রাত্রি একটা হইতে দুইটার মধ্যে এক হত্যাকাণ্ড সঙ্ঘটিত হইয়াছিল; রাত্রি একটার পর একজন লোককে হত দোকানদারের দোকানের পশ্চাতে দেখা গিয়াছিল। কোন সাক্ষীর মুখে একথাও শুনিতে পাওয়া গিয়াছে যে, সেই ব্যক্তি পরে আমার বাসায় প্রবেশ করিয়াছিল। আমার স্মরণ আছে ঠিক সেই সময় আপনি আমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন; ইহা হইতে কি অনুমান করা সম্ভব, তাহা আপনিই বিবেচনা করুন।'

রা-তাই বলিল, 'এই ঘটনাচক্র হইতে নির্বোধেরা অনুমান করিবে, আমিই হত্যাকারী; কিন্তু আমি সংবাদপত্রে একথাও পাঠ

করিয়াছি যে, পুলিসের একজন ইনস্পেকটর হত্যাকারীর সন্ধানের জন্য তোমার নিকট উপস্থিত হইলে তুমি তাহাকে বলিয়াছিলে, সে-রাত্রে কোন লোক তোমার গৃহে প্রবেশ করে নাই ; এ কথা কি সত্য ?'

আমি উত্তেজিতভাবে বলিলাম, 'মিঃ রা-তাই, আমি ইনস্পেকটরকে কি বলিয়াছি না বলিয়াছি, আপাততঃ সে তর্কের আবশ্যক নাই ; আমার কক্ষে উপস্থিত হইয়া আপনি আপনার আকস্মিক আবির্ভাবের কী কারণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই স্মরণ করুন। আপনি কি বলেন নাই, আপনি পথে হাওয়া খাইতে বাহির হইয়া পথ ভুলিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে দৈবচক্রে আমার ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলেন ?'

রা-তাই বলিল, 'তোমার আর কি কি বক্তব্য আছে বল, শুনিয়া তোমার সকল কথার উত্তর দিব।'

আমি বলিলাম, 'আপনি আমার ঘরে গিয়া মিশরীয় পুরোহিত রা-মীসের মমিটি হস্তগত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাহা হস্তান্তর করিতে সম্মত হই নাই ; আমাকে অসম্মত দেখিয়া আর তাহা লইবার জন্য জিদ করিলেন না, আমার নিকট বিদায় লইয়া উঠিবার সময় ভদ্রলোকের মত আমার সহিত কর-কম্পনে উদ্যত হইলেন, এবং আমাকে অসতর্ক দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আমাকে আক্রমণপূর্বক মাটিতে ফেলিয়া আমার বুকে চড়িয়া বসিলেন, দুই হাতে আমার গলা টিপিয়া ধরিয়া আমাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিলেন ; তাহার পর কি কৌশলে যে আমার আলমারি হইতে সেই মমিটি বাহির করিয়া লইয়া সরিয়া পড়িলেন তাহা আপনিই বলিতে পারেন। বিস্ময়ের কথা এই যে, এমন গর্হিত কার্য করিয়াও বিন্দুমাত্র লজ্জিত বা অনুতপ্ত হওয়া দূরের কথা, আপনি আমার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন ! এরূপ অবস্থায় কোনও ভদ্রলোক আপনাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিতে পারে কি না তাহা আপনিই বিচার করুন।'

ভাবিয়াছিলাম আমার মুখে এইরূপ স্পষ্ট কথা শুনিয়া রা-তাই

লজ্জিত হইবে ; কিন্তু তাহাকে কিছুমাত্রও লজ্জিত বা কুণ্ঠিত দেখিলাম না। আমার কথা শুনিয়া সে বলিল, 'মিঃ সেন, তোমার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিতেছি, তুমি আমাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেছ ; কিন্তু আমি যাহা করিয়াছিলাম তাহা কোন দুরভিসন্ধির বশবর্তী হইয়া করি নাই।'

আমি বলিলাম, 'আপনার কথা শুনিয়া মনে হইতেছে আপনার দৃষ্টান্তে অতঃপর দস্যুরাও বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া বিচারককে বলিবে তাহারা কোন দুরভিসন্ধিতে ডাকাতি করে নাই, সাধু-সঙ্কল্পের বশবর্তী হইয়াই পরের ধন লুণ্ঠন করিয়াছিল ! আপনার এইরূপ যুক্তি যে অত্যন্ত মৌলিক, তাহা অস্বীকার করিতে পারিব না। যাহা হউক, আমি যদি পুলিসের ইনস্পেকটরকে আপনার সম্বন্ধে মিথ্যা সংবাদ দিয়াই থাকি, তবে তাহা আপনার প্রতিকূল না হইয়া অনুকূলই হইয়াছিল। আমি আপনাকে ধরাইয়া দিবার চেষ্টা না করিয়া ও আপনার অপরাধ গোপনের চেষ্টা করিয়া কুকর্ম করিয়াছি বটে, কিন্তু আপনার তাহাতে উপকার ভিন্ন অপকার হয় নাই।'

রা-তাই বলিল, 'তোমার এ কথা সত্য,তুমি আমার হিতার্থে সত্য গোপন করিয়াছিলে ; এজন্য তুমি আমার ধন্যবাদের পাত্র ; একদিন তুমি জানিতে পারিবে আনি অকৃতজ্ঞ নহি, কিংবা আমাকে তুমি যেরূপ মন্দ লোক মনে করিতেছ, সেরূপও নহি। আপাততঃ মমির সম্বন্ধেই তর্ক করা যাউক। তর্কানুরোধে আমি স্বীকার করিতেছি, আমি মমিটি লইবার জন্যই স্বেচ্ছাক্রমে সেই রাত্রে তোমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলাম। মমিটি আমাকে প্রদান করিবার জন্য পুনঃ-পুনঃ তোমাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম ; কিন্তু আমার অনুনয় বিনয়, ভয়-প্রদর্শন সমস্তই বৃথা হইয়াছিল। তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা করিলে না, অগত্যা তখন আমাকে তাহা বলপূর্বক হস্তগত করিতে হইল। স্বীকার করি, কাজটি আমার পক্ষে ঠিক বন্ধুর মত কাজ হয় নাই ; কিন্তু আমি যাহা কারয়াছিলাম, আমার অবস্থায় পড়িলে তুমিও ঠিক তাহাই করিতে ; চুরি করিয়া হউক, ডাকাতি করিয়া

হউক, তুমি তাহা হস্তগত করিতে। আমার কথা বোধহয় তুমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছ না, আমি সকল কথা খুলিয়া বলি শোন।'

আমি বিদ্রূপপূর্ণ স্বরে বলিলাম, 'আর খুলিয়া বলিতে হইবে কেন? আপনি যাহা বলিলেন, তাহাতেই আপনার সদভিসন্ধির বিলক্ষণ পরিচয় পাইয়াছি।'

কিন্তু আমার কথা কানে না তুলিয়া রা-তাই বলিতে লাগিল, 'স্যর জর্জ ম্যাক্সওয়েলের নিকট বোধহয় শুনিয়াছ, আমি মিশর দেশের লোক। তুমি হিন্দুস্থানের অধিবাসী, শুনিয়াছি তোমাদের দেশে চন্দ্র-সূর্য-বংশোদ্ভব ব্যক্তিগণের অস্তিত্ব এখনও বর্তমান আছে। তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব-পুরুষগণকে কিরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন, পূর্ব-পুরুষগণের বিরুদ্ধে কেহ কোনও কথা বলিলে তাঁহারা কিরূপ মর্মাহত হন, তাহা তোমার অজ্ঞাত না থাকাই সম্ভব। এইসকল প্রাচীন বংশ সহস্র সহস্র বৎসর কাল হইতে বর্তমান আছে, তাহাদের শাখা-প্রশাখা দেশে বিদেশে প্রসারিত হইয়াছে। তোমাদের দেশের ন্যায় আমাদের মিশর দেশেও অতি প্রাচীন বংশ আছে; আমি রা-তাই এইরূপ একটি প্রাচীন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; এই বংশ মিশর দেশে গত তিনসহস্র বৎসর হইতে বর্তমান। রা-মীস নামক যে ব্যক্তির মমি তোমার পিতা দশ পনেরো বৎসর পূর্বে কোনও ইংরাজের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই রা-মীস আমার পূর্বপুরুষ। একজন মিশর-প্রবাসী ইংরাজ প্রত্নতত্ত্ব [illegible] ছলে সেই মমি সমাধিষর্ভ হইতে উত্তোলিত করিয়াছিল; আমার পূর্ব-পুরুষের মমি তাঁহার সমাধিগর্ভে পুনঃস্থাপিত করিবার জন্য আমার আগ্রহ না হইবে কেন? তোমার গৃহ হইতে তোমার গৃহ-বিগ্রহকে যদি কেহ অপহরণ করিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে ছলে বলে কৌশলে, যেমন করিয়া হউক তাহা পুনর্বার হস্তগত করিতে কি তোমার আগ্রহ হয় না? যদি না হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে, তুমি কাপুরুষ, তুমি জড়, তুমি মনুষ্য নামের অযোগ্য, নরাধম! আমি আমার পূর্ব-পুরুষের মমির অনুসন্ধানে বহু বৎসর

ধরিয়া ইউরোপের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, ইউরোপের প্রধান প্রধান নগরের সকল মিউজিয়ম তন্ন-তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াছি, দেশ-বিদেশের দুষ্প্রাপ্য কৌতুকাবহ প্রাচীন সামগ্রী সংগ্রহ করা যাহাদের অভ্যাস, তাহাদের গৃহেও অনুসন্ধানের ত্রুটি করি নাই; কিন্তু কোন স্থানেই সফল-মনোরথ হইতে পারি নাই। তাহার পর ঘটনাক্রমে জানিতে পারিলাম, তোমার পিতা মিশর দেশে অবস্থানকালে এই মমিটি স্বগৃহে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার পর তুমি তাহা ইংলণ্ডে লইয়া গিয়াছ। এই সংবাদ পাইয়াই আমি ইংলণ্ডে গমন করি, এবং তোমার সহিত পরিচিত হই; তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা তোমার অজ্ঞাত নহে।'

রা-তাইয়ের কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সেই মমিটি এখন কোথায় আছে?'

রা-তাই বলিল, 'এই নগরেই আছে, তাহা লইয়া আমি আগামী কল্য মিশর দেশে যাত্রা করিব; যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাহা তাঁহার সমাধিগর্ভে পুনঃস্থাপিত করিতে না পারিতেছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি শান্তিলাভ করিতে পারিব না। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে তোমার সহিত অধিক তর্ক-বিতর্কে আমার প্রবৃত্তি নাই; তবে, তোমার পিতা অর্থ-বিনিময়ে তাহা হস্তগত করিয়াছিলেন, আমি তোমার নিকট হইতে তাহা বলপূর্বক গ্রহণ করিয়াছি। তুমি ইহা যেরূপ মূল্যবান মনে কর, আমি তদপেক্ষা ইহা অধিক মূল্যবান মনে করি, সুতরাং এই মমির পরিবর্তে তুমি আমার নিকট যাহা চাহিবে, তাহাই তোমাকে প্রদান করিতে সম্মত আছি।'

আমি বলিলাম, 'আমার পিতৃ-পরিত্যক্ত স্মৃতিচিহ্ন বলিয়াই আমার নিকট এই মমির যাহা কিছু আদর; নতুবা ইহার বিশেষ কোনও মূল্য নাই, সুতরাং আমি ইহার পরিবর্তে আপনার নিকট কিছুই প্রার্থনা করি না; আপনি আমার অসম্মতিতে এই মমি হস্তগত করিয়া যে অন্যায় করিয়াছেন, আপনার সকল কথা শুনিয়া সে

অপরাধ মার্জনীয় মনে করিতেছি। কিন্তু আপনিই আমার প্রতিবেশী দোকানদারকে রাত্রিকালে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছেন, এই সন্দেহ আমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছে, আপনি কিরূপে আমার এই সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন ?'

রা-তাই বলিল, 'তোমার সন্দেহ ভঞ্জন করা আমার পক্ষে বড় কঠিন হইবে না।'—রা-তাই তাহার কোটের পকেট হইতে একখানি সংবাদ-পত্র বাহির করিয়া তাহার একটি প্রবন্ধ আমাকে পাঠ করিতে বলিল ; এই প্রবন্ধটির অনুবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইল—

চার্চ লেনের রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড

(রিপোর্টারের পত্র)

'আজ সকালে বেলা প্রায় নটার সময়,—ম্যাক্‌লিন নামক একটি লোক বো স্ট্রীটের থানায় উপস্থিত হইয়া দারোগার নিকট প্রকাশ করে, সে চার্চ লেনে পার্সিভাল নামক একজন দোকানদারকে হত্যা করিয়াছে। ম্যাক্‌লিনের এজাহার হইতে জানিতে পারা যায়, অনেক দিন পূর্বে পার্সিভালের দোকানে সে বিল-সরকারের কাজ করিত। একবার সে বিলের টাকা আদায় করিয়া তাহার কিয়দংশ আত্মসাৎ করায় পার্সিভাল তাহাকে পদচ্যুত করে; এইভাবে পদচ্যুত হওয়ায় ও বিশেষ চেষ্টাতেও অন্যত্র চাকরি না পাওয়ায় সে পার্সিভালের উপর জাতক্রোধ হইয়া উঠে। সে পুনর্বার চাকরির আশায় কয়েকবার পার্সিভালের নিকটেও গিয়াছিল, কিন্তু পার্সিভাল বিশ্বাসঘাতক ভৃত্যকে তাহার কার্যে পুনর্বার নিযুক্ত করিতে সম্মত হয় নাই। বেকার অবস্থায় ম্যাক্‌লিনের কষ্টের সীমা ছিল না ; ঘটনার দিন মধ্যরাত্রে সে পার্সিভালের দোকানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলে, "আমাকে যদি চাকরি না দাও তবে কিছু অর্থ-সাহায্য কর, আজ শমস্ত দিন আমার আহার নাই।" দোকানদার ইহাতেও অসম্মত হয় ; তখন ম্যাক্‌লিন ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া পার্সিভালের বক্ষে একখানি ছোরা বসাইয়া দিয়া দোকানের পশ্চাৎ-দ্বার খুলিয়া পলায়ন করে। ছোরার আঘাতে পার্সিভালের মৃত্যু

হয়। এই ঘটনার পরদিন ম্যাক্‌লিন অনুতপ্ত চিত্তে থানার দারোগার হস্তে আত্মসমর্পণ করে। তাহার এজাহার শুনিয়া থানার দারোগা তাহাকে গারদে লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে, সে একটি পিস্তল বাহির করিয়া তদ্দারা আত্মহত্যা করে। পুলিশ অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছে, মৃত হত্যাকারীর কথা মিথ্যা নহে, সে অনেক দিন পার্সিভালের দোকানে বিল-সরকারের কাজ করিয়াছিল এবং তহবিল-তছরুপাত করিয়া পদচ্যুত হইয়াছিল। পদচ্যুত হইয়া সে সেই পল্লীর একটি মদের দোকানে তাহার বন্ধুগণের নিকটে বলিয়াছিল, একদিন সে পার্সিভালকে খুন করিবে।'

এই সংবাদটি পাঠ করিয়া আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত নির্বাকভাবে বসিয়া রহিলাম; বুঝিলাম রা-তাইয়ের প্রতি সন্দেহ করিয়া আমি বড়ই অন্যায় করিয়াছি; হত্যাকারী যখন পুলিশের নিকট স্বেচ্ছায় অপরাধ স্বীকার করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে আত্মহত্যা করিয়াছে, তখন রা-তাই যে এই অপরাধের সহিত সম্পূর্ণ সংস্রবহীন ইহা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইয়াছে।—আমার বুকের উপর হইতে একটা বোঝা নামিয়া গেল।

আমাকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া রা-তাই বলিল, 'মিঃ সেন, এখন বোধহয় তুমি বুঝিয়াছ এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের সহিত আমার কোন সংস্রব ছিল না; অকারণে আমাকে হত্যাকারী মনে করিয়া তুমি বড়ই অন্যায় করিয়াছ। হত্যাকারী স্বয়ং এভাবে অপরাধ স্বীকার না করিলে তোমার এ সন্দেহ কখনও দূর হইত না। হত্যা-কাণ্ডের অব্যবহিত পরে আমি তোমার বাসায় উপস্থিত হইয়াছিলাম বলিয়া, আমিই হত্যাকারী এই সন্দেহ তোমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল।'

আমি বলিলাম, 'আপনার কথা সত্য, আমি আমার এই অন্যায় সন্দেহের জন্য কি বলিয়া আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব, বুঝিতে পারিতেছি না।'

রা-তাই বলিল, 'তোমার কথার ভাবে বোধ হইতেছে, এই

অন্যায় সন্দেহের জন্য তুমি অনুতপ্ত হইয়াছ, অতএব আমি এ সম্বন্ধে আর কোনও কথা বলিতে ইচ্ছা করি না। এখন তুমি আমাকে বন্ধু মনে করিলে বুঝিব তুমি আমাকে নিরপরাধ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছ। আমি স্বীকার করিতেছি, তোমার অজ্ঞাতসারে তোমার গৃহ হইতে মমিটি লওয়া আমার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই ; যদি তাহা আমাকে প্রদান করা তোমার অভিপ্রেত না হয়, তাহা হইলে তুমি উহা পুনঃগ্রহণ করিতে পার। আমি ইচ্ছা করিলে এই মুহূর্তেই তাহা তোমার লণ্ডনের বাসায় ফেরত পাঠাইতে পারি।'

আমি বলিলাম, 'আপনার পূর্বপুরুষের মমি আপনার নিকটেই থাক, তাহা আমি পুনঃগ্রহণের ইচ্ছা করি না ; আপনি পূর্বে এ সকল কথা বলিলে আমি স্বেচ্ছায় তাহা আপনাকে প্রদান করিতাম। আপনার বিরুদ্ধে অন্যায় ধারণা পোষণ কারয়া আপনার নিকট অপরাধী হইয়াছি ; আম্যর সেই অপরাধ ক্ষমা করুন।'

রা-তাই বলিল, 'মানুষ-মাত্রেই ভ্রম-প্রমাদের অধীন, আমি তোমাকে প্রসন্ন মনে ক্ষমা করিলাম। আমাদের কথা শেষ হইয়াছে, বেলাও আর অধিক নাই, চল এখান হইতে যাওয়া যাক। আজ রাত্রে আমার বাসায় তোমার নিমন্ত্রণ থাকিল ; আশা করি অতিথি-সংকারে আমার ক্রুটি হইবে না। আমার বাসায় আমার পালিতা কন্যা রেবেকার গান বাজনা শুনিয়া তুমি উপভোগ করিতে পারিবে।'

আমি বলিলাম, 'আপনার প্রস্তাব অত্যন্ত লোভনীয় বটে, কিন্তু আমি—'

রা-তাই আমাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই হাত নাড়িয়া বলিল, 'না, না, আমি তোমার কোনও আপত্তিই শুনিতে চাহি না, আমার এই সামান্য অনুরোধ তোমাকে রক্ষা করিতেই হইবে। আমার গাড়ি অদূরে দাঁড়াইয়া আছে, তুমি আমার সঙ্গেই চল ; কিছুকাল উভয়ে বেশ আনন্দে কাটাইতে পারিব।'

অগত্যা আমাকে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে হইল। সেই ভগ্ন মন্দির পরিত্যাগ করিয়া চলিতে চলিতে রা-তাই আমাকে বলিল,

'মিঃ সেন, নেপল্‌স্‌ নগর আমার অত্যন্ত প্রিয়; আমি যখনই ইউরোপে আসি, এই নগরে একবার না আসিয়া থাকিতে পারি না; অনেক বিদেশী লোক প্রতি মাসেই একবার এখানে আসিয়া থাকেন। এখানে দেখিবার, ভাবিবার ও শিখিবার বিষয় অনেক আছে। তোমার প্রীতিকর হইলে ভবিষ্যতে তোমাকে এই প্রাচীন নগর সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত কাহিনী শুনাইব।—অদূরে ঐ ভগ্নপ্রায় "ফোরম্‌" দেখিতেছ? ঐ স্থানে শত-শত বক্তা দণ্ডায়মান হইয়া অগ্নিময়ী বক্তৃতায় সহস্র সহস্র শ্রোতার হৃদয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সঞ্চার করিতেন, সে কত কালের কথা! আর ঐ যে ভগ্নস্তূপ অতীতের সমাধি বক্ষে ধরিয়া মূকের ন্যায় নিপতিত রহিয়াছে, এক কালে উহা অতি সুদৃশ্য আরামদায়ক স্নানাগার ছিল; কত অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী রূপযৌবনের গর্বে অধীর হইয়া, কত দিব্যকান্তি রূপবান যুবা পুরুষ বিলাস-গৌরবে পূর্ণ হইয়া এখানে স্নান করিতে আসিত; তাহাদের আনন্দে, কৌতুকে, গল্পে ও হাস্যে চতুর্দিক মুখরিত হইয়া উঠিত। আর ঐ যে নাট্যশালার ভগ্নাবশেষ দেখিতেছ, ঐ স্থানে প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্বে সহস্র সহস্র আমোদলিপ্সু তরলচিত্ত দর্শকের সম্মুখে কত সুখ-দুঃখের, মিলন-বিরহের ও হাস্য-রোদনের অভিনয় চলিত, তাহা কে বলিতে পারে? আর একটু দূরে গমন করিলে আইসিস দেবীর ভগ্ন মন্দির দেখিতে পাইবে, সেই মিশরীয় দেবীর পাদমূলে অগণ্য ভক্তের মস্তক ভক্তিভরে অবনত হইয়াছে। কিন্তু সেই প্রাচীন যুগের কথা এখন স্বপ্নমাত্র!—চল আমরা ঐ দিক দিয়াই যাই।'

অপরাহ্ণের অস্তমান তপনের লোহিতালোক আমরা সেই নির্জন পথ দিয়া আইসিস দেবীর ভগ্ন মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। মন্দিরের সন্নিকটবর্তী হইয়া তাহার শোচনীয় অবস্থা দর্শনে মহাকালের অজেয় শক্তি মনে পড়িয়া গেল; কাল-প্রভাবে দেবী-মন্দিরের যে দুরবস্থা হইয়াছে, তাহা দেখিয়া মন ক্ষোভে পরিপূর্ণ হইল, কবির সেই উক্তি মনে পড়িল:

'যদুপতে ক্ব গতা মথুরাপুরী
রঘুপতে ক্ব গতোত্তরকোশলা ?
ইতি বিচিন্ত্য কুরু স্বমনস্থিরম্
নসদিদং জগদিত্যবধারয় ।'

মনে হইল সংসারের সকলই অনিত্য। মন্দিরের সে শ্রী নাই, শোভা সম্পদ সমস্তই অপগত হইয়াছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কালের সহিত অনবরত যুদ্ধ করিয়া এই মন্দির জীর্ণ, ভগ্ন ও বিগত গৌরবের সমাধি-স্তূপে পরিণত হইয়াছে।

এই মন্দিরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া রা-তাই আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে আমাকে বলিতে লাগিল, 'দেখ, এই মন্দিরের গৌরবরবি চিরঅস্তমিত হইয়াছে; কিন্তু এমন একদিন ছিল, যখন এই মন্দির সমগ্র দেশের গৌরবস্থানীয় ছিল; তখন এখানে প্রতিদিন কত ভক্তের সমাগম হইত, দিবা রাত্রি মন্দির-প্রাঙ্গণে উৎসবের তরঙ্গ বহিত; এমন কি, সভ্য জগতের সম্রাজ্ঞী রোম নগরী পর্যন্ত ইহার মহিমায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। আমি এখনও যেন মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, ভক্তবৃন্দ ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে অবনত মস্তকে ঐখানে আসিয়া দাঁড়াইতেছে, শ্বেতবস্ত্রপরিহিত পুরোহিতমণ্ডলী পবিত্র দেহে উদাত্ত স্বরে মন্ত্র পাঠ করিতেছেন, ধূপ ধুনা প্রভৃতির সুগন্ধের সহিত সদ্যঃপ্রস্ফুটিত কুসুমরাজির সৌরভ মিশ্রিত হইয়া সেই মিশ্র গন্ধে বায়ুস্তর পরিপূর্ণ হইতেছে। মিঃ সেন, সেই সকল পুরোহিত আজ কোথায়? যুগান্ত পূর্বে যে সকল দেবমূর্তি এখানে বিদ্যমান থাকিয়া নিখিলের ভক্তি-উপহার গ্রহণ করিতেন, তাঁহাদের চিহ্নমাত্র বর্তমান নাই, ভক্তবৃন্দের দেহ সমাধিস্তূপে বিলীন হইয়াছে; সমস্তই ধূলি ও ভস্মে পরিণত হইয়াছে। কেবল দুই সহস্র বৎসরের স্মৃতি পুরাবৃত্তের পৃষ্ঠায় জাগরূক থাকিয়া অনন্তকালের পরিবর্তনশীলতার জয় ঘোষণা করিতেছে। অনিত্য, সকলই অনিত্য; চল, আর এখানে থাকিবার আবশ্যক নাই।'

আমি রা-তাইয়ের সঙ্গে সেই স্থান হইতে রাজপথের অভিমুখে

চলিলাম ; রা-তাই যুগান্ত পূর্বের এই সকল ঘটনা কিরূপে জানিল, তাহা শুনিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি মিশর দেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে এ সকল কথা কিরূপে জানিলেন ?'

রা-তাই বলিল, 'কিরূপে জানিলাম, তাহা শুনিলে সে কথা তুমি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে না ; সুতরাং এ সকল বিবরণ আমার পাঠলব্ধ অভিজ্ঞতার ফল বলিয়াই তুমি মনে করিতে পার। প্রাচীন মিশরের প্রভাব এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, ইহাতে বিস্মিত হইও না।'

কিছু দূরে রা-তাইয়ের গাড়ি দাঁড়াইয়া ছিল, সুন্দর গাড়ি-খানিতে দুইটি অতি বৃহৎ অশ্ব সংযোজিত ছিল ; গাড়ির কোচ-ম্যানটিকেও একটি উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে ভূষিত দেখিলাম। সহিসের পরিচ্ছদও কৃষ্ণবর্ণ ; সে গাড়ির দরজার কাছে দাঁড়াইয়া তাহার প্রভুর প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল। রা-তাই আমাকে সঙ্গে লইয়া গাড়িতে উঠিল। গাড়ি নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া চলিল।

আমরা নেপল্‌স্ নগরে রা-তাইয়ের বাসার দিকে অগ্রসর হইলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

লণ্ডনে নদীতীরে যে দিন মধ্যরাত্রে রা-তাইকে সর্বপ্রথম দেখিতে পাই এবং তাহার পৈশাচিক কার্য প্রত্যক্ষ করিয়া ক্রোধে ও ঘৃণায় সেই স্থান হইতে প্রস্থান করি, সেই দিন যদি কেহ আমার নিকট দৈববাণী করিত সপ্তাহ-মধ্যেই আমি তাহার সহিত বন্ধুভাবে এক গাড়িতে ভ্রমণ করিব ও প্রসন্ন চিত্তে তাহার আতিথ্য গ্রহণ করিব, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই সেই দৈববাণীতে বিশ্বাস করিতাম না। কিন্তু মানুষ অবস্থার দাস ; রা-তাইয়ের কৈফিয়ৎ

শুনিয়া আমার অসন্তোষ ও বিরক্তি দূর হইয়াছিল; এমন কি তাহার সহিত নানা বিষয় সম্বন্ধে আলাপ করিয়া যথেষ্ট আনন্দও অনুভব করিলাম। আমি বাল্যকাল হইতেই প্রবাসী, এই বয়সে পৃথিবীর অনেক দেশে ভ্রমণ করিয়াছি, অনেক বুদ্ধিমান বহুদর্শী ও সুপণ্ডিত ব্যক্তির সহিত আলাপও করিয়াছি; চিত্রবিদ্যায় যে সামান্য খ্যাতি ছিল, তাহার বলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের অনেক বড় বড় মজলিসে নিমন্ত্রিত হইয়াছি, বহু লোকের আলাপ শুনিয়াছি; কিন্তু কি বহুদর্শিতায়, কি বাক্‌পটুতায় রা-তাইয়ের সমকক্ষ লোক এ পর্যন্ত একজনকেও দেখি নাই। তাহার সহিত আলাপ করিয়া বুঝিতে পারিলাম, সভ্য জগতের ইতিহাসে তাহার আশ্চর্য অভিজ্ঞতা; প্রাচীন যুগের নানা ঐতিহাসিক কাহিনীও সে এমনভাবে বলিতে লাগিল, যেন সেই সকল ঘটনা সে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছে; বোধ হইল, সেই বহু প্রাচীন যুগেও সে বর্তমান ছিল।

রা-তাইয়ের সহিত গল্প করিতে করিতে কত পথ অতিক্রম করিলাম, তাহা বুঝিতে পারিলাম না; সময়টা মুহূর্তের মত কাটিয়া গেল। অবশেষে গাড়ি একখানি প্রকাণ্ড পুরাতন অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অট্টালিকার সম্মুখে সুপ্রশস্ত আঙ্গিনা, আঙ্গিনায় সুন্দর পুষ্পকানন। বাড়িটি দেখিয়া মনে হইল, এমন বাড়ি নেপলস্ নগরে অধিক নাই।

একজন ভৃত্য গাড়ির দরজা খুলিয়া দিলে রা-তাই গাড়ি হইতে নামিল; আমিও তাহার অনুসরণ করিলাম। সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে রা-তাই আমাকে বলিল, 'মিঃ সেন, আমার গৃহে সাদরে তোমায় অভ্যর্থনা করিতেছি; তুমি চিত্রকর, কিন্তু তোমার ন্যায় চিত্রকর আমার গৃহে যে এই প্রথম পদার্পণ করিতেছে, এরূপ মনে করিও না; ইউরোপের অনেক প্রতিভাবান খ্যাতনামা চিত্রকরের পদস্পর্শে আমার এই অট্টালিকা পবিত্র হইয়াছে। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকরগণের অঙ্কিত চিত্রসমূহ আমার গৃহ-প্রাচীরে বিলম্বিত দেখিতে পাইবে।

আমি রা-তাইয়ের সঙ্গে বিভিন্ন কক্ষে ঘুরিয়া ঘুরিয়া গৃহসজ্জা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম; অবশেষে একটি সুপ্রশস্ত হলে উপস্থিত হইলাম। এই হলটি প্রায় পঞ্চাশ হাত দীর্ঘ, ত্রিশ হাত প্রশস্ত; এরূপ সুসজ্জিত হল ইংলণ্ডের অনেক লর্ডের বাড়িতেও দেখি নাই। দেখিলাম, সে হলের এক প্রান্তে একটি বৃহৎ পিয়ানো রহিয়াছে, তাহার নিকট একখানি চেয়ারে বসিয়া একটি পরমা সুন্দরী যুবতী ধীরে ধীরে অস্ট্রিচ পক্ষীর পালক নির্মিত একখানি পাখা নাড়িতেছিলেন; আমি সেই যুবতীকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলাম, লেডী বেকেনহামের গৃহে যে যুবতী বেহালা বাজাইয়া আমাদের সকলকে মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন, এবং নেপল্সের রাজপথ দিয়া যাঁহাকে সুদৃশ্য ব্রুহামে যাইতে দেখিয়াছিলাম, ইনি সেই যুবতী, রা-তাইয়ের পালিতা কন্যা রেবেকা কোহেন।

আমাদিগকে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া যুবতী ত্রস্তা হরিণীর ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার নেত্রে ভয়ের চিহ্ন সুপরিস্ফুট দেখিলাম; কিন্তু তাঁহার ভাব পরিবর্তনের কারণ বুঝিতে পারিলাম না। মুহূর্তমধ্যেই যুবতী আত্মসম্বরণ করিয়া বসন্তসমীরণ-সংস্পর্শে চঞ্চলা কুসুমকুন্তলা বনলতার ন্যায় ধীরে ধীরে আমাদের দিকে অগ্রসর হইলেন।

রা-তাই তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'রেবেকা, মিঃ সেন গত রাত্রে নেপল্সে আসিয়াছেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার আমি বড় সুখী হইয়াছি। আজ রাত্রে ইনি আমাদের গৃহে অতিথি, নৈশ ভোজনের জন্য ইঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছি।'

রা-তাইয়ের কথায় মনোযোগ না করিয়া আমি সবিস্ময়ে যুবতীকে দেখিতে লাগিলাম। লেডী বেকেনহামের নিকট এই যুবতীর জীবন সম্বন্ধে যে সকরুণ কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি সহানুভূতিতে আমার হৃদয় পূর্ণ হইল। কিন্তু রা-তাইয়ের কথা শুনিয়া রেবেকার মুখখানি মুহূর্ত-মধ্যে শুকাইয়া গেল; আমি তাঁহার মনঃক্ষোভের কারণ বুঝিতে পারিলাম না।

যাহা হউক রেবেকা আত্মসম্বরণ করিয়া মৃদু স্বরে আমাকে বলিলেন, 'মহাশয়, আমাদের গৃহে আপনার অভ্যর্থনা করিতেছি।' তাঁহার কথা শুনিয়া বোধ হইল, যেন গ্রামোফোন রেকর্ড হইতে কথাটা বাহির হইল ; তাঁহার সেই সম্ভাষণে হৃদয়ের আবেগ, আনন্দ বা আন্তরিকতার কোন পরিচয় পাওয়া গেল না।

রেবেকার কথা শুনিয়া আমি তাঁহাকে যথাযোগ্য উত্তর দিলাম ; রা-তাই আমাকে সেইখানে রাখিয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল। আমি উপবেশন করিলে রেবেকা আমার সঙ্গে দুই একটি মাত্র কথা কহিয়াই উঠিয়া বাতায়নের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন, এবং অনিমিষ নেত্রে চন্দ্রকরোজ্জ্বল পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অল্পক্ষণ পরে তিনি সহসা আমার সম্মুখে আসিয়া নিম্ন স্বরে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বলিলেন, 'মিঃ সেন, আপনি কি পাগল হইয়াছেন ? এখানে কি জন্য আসিয়াছেন ? ইচ্ছা করিয়া কে কবে শোণিতলোলুপ হিংস্র ব্যাঘ্রের গুহায় প্রবেশ করে ?'

রেবেকার কথা শুনিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না, তিনি এ কথা কেন বলিলেন, তাহাও বুঝিতে পারিলাম না ; সুতরাং কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম. 'আপনার এ কথার অর্থ কি ?'

রেবেকা বলিলেন, 'আপনার এখানে পদার্পণ কিরূপ বিপজ্জনক, তাহা আপনাকে বুঝাই, আমার এরূপ শক্তি নাই।'

রেবেকা এই কথা কয়টি বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন ; সরোবরের নীল জলে মৎস্যের সবেগ পুচ্ছ-সঞ্চালনে মৃণাল-বৃন্তস্থ প্রস্ফুটিত শতদল যেমন কাঁপিয়া উঠে, যুবতীর দেহও সেইভাবে কাঁপিতে লাগিল ; করুণায় তাঁহার চক্ষুদুটি অশ্রুপ্লাবিত হইয়া উঠিল, সেই অশ্রুমুখী রূপসীর রূপের শোভা যেন শতগুণ বর্ধিত হইল। আমি বিস্ময়-বিহ্বল নেত্রে তাঁহার সেই করুণাময়ী দেবীমূর্তি দেখিতে লাগিলাম। তাহার পর বলিলাম, 'আপনার কথার অর্থ আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না ; আপনি যাহা বলিতেছেন তাহাতে এই মনে হয়, আমি সহসা কোনও আসন্ন বিপদের সম্মুখীন হইয়াছি ;

কিন্তু রা-তাইয়ের ন্যায় সদাশয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আতিথ্য স্বীকার করিয়া যে কোনও বিপদ ঘটিতে পারে, ইহা সম্ভব বোধ হয় না। আজ অপরাহ্নে পম্পিতে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, নৈশ ভোজনের জন্য সেখানেই তিনি আমায় নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; তাই তাঁহার সহিত এখানে আসিয়াছি। ইহা যে নির্বোধের কার্য হইয়াছে এরূপ তো অনুমান হয় না। তবে, যদি আমার উপস্থিতি কোনও কারণে আপনার অপ্রীতিকর হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি এখনই প্রস্থান করিতে প্রস্তুত আছি।'

রেবেকা আবেগভরে বলিলেন, 'আমি আমার কোন অসুবিধার আশঙ্কায় এ কথা বলি নাই; আপনি এরূপ মনে করিয়া থাকিলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইব। আপনার মঙ্গলের জন্যই আপনাকে সাবধান করিয়াছি। এখানে আগমন করা আপনার পক্ষে কিরূপ বিপজ্জনক, তাহা বুঝিতে পারিলে আপনি এই মুহূর্তেই এই স্থান ত্যাগ করিতেন।'

আমি বলিলাম, 'আপনি দয়া করিয়া সকল কথা খুলিয়া বলুন।'

রেবেকা বলিলেন, 'আমার সে শক্তি নাই; কিন্তু যখন বিপদে পড়িবেন, তখন বুঝিতে পারিবেন, সময় থাকিতে আমি আপনাকে সাবধান করিয়াছিলাম।'

আমি বলিলাম, 'কিন্তু—'

আমার কথায় বাধা দিয়া রেবেকা সভয়ে বলিলেন, 'চুপ করুন, উনি আসিতেছেন!'

মুহূর্তমধ্যে রা-তাই আমাদের নিকট উপস্থিত হইল; এবার সে ভ্রমণের পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া অন্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আসিয়াছিল। আমাদের কথাবার্তা চলিতে লাগিল; অল্পক্ষণ পরেই ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, খানা প্রস্তুত।

আমরা তিন জনে ভোজন-কক্ষে চলিলাম। সেই কক্ষটিও অতি সুন্দর রূপে সজ্জিত। কক্ষদ্বারে কয়েকটি ভৃত্য সসম্ভ্রমে আমাদিগকে অভিবাদন করিল। তাহারা সকলেই দীর্ঘ-দেহ, গম্ভীর-

প্রকৃতি, প্রৌঢ়; তাহাদের বর্ণ কৃষ্ণাভ; বর্ণ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম, তাহারা ইটালি দেশের লোক নহে; আকার ও পরিচ্ছদ দেখিয়া তাহাদিগকে আরব বলিয়া বোধ হইল। আমরা খানার টেবিলে বসিলে তাহারা গম্ভীরভাবে নিঃশব্দে পরিবেশন করিতে লাগিল; আনন্দ, উল্লাস, চাঞ্চল্য, বিরক্তি, বিষাদ প্রভৃতি যে সকল সাধারণ মনোবৃত্তি মনুষ্যের মুখমণ্ডলে নিয়ত প্রতিবিম্বিত হয়, তাহাদের একটিও আরব ভৃত্যগণের মুখে দেখিতে পাইলাম না, লণ্ডন বা প্যারিসের সর্বশ্রেষ্ঠ হোটেলসমূহেও তদপেক্ষা অধিক রসনা-তৃপ্তিকর উপাদেয় আহার্য দ্রব্য সংগৃহীত হওয়া অসম্ভব। আমরা যে-সকল ভোজ্য দ্রব্য আহার করিতে লাগিলাম, রা-তাই তাহার কোনটিই স্পর্শ করিল না; সে দুই এক টুকরা সুপক্ব ফল ও কয়েকখানি ক্ষুদ্র পিষ্টক মাত্র ভোজন করিল, তাহার পর একটি রৌপ্যনির্মিত কৌটায় রক্ষিত একপ্রকার শুভ্র চূর্ণ এক চামচা এক গ্লাস জলে মিশাইয়া সমস্ত জলটুকু এক নিঃশ্বাসে পান করিল।

আহার করিতে করিতে আমি একবার তাহার দিকে চাহিলাম। রা-তাই আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল, 'আমাকে অত্যন্ত অল্পাহারী দেখিয়া তুমি বোধহয় বিস্মিত হইয়াছ, কিন্তু বিস্ময়ের কোনও কারণ নাই; আমি দীর্ঘকাল হইতেই এইরূপ অল্পাহারে অভ্যস্ত; শরীর পোষণের নিমিত্ত আকণ্ঠ ভোজনের আবশ্যকতা আমি স্বীকার করি না। তোমাদের হিন্দুস্থানের যোগী ঋষি ও তপস্বীগণও অত্যন্ত অল্পাহারী। দীর্ঘকাল অনাহারে তাঁহারা কঠোর তপস্যায় রত থাকেন, তাহাতে তাঁহাদের কষ্ট হয় না; কোন ক্ষতিও হয় না। আমি সকালে কিছু মোরব্বা ও এই চূর্ণ-মিশ্রিত জল খাই; রাত্রে কি খাই, তাহা প্রত্যক্ষ করিলে; তথাপি এ বয়সে আমার শরীরে যে সামর্থ্য আছে তোমারও বোধহয় তাহা নাই। আমার কথায় তোমার সন্দেহ হইলে, আমার বল পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার; আমার হস্তের অঙ্গুলি বক্র করিতেছি, তুমি তাহা সোজা কর।'

বৃদ্ধের কথা শুনিয়া আমার কৌতূহলের সীমা রহিল না। আমার আহার শেষ হইয়াছিল; তাহার কথা কতদূর সত্য, ইহা পরীক্ষার জন্য আমি তাহার দক্ষিণ হস্তের তর্জনীর বক্র অগ্রভাগ চাপিয়া ধরিলাম; দেখিলাম তাহা তুষারের ন্যায় শীতল। সেই অঙ্গুলি স্পর্শমাত্র দেহে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সঞ্চার অনুভব করিলাম। তথাপি তাহার অঙ্গুলি ছাড়িয়া না দিয়া সবলে তাহা আকর্ষণ করিলাম। আমি যুবা পুরুষ, আমার দেহে বলেরও অভাব নাই; কিন্তু কোন প্রকারেই বৃদ্ধের সেই বক্র অঙ্গুলি সরল করিতে পারিলাম না। একটু অপ্রতিভ হইয়া আমি রেবেকার মুখের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, তাঁহার মুখ মৃতের মুখের ন্যায় বিবর্ণ ও রক্তশূন্য। তাঁহার হাত থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল; আমি তাঁহার এই আকস্মিক ভাব-পরিবর্তনের কারণ বুঝিতে পারিলাম না। রেবেকার চক্ষুর সহিত আমার চক্ষুর মিলন হইবামাত্র তিনি অন্য দিকে ফিরিয়া চাহিলেন; বুঝিলাম, আমি তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ করিয়াছি, ইহা প্রকাশ কার এরূপ তাঁহার ইচ্ছা নহে।

রেবেকা আর সেখানে বসিলেন না, উঠিয়া নত মুখে ধীরে ধীরে কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলেন; খাইবার সময় একবার অনুনয়-পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিলেন। সেই দৃষ্টির অর্থ—'যদি বিপদে পড়িতে না চাও, তবে এই মুহূর্তেই এই ভয়ঙ্কর স্থান ত্যাগ কর।'

রেবেকা সেই কক্ষ হইতে প্রস্থান করিলেন, রা-তাই একটি সুবর্ণ-নির্মিত সিগারেটের বাক্স আমার সম্মুখে স্থাপন করিয়া বলিল, 'আমার ধূমপানের অভ্যাস নাই, কিন্তু আমার অতিথিগণের পরিতোষ সাধনের জন্য সর্বদাই আমাকে সিগারেট সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হয়; এগুলি বাজারের জঘন্য সিগারেট নহে; তুরস্ক দেশে আমার কিছু ভূ-সম্পত্তি আছে, সেখানে যে তামাকের চাষ হয়, তেমন উৎকৃষ্ট তামাক পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে পাওয়া যায় না; এগুলি আমার সেই ক্ষেতের তামাকের সিগারেট। ইহা কিরূপ সুমিষ্ট, সদ্‌গন্ধযুক্ত ও উপভোগ্য তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখ।'

সিগারেটে আমার অরুচি ছিল না, এমন দিনও গিয়াছে যেদিন দুই তিনটি সিগারেটের বাক্স খালি করিয়াছি। আমি একটি সিগারেট ধরাইয়া দুই তিন মিনিট কাল নিঃশব্দে ধূম পান করিলাম, দেখিলাম রা-তাইয়ের কথা মিথ্যা নহে; ইংলণ্ডে অনেক সম্ভ্রান্ত বন্ধুর ভবনে ও বড় বড় মজলিসে অনেক উৎকৃষ্ট সিগারেটের ধূম পান করিয়াছি, কিন্তু এরূপ উৎকৃষ্ট সিগারেট জীবনে এই প্রথম দেখিলাম; দেশে থাকিতে তাম্রকুটের মহিমা সম্বন্ধে কোনও রসিক বন্ধুর মুখে শুনিয়াছিলাম,—

'তাম্রকুটং মহাদ্রব্যং শ্রদ্ধয়া দীয়তে যদি,
অশ্বমেধসমং পুণ্যং টানে টানে ভবিষ্যতি!'

আজ বহু দিন পরে বিদেশে হঠাৎ শ্লোকটা মনে পড়িয়া গেল। এই সিগারেট-ধূম পান করিয়া টানে টানে অশ্বমেধের পুণ্য লাভ হইল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু ফলারে ব্রাহ্মণ উৎকৃষ্ট ফলার পাইলে যেমন আনন্দে উদ্‌ভ্রান্ত হয়, এই সিগারেটের ধূম পান করিয়া আমারও অবস্থা প্রায় সেইরূপ হইল; একটি সিগারেট শেষ করিয়া আমি আর একটি ধরাইয়া লইলাম।

সিগারেট আমার খুব ভাল লাগিয়াছে বুঝিতে পারিয়া রা-তাই বলিল, 'আমার সিগারেট যে কত উৎকৃষ্ট, তাহা বোধহয় তুমি বুঝিতে পারিয়াছ।'

আমি বলিলাম, 'আমি এ পর্যন্ত অনেক রকম সিগারেট খাইয়াছি, কিন্তু ইহার সহিত তাহাদের তুলনা হয় না!'

একটি দুইটি করিয়া আমি অর্ধ ডজন সিগারেট নিঃশেষিত করিলাম; ক্রমে আমার মস্তিষ্কে মত্ততা উপস্থিত হইল; গোলাপী নেশায় কল্পনা যেমন প্রখর হয়, অনুভবের শক্তি যেরূপ তীক্ষ্ণ হয়, দেহে ও মনে যে প্রকার চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, আমারও সেইরূপ হইল; আনন্দে উৎসাহে উদ্দীপনায় আমার হৃদয় পূর্ণ হইল।

রা-তাই বলিল, 'রেবেকা যে গীতবাদ্যে সুনিপুণা, তুমি সে পরিচয় পাইয়াছ। আজ তুমি আমার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছ,

আজ যাহাতে তোমার পরিতৃপ্তি হয়, তাহাই করা আমার কর্তব্য; আমি রেবেকাকে ডাকিতেছি, সে বেহালা বাজাইয়া তোমার মনোরঞ্জন করুক।'

রা-তাই রেবেকাকে আহ্বান করিবার পূর্বেই তিনি সেই কক্ষে উপস্থিত হইলেন, এবং রা-তাইয়ের ইঙ্গিতমাত্র বেহালা লইয়া বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। আমি বিহ্বল চিত্তে বেহালা শুনিতে লাগিলাম। বেহালার সেই সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে কত নূতন ভাব, কত উজ্জ্বল কল্পনা, কত সুখের স্বপ্ন ধীরে ধীরে আমার চিত্তে সমুদিত হইতে লাগিল। আমার মনে হইল, পৃথিবীতে আমার অসাধ্য কর্ম কিছুই নাই; আমার বিশ্বাস হইল, এই অদ্ভুত বৃদ্ধের সহায়তায় আমি জ্ঞানের উৎস উন্মুক্ত করিব, যশের উচ্চ শৈলে আরোহণ পূর্বক অমরতা লাভ করিব; পৃথিবীতে আমার কোনও কামনা অপূর্ণ থাকিবে না। সুখের আবেশে ধীরে ধীরে আমার চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল; কল্পনা-নেত্রে দেখিতে পাইলাম, যেন কোন ত্রিভুবনমোহিনী দেবী যশের উজ্জ্বল হীরক-মুকুট হস্তে লইয়া অদূরে দণ্ডায়মান হইয়া তাহা গ্রহণের জন্য স্মিতমুখে আমাকে আহ্বান করিতেছেন!—ক্রমে বেহালা থামিয়া গেল, সঙ্গীত নীরব হইল; কিন্তু তাহার সুমিষ্ট স্বর-তরঙ্গ অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেই কক্ষ পূর্ণ করিয়া রাখিল। যুবতী সহসা উঠিয়া বেহালাখানা টেবিলের উপর রাখিয়া ত্রস্ত পদে কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন।

রেবেকা হঠাৎ কেন এভাবে সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না; এই সুন্দরীর সকল ব্যবহারই বড় বিচিত্র বোধ হইতেছিল, কিন্তু কোন কথা জানিবার উপায় ছিল না।

রেবেকা প্রস্থান করিলে রা-তাই আমাকে বলিল, 'মিঃ সেন, তুমি আমার একটি অনুরোধ রক্ষা করিলে অত্যন্ত সুখী হইব।'

রা-তাই আবার কি অনুরোধ করিবে, অনুমান করিতে পারিলাম না; বলিলাম, 'আপনার অনুরোধটি কি, না শুনিয়া আমি অঙ্গীকার করিতে পারিতেছি না।'

রা-তাই বলিল, 'তুমি ভয় পাইও না, আমি তোমাকে কোনও অন্যায় অনুরোধ করিব না। আমার একখানি সুন্দর সুসজ্জিত জাহাজ আছে, সেই জাহাজে আমি রেবেকাকে লইয়া আগামী কল্য কায়রো যাত্রা করিব ; আমার অনুরোধ, তুমিও আমাদের সঙ্গে চল।'

কোথায় নেপল্‌স্‌, আর কোথায় কায়রো! কিন্তু রা-তাই যে স্বরে কথাটা বলিল, তাহা শুনিয়া বোধ হইল, যেন নেপল্‌সের দুই চারি মাইল দূরে অবস্থিত কোনও সহর।

আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কালই আপনি কায়রো যাইতেছেন! হঠাৎ সেখানে কেন যাইবেন?'

রা-তাই বলিল. 'হাঁ, হঠাৎ যাইতে হইতেছে। আমাদের সঙ্গে তোমার যাইতে আপত্তি কি? যদি তুমি পরের চাকর হইতে, তাহা হইলে তোমাকে এ অনুরোধ করিতাম না। কায়রো নগরের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর, দেখিবার সামগ্রীও সেখানে অনেক ; আমাদের সঙ্গে গমন করিলে তুমি যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিতে পারিবে। আমার পূর্বপুরুষের মমিটি তাঁহার বিশ্রামাগারে পুনঃ-স্থাপনের অভিপ্রায়েই আমি সেখানে যাইতেছি।'

আমি বলিলাম, 'আমাকে কি উদ্দেশ্যে সঙ্গে লইবার ইচ্ছা করিতেছেন?'

রা-তাই বলিল, 'তুমি সঙ্গে থাকিলে আমাদের সময় বেশ আনন্দে কাটিবে। যদি বুঝিতাম আমাদের সঙ্গে যাইলে তোমার কোনও অসুবিধা ঘটিবে,, তাহা হইলে কখনই তোমাকে এ অনুরোধ করিতাম না। তুমি চিত্রকর, নানা দেশ-বিদেশ দর্শনের সুযোগ ত্যাগ করা তোমার উচিত নহে ; বিভিন্ন দেশ-পর্যটনে চিত্রবিদ্যানুশীলনের যথেষ্ট সাহায্য হয়।'

আমি যাইব কি যাইব না, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। মিশর দেশে আমি অনেক দিন বাস করিয়াছি, সেই দেশেই আমার পিতার প্রাণ পঞ্চভূতে বিলীন হইয়াছে ; আমার নিকট মিশর সুপবিত্র তীর্থ-স্বরূপ ; বিশেষতঃ সেই রহস্য-সঙ্কুল প্রাচীন দেশে দেখিবার

বস্তু কত আছে; সুতরাং এ সুযোগ ত্যাগ করা উচিত মনে হইল না। আরও ভাবিয়া দেখিলাম, রা-তাইয়ের সঙ্গে সেখানে গমন করিলে আমার অনেক অজ্ঞাত বিষয় জানিবার সুবিধা হইবে। প্রাচ্য সভ্যতার আদি যুগে পরাক্রান্ত ফারো রাজগণ যেখানে মহা গৌরবে রাজত্ব করিয়াছিলেন, সেখানকার প্রত্যেক ধূলিকণা প্রাচীন যুগের পুণ্য-স্মৃতিতে অনুরঞ্জিত: সেই দেশ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে আমার হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ, রেবেকার ন্যায় অতুলনীয়া সুন্দরীর সাহচর্যে দীর্ঘকাল যাপন করাও অল্প প্রলোভনের বিষয় নহে; তাঁহার সহিত গল্প করিয়া, তাঁহার গান শুনিয়া, চতুর্দিকের বিচিত্র দৃশ্য দেখিয়া দিনগুলি সুখস্বপ্নের ন্যায় কাটাইতে পারিব, হয়ত রেবেকার বৈচিত্র্যময় জীবনের গুপ্ত রহস্যও জানিতে পারিব; সুতরাং রা-তাইয়ের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করাই কর্তব্য।

আমাকে মৌন দেখিয়া রা-তাই পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি চুপ করিয়া রহিলে কেন? আমার কথা কি অসঙ্গত মনে করিতেছ?'

আমি বলিলাম, 'না, কিছুমাত্র অসঙ্গত নহে: তবে কথা এই যে, আপাততঃ দীর্ঘকালের জন্য ইংলণ্ড ত্যাগ করিতে আমার ইচ্ছা নাই।'

রা-তাই হাসিয়া বলিল, 'ভয় নাই, আমরা কায়রো যাত্রা করিবামাত্র ইংলণ্ড সমুদ্রগর্ভে অদৃশ্য হইবে না, এখন যেখানে আছে, চিরদিন সেইখানেই থাকিবে; কিন্তু কায়রো দর্শনের এমন সুযোগ তুমি জীবনে আর কখনও পাইবে কি না সন্দেহ; এ অবস্থায় তোমার আর ইতস্ততঃ করা উচিত নহে।'

আমি বলিলাম, 'এ কথা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবার জন্য আমি এক দিন সময় চাই।'

রা-তাই বলিল, 'সময় লইলেই তুমি ভাবিয়া-চিন্তিয়া নানা রকম নূতন আপত্তি তুলিবে, এ অবস্থায় তাড়াতাড়ি মত প্রকাশ করাই উচিত; রেবেকা এখানে উপস্থিত থাকিলে সে নিশ্চয়ই তোমাকে যাইবার জন্য অনুরোধ করিত।'

অতঃপর আমি আপত্তি করিলাম না, বলিলাম, 'আচ্ছা আপনার

প্রস্তাবেই সম্মত হইলাম।'

রা-তাই বলিল, 'কাল সাতটার সময় আমরা জাহাজে উঠিব, তোমার যে সকল আসবাবপত্র সঙ্গে লওয়া আবশ্যক, তাহা জাহাজে লইয়া যাইবার জন্য তোমাকে কোন বন্দোবস্ত করিতে হইবে না; আমার ভৃত্যেরাই তোমার হোটেল হইতে তাহা জাহাজে লইয়া যাইবে।'

ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম রাত্রি প্রায় এগারটা বাজে, সুতরাং রা-তাইয়ের নিকট হইতে উঠিলাম। যাইবার পূর্বে রেবেকার নিকট বিদায় লইবার জন্য বড় আগ্রহ হইল, কিন্তু তাঁহাকে ডাকাইয়া দেখা করিতে সাহস হইল না। মনে হইল, আমি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করি নাই বলিয়াই হয়ত তিনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।

রা-তাই আমাকে তাহার গাড়িতে হোটেলে পাঠাইতে চাহিল, কিন্তু আমি তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম না; পদব্রজে সেই অট্টালিকা হইতে বাহির হইয়া বাগানের পাশ দিয়া রাজপথের অভিমুখে চলিলাম। অন্যমনস্কভাবে চলিতেছি, এমন সময় সেই অট্টালিকা-সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র দ্বার খুলিয়া কে আমাকে নিম্ন স্বরে আহ্বান করিল। আমি সবিস্ময়ে ফিরিয়া চাহিয়া রেবেকাকে সেই দ্বারপ্রান্তে দেখিতে পাইলাম। রেবেকা চঞ্চল চরণে আমার নিকটে আসিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, 'মিঃ সেন, যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা সত্ত্বেও আমি এখানে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। সন্ধ্যার সময় আপনাকে যে কথা বলিয়াছিলাম, তাহাতে আপনি কর্ণপাত করেন নাই; আবার বলিতেছি, আপনি সাবধান হউন! আপনি এই নরপিশাচের নিকট আর আসিবেন না, তাহার ছায়াও স্পর্শ করিলে, আমার কথা অগ্রাহ্য করিলে আপনি ভয়ঙ্কর বিপদে পড়িবেন, তখন আপনার অনুতাপ নিষ্ফল হইবে।'

সেদিন শুক্লপক্ষের চতুর্দশী কি পূর্ণিমা, আকাশে পূর্ণচন্দ্র ভাসিতে-ছিলেন, তাঁহার সুধা-ধবল কিরণ-ধারাপাতে নৈশ প্রকৃতি অনুপম শোভা ধারণ করিয়াছিল; শুভ্র কৌমুদীরাশি রেবেকার অনিন্দ্যসুন্দর

বদন-মণ্ডলে নিপতিত হইয়াছিল ; সেই স্ফুট চন্দ্রালোকে তাঁহার মুখে ব্যাকুলতার চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। আমি তাঁহার কথার মর্ম বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনার এত ভয়ের কারণ কি ? আপনার সকল কথাই অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ ; রা-তাই মানুষ তো ?'

রেবেকা বলিলেন, 'তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না ; এক এক বার আমার মনে হয়, সে মনুষ্যরূপী শয়তান, অন্যের অনিষ্ট-সাধনই তাহার জীবনের ব্রত। আপনি স্বপ্নেও ভাবিবেন না—সে আপনার মঙ্গলের জন্য, বা আপনার আনন্দবর্ধনের নিমিত্ত আপনার বন্ধুত্ব কামনা করিতেছে। তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতায় আপনার অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্টসিদ্ধি হইবে না ; তবে, আপনার যে কি অনিষ্ট হইবে, তাহা আমার অনুমান করিবার শক্তি নাই। তাহার সহিত আপনার নূতন আলাপ, কিন্তু আমি দীর্ঘকাল হইতে তাহার আশ্রয়ে বাস করিতেছি, সুতরাং তাহার প্রকৃতি আমার অজ্ঞাত নহে। মিঃ সেন, আমি আপনাকে বিনয় করিয়া বলিতেছি, আপনি প্রাণ থাকিতে তাহার নিকট যাইবেন না, ভবিষ্যতে কখনও তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, এই পিশাচের কবলে পতিত হওয়া অপেক্ষা আপনার মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়স্কর।'

আশ্চর্যের কথা এই যে, স্যর জর্জ ম্যাক্সওয়েলও ঠিক এই কথা বলিয়া আমাকে সাবধান করিয়াছিলেন। কিন্তু রা-তাই যে এমন ভয়ঙ্কর মনুষ্য, তাহা তাহার কথা শুনিয়া, বা তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া অনুমান করা অসম্ভব ; অথচ ইঁহারা অকারণেই বা কেন আমাকে সাবধান হইতে বলিবেন ? যাহা হউক, আমি রেবেকার কাতরতাপূর্ণ বিষণ্ণ মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষুণ্ণভাবে বলিলাম, 'আপনি আমাকে সাবধান হইতে বলিতেছেন, অথচ দেখিতেছি আপনি স্বয়ং দীর্ঘকাল হইতে তাহার আশ্রয়ে বাস করিতেছেন ; রা-তাইয়ের সংশ্রবে আসিলে যদি আমার বিপদের আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে আপনারও কি সে আশঙ্কা নাই ?'

রেবেকা বলিলেন, 'আমারও বিপদের আশঙ্কা আছে, তাহা জানি,

কিন্তু আমি নিরুপায়; সে আমাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছে, তাহার প্রচণ্ড শক্তিতে আমি অভিভূত; আমার ইহকাল পরকাল ছুই-ই গিয়াছে, বোধহয় তাহার কবল হইতে আমার আত্মাও কখনও মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না। আমার তো সর্বনাশ হইয়াছেই; কিন্তু আপনি বিদেশী ভদ্রলোক, সম্ভবতঃ দেশে আপনার পিতা মাতা আছেন, আপনার উপর হয়ত তাঁহাদের ভবিষ্যতের সকল আশা-ভরসা নির্ভর করিতেছে; আপনারও সর্বনাশ হইবে, ইহা আমি দেখিতে প্যারব না। সেইজন্যই সময় থাকিতে আপনাকে সাবধান করিতেছি। আপনি আমার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিবেন না; আজ রাত্রেই নেপল্‌স্ হইতে প্রস্থান করুন। আপনার স্বদেশে চলিয়া যাইতে পারেন, চীনে, জাপানে, রুশিয়ায়, আমেরিকায়—যেখানে ইচ্ছা আপনি চলিয়া যান; আপনি কদাচ এই দানবের সম্মুখে যাইবেন না: স্বেচ্ছায় বিষধর সর্পকে কণ্ঠে ধারণ করিবেন না।'

আমি বলিলাম, 'আপনি আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী তাহা বুঝিয়াছি, কিন্তু এখন আপনার সাবধান-বাক্য নিষ্ফল; আমি রা·তাইকে কথা দিয়াছি, আগামী কল্য রাত্রে তাহার সহিত মিশরে যাত্রা করিব।'

আমার কথা শুনিয়া রেবেকা অস্ফুট স্বরে আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন, এবং বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমি তাঁহার ভাব দেখিয়া শঙ্কিত হইলাম, ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আমার কথা শুনিয়া আপনি কি বিস্মিত হইয়াছেন?'

রেবেকা ব্যাকুল ভাবে বলিলেন, 'আপনি সর্বনাশ করিয়াছেন! কেন আপনি তাহার সহিত মিশরে যাইতে সম্মত হইলেন? আপনি যে কি ভুল করিয়াছেন, তাহা আপনার কল্পনা করিবারও সামর্থ্য নাই; আপনার এই ভ্রম আপনি ইহজীবনে কখনও সংশোধন করিতে পারিবেন না। এখনও বলিতেছি, আপনি এভাবে আত্মহত্যা করিবেন না; আপনি সেই নরপিশাচের নিকট যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছেন, সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলে আপনার অপরাধ হইবে না, আপনি আজ রাত্রেই নেপল্‌স্ ত্যাগ করুন।'—রেবেকা আর কোন কথা বলিতে

পারিলেন না, দাঁড়াইয়া থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন।

তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমার বড় দুঃখ হইল, আমি ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলাম, 'রা-তাইয়ের সহবাসে যাহাতে ভবিষ্যতে আমি বিপন্ন না হই, সেজন্য আপনি আমাকে সাবধান করিতে আসিয়াছেন; বুঝিতেছি রা-তাই ইহা জানিতে পারিলে আপনার যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা আছে। আপনাকে বিপদের মুখে নিক্ষেপ করিয়া আমি প্রাণভয়ে পলায়ন করিব, আমাকে এরূপ কাপুরুষ, এত ইতর মনে করিবেন না।'

রেবেকা অস্ফুট স্বরে বলিলেন, 'আপনি যাহাতে বিপন্ন না হন, এই অভিপ্রায়েই আপনাকে এ সকল কথা বলিলাম। যেদিন আপনার সহিত আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সেইদিনই বুঝিয়াছিলাম আপনি শীঘ্রই এই কুহকীর কুহক-জালে আবদ্ধ হইবেন; সেই দিন হইতেই আপনাকে সাবধান করিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছিল, কিন্তু পূর্বে তাহার সুযোগ পাই নাই।'

আমি বলিলাম, 'রা-তাই যদি এতই ভয়ানক লোক হয়, তাহা হইলে কেন তাহার আশ্রয়ে বাস করিতেছেন? কেন পলায়নের চেষ্টা করেন না? আমার একটি প্রস্তাব আছে, তদনুসারে কাজ করিতে পারিবেন? চলুন, আজ রাত্রে—এখনই আমরা উভয়ে এখান হইতে পলায়ন করি। অবশ্য আমার সহিত আপনার তেমন ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় হয় নাই, কিন্তু আমি ভদ্রলোক, আমার কর্তব্য-জ্ঞানের উপর আপনি অনায়াসে নির্ভর করিতে পারেন। আমার অর্থের অভাব নাই; আপনি যাহাতে সুখী হন, সর্বাগ্রে তাহার ব্যবস্থা করিব। আমার সঙ্গে গমন করিলে আপনার কোনও বিপদের আশঙ্কা নাই, এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।'

রেবেকা সভয়ে বলিলেন, 'না না, আপনি আমাকে এ অনুরোধ করিবেন না; আমার সাধ্য থাকিলে আমি আনন্দের সহিত আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতাম, কিন্তু সে সাধ্য আমার নাই: বিহঙ্গিনীর পক্ষ ছেদন করিলে সে কখনই তাহার ইচ্ছামত উড়িয়া যাইতে পারে না; আমার অবস্থাও সেইরূপ। এই পিশাচ যে শৃঙ্খলে

আমাকে আবদ্ধ করিয়াছে, তাহা লৌহ-শৃঙ্খল অপেক্ষা সহস্রগুণ দৃঢ়, জীবনে এ বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিব না; আমি তো বলিয়াছি, মৃত্যুর পরও বোধহয় তাহার কবল হইতে মুক্তি নাই।'

রেবেকা সহসা উভয় হস্তে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগে তাঁহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। এমন মর্মভেদী নিঃশব্দ রোদন আমি জীবনে আর কখনও দেখিয়াছি কি না সন্দেহ। সেই চন্দ্রালোকিত নিস্তব্ধ নিশীথ রাত্রে, নির্জন উপবন প্রান্তে, সেই ভগ্নহৃদয়া কোমলপ্রাণা ব্যথিতা পরদুঃখ-কাতরা সুন্দরীকে এই ভাবে রোদন করিতে দেখিয়া স্নেহে করুণায় সমবেদনায় আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল; আমি আবেগভরে বলিলাম, 'রেবেকা, যদি তুমি রা-তাইকে ত্যাগ করিয়া যাইতে সম্মত না হও, যদি তোমার সে শক্তি না থাকে, তাহা হইলে আজ আমি তোমার সম্মুখে পরমেশ্বরের দিব্য করিয়া বলিতেছি, আমিও প্রাণভয়ে কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করিব না; তোমাদের সহিত কাল রাত্রে মিশরে যাত্র করিব, অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে।'

এই কথা শুনিয়া রেবেকা আর আমাকে আমার সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন না; তিনি যে পথে আসিয়াছিলেন সেই পথেই অট্টালিকায় পুনঃপ্রবেশ করিলেন। আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেই স্থানে দণ্ডায়মান রহিলাম; নানা নূতন চিন্তায় আমার হৃদয় আন্দোলিত হইতে লাগিল। তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলাম, 'ভালই হউক আর মন্দই হউক, যে স্রোতে ভাসিতে উদ্যত হইয়াছি, সেই স্রোতেই ভাসিয়া যাইব; দেখি ইহার শেষ কোথায়! বুঝিতেছি রেবেকা বিপন্না, তাঁহার উদ্ধার-সাধনের চেষ্টা করিয়া হয়ত আমিও বিপন্ন হইতে পারি; কিন্তু যতক্ষণ প্রাণ থাকিবে, বিপদের সহিত যুদ্ধ কারতে পরাঙ্মুখ হইব না। ভগবান, তুমি আমার সহায় হও!'

ভগবান আমার এ প্রার্থনা শ্রবণ করিলেন কি না বলিতে পারি না; আমি চিন্তাকুল চিত্তে পদব্রজে গভীর রাত্রে হোটেলে প্রত্যাগমন করিলাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পরদিন রাত্রি দশটার পূর্বেই রা-তাইয়ের গাড়ি আমাদের হোটেলের দরজায় উপস্থিত হইল ; আমার সঙ্গে যে সব জিনিস পত্র যাইবার কথা, রা-তাইয়ের দুইজন ভৃত্য সন্ধ্যার পূর্বেই তাহা জাহাজে লইয়া গিয়াছিল। হোটেলের হিসাব পরিষ্কার করিয়া আমি রা-তাইয়ের গাড়িতে বন্দরের দিকে চলিলাম।

রা-তাইয়ের জাহাজখানি তেমনি বড় না হইলেও বেশ সুন্দর ; কিন্তু সেই রাত্রে জাহাজের সকল অংশ দেখা হইল না। আমি কেবিনে পদার্পণ করিবামাত্র জাহাজের কাপ্তেন আমাকে ফরাসী ভাষায় বলিলেন, 'মিঃ রা-তাই ও তাঁহার সঙ্গিনী উভয়েই জাহাজে আসিয়া স্ব-স্ব কেবিনে বিশ্রাম করিতেছেন।'—আমি রাত্রে আর তাঁহাদের সহিত সাক্ষাতের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলাম না। রা-তাই আমার আদেশ পালনের জন্য একটি ভৃত্য নিযুক্ত করিয়াছিল। কাপ্তেনের ইঙ্গিতে সেই ভৃত্যটি আমাকে আমার কেবিনে লইয়া চলিল।

কেবিনে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, আমার লগেজগুলি সেই কক্ষে সংরক্ষিত হইয়াছে। রাত্রি এগারটার সময় কেবিনস্থিত শুভ্র সুকোমল শয্যায় শয়ন করিলাম, এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলাম।

পরদিন প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলাম,—অনন্ত নীলাম্বুরাশি চতুর্দিকে প্রসারিত রহিয়াছে। তাহার উপর জাহাজখানি শুভ্র ঝিনুকের মত নাচিয়া নাচিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে ; সৌরকর-প্রতিবিম্বিত সমুদ্রজলরাশি গলিত সুবর্ণ-প্রবাহের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। আমি পরিচ্ছদ পরিবর্তন করিয়া ডেকের উপর আসিলাম ; আমাদের পদতলে অনন্ত সমুদ্র, ঊর্ধ্বে অনন্ত নীলাকাশ ; সুনীল আকাশে

খণ্ড-বিখণ্ড শুভ্র মেঘস্তর বায়ুপ্রবাহে আমাদের এই জাহাজের মতই অনন্তের অভিমুখে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। দূরে—বহুদূরে সুনীল আকাশ সুনীল মহাসিন্ধুর সহিত মিশিতেছিল ; যেন অনন্ত অনন্তের আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ। সেই অতুলনীয় সৌন্দর্য ভাষায় ব্যক্ত হয় না ; চিত্রকরের তুলিকা চিত্রপটে তাহার অনুরূপ আলেখ্য অঙ্কিত করিতে অসমর্থ ; তাহা কেবল অনুভব ও উপভোগের যোগ্য।

রাত্রে যখন জাহাজে উঠি তখন মনে হইয়াছিল জাহাজখানি ক্ষুদ্র ; কিন্তু দিবালোকে দেখিলাম, তাহা তেমন ক্ষুদ্র নহে ; তাহা অন্ততঃ পাঁচ শত টন, অর্থাৎ প্রায় চৌদ্দ হাজার মণ বোঝাই লইতে পারে। জাহাজের কাপ্তেন জাতিতে গ্রীক, কিন্তু জাহাজের মাঝি মাল্লারা যে কোন্ দেশের লোক তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তবে তাহারা যে ইংরাজ, ফরাসী বা জর্মন নহে, তাহা তাহাদের আকার ও বর্ণ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম। দেখিলাম লোকগুলা বড়ই গম্ভীর, তাহারা কলের মত স্ব-স্ব কর্তব্য সম্পন্ন করিতেছে। জাহাজের অন্যান্য কর্মচারীদের সহিত তখন পর্যন্ত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই।

বেলা আটটার সময় খানসামা আমাকে সংবাদ দিল, চা প্রস্তুত। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, রা-তাই তখনও সেলুন অর্থাৎ বৈঠকখানায় আসে নাই। শুনিলাম সে বেলা একটার পূর্বে তাহার কামরা হইতে বাহির হয় না। সুতরাং আমি একাকী প্রাতঃকৃত্য শেষ করিলাম, তাহার পর ধীরে ধীরে ডেকে উপস্থিত হইয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া সিগারেট টানিতে লাগিলাম। সমুদ্র তখন স্থির, মুক্ত সমীরণ-প্রবাহে জাহাজ অকূল সমুদ্রের উপর দিয়া তাহার লক্ষ্যাভিমুখে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছিল।

অনেকক্ষণ পরে আমার পশ্চাৎ হইতে মধুর স্বরে কে আমাকে সম্বোধন করিল ; সেই পরিচিত স্বরে আকৃষ্ট হইয়া আমি ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম, রেবেকা আমার দিকে অগ্রসর হইতেছেন ; একটি কৃষ্ণবর্ণ সুদৃশ্য নূতন পরিচ্ছদে তাঁহাকে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। রেবেকা আমার সহিত কর-কম্পন করিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন, 'মিঃ সেন,

আমি চায়ের টেবিলে আপনার সঙ্গে যোগ দিতে পারি নাই, আমার এ ত্রুটি মার্জনা করিবেন ; আজ আমার উঠিতে অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল।'

রেবেকার মুখ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, দুই দিন পূর্বে রাত্রিকালে তাঁহার সহিত আমার যে কথা হইয়াছিল তাহা তিনি বিস্মৃত হন নাই। কিন্তু জাহাজে এই প্রথম সাক্ষাতের সময় সে সম্বন্ধে তিনি কোনও কথা বলিলেন না. সুতরাং আমিও সে প্রসঙ্গের পুনরবতারণা করিলাম না ; আমাদের অন্যান্য কথা চলিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, 'রেবেকা, তুমি অনেকবার সমুদ্র-ভ্রমণ করিয়াছ, সমুদ্র-যাত্রা তোমার কেমন লাগে ?'

রেবেকা বলিলেন. 'খুব ভাল লাগে, সমুদ্রেই আমি ভাল থাকি। মনে পড়ে বাল্যকালে যখন আমার পিতা জীবিত ছিলেন, সেই সময় আমি মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত সমুদ্রে বেড়াইতে যাইতাম ; তাহাতে যে কত আনন্দ পাইতাম, সে কথা আর কি বলিব ! তুফানের সময় সমুদ্রের তরঙ্গ পাহাড়ের সমান উঁচু হইয়া উঠিত জাহাজ অত্যন্ত দুলিত ; আমার মনে হইত, যেন মায়ের কোলে বসিয়া দুলিতেছি।'

রেবেকা তাঁহার সুখময় বাল্যকালের কথা, পিতামাতার স্নেহের কথা স্মরণ করিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন ; কিন্তু অবিলম্বে আত্মসম্বরণ করিয়া নানা দেশ সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতার গল্প আরম্ভ করিলেন। দেখিলাম, তিনি ইউরোপের সকল রাজধানী-তেই ভ্রমণ করিয়াছেন। রা-তাই তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া কিজন্য ইউরোপের সকল দেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। নানা কারণে সে-সম্বন্ধে তাঁহাকে কোনও প্রশ্ন করিলাম না ; তবে বুঝিলাম, ইউরোপের সকল দেশই তাঁহার সুপরিচিত।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কোন্ দেশ তোমার সর্বাপেক্ষা অধিক ভাল লাগে ?'

রেবেকা বিমর্ষভাবে বলিলেন. 'কোন্ দেশ যে আমার বেশী ভাল লাগে, তাহা কখনও ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাই নাই ; যে হতভাগ্য

চিরজীবনের জন্য কারা-পিঞ্জরে অবরুদ্ধ আছে, সে কি কখনও ভাবিয়া দেখে তাহার কারাকক্ষটি কোন্ বর্ণে রঞ্জিত, বা সেই কক্ষের দ্বার-জানালাগুলি কোন্ কাষ্ঠে নির্মিত ? আমার অবস্থাও সেইরূপ ; আমি পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী, আমার নিকট লৌহ-পিঞ্জর ও স্বর্ণ-পিঞ্জর উভয়ই সমান ; যে দেশে যাই কোথাও সুখ পাই না।'

রেবেকার এই কথা শুনিয়া আমি আর কিছু বলিলাম না। রা-তাইয়ের জাহাজে তাহার কক্ষের অদূরে বসিয়া এই সকল বিষয় লইয়া আলোচনা করা সঙ্গত মনে হইল না।

মধ্যাহ্ন অতীত হইলে রা-তাই তাহার কেবিনের বাহিরে আসিল, কিন্তু তাহার পরিচ্ছদের পরিবর্তন দেখিলাম না ; দেহে সেই কৃষ্ণবর্ণ পুরাতন লম্বা কোট, পায়ে আঁটো পায়জামা, ও মাথায় আরবদের মত চূড়াদার রঙ্গীন টুপি।

রেবেকা পূর্বেই তাঁহার কেবিনে প্রস্থান করিয়াছিলেন ; আমাকে একাকী বসিয়া থাকিতে দেখিয়া রা-তাই আমার কাছে আসিয়া বলিল, 'মিঃ সেন, গত রাত্রে আমি তোমাকে আমার জাহাজে অভ্যর্থনা করিবার জন্য নিচে উপস্থিত থাকিতে পারি নাই ; আমার পক্ষে ইহা শিষ্টাচারসঙ্গত হয় নাই ; কিন্তু সেজন্য তুমি অসন্তুষ্ট হইও না ; আমার মত বৃদ্ধ সকল কাজ যথানিয়মে করিবে, এরূপ আশা করিতে পার না ; বয়সের দোষে অনেক কাজে অনেক ত্রুটি ঘটে। যাহা হউক, আশা করি জাহাজে আসিয়া তোমাকে কোনও অসুবিধায় পড়িতে হয় নাই।'

'আমি বলিলাম, 'না, আমার কোনও অসুবিধা হয় নাই, রাত্রিটা বেশ আরামেই কাটিয়াছে ; আপনার এই জাহাজখানি বড় চমৎকার।'

আমার মুখে জাহাজের প্রশংসা শুনিয়া রা-তাই বড় খুশি হইল ; মাথা নাড়িয়া বলিল, 'ভাল হইবারই তো কথা ; এই জাহাজের জন্য আমি বড় অল্প অর্থ ব্যয় করি নাই, এই জাহাজে চড়িয়া সমজদার ব্যক্তি-মাত্রেই ইহার বড় প্রশংসা করেন ; এখানি আমার দেশ-ভ্রমণের প্রধান সহায়। তুমি বুঝি জাহাজের সকল অংশ এখনও ভাল করিয়া দেখ নাই ?'

আমি বলিলাম, 'না, এখনও জাহাজের বিভিন্ন অংশ ঘুরিয়া দেখি নাই।'

রা-তাই বলিল, 'তবে চল, জাহাজখানা তোমাকে ভাল করিয়া দেখাইয়া আনি।'

অগত্যা আমাকে উঠিতে হইল। রা-তাইয়ের সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জাহাজখানির বিভিন্ন অংশ দেখিলাম; অবশেষে সেলুনে প্রবেশ করিলাম; জাহাজে ইহাই রা-তাইয়ের বৈঠকখানা। জাহাজের সেলুনটি যেমন প্রশস্ত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সেইরূপ সুসজ্জিত। আমি এ পর্যন্ত অনেক জাহাজে চড়িয়াছি, কিন্তু এরূপ সুন্দর ও সুসজ্জিত সেলুন আর কোনও জাহাজে দেখিয়াছি কি না স্মরণ হয় না।

সেলুন হইতে বাহির হইয়া রা-তাইয়ের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, সেই কক্ষের এক প্রান্তে তাহার পূর্বপুরুষের মমিটি সংস্থাপিত আছে। মমিটি দেখিয়াই পূর্ব-কথা আমার মনে পড়িয়া গেল; রা-তাই আমার প্রতি কিরূপ অত্যাচার করিয়া আমার লণ্ডনস্থ গৃহ হইতে এই মমি লইয়া পলায়ন করিয়াছিল, তাহা স্মরণ হইবামাত্র সর্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল; ইচ্ছাপূর্বক এরূপ ভয়ঙ্কর লোকের কবলে আসিয়া পড়িয়াছি ভাবিয়া মন বড় দমিয়া গেল; মনে হইতে লাগিল, আমি যেন আর পূর্বের সে মানুষ নাই, আমার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

জাহাজের চারিদিকে অনেকক্ষণ ঘুরিয়া ডেকে ফিরিয়া আসিলাম, এবং একখানি চেয়ারে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। ভাবিয়াছিলাম শীঘ্রই হয়ত আবার রেবেকার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, কিন্তু তাঁহাকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত দেখিতে পাইলাম না। একজন ভৃত্যাকে তাঁহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, তাঁহার শিরঃপীড়া হইয়াছে, কেবিন ত্যাগ করিবার শক্তি নাই। রা-তাই অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার সঙ্গে গল্প করিয়া উঠিয়া গেল; আমি একাকী ডেকের উপর বসিয়া সেই অনন্ত মহাসমুদ্রে সূর্যাস্তের অতুলনীয় শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। অস্তমান তপনের লোহিত রশ্মিরাগে

সমুদ্রের নীল জল স্বর্ণাভ বোধ হইতে লাগিল ; চতুর্দিক নিস্তব্ধ, এবং সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতি যেন এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরের ধ্যানে সমাহিত-চিত্ত।

ক্রমে সূর্যাস্ত হইল। সন্ধ্যার ধূসর ছায়ায় ধীরে ধীরে সমুদ্র সমাচ্ছন্ন হইল, গগন-প্রান্তে দুই একটি নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিল। সেই মৌন, শান্ত, স্তব্ধ সন্ধ্যায় বিশ্ব-প্রকৃতির যে সৌন্দর্য সন্দর্শন করিলাম, তাহা ভাষায় ব্যক্ত হইতে পারে না; আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত একাকী ডেকের উপর বসিয়া সেই অনির্বচনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করিলাম। সমুদ্রের এমন স্তব্ধ ভাব পূর্বে কখনও দেখি নাই; মহা-ঝটিকার পূর্বে প্রকৃতি যেরূপ নিস্তব্ধ হয়, সেদিন সমুদ্রেরও ঠিক সেই ভাব দেখিয়া জাহাজের কাপ্তেনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'প্রকৃতির এইরূপ নিস্তব্ধতা দেখিয়া কি আপনার ইহা একটু বিচিত্র মনে হইতেছে না?'

কাপ্তেন ফরাসী ভাষায় বলিলেন, 'আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না, আজ সকাল হইতেই ব্যারোমেটারের (বায়ুমান যন্ত্রের) বড় পরিবর্তন দেখিতেছি; রাত্রে ঝটিকার আশঙ্কা করিতেছি।'

আমারও সেইরূপ অনুমান হইতেছিল। কাপ্তেন প্রস্থান করিলে আমি ডেকের উপর ঘুরিতে ঘুরিতে একটি কাঁচময় গবাক্ষের পাশে উপবেশন করিলাম; সেই গবাক্ষের ভিতর দিয়া ডেকের নিম্নতলে অবস্থিত ও বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত একটি কেবিনের কিয়দংশ আমার নয়নগোচর হইল। সেখানে আমার অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সেই কেবিনের ভিতর হইতে রেবেকার অস্ফুট কণ্ঠস্বর আমার কর্ণে প্রবেশ করিল; তিনি কাহাকে কি বলিতেছেন—শুনিবার কৌতূহল দমন করিতে পারিলাম না।

রা-তাই রেবেকাকে জর্মন ভাষায় বলিল, 'সাবধান, তুমি আমার অবাধ্য হইও না; আমার অঙ্গুলি ধরিয়া চাহিয়া দেখ, নখ-দর্পণে কি দেখিতে পাও।'

রেবেকা কোন উত্তর দিলেন না।

রা-তাই পুনর্বার দৃঢ় স্বরে বলিল, 'কি দেখিতেছ, শীঘ্র বল।'

রেবেকা এবার বিকৃত স্বরে বলিলেন, 'একটি সুবিস্তীর্ণ মরুভূমি, তাহার এক প্রান্তে উচ্চ গিরিশ্রেণী, সেই পর্বতের পাদদেশে বালুকাময় প্রান্তরে একটি তাম্বু; তাম্বুর মধ্যে একজন রোগী, রোগীর বাহ্যজ্ঞান নাই, রোগের যন্ত্রণায় সে খাটিয়ার উপর মলিন শয্যায় পড়িয়া ছটফট করিতেছে।'

রা-তাই জিজ্ঞাসা করিল, 'এই রোগীকে তুমি চিনিতে পারিতেছ কি?'

রেবেকা নিরুত্তর।

রা-তাই পুনর্বার বলিল, 'চিনিয়াছ কি না শীঘ্র বল!'

রেবেকা বলিলেন, 'হাঁ, চিনিয়াছি।'

রা-তাই বলিল, 'আর কি দেখিতে পাইতেছ?'

রেবেকা বলিলেন, 'একজন আরব তাম্বুর বাহিরে উত্তপ্ত বালুকা-রাশিতে পড়িয়া রোগের যন্ত্রণায় দুই হাতে চুল ছিঁড়িতেছে, তাহার চোখ, মুখ, নাক ও গলা ফুলিয়া উঠিয়াছে।'

রা-তাই বলিল, 'আবার দেখ, এবার কি দেখিতেছ?'

রেবেকা বলিলেন, 'আরবটার যন্ত্রণা থামিয়া গিয়াছে, সে বালির উপর লম্বা হইয়া পড়িয়া আছে, বোধহয় মরিয়াছে।'

রা-তাই ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পুনর্বার বলিল, 'এবার চাহিয়া দেখ, আর কিছু দেখিতে পাও কি না।'

রেবেকা বলিলেন, 'না, বড় অন্ধকার, কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।'

রা-তাই উত্তেজিত স্বরে বলিল, 'ভাল করিয়া হাত ধর, নখের দিকে নিবিষ্ট চিত্তে চাহিয়া থাক; মুহূর্তমধ্যে অন্ধকার কাটিয়া যাইবে, নূতন দৃশ্য দেখিতে পাইবে।'

রেবেকা বলিলেন, 'একটি অন্ধকার গুহা দেখিতে পাইতেছি,—না, গুহা নহে, ইহা একটি পাতাল ঘর। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড থামের উপর অদ্ভুত আকারের ছাদ; কক্ষের প্রাচীরে প্রাচীরে প্রাচীন যুগের নানাপ্রকার ভাস্কর-শিল্প; কক্ষের এক প্রান্তে একখণ্ড প্রস্তরের উপর একটি মৃতদেহ।

ইহার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত আর কোনও কথা শুনিতে পাইলাম না, মনে করিলাম, হয়ত কথাবার্তা শেষ হইয়াছে; কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই রা-তাই বলিল, 'আর একবার ভাল করিয়া আমার নখের দিকে চাহ ; দেখ নূতন কিছু দেখিতে পাও কি না ?'

রেবেকা উন্মাদিনীর ন্যায় বিকৃত স্বরে বলিলেন, 'মৃত্যু ! চারিদিকেই মৃত্যুর স্রোত চলিতেছে ! রাজপথে শত শত মৃতদেহ নিপতিত রহিয়াছে। শোকার্তের বিলাপ-ধ্বনিতে আমার কর্ণ বধির হইয়া গেল ! চারিদিকে নরকের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে ; বালক, যুবক, বৃদ্ধ, নরনারী সকলেই সেই আগুনে পুড়িয়া মরিতেছে ! উঃ কি শোচনীয় দৃশ্য ! আমি আর ইহাদের দেখিতে পারিতেছি না ; ছাড়িয়া দাও, দয়া করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দাও !'

রা-তাই পিশাচের ন্যায় খিল-খিল করিয়া হাসিয়া বলিল, 'ভাল ভাল, তোমার কথা শুনিয়া সুখী হইলাম ; বুঝিলাম, আমার জীবনের ব্রত সফল হইবে। তোমাকে এ দৃশ্য আর দেখিতে হইবে না, তুমি এখন শয়ন করিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হও ; তুমি নখ-দর্পণে যাহা দেখিলে, ও আমাকে যাহা বলিলে, নিদ্রাভঙ্গে তাহা যেন তোমার স্মরণ না হয়।'

রা-তাইয়ের সহিত রেবেকার যে সকল কথা হইল, তাহার মর্ম কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বাল্যকালে গল্পে শুনিয়াছিলাম, সেকালে আমাদের দেশের যোগী ঋষিরা নখ-দর্পণে ভূত ভবিষ্যতের সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতেন ; জানিতাম না, একালেও মিশর দেশে সেই বিদ্যার চর্চা আছে। আমি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া চিন্তাকুল চিত্তে সেই স্থান হইতে উঠিয়া ডেকে পাদচারণ করিতে লাগিলাম ; ইতিমধ্যে রা-তাই সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সে প্রফুল্লভাবে আমাকে বলিল, 'মিঃ সেন, তোমার সঙ্গে একটু গল্প করিতে আসিয়াছি ; আজ আমার মন বেশ প্রফুল্ল আছে, মনে হইতেছে আজ আমাদের গল্প খুব জমিবে।'

রা-তাইকে আর কোনদিন এমন প্রফুল্ল দেখি নাই, কিন্তু সে সময়

আমার মন চিন্তাভারে সমাচ্ছন্ন ছিল, গল্প করিতে প্রবৃত্তি হইতেছিল না ; আমি কোন কথা না বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

রা-তাই আমার ভাবান্তর লক্ষ করিয়া বলিল, 'আজ তোমাকে এত বিমর্ষ দেখিতেছি কেন? কি হইয়াছে বল ; আমার অতিথি-সৎকারের কি কোন ত্রুটি হইয়াছে?'

আমি বলিলাম, 'না, কোন বিষয়ে আপনার ত্রুটি নাই। আজ আমার শরীর ভাল নাই, একটু মাথা ধরিয়াছে, সেইজন্য গল্প করিতে ইচ্ছা হইতেছে না।'

আমার মাথা ধরিয়াছে শুনিয়া রা-তাই আমাকে শিরঃপীড়া নিবারণের ঔষধ দিতে চাহিল ; কিন্তু আমি ঔষধ ব্যবহারে সম্মত হইলাম না।

রা-তাই মুরুব্বির মত ভঙ্গিতে বলিল. 'তোমরা একালের ছোকরা রোগের প্রথম আক্রমণ অগ্রাহ্য করিয়া শরীরকে কষ্ট দেওয়াই বীরত্ব মনে কর ; যাহা হউক, তুমি ইচ্ছা করিয়া রোগে ভুগিলে আর আমি কি করিব?'

একথা শুনিয়াও আমি কোন কথা বলিলাম না ; রা'তাই আমার পাশে বসিয়া গল্প আরম্ভ করিয়া দিল, এবং প্রায় এক ঘণ্টা সুকুমার শিল্প-কলা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিল : আমি চিত্রকর বলিয়া চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধেও সে অনেক কথা বলিল। এই সকল বিষয়ে তাহার অভিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম ; তাহার কথা শুনিয়া মনে হইল, সে যেন এই বিদ্যার আলোচনাতেই জীবন উৎসর্গ করিয়াছে।

অবশেষে রেবেকা বেড়াইতে বেড়াইতে সেইখানে উপস্থিত হইয়া রা-তাইয়ের বক্তৃতা-প্রবাহ হইতে আমাকে উদ্ধার করিলেন। তিনি বলিলেন, 'মিঃ সেন, আজ কি ভয়ানক গরম পড়িয়াছে! বাতাস একবারেই বন্ধ হইয়াছে, ইহা ঝড়ের পূর্বলক্ষণ বলিয়া মনে হয় না কি?'

আমি বলিলাম, আকাশের যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে

বোধ হয় ঝড় বৃষ্টি হইবে ; এই গরমে কেবিনের মধ্যে হাঁপাইয়া উঠিব ভাবিয়া এত রাত্রেও বাহিরে বসিয়া আছি।'

রেবেকা বলিলেন, 'কেন বলিতে পারি না, এত ভয়ানক গরমেও সন্ধ্যার পর আমার ঘুম আসিয়াছিল ; অল্প মাথা ধরায় প্রথমে শুইয়া পড়ি, তাহার পরেই গাঢ় নিদ্রা। অনেক দিন আমার এমন সুনিদ্রা হয় নাই। হঠাৎ জাগিয়া অত্যন্ত গরম বোধ হওয়ায় ডেকে আসিয়াছি, দেখিতেছি এত রাত্রেও আপনারা জাগিয়া বসিয়া আছেন।'

আমি রেবেকাকে কোন কথা না বলিয়া বক্র দৃষ্টিতে একবার রা-তাইয়ের মুখের দিকে চাহিলাম। রা-তাই তাঁহাকে বলিয়াছিল, নিদ্রা-ভঙ্গে নখ দর্পণের কথা তাঁহার মনে থাকিবে না, দেখিলাম এ কথা ঠিক।

রা-তাই রেবেকাকে বলিল, 'মিঃ সেনের মাথা ধরিয়াছে, কিন্তু তিনি ঔষধ খাইতে রাজি নহেন ; শুনিয়াছিলাম তোমারও একটু শিরঃপীড়া হইয়াছে, কিন্তু তুমি ঘুমাইতেছিলে দেখিয়া আমি তোমাকে জাগাই নাই ; তোমার একটু ঔষধ খাওয়া আবশ্যক, আমি আমার কেবিন হইতে তোমাকে ঔষধ পাঠাইয়া দিতেছি।'

রা-তাই ঔষধের সন্ধানে সেখান হইতে চলিয়া গেল, আমি রেবেকার সহিত ডেকের উপর ঘুরিতে ঘুরিতে রেলিংএর ধারে উপস্থিত হইলাম। রেবেকা রেলিং-এর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া স্থির দৃষ্টিতে অন্ধকার সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন ; আজ তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ। তাঁহার কি কষ্ট জানি না, কিন্তু তাঁহার সেই নীরব কাতরতা আমার হৃদয় স্পর্শ করিল। আমি তাঁহার আরও কাছে সরিয়া গিয়া কোমল স্বরে বলিলাম, 'রেবেকা, আজ তোমাকে বড়ই বিমর্ষ দেখিতেছি ; কি করিলে তুমি প্রফুল্ল হও ?'

রেবেকা দৃষ্টি না ফিরাইয়াই বলিলেন, 'আনন্দ, উৎসাহ, প্রফুল্লতা চিরকালের জন্য বিসর্জন দিয়াছি ; এ জীবনে তাহা ফিরিয়া আসিবে না। মিঃ সেন, আপনি কেন আমার প্রতি এত করুণা প্রকাশ করিতেছেন ? আমার উপকার সাধন আপনার অসাধ্য, বোধহয় মনুষ্য-মাত্রেরই অসাধ্য।'

তাঁহার সেই কাতর স্বরে যে নিরাশা, হৃদয়ের যে অব্যক্ত গভীর বেদনা ধ্বনিত হইল, ভাষায় তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব, তাহা কেবল অনুভব-যোগ্য।

আমি বলিলাম, 'না, তোমার এ কথা আমি বিশ্বাস করি না; আজ নিদ্রাবস্থায় তুমি কোনও দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছ, তাহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিতেছ না, সেইজন্যই এত বিমর্ষ হইয়াছ।'

এবার রেবেকা মুখ তুলিয়া আমার মুখের দিকে চাহিলেন। ক্ষুণ্ণ ভাবে বলিলেন, 'মিঃ সেন, আপনি বৃথা আমাকে সান্ত্বনাদানের চেষ্টা করিতেছেন; যাহার সকল সুখ শান্তি, সকল আশার অবসান হইয়াছে, তাহাকে আপনি কী সান্ত্বনা দিবেন? আমি অহর্নিশা যে নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিতেছি, তাহা আপনার বুঝিবার শক্তি থাকিলে আপনি আমাকে এ সকল কথা বলিতে কুণ্ঠিত হইতেন।'

আমি বলিলাম, 'তোমার কষ্ট কি, তুমি দিবা রাত্রি কেন এমন বিষণ্ণ থাক, তাহা জানিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু কোন দিন তোমার নিকট পরিষ্কার উত্তর পাই নাই। এখনও কি আমাকে তোমার মনের কথা বলিতে সাহস হয় না? রেবেকা, যদিও দুই সপ্তাহের অধিক তোমার সহিত আমার পরিচয় হয় নাই, তথাপি তুমি নিশ্চয় জানিও, তোমার সুখের জন্য আমি প্রাণ বিসর্জনেও কুণ্ঠিত হইব না।'

রেবেকা বলিলেন, 'আপনার এ কথা আমি বিশ্বাস করি; আপনার ন্যায় হিতাকাঙ্ক্ষী পৃথিবীতে আমার কেহই নাই, এজন্য আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ; কিন্তু আপনি যে সকল কথা জানিতে চান, তাহা আমি আপনাকে বলিতে পারিব না, তাহা বলা আমার অসাধ্য।'

রেবেকা আর কোন কথা না বলিয়া সহসা সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। রাত্রি অনেক হইয়াছিল, আমিও চিন্তা-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমার কেবিনে প্রবেশ করিলাম। শয্যায় শয়ন করিলাম বটে, কিন্তু নিদ্রাকর্ষণ হইল না, গরমে ছট-ফট করিতে লাগিলাম; শেষে কেবিনের

মধ্যে আর থাকিতে না পারিয়া ভাবিলাম কিছুকাল ডেকের উপর পাদ-চারণ করিলে নিদ্রাকর্ষণ হইতেও পারে ; তাহাই কর্তব্য মনে হইল।

রাত্রি তখন একটা বাজিয়া গিয়াছিল ; আমি কেবিন হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম, সমুদ্র-বক্ষে চন্দ্রোদয় হইতেছে। যেন একটি সুবৃহৎ সুবর্ণময় চক্রার্ধ কোনও ঐন্দ্রজালিকের কুহক মন্ত্র প্রভাবে অন্ধকার নিশীথিনীর কৃষ্ণাবগুণ্ঠন বিদীর্ণ কারয়া ধীরে ধীরে গগন-পথে আবির্ভূত হইতেছে। সৃষ্টির আদি কালে মন্দরমন্থিত মহাসমুদ্রে সুধাকরের উৎপত্তি হইয়াছিল ; সেই সুগভীর নিশীথ কালে সুপ্ত সমুদ্র-বক্ষে চন্দ্রোদয় দেখিয়া আমাদের সেই পৌরাণিক উপকথা মনে পড়িয়া গেল ; আমি চাহিয়া দেখিলাম, কৃষ্ণপক্ষের খণ্ড-চন্দ্রের ম্লান কৌমুদী-সংস্পর্শে বহু দূর পর্যন্ত সমুদ্রের জলরাশি ঝিক-ঝিক করিতেছে, সমুদ্রের জল আর সর্বত্র গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। আমি অতি ধীরে ডেকে উঠিলাম ; সহসা ডেকের অন্য প্রান্তে অস্ফুট চন্দ্রালোকে একটি মনুষ্যের ছায়াময় মূর্তি আমার নয়ন-পথে নিপতিত হইল ; তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলাম, সে রা-তাই।

রা-তাই আমাকে দেখিতে পায় নাই, তাহাকে সেই সময় সেই স্থানে দেখিয়া আমি স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান রহিলাম। দেখিলাম, সে তাহার অস্থিময় শীর্ণ বাহুদ্বয় ঊর্ধ্বে তুলিয়া ঊর্ধ্ব দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া অন্ধকারে কি মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছে। আমি যেখানে দণ্ডায়মান ছিলাম, সেই স্থানটি অন্ধকারপূর্ণ বলিয়া সে আমাকে দেখিতে পায় নাই ; কিন্তু সে অনাবৃত স্থানে দণ্ডায়মান ছিল, নবোদিত চন্দ্রের আলোক তাহার মুখে পতিত হওয়ায় তাহার তাৎকালিক মুখভঙ্গী দেখিয়া আমি ভয়ে আড়ষ্ট হইলাম। মানুষের মুখে এমন পৈশাচিক ভাব আমি আর কখনও দেখি নাই ; স্বচক্ষে না দেখিলে মানুষের মুখের সেরূপ ভীষণ চিত্র বোধহয় কল্পনা করিতেও পারিতাম না : সে মুখ যেন মানুষেব মুখ নহে, প্রেতের মুখ ! তাহা দেখিয়া আতঙ্কে দেহ কণ্টকিত হইল বটে, কিন্তু আমি দৃষ্টি ফিরাইতে পারিলাম না, মোহাবিষ্টের ন্যায় সেইদিকে চাহিয়া রহিলাম।

রা-তাই অনেকক্ষণ পর্যন্ত অস্পষ্ট স্বরে মন্ত্রপাঠ করিয়া আমার দিকে আসিতে লাগিল; আমার মনে হইল, সে সময় সে আমাকে দেখিতে পাইলে ব্যাঘ্রের ন্যায় এক লম্ফে আমাকে আক্রমণ পূর্বক আমার গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিত; অতিথি বলিয়া ক্ষমা করিত না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সে আমাকে দেখিতে পাইল না। আমি সঙ্কুচিতভাবে সরিয়া দাঁড়াইলাম; সে আমার পাশ দিয়া ধীরে ধীরে ডেক হইতে নামিয়া গেল।

রা-তাই প্রস্থান করিলে আমি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম; ভাবিতে লাগিলাম, এ কে, মানুষ, না প্রেত? আমি স্ব-ইচ্ছায় কাহার কবলে নিপতিত হইয়াছি?

নবম পরিচ্ছেদ

রা-তাইয়ের জাহাজে যে 'ব্যারোমেটার' (বায়ুমান যন্ত্র) ছিল, তাহার অবস্থা দেখিয়া কাপ্তেনের সন্দেহ হইয়াছিল, রাত্রে হয়ত তুফান হইতে পারে; তাহার সেই অনুমান মিথ্যা নহে। ভূমধ্যসাগর সম্বন্ধে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারা জানেন, সেখানে অতি অল্প সময়ের মধ্যে হঠাৎ তুমুল ঝটিকার আবির্ভাব হয়। প্রভাতে দেখা গেল আকাশ নির্মল, কোনও দিকে মেঘের চিহ্নমাত্র নাই; বায়ুর গতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, প্রকৃতি স্থির; কিন্তু সেইদিন সন্ধ্যাকালেই মহা ঝটিকার আক্রমণে জাহাজ লণ্ড-ভণ্ড হইতে পারে, প্রাণ যাওয়াও বিচিত্র নহে। আমাদের অবস্থাও সেইরূপ সঙ্কটজনক হইয়াছিল।

রা-তাই ডেক হইতে নামিয়া তাহার কেবিনে প্রবেশ করিলে, কেন বলিতে পারি না, আমার আর ডেকের উপর থাকিতে সাহস হইল না, আমার কেবিনে ফিরিয়া আসিলাম। তখন সমুদ্রবক্ষ স্বচ্ছ মুকুরের ন্যায় স্থির, আকাশের কোনও প্রান্তে বিন্দুমাত্র মেঘ ছিল না। কেবিনে পুনঃ-প্রবেশ করিয়া যখন শয়ন করিলাম, তখন রাত্রি প্রায় দুইটা; শয়নের অল্পক্ষণ পরেই নিদ্রাদেবী আমাকে দয়া করিলেন, আমি গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইলাম।

অতি প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলাম, প্রকৃতির মহা পরিবর্তন সঙ্ঘটিত হইয়াছে। প্রচণ্ড ঝটিকার তাড়নায় জাহাজখানি প্রবল বেগে আন্দোলিত হইতেছে; একবার তাহার মাথা সবেগে জলের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, আবার তাহা পর্বতপ্রমাণ উচ্চ তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, এবং প্রতি মুহূর্তেই ঝটিকার ভৈরব হুঙ্কারে কর্ণ বধির হইতেছে। সমুদ্রে মহা ঝটিকার মূর্তি কিরূপ ভীষণ, ভুক্ত-ভোগী ভিন্ন অন্যের তাহা ধারণা করা অসম্ভব। জাহাজের মাস্তুলগুলি প্রতি মুহূর্তে মড়-মড় করিতেছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তরঙ্গ জাহাজের উপর দিয়া গড়াইয়া যাইতেছে; প্রতি মুহূর্তেই মনে হইতেছে, জাহাজ বুঝি এইবার অতল জলধি-গর্ভে প্রবেশ করিবে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবন্ত অবস্থায় সমাধি হইবে।

প্রায় এক ঘণ্টাকাল আমি কিংকর্তব্য-বিমূঢ় ভাবে শয্যায় পড়িয়া রহিলাম: কয়েক বার উঠিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু সেই দোদুল্যমান জাহাজে পদমাত্র অগ্রসর হওয়া দূরের কথা, দণ্ডায়মান হওয়াও অসম্ভব। এই ভীষণ বিপদে পড়িয়া মনে হইল, রা-তাইয়ের সঙ্গে সমুদ্র-পথে আসিয়া কি কুকর্মই করিয়াছি! কিন্তু তখন আক্ষেপ বৃথা, অথচ কেবিনের মধ্যে নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া থাকিয়া ডুবিয়া মরিতেও ইচ্ছা হইল না: ভাবিলাম, অদৃষ্টে যাহাই থাক, যেমন করিয়া হউক একবার ডেকে যাইতে হইবে।

আমি উঠিবার চেষ্টা করিয়া দুই একবার আছাড় খাইলাম, চলিতে পারিব না বুঝিয়া আর দাঁড়াইবার চেষ্টা না করিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া, কখনও বা হাতে ও হাঁটুতে ভর দিয়া অতি কষ্টে ডেকের দিকে অগ্রসর হইলাম; কিন্তু তথাপি নিস্তার নাই, সেইভাবে যাইতে যাইতেও কত বার যে আছাড় খাইলাম তাহার সংখ্যা নাই। যাহা হউক, সম্মুখে যাহা কিছু পাইলাম তাহাই ধরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম। কাচময় গবাক্ষ-পথে সমুদ্রের অবস্থা দেখিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। পূর্বরাত্রে শয়নের পূর্বে রাত্রি প্রায় দুইটার সময় যে সমুদ্র দেখিয়াছিলাম, ইহা কি সেই সমুদ্র? এখন ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ তরঙ্গরাশি

পর্বতের মত উচ্চ হইয়া অতল সমুদ্রগর্ভবাসী বন্ধনমুক্ত ক্রুদ্ধ লক্ষ দানবের ন্যায় ভৈরব হুঙ্কারে উদ্দাম নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে ; এবং সেই উত্তাল তরঙ্গরাশি মুহুর্মুহু জাহাজের উপর দিয়া এক দিক হইতে অন্য দিকে আছড়াইয়া পড়িতেছে। প্রত্যেক তরঙ্গের আঘাতে জাহাজের সুদৃঢ় বন্ধনসমূহ শিথিল হইতে লাগল এবং তাহার এক একটি অংশ মত্ত মাতঙ্গের শুণ্ডাকর্ষণে কদলী তরুর ন্যায় ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িল। লক্ষ লক্ষ মহাকায় দানবের ভীষণ অট্টহাস্যের ন্যায় ঝটিকার শ্রবণ-বিদারক গর্জনে ও গগনে পবনে সাগরের সেই মহাসংগ্রামে প্রাণে যে কী আতঙ্কের সঞ্চার হইল তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি নাই।

হাতে পায়ে বুকে ভর দিয়া কোন রকমে ডেকে উঠিতেই এমন একটা ঝটকা আসিল যে, মনে হইল আমি বুঝি উড়িয়া গিয়া সমুদ্রে পড়িলাম। দেখিলাম সেই ঝটকায় আমার সম্মুখবর্তী একটি দরজা ভাঙিয়া, এক টুকরা পাতলা কাগজের মত আমার মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গিয়া সমুদ্রে পড়িল। তখন আর চিন্তা করিবার অবসর ছিল না, আমি প্রাণভয়ে উভয় হস্তে লৌহ-নির্মিত রেলিং চাপিয়া ধরিলাম, রেলিং ধরিয়া অতি সাবধানে সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইলাম। কিন্তু ঝটিকা-বেগে আমার নিশ্বাস-রোধের উপক্রম হইল, আমি দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে লাগিলাম। সভয়ে দেখিলাম, বিরাট সমুদ্র-তরঙ্গ জাহাজের চতুর্দিকে আবার পর্বতপ্রমাণ উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। মনে হইল, এই উচ্ছ্বসিত তরঙ্গরাশি এই মুহূর্তেই ক্ষুধিত রাক্ষসের ন্যায় আমাকে গ্রাস করিবে।—মহা ঝটিকায় আলোড়িত উন্মত্ত মহাসমুদ্রের সেই ভয়াবহ দৃশ্য বর্ণনা করিবার চেষ্টা বৃথা।

প্রতি মুহূর্তেই ঝটিকার বেগ যেরূপ বর্ধিত হইয়াছিল, তাহাতে আমি যে কতক্ষণ রেলিং ধরিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতাম তাহা বলিতে পারি না। সে সময় আমার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক হইয়া উঠিয়াছিল ; রেলিং ছাড়িয়া দিলেই আমি ঝটিকা-বেগে উড়িয়া গিয়া সমুদ্রে পড়িতাম, রেলিং থাকিলেও বোধহয় অধিক কাল বাঁচিতাম না ; উন্মত্ত সমুদ্র-তরঙ্গ ডেকের উপর দিয়া আমাকে ভাসাইয়া লইয়া

যাইত। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ভাবিতেছি, এমন সময় জাহাজের ভীমমূর্তি ফরাসী কাপ্তেন 'অয়েল-স্কিন্' নির্মিত পরিচ্ছদে মণ্ডিত হইয়া, এইরূপ প্রাকৃতিক বিপ্লবকালের উপযোগী পাদুকা পরিধান করিয়া অতি সন্তর্পণে আমার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং আমার হাত ধরিয়া নিরাপদ স্থানে টানিয়া লইয়া চলিলেন। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তিনি মুখ নাড়িতেছেন, বুঝিলাম তিনি আমাকে কোন কথা বলিতেছেন ; কিন্তু ঝটিকার সেই ভীষণ গর্জনে ও সমুদ্রের গভীর কল্লোলে আমার কর্ণ বধির হইয়াছিল, তাঁহার একটি কথা শুনিতে পাইলাম না।

আমি কাপ্তেনের অনুগ্রহে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে আশ্রয় পাইলাম বটে, কিন্তু এ-যাত্রা প্রাণরক্ষা হইবে কি না বুঝিতে পারিলাম না। আমি অনেকবার জাহাজে চড়িয়া সমুদ্র-পথে ভ্রমণ করিয়াছি, দুই একবার ঝড়ের হাতেও পড়িয়াছি, কিন্তু এমন ভয়ঙ্কর তুফানে পড়িলে জাহাজ রক্ষা পায়, আমার এরূপ বিশ্বাস ছিল না। দেখিলাম, ঝটিকা না থামিয়া তাহার বেগ উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে লাগিল। অনন্ত সমুদ্রের তুলনায় জাহাজখানি একখানি অতি ক্ষুদ্র ঝিনুক অপেক্ষাও ক্ষুদ্র ; এই জাহাজ কতক্ষণ পর্যন্ত অজেয় প্রাকৃতিক শক্তি প্রতিহত করিবে ?—আমি সভয়ে পুনঃ পুনঃ কাপ্তেনের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলাম, তাঁহার মুখেও ভয় ও ব্যাকুলতার চিহ্ন পরিস্ফুট দেখিলাম ; তিনি শূন্য দৃষ্টিতে পুনঃ-পুনঃ ঝটিকা-সংক্ষুব্ধ আকাশের দিকে চাহিতে লাগিলেন। সকল লোককেই ভয়ে অভিভূত ও ব্যাকুল দেখিলাম ; কেবল জাহাজের পরিচালন-চক্রের নিকট একটি দীর্ঘদেহ বলবান যুবককে সম্পূর্ণ অচঞ্চল দেখিলাম ; তাহার চক্ষুর উপরে সুদীর্ঘ ভ্রূ, প্রশস্ত ললাট, মস্তকে নিবিড় কেশরাশি, হস্ত দুইখানি যেমন দীর্ঘ সেইরূপও সবল। সে তাহার করধৃত চক্র পরিত্যাগ পূর্বক মুহূর্তের জন্যও স্থান ত্যাগ করিল না, অবিচলিত চিত্তে দৃঢ় হস্তে চক্রের দাঁতগুলি ধরিয়া জাহাজখানি নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বস্তুতঃ, তাহার সাহস ও [illegible] উপরেই আরোহী-

গণের জীবন নির্ভর করিতেছিল। এই মহা ঝটিকায় তাহাকে যেরূপ নির্বিকার দেখিলাম তাহাতে মনে হইল, তাহার মৃত্যুভয় নাই ; জীবন ও মৃত্যুকে সে সমজ্ঞান করিতে শিখিয়াছে। সেইজন্যই বোধহয় জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়াও সে সম্পূর্ণ অচঞ্চল।

কাপ্তেন আমাকে যেখানে রাখিয়া গিয়াছিলেন, প্রায় অর্ধঘণ্টাকাল সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলাম বটে, কিন্তু সমুদ্র-তরঙ্গে আমার সর্বাঙ্গ সিক্ত হওয়ায় আমি অসম সাহসে ভর করিয়া সিঁড়ি দিয়া নিচে নামিবার চেষ্টা করিলাম। কয়েক ধাপ নামিয়াছি, এমন সময় পর্বত-প্রমাণ একটি তরঙ্গ আসিয়া জাহাজের উপর হইতে একখানি নৌকা ভাসাইয়া লইয়া গেল। আমার নামিতে দুই-এক মিনিট বিলম্ব হইলে বোধহয় আমাকেও সেইসঙ্গে ভাসিয়া যাইতে হইত। আমি নামিয়া বহু কষ্টে সেলুনে প্রবেশ কারলাম।

সেলুনের মধ্যে তখনও অত্যন্ত গরম, কিন্তু আমার পরিচ্ছদ সিক্ত হওয়ায় শীতে সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল ; বস্ত্র পরিবর্তন না করিলে চলে না, কিন্তু সেই মহা তুফানের মধ্যে তাহা বড় সহজ নহে ; তথাপি আমি সেই চেষ্টায় আমার কেবিনের দিকে অগ্রসর হইলাম। ইতিমধ্যে রেবেকা তাঁহার কেবিনের দরজা খুলিয়া আমার সম্মুখে আসিলেন। তাঁহাকে বিন্দুমাত্র ভীত দেখিলাম না, বরং অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল বোধ হইল। জীবনে যাহার সকল সুখের সকল আশার অবসান হইয়াছে, মৃত্যুর করাল বদন উন্মুক্ত দেখিয়া ও প্রলয়ের মরণডঙ্কাধ্বনি শুনিয়া তাহার মনে ভাবান্তর উপস্থিত না হওয়াই সম্ভব। রেবেকা আমাকে বলিলেন, 'মিঃ সেন, আমার সঙ্গে আসিলে আপনি একটি অতি অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে পাইবেন।'

মৃত্যু-তরঙ্গের গম্ভীর কল্লোলে যখন কর্ণ বধির হইতেছিল, গগনে পবনে ও সমুদ্রে যখন মহাযুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময় রেবেকা আমাকে কী অদ্ভুত দৃশ্য দেখাইবেন বুঝিতে না পারিয়া আমি কৌতূহলের সহিত তাঁহার অনুসরণ করিলাম। রেবেকার কেবিনে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, রা-তাই সেই কামরার এক কোণে জড়সড়

হইয়া বসিয়া ভয়ে কাঁপিতেছে, তাহার মুখমণ্ডলে মৃত্যুর ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে।

রা-তাইয়ের মত সাহসী ও জ্ঞানবান ব্যক্তি জলমগ্ন হইবার ভয়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য ও জড়প্রায় হইয়া রমণীর কক্ষে এভাবে পড়িয়া থাকিবে, ইহা কল্পনারও অগোচর। আমি অদূরে দণ্ডায়মান হইয়া অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। কিন্তু সে আমার দিকে একবারও চাহিল না; ঝটিকার সহিত সমুদ্রের সংগ্রাম যতই প্রবল হইয়া উঠিল, ততই সে ভয়-ব্যাকুল চিত্তে কামরার কোণে সরিয়া সরিয়া বসিতে লাগিল, এবং এক-একবার সভয়ে চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল; তাহার সেই দৃষ্টি উন্মত্তের দৃষ্টির ন্যায় অর্থহীন, কিন্তু ভীষণ।

অন্য কোন লোকের এরূপ অবস্থা দেখিলে বোধহয় আমার কষ্ট হইত, কিন্তু রা-তাইয়ের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না, তাহার দুর্দশা দর্শনে আমার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র সহানুভূতির সঞ্চার হইল না; বরং মনে হইতে লাগিল, এ আপদটা জলে ডুবিয়া মরিলেই ভাল হয়। এই উন্মত্ত ভয়াতুর বৃদ্ধকে সেই অবস্থায় রমণীর শয়ন-কক্ষে থাকিতে দেওয়া অকর্তব্য মনে করিয়া আমি বলিলাম, 'মিঃ রা-তাই, জাহাজ-ডুবির ভয়ে কি আপনার কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাইয়াছে? জ্ঞানবান হইয়া বিপদে আপনি এরূপ অধীর হইলেন কেন? এরূপ ভীরুতায় আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত! আমি ডেকে গিয়াছিলাম, ঝটিকার অবস্থা দেখিয়া বুঝিয়াছি হঠাৎ জাহাজ ডুবিবার কোন আশঙ্কা নাই।'

রা-তাই কোন কথা বলিল না, বসিয়া গোঁ গোঁ করিতে লাগিল। আমি অতঃপর বাক্যব্যয় বৃথা মনে করিয়া তাহাকে হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু সে নড়িল না, ক্ষিপ্ত কুক্কুরের ন্যায় দন্ত বাহির করিয়া আমাকে কামড়াইতে আসিল, এবং সজোরে হাত টানিয়া লইয়া বিকৃত স্বরে বলিল, 'তুমি মিথ্যা কথা বলিতেছ; আমার উপর দেবতার অভিসম্পাত আছে, যদি আমি ডুবিয়া মরি, তাহা হইলে আমার আত্মার সদগতি হইবে না। আমি মরিতে

পারিব না ; আর সকলে ডুবুক, আমি যাহাতে না মরি, তাহার উপায় করিতেই হইবে।'

রা-তাইয়ের স্বার্থপরতা দেখিয়া আমার মনে বড় ঘৃণা হইল, ক্রোধে সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। আমি গর্জন করিয়া বলিলাম, 'মহাশয় ! আপনি এ কি কথা বলিতেছেন ? স্ত্রীলোকের সম্মুখে এমন কথা বলিতে আপনার লজ্জা হইল না ? আপনি এখানে থাকিতে পারিবেন না, উঠুন, আমি আপনাকে আপনার কামরায় রাখিয়া আসি।'

আমি রা-তাইয়ের উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া পুনর্বার তাহার হাত ধরিলাম, এবং সবলে তাহাকে টানিয়া তাহার কামরায় লইয়া চলিলাম। সে তাহার কেবিনের মধ্যে লগুড়াহত কুক্কুরের ন্যায় ব্যাকুলভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। আমি তাহার কেবিনের দরজা বন্ধ করিয়া সেলুনে পুনঃ-প্রবেশ করিলাম।

রেবেকা সেলুনে বসিয়া ছিলেন, আমি তাঁহাকে বলিলাম, 'রেবেকা, তোমার কোন ভয় নাই, তুফান শীঘ্রই থামিয়া যাইবে।'

রেবেকা বলিলেন, 'আমার সর্বাঙ্গ কাঁপিতেছে দেখিয়া মনে করিবেন না প্রাণভয়ে আমি কাতর হইয়াছি, আমার দুশ্চিন্তার কারণ স্বতন্ত্র।'

আমি বলিলাম, 'তুমি বোধহয় রা-তাইয়ের ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া এরূপ বিচলিত হইয়াছ ; কিন্তু তাহার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে সে আজ আমাদের কোন অপকার করিতে পারিবে না।'

রেবেকা বলিলেন, 'আপনি তাহার প্রকৃতির বিশেষ পরিচয় পাইলে এ কথা বলিতেন না ; সে এখন আতঙ্কে অভিভূত হইয়াছে বটে, কিন্তু ঝড় থামিলেই তাহার প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন দেখিতে পাইবেন। আমরা তাহার কাপুরুষতার পরিচয় পাইয়াছি বলিয়া সে আমাদের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবে। মিঃ সেন, আমার এক একবার মনে হয়, রা-তাই মানুষ নহে ; আর যদি সে সত্যই মানুষ হয়, তাহা হইলে এমন মানুষ পৃথিবীতে বোধহয় আর দ্বিতীয় নাই।'

দশম পরিচ্ছেদ

সেই ভীষণ ঝটিকা অতিক্রম করিয়া জাহাজ পরদিন সন্ধ্যার পূর্বে সৈয়দ বন্দরে প্রবেশ করিল। পশ্চিম আকাশ তখন অস্তমান তপনের লোহিত কিরণ-রাগে রঞ্জিত হইয়াছিল। সমুদ্রের দূরতম প্রান্তে, পশ্চিম-দিকচক্রাবালে আলোক ও অন্ধকারের মধুর মিলন সন্দর্শন করিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম; ঝটিকা-শ্রান্ত প্রকৃতির এমন কোমল মাধুর্য জীবনে আর কখনও উপভোগ করি নাই। পর্যটকগণ সৈয়দ বন্দরকে বৈচিত্র্যবিহীন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-বর্জিত কদর্য স্থান বলিয়া উল্লেখ করেন; সুতরাং সৈয়দ বন্দর আমার ভাল লাগিয়াছিল, এ কথা শুনিয়া অনেকেই নাসা কুঞ্চিত করিতে পারেন। কিন্তু সকলের চক্ষু সমান নহে। জাহাজ হইতে সেই বন্দরের যে শোভা দেখিলাম. তাহা দীর্ঘকাল আমার স্মরণ থাকিবে। ধূসর সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে সেই সুবৃহৎ বহু প্রাচীন প্রাচ্য নগরী অতীতের কি এক মোহকর রহস্য-জালে সমাচ্ছন্ন বোধ হইল, যেন একাধিক-সহস্র রজনীর একটি রজনী আরবের উপন্যাস-লোক হইতে উড়িয়া আসিয়া আমার নয়ন-সমক্ষে স্বপ্নে সুষমা বিকাশ করিল। বন্দর হইতে আমাদের প্রাচ্য-দেশ-সুলভ বিচিত্র আকারের হর্ম্যরাজির শোভা, বহু বিভিন্ন জাতির শ্রেণীবদ্ধ জলযান সমূহের মনোহর দৃশ্য দীর্ঘকাল সমুদ্রবাসের পর আমার বড় উপভোগ্য বোধ হইল। দেখিলাম দীর্ঘদেহ, কষ্টসহ আরবগণ দলবদ্ধ হইয়া মনের আনন্দে সমস্বরে গান করিতে করিতে বন্দরের রাজপথ অতিক্রম করিতেছে, শ্রেণীবদ্ধ শত শত উষ্ট্রের গলঘণ্টা-সমূহ হইতে মধুর নিক্বণ উত্থিত হইতেছে, গর্দভচালক সরল-হৃদয় আরব বালকগণ তুচ্ছ কথা লইয়া উচ্চহাস্যে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত করিতেছে, এবং সুবেশধারী সুদানী সৈনিকবৃন্দ দল বাঁধিয়া তালে তালে পা ফেলিয়া প্রশস্ত পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে;—এইরূপ বিবিধ দৃশ্যের সম্মিলনে সৈয়দ বন্দর একখানি সুদৃশ্য মায়াচিত্রের ন্যায় আমার নয়ন মন বিমুগ্ধ করিল।

জাহাজ বন্দরে নঙ্গর করিলে রা-তাইয়ের একজন ভৃত্য নামিয়া গেল, এবং ঘণ্টা-দুই পরে জাহাজে প্রত্যাবর্তনপূর্বক সংবাদ দিল, আমাদের জন্য সে একখানি স্পেশাল ট্রেনের বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছে। আমরা জিনিস পত্র লইয়া জাহাজ হইতে নামিলাম, তাহার পর সুপ্রশস্ত রাজপথ অতিক্রম করিয়া রেলের স্টেশনাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। স্টেশনটি নগরের বহির্ভাগে অবস্থিত। স্টেশনে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, প্ল্যাটফরমে একখানি এঞ্জিন একখানি মাত্র প্রথম শ্রেণীর গাড়ি লইয়া আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছে। আমরা সেই গাড়িতে উঠিলে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ট্রেনখানি বংশীধ্বনি করিয়া খালের পাশ দিয়া নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া চলিল।

সমুদ্রে তুফানের সময় জাহাজের উপর রা-তাই যে কাপুরুষতার পরিচয় দিয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়া সে আমাদের প্রতি যে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তাহা তাহার ভাব দেখিয়াই বেশ বুঝিতে পারিলাম। ঝটিকার পর জাহাজ যতক্ষণ সমুদ্রে ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত রা-তাই আমাদের নিকটে আসে নাই; নিজের কামরার মধ্যে বসিয়া ছিল। কিন্তু ট্রেনে চাপিয়া তাহাকে আমাদের সংস্পর্শে আসিতে হইল; কারণ, বলিয়াছি, এই ট্রেনে একখানির অধিক গাড়ি ছিল না, সুতরাং আমরা তিন জনেই সেই গাড়িতে উঠিয়াছিলাম। রেবেকা গাড়ির এক কোণে একখানি বেঞ্চির উপরে বসিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, রা-তাই স্থূল ওভার-কোটে সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া আর একখানি বেঞ্চিতে বসিয়া ছিল; আমি একটু দূরে তৃতীয় বেঞ্চিতে বসিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে মরু-প্রকৃতির দিকে চাহিয়া ছিলাম। ক্রোশের পর ক্রোশ অতিক্রম করিয়া ট্রেন কায়রো অভিমুখে ধাবিত হইল। রেল-পথের একদিকে সুবিস্তীর্ণ খালের নির্মল জলরাশি, অন্যদিকে দিগন্ত-বিস্তৃত রজত-শুভ্র মরু-বালুকা। অন্ধকারের ভিতর দিয়া ট্রেন স্টেশনের পর স্টেশন অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিল। অবশেষে ইস্‌মাইলা নামক একটি স্টেশনে উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে ট্রেন পরিবর্তিত করিতে হইল। আর একখানি ক্ষুদ্র ট্রেন সেই

স্টেশনের ভিন্ন লাইনে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, আমরা সেই ট্রেনে উঠিলাম।

এতক্ষণ পরে মরুভূমির উপর দিয়া ট্রেন চলিতে আরম্ভ করিল। আমরা নূতন ট্রেনে উঠিবার পূর্বেই গাড়িতে আলো দেওয়া হইয়াছিল, ট্রেন চলিবার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মশক দলবদ্ধ হইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিল। আমরা উভয় হস্তে মশা তাড়াইতে লাগিলাম বটে, কিন্তু বিস্তর চেষ্টাতেও তাহাদের দংশন হইতে পরিত্রাণ পাইলাম না; অর্ধ রাত্রি মরুভূমির উপর মহা অশান্তিতে কাটিল। মধ্যরাত্রি অতীত হইলে কায়রো নগরের স্টেশনে ট্রেন থামিল। স্টেশনের বহির্দেশে একখানি ঘোড়ার গাড়ি আমাদের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল; আমরা ট্রেন হইতে নামিয়া সেই গাড়িতে উঠিয়া হোটেলে চলিলাম।

ট্রেন হইতে নামিবার সময় মনে করিয়াছিলাম হয়ত কোন দুর্গন্ধ, দূষিত, অপরিচ্ছন্ন, সঙ্কীর্ণ হোটেলে আমাদিগকে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু হোটেলে পদার্পণ করিয়াই আমার সে ভ্রম দূর হইল। এই হোটেলের কক্ষগুলি যেমন প্রশস্ত, সেইরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত; তবে, এই হোটেলের সাজ-সজ্জার সহিত কোনও ইউরোপীয় হোটেলের সাজ-সজ্জার সাদৃশ্য দেখিতে পাইলাম না। হোটেলটি সম্পূর্ণ মিশরীয় ভাবে সজ্জিত, সেই সজ্জায় প্রাচ্যদেশ-সুলভ রুচিবৈচিত্র্যেরই পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের গাড়ি হোটেলের দ্বারদেশে উপস্থিত হইবামাত্র হোটেলের অধ্যক্ষ যেরূপ সসম্ভ্রমে রা-তাইকে অভিবাদন করিল তাহা দেখিয়া বুঝিলাম, রা-তাই তাহার অপরিচিত নহে। হোটেলের অধ্যক্ষ রা-তাইকে জানাইল, হোটেলের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কামরাগুলি আমাদের বাসের জন্য খালি রাখা হইয়াছে। সেইসকল কক্ষে প্রবেশ করিয়া বুঝিতে পারিলাম, রা-তাইয়ের আর যে ত্রুটিই থাক, দেশ-ভ্রমণ উপলক্ষে অর্থব্যয়ে তাহার কুণ্ঠা নাই; কোনও রাজা মহারাজার সহিত দেশ-ভ্রমণে বাহির হইলেও আমাদের অভ্যর্থনার বন্দোবস্ত ইহা অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট হইতে পারিত না।

হোটেলে উপস্থিত হইয়া রা-তাই আমাদিগকে বলিল, 'মিঃ সেন, দীর্ঘকাল পরে আমরা কায়রো নগরে উপস্থিত হইয়াছি। পথে আসিতে আসিতে তুমি বোধহয় মনে করিয়াছিলে, এই বুড়ার সঙ্গে আসিয়া কি কুকর্মই করিয়াছ; কিন্তু তুমি ক্রমে বুঝিতে পারিবে, আমার অনুরোধ রক্ষা করা তোমার পক্ষে নির্বোধের কাজ হয় নাই।'

আমি রা-তাইয়ের সঙ্গে আসিয়া ভাল করিয়াছি কি না তাহা তখন পর্যন্ত বুঝিতে পারি নাই; তথাপি তাহার কথা শুনিয়া ভদ্রতার অনুরোধে তাহার এই অনুগ্রহের জন্য তাহাকে ধন্যবাদ দিলাম; অনন্তর বস্ত্রাদি পরিবর্তন পূর্বক ভোজন করিতে বসিলাম।

ট্রেনে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া আমার অত্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল, পরিতৃপ্তির সহিত উদর পূর্ণ করিলাম। রা-তাই আমাদের সঙ্গে আহারে বসিল না, আমি ও রেবেকা একত্র বসিয়া আহার করিলাম। তাহার পর আমাদের বাসের জন্য নির্দিষ্ট বিভিন্ন কক্ষে শয়ন কারতে চলিলাম।

আমার বাসের জন্য যে কক্ষটি নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা বেশ প্রশস্ত। আমি সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে কায়রো নগরের নৈশ শোভা নিরীক্ষণ করিলাম; তাহার পর শয়ন করিলাম। তখন অধিক রাত্রি ছিল না, দেহও অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিল, শুভ্র সুকোমল শয্যায় শয়নমাত্র গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলাম।

অধিক রাত্রি-জাগরণে আমার কিছু বিলম্বে নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন সূর্যোদয় হইয়াছিল; প্রাতঃসূর্যের পীতাভ কিরণরাশি বাতায়ন-পথে আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। নিদ্রাভঙ্গে গাত্রোত্থান করিয়া আমি সেই বাতায়ন-সন্নিধানে দণ্ডায়মান হইলাম; অসংখ্য সমুচ্চ সৌধের ছাদ আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। দেখিলাম, নিকটে ও দূরে শত-শত সুদীর্ঘ তাল বৃক্ষ চিত্রপটে অঙ্কিত সুদৃশ্য চিত্রের ন্যায় বিরাজিত রহিয়াছে, এবং প্রাতঃসূর্যের লোহিত কিরণ তাহাদের শ্যামল পত্ররাশি চুম্বন করিতেছে;—দূরে, বহুদূরে সুপ্রসিদ্ধ পিরামিড

যেন সুবিস্তীর্ণ নীল নদের বিশাল সলিল-প্রবাহ ভেদ করিয়া উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তরুণ সূর্যের উজ্জ্বল আলোক ও সুশীতল প্রভাত-বায়ু তাহার অভ্রভেদী শিখরের সহিত ক্রীড়া করিতেছে। অদূরবর্তী রাজপথ দিয়া দীর্ঘদেহ আরবগণ, গর্দভ পরিচালক কৃষক-সন্তানগণ, অদ্ভুত বেশধারী বিভিন্ন আকারের নাগরিক ও ভিক্ষুগণ গন্তব্য স্থানে ধাবিত হইয়াছে, এবং মধ্যে-মধ্যে দুই একটি হাইল্যাণ্ডার গোরা অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া সগর্বে রাজপথে পাদচারণ করিতেছে।

প্রাভাতিক আহারের সময় রা-তাইকে ভোজন কক্ষে দেখিতে পাইলাম না ; সুতরাং আমি ও রেবেকা একত্র বসিয়া ভোজন শেষ করিলাম। আহারের পর প্রস্তরনির্মিত বারান্দায় দুখানি চেয়ারে বসিয়া আমরা গল্প আরম্ভ করিলাম।

নানা কথার পর রেবেকা বলিলেন, 'মিঃ সেন, কাল হইতে আপনাকে একটা কথা বলিব বলিব মনে করিয়াও সুযোগের অভাবে বলিতে পারি নাই। জাহাজে আসিবার সময় আপনি আমাকে বলিয়াছিলেন, আমার সুখের জন্য আপনি সকলই করিতে প্রস্তুত আছেন ; সেই কথা স্মরণ করিয়া আজ আপনার নিকট কিছু অনুগ্রহ প্রার্থনা করিব, আপনি তাহা পূর্ণ করিবেন কি ?'

আমি বলিলাম, 'তুমি আমাকে কি অনুরোধ করিবে, তাহা অনুমান করিতে পারিতেছি না ; যদি আমার সাধ্য হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তোমার অনুরোধ রক্ষা করিব।'

রেবেকা বলিলেন, 'না, আপনি অগ্রে অঙ্গীকার করুন ; আপনি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিলে আমি যে সুখ লাভ করিব, তেমন সুখ আমার অদৃষ্টে অনেক দিন ঘটে নাই।'

আমি বলিলাম, 'তোমার কথা না শুনিয়া আমি অঙ্গীকার করিতে পারিব না ; তোমার কি বলিবার আছে বল, শুনি।'—রেবেকা বিষণ্ণ-ভাবে বলিলেন, 'আপনি আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলে আমার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইবে। আপনি রা-তাইয়ের সঙ্গে এত দূর পর্যন্ত আসিয়া

নানা ঘটনায় বোধহয় বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহার সাহচর্য গ্রহণ আপনার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই। যতদিন আপনি জাহাজে ছিলেন ততদিন পর্যন্ত আপনার স্বাধীনভাবে কিছুই করিবার উপায় ছিল না ; কিন্তু এখন আপনি স্বাধীন, আপনার ইচ্ছায় কেহই বাধা দিতে পারিবে না। আমার অনুরোধ, আপনি অবিলম্বে এখান হইতে স্থানান্তরে প্রস্থান করুন। আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না, কিন্তু আমি বুঝিতেছি আপনার বিপদ প্রতি মুহূর্তেই ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে ; সে যে কি বিপদ তাহা আপনাকে বলিতে পারিব না, কারণ আমারও তাহা অজ্ঞাত ; তবে, আপনি যে কোনও ভয়ঙ্কর বিপদকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছেন, ইহা আমি স্পষ্ট অনুভব করিতেছি। আপনি যদি এখন আমাদের নিকট হইতে পলায়ন না করেন, তাহা হইলে ইহার পর আর পলায়নের উপায় থাকিবে না।'

আমি বলিলাম, 'আমার বিপদের আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া তুমি একাধিক বার আমাকে সাবধান করিয়াছ, এজন্য তুমি আমার ধন্য-বাদের পাত্রী। আমি তোমার সাবধান-ব্যাক্য অগ্রাহ্য করিয়াছি বটে, কিন্তু তাহা অবিশ্বাস করি নাই। রা-তাইয়ের প্রকৃতির যে পরিচয় পাইয়াছি তাহাতে স্পষ্ট বুঝিয়াছি, পৃথিবীতে কোন কার্যই তাহার অসাধ্য নহে ; আমাকে বিপন্ন করা তাহার পক্ষে অতি সহজ, তাহাও আমি জানি ; কিন্তু আমার সঙ্কল্পের কথা তোমাকে তো পূর্বেই বলিয়াছি। আমি তোমার প্রস্তাবানুসারে পলায়নে অসম্মত নহি, কিন্তু তোমাকেও আমার সহিত পলায়ন করিতে হইবে ; যদি ইহাতে অসম্মত হও, তাহা হইলে আমি রা-তাইয়ের সঙ্গ ত্যাগ করিব না।'

রেবেকা গম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'আপনার সহিত পলায়ন আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ; আপনি মনে করিবেন না আমি ইচ্ছা করিলেই এই পিশাচের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি। আমি তো আপনাকে পূর্বেই বলিয়াছি, আমার সে শক্তি নাই ; এই দুর্বৃত্ত আমাকে যে শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়াছে সে শৃঙ্খল ছিন্ন করা মনুষ্যের

অসাধ্য; বিশেষতঃ, আপনার সহিত পলায়ন করিয়াও কোন ফল নাই। আমি কোথায় পলায়ন করিব? উত্তর মেরুর প্রান্তবর্তী তুষার-প্রান্তরে, সাইবিরিয়ার দুর্গম অরণ্যে, মরুময় সাহারার বিস্তীর্ণ বক্ষস্থিত কোনও জনমানবশূন্য নিভৃত ওয়েসিসে, যেখানেই আমি পলায়ন করি, এই নরপিশাচ আবার সেই অদৃশ্য বন্ধন-শৃঙ্খল আকর্ষণ করিয়া সেই স্থান হইতে আমাকে লইয়া আসিবে। যে মুহূর্তে সে আমাকে স্মরণ করিবে সে সময় সহস্র ক্রোশ দূরে থাকিলেও, আপনার স্নেহ ও অনুগ্রহ, স্বাধীনতার সুখ, জীবনের শান্তি, সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া যে উপায়েই হউক তাহার নিকট আসিতে বাধ্য হইব; আমি যে তাহার উৎপীড়নে প্রতি মুহূর্তে তিল তিল করিয়া মরিতেছি, সে চিন্তা তখন আমার মনে স্থান পাইবে না। জানি না কি অদ্ভুত উপায়ে, কি ইন্দ্রজাল-কৌশলে আমার ইচ্ছাকে সে এভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।—আপনার অনুরোধ রক্ষা করা আমার অসাধ্য, ইহার অধিক আমার আর কিছুই বলিবার নাই।'

রেবেকার এ কথা অবিশ্বাস করিলাম না, কিন্তু সমস্ত ব্যাপার এমন দুর্ভেদ্য রহস্য-জালে সমাচ্ছন্ন যে, তাহার কারণ নির্ণয় করা সুকঠিন বোধ হইল। সেই পরিস্ফুট দিবালোকে পথ-প্রান্তবর্তী প্রশস্ত প্রস্তরনির্মিত অলিন্দে উপবেশন করিয়া সমস্ত ঘটনা আমার নিকট উৎকট দুঃস্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

রেবেকা অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপ করিয়া থাকিয়া পুনর্বার বলিলেন, 'মিঃ সেন, আপনি এমন কঠিনহৃদয়, তাহা জানিতাম না। আমি চিরজীবনের জন্য অসুখী হইয়াছি; আমি যে ফাঁদে পড়িয়া জীবন্মৃত হইয়া আছি, আমার চক্ষুর উপর আর একজন নিরপরাধ ব্যক্তি সেই ফাঁদে পড়িয়া চিরজীবনের জন্য মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা ভোগে উদ্যত হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া দুঃখে কষ্টে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আপনি যদি দূরে চলিয়া যাইতেন, তাহা হইলে আপনাকে নিরাপদ মনে করিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইতাম। আমার অনুরোধ, এ আনন্দ হইতে আমাকে বঞ্চিত করিবেন না।'

আমি তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইয়া আবেগপূর্ণ স্বরে বলিলাম, 'রেবেকা, তবে আমার মনের কথা শোন। যে মুহূর্তে আমি তোমাকে প্রথম দেখি; সেই মুহূর্তেই বুঝিতে পারি, কোন দুঃসহ যন্ত্রণায় তোমার হৃদয় তিল তিল করিয়া দগ্ধ হইতেছে, তোমার মনে বিন্দুমাত্র সুখ শান্তি নাই। আমি তাহার কারণ বুঝিতে না পারিলেও প্রতিজ্ঞা করিলাম, যেমন করিয়া পারি তোমার দুঃখ-কষ্ট মোচন করিব। ক্রমে ঘটনাচক্রের আবর্তনে আমি তোমার সঙ্গী হইলাম; এখন তোমার মর্মবেদনার কারণ কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছি; কিন্তু আমার সঙ্কল্প ত্যাগ করি নাই। যে রাত্রে নেপল্‌স্ নগরে রা-তাইয়ের গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম, সেই রাত্রে তুমি গোপনে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রা-তাইয়ের ন্যায় দুর্জনকে পরিহার করিবার জন্য আগ্রহভরে আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলে। কিন্তু আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবার জন্যই সেদিন তোমার সেই কাতর অনুরোধ রক্ষা করি নাই; আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এই নর-প্রেত কোন্ দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খলে তোমাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহা পরীক্ষা করিব, এবং সম্ভব হইলে সেই শৃঙ্খল ছিন্ন করিব। যদি তুমি আমার সঙ্গে পলায়নের প্রস্তাবে সম্মত হও, তাহা হইলে আমি এই মুহূর্তেই রা-তাইয়ের সংস্রব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি; পূর্বেও আমি তোমাকে এ কথা বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, তুমি আমার সঙ্গে যাইলে প্রাণপণে তোমার মানসম্ভ্রম রক্ষা করিব, তোমার কোন অপকারের আশঙ্কা নাই। ইংলণ্ড আমার স্বদেশ নহে সত্য, সেখানে আমার আত্মীয় পরিজন নাই বটে, কিন্তু সে দেশে আমার সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য বন্ধুগণের অভাব নাই, তোমার ন্যায় বহুগুণান্বিতা সুশীলা পবিত্রহৃদয়া নারীকে কন্যার ন্যায় গৃহে স্থান দান করিতে তাঁহারা কেহই কুণ্ঠিত হইবেন না, পরিবারের মধ্যে তোমাকে সাদরে গ্রহণ করিবেন, তাহার পর তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের কোনও একটা ব্যবস্থা হইবে। কিন্তু যদি তুমি আমার সঙ্গে যাইতে সম্মত না হও, তাহা হইলে যতদিন তুমি এই নর-প্রেতের সঙ্গে থাকিবে, ততদিন

পর্যন্ত আমি ছায়ার ন্যায় তোমার সঙ্গে থাকিব, তোমার অনুনয় বিনয় বা যুক্তিতর্কে আমার এই সঙ্কল্প বিচলিত হইবে না।'

আমার কথা শুনিয়া রেবেকা মর্মর মূর্তির ন্যায় নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিলেন; দেখিলাম তাঁহার মুখ মৃতের মুখের ন্যায় বিবর্ণ: দেখিয়া আমার মনে বড় কষ্ট হইল, আমি সহানুভূতিভরে বলিলাম, 'আমি যে-সকল কথা বলিলাম, সে সম্বন্ধে তোমার কি কিছুই বলিবার নাই?'

রেবেকা মাথা তুলিয়া অত্যন্ত আবেগের সহিত বলিলেন, 'হাঁ, বলিবার আছে; আমি এই বলি যে, তুমি বড় নির্দয়, আমার এই দুঃখের উপর নূতন দুঃখ-ভার চাপাইতে তুমি বিন্দুমাত্র কষ্টবোধ করিতেছ না!'

আমি বলিলাম, 'রেবেকা, তুমি অতি সরল, তাই মনে করিয়াছ সহজে আমাকে ভুলাইতে পারিবে; আমি নির্বোধ হইলে হয়ত তোমার কথায় ভুলিতাম, কিন্তু ভগবান আমাকে নিতান্ত নির্বোধ করেন নাই; আমার আরও কিছু বলিবার আছে, শোন। তুমি রা-তাইকে যমের মত ভয় কর, তুমি অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া মনে করিতেছ, তাহার কবল হইতে তোমার উদ্ধার নাই; কিন্তু আমার নিকট ইহা অসম্ভব মনে হয়। মনে কর, আমরা উভয়ে যদি রা-তাইয়ের অজ্ঞাতসারে লণ্ডনে পলায়ন করি, তাহা হইলে সে কিরূপে তোমাকে ধরিবে? এই দুর্বৃত্ত তোমাকে স্থানান্তরে গমনের স্বাধীনতায় বঞ্চিত করে নাই, সুতরাং আমার সঙ্গে লণ্ডনে গমন করা তোমার পক্ষে কঠিন নহে। যদি তুমি লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া কোনও সম্ভ্রান্ত পরিবারে বাস কর, তাহা হইলে সে কিরূপে তোমাকে পুনর্বার হাতে পাইবে? রা-তাই যদি তোমার সন্ধানে লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া বলপ্রয়োগ পূর্বক তোমাকে লইয়া যাইতে চাহে, তাহা হইলে ইংলণ্ডের রাজশক্তি তাহাকে তাহার ধৃষ্টতার উপযুক্ত দণ্ড দানে কখনও পরাঙ্মুখ হইবে না।'

রেবেকা সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'মিঃ সেন, তুমি এই নরপিশাচের শক্তির পরিচয় পাও নাই বলিয়াই একথা বলিতেছ।

তুমি কি মনে কর, আমি তাহার কবল হইতে উদ্ধার লাভের চেষ্টা না করিয়াই এভাবে বসিয়া আছি? শত্রুর কবল হইতে পলায়নের জন্য পশু পক্ষী পর্যন্ত চেষ্টা করে, মানুষ তো দূরের কথা। হাঁ, আমি এই পিশাচের কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য দুইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু যে সুদৃঢ় শৃঙ্খলে আমি আবদ্ধ, সে শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে পারি নাই, তাই আবার আমাকে ফাঁদে পড়িতে হইয়াছে। আমার পলায়নের কাহিনী সংক্ষেপে বলিতেছি। একবার রুশ-রাজধানী সেণ্টপিটার্সবর্গ হইতে, আর একবার বার্লিন নগর হইতে পলায়ন করি। সেণ্টপিটার্সবর্গ হইতে যেবার পলায়ন করি, সেবার আমি যে বিপদে পড়িয়াছিলাম তাহা শুনিলে দুঃখে পাষাণও বিদীর্ণ হয়। সেণ্টপিটার্সবর্গ হইতে যাত্রা করিয়া আমি অনাহারে ও পথশ্রমে মৃতবৎ হইয়া মস্কো নগরে উপস্থিত হই, তাহার পর কার্পেথিয়ান গিরিমালা অতিক্রম পূর্বক কোনও রকমে প্রাণ লইয়া বুদাপেস্ত নগরে গমন করি। সেই নগরে আমার পিতার দুই একজন সম্ভ্রান্ত বন্ধু বাস করিতেন, আমি আত্মপরিচয় দিয়া তাঁহাদের আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তাঁহারা দয়া করিয়া আমাকে তাঁহাদের গৃহে স্থান দিলেন।

'এক মাস পর্যন্ত রা-তাইয়ের কোনও সংবাদ পাইলাম না, আমি অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হইলাম। এক মাস পরে একদিন রাত্রে একাকী শয়ন-কক্ষে বসিয়া আমার দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করিতেছি, এমন সময় আমার বোধ হইল, কেহ আমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আমাকে অবিলম্বে নগর-প্রান্তে অবস্থিত একটি বনে গমনের জন্য আদেশ করিতেছে।—আমি শিহরিয়া পশ্চাতে চাহিলাম, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। রুদ্ধদ্বার গৃহ-কক্ষে কাহারও প্রবেশের সম্ভাবনা ছিল না; তবে কে, কী কৌশলে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া আমাকে এই আদেশ করিল? আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু আর কোনও কথা চিন্তা করিলাম না, তৎক্ষণাৎ উঠিয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইলাম, এবং সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া সিঁড়ি দিয়া নিচে নামিলাম; তাহার

পর সদর দরজা খুলিয়া নির্দিষ্ট অরণ্যে উপস্থিত হইলাম ; সেই অরণ্য আমি পূর্বে কখনও দেখি নাই, সেখানে যাইবার পথও চিনিতাম না ; সুতরাং আমি কিরূপে যে সেখানে উপস্থিত হইলাম, তাহা আমার বুদ্ধির অগোচর।

'সেই অরণ্যের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, রা-তাই একটি শুষ্ক কাঠের গুঁড়ির উপর বসিয়া আছে। উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে তাহাকে চিনিতে আমার বিন্দুমাত্র বিলম্ব হইল না। তাহার ভাঁটার মত চক্ষুদুটি হইতে আগুনের হল্কা বাহির হইতে লাগিল। সে তীব্র দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া শুভ্র দন্তগুলি বাহির করিয়া একবার হাসিল,—নরমাংস-লোলুপ ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্র সম্মুখে শিকার দেখিলে বোধহয় সেই রকম করিয়াই হাসে!'

আমি ঔৎসুক্য ভরে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তাহার পর কি হইল?'

রেবেকা বলিলেন, 'সে কথা আমার স্মরণ নাই ; রা-তাইয়ের সেই হাসি দেখিয়াই আমি অজ্ঞান হইয়া পড়ি ; সংজ্ঞালাভ করিলে দেখিলাম, আমি প্যারিস নগরে তাহার গৃহে নীত হইয়াছি। পরে সুযোগ বুঝিয়া আমি আমার আশ্রয়দাতা পিতৃবন্ধুকে সকল কথা জানাইয়া একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম ; কিন্তু সে পত্র তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল কি না, কোনও দিন তাহা জানিতে পারি নাই।'

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলাম, 'এই তো প্রথম বারের ইতিহাস ; দ্বিতীয় বার কি হইয়াছিল?'

রেবেকা বলিলেন, 'দ্বিতীয় বার আমি বার্লিন হইতে পলায়ন করি। সেই নগরেই একটি অল্পবয়স্ক জর্মন যুবকের সহিত রা-তাইয়ের পরিচয় হয়। তুমি যেমন রা-তাইয়ের কুহকে মুগ্ধ হইয়াছ, সেই যুবকটির অবস্থাও এইরূপ হইয়াছিল ; অবশেষে সে নিদারুণ মনস্তাপে আত্মহত্যা করিয়া রা-তাইয়ের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। এই ব্যাপার দেখিয়া আমার মন ভয়ে ও নিরাশায় পূর্ণ হয় ; মনে করিলাম, পালাইয়া তো এই পিশাচের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিব না, আমিও আত্মহত্যা করিব, জলে ডুবিয়া মরিব। একদিন

মধ্যরাত্রে রা-তাইয়ের অজ্ঞাতসারে গৃহত্যাগ করিয়া নদীতীরে উপস্থিত হইলাম ; আমি যে স্থানে দণ্ডায়মান হইলাম, সেই স্থানটি নদীর জল হইতে অনেক উচ্চ, নিচেই গভীর জল ; আমি উভয় হস্ত উর্দ্ধে তুলিয়া সেই উচ্চ পাড়ের উপর হইতে নদী-গর্ভে লাফাইয়া পড়িব, এমন সময় কে আমার পৃষ্ঠে অঙ্গুলি স্পর্শ করিল ; ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম, রা-তাই আমার পশ্চাতে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আমার আত্মহত্যার সাধ মিটিয়া গেল, তাহার ইঙ্গিত-মাত্র তাহার অনুসরণ করিলাম। রা-তাই তীব্র স্বরে আমাকে বলিল, "এই দ্বিতীয় বার তুমি আমার অবাধ্য হইয়া পলায়নের চেষ্টা করিয়াছ, এবারও তোমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে ; ইহাতেও কি তুমি বুঝিতে পার নাই, আমার কবল হইতে এ জীবনে তোমার উদ্ধারলাভের আশা নাই ?"—এই দুই বারের অভিজ্ঞতায় আমি বুঝিয়াছি পলায়ন করিলেও আমি তাহার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব না।'

রেবেকা আর কোনও কথা না বলিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন ; আমি বসিয়া বসিয়া এই অবিশ্বাস্য অদ্ভুত রহস্যের কথা ভাবিতে লাগিলাম ; মনে হইল, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এমন অদ্ভুত ব্যাপার কি সম্ভব ! কে এ সকল কথা বিশ্বাস করিবে? কিন্তু আমি স্বচক্ষে যাহা দেখিতেছি, কিরূপেই বা তাহা অবিশ্বাস করিব ? এই ব্যাপারের শেষ কোথায়, তাহা আমাকে দেখিতেই হইবে। আমি সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

সেদিন অপরাহ্নে রা-তাইয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল না। রাত্রে আহারের পর আমি বারান্দায় একখানি চেয়ারে বসিয়া ধূমপান করিবার সময় দেখিতে পাইলাম, রা-তাই নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে হোটেল হইতে বাহির হইয়া গেল ! বারান্দায় আলো ছিল না, অন্ধকারে সে আমাকে দেখিতে পায় নাই। সে এত রাত্রে সাজসজ্জা করিয়া একাকী কোথায় যাইতেছে জানিবার জন্য আমার বড় আগ্রহ হইল, আমি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া সন্তর্পণে তাহার অনুসরণ করিলাম।

পথে আসিয়া রা-তাই একখানি ঘোড়ার গাড়িতে উঠিয়া বসিল ;

কোচম্যান তৎক্ষণাৎ সবেগে গাড়ী হাঁকাইল। নিকটেই একটা গাড়ীর আড্ডা ছিল, আমি সেই আড্ডা হইতে একখানি গাড়া লইয়া রা-তাইয়ের অনুসরণ করিলাম।

সমস্ত দিনের প্রখর রৌদ্রের পর রাত্রি বেশ শীতল ও উপভোগ্য বোধ হইতে লাগিল; আমি গাড়ীতে এক মাইলের কিছু অধিক দূর চলিলাম। আমার মন চিন্তাশূন্য ছিল না; আমি ভাবিতেছিলাম এই গভীর রাত্রে অপরিচিত স্থানে রা-তাইয়ের অনুসরণ করা কি আমার পক্ষে সঙ্গত হইতেছে? একবার মনে হইল, কৌতূহল পরিতৃপ্ত না হইলে ক্ষতি কী, আর যাইব না, হোটেলে ফিরিয়া যাই; কিন্তু পর-মুহূর্তেই ভাবান্তর উপস্থিত হইল, রা-তাই কোথায় যাইতেছে, এত রাত্রে অন্যত্র তাহার কি কাজ? এতদিন ইহার সহিত বাস করিয়া ইহার প্রকৃতির প্রকৃত পরিচয় পাইলাম না, আজ যদি নূতন কিছু সুযোগ পাই, তবে সে সুযোগ ত্যাগ করা বুদ্ধিমানের কার্য হইবে না।—সুতরাং আর হোটেলে প্রত্যাগমন করা হইল না; আমাদের গাড়ী নীল নদের সুবিস্তীর্ণ বাঁধের উপর উপস্থিত হইল।

বাঁধ অতিক্রম করিয়া গাড়ী পুরাতন কায়রো নগরের মিউজিয়মের সমীপবর্তী হইলে আমি মনে করিলাম, এই মিউজিয়মই বোধহয় রা-তাইয়ের লক্ষ্যস্থল; কিন্তু তাহার গাড়ী ক্রমে মিউজিয়মের দ্বারও অতিক্রম করিল; তখন বুঝিলাম সে অন্য কোথাও যাইতেছে। ঘড়ি খুলিয়া গাড়ীর আলোকে দেখিলাম, তখন রাত্রি প্রায় বারটা।

সেই বহু প্রাচীন রাজপথের দুই ধারে 'লেবেক' বৃক্ষের উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান ছিল, পথ জনমানব-শূন্য; কেবল দূরে দূরে পল্লী-কুটিরের অভ্যন্তরস্থ আলোক-রশ্মি দৃষ্টিগোচর হইতেছিল; এবং মধ্যে মধ্যে নিশাচর পক্ষী ও দুই-একটা গ্রাম্য কুকুর বিরাট চিৎকারে নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। রা-তাইয়ের গাড়ী ক্রমে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া পিরামিডের পাদদেশে উপস্থিত হইল। সেই স্থানে তাহার গাড়ী থামিল দেখিয়া একটু দূরে থাকিতে আমার

গাড়ীও থামাইলাম, এবং গাড়ী হইতে নামিয়া রা-তাইয়ের অনুসরণ করিলাম।

আমি যে রা-তাইয়ের অনুসরণ করিয়াছি, তাহা সে একবারও ফিরিয়া দেখিল না; সে ব্যস্তভাবে পিরামিডের দিকে অগ্রসর হইল। পিরামিডের পাদভূমি বালুকা-সমাচ্ছন্ন; সেই বালুকারাশির উপর দিয়া আমি রা-তাইয়ের অনুসরণ করিতে করিতে দেখিলাম, সেই গভীর রাত্রে সে পিরামিডে উঠিতেছে। রা-তাই কি মানুষ?

রা-তাই পঞ্চাশ যাট ফুট ঊর্ধ্বে উঠিয়া গম্ভীর স্বরে কাহাকে আহ্বান করিল। একজন লোক তৎক্ষণাৎ একখণ্ড প্রস্তরের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল; পাছে সে আমাকে দেখিতে পায়, এই ভয়ে আমি একখানি প্রস্তরের আড়ালে সরিয়া দাঁড়াইলাম, এবং তাহারা কি করে তাহাই দেখিতে লাগিলাম।

আগন্তুকের আকার-প্রকার দেখিয়া তাহাকে আরব বলিয়া বোধ হইল। এই লোকটি প্রকাণ্ড জোয়ান। অনেকক্ষণ পর্যন্ত মৃদু স্বরে কথোপকথনের পর তাহারা উভয়েই পিরামিডের ঊর্ধ্বদেশে আরোহণ করিতে লাগিল। কিছুকাল পরে তাহারা হঠাৎ অদৃশ্য হইল। আমি বুঝিলাম, তাহারা পিরামিডের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে।

যাঁহারা মিশরের পিরামিড দেখিয়াছেন তাঁহারা অবগত আছেন, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড একত্র গাঁথিয়া পৃথিবীর এই অন্যতম 'আশ্চর্য পদার্থ' গঠিত হইয়াছে। প্রস্তর-খণ্ডগুলি এভাবে সংস্থাপিত যে, তিন ফুট অন্তর এক একটি সোপানের মত দেখা যায়। বহু ঊর্ধ্বে পিরামিডের অভ্যন্তরে প্রবেশের দ্বার। আমি সাবধানে সেই দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিব কি না চিন্তা করিতে লাগিলাম। মনে বড় ভয় হইতেছিল; মনে হইল, যদি রা-তাই বা তাহার সেই ভীমাকৃতি অনুচর হঠাৎ আমাকে সেখানে দেখিতে পায়, তাহা হইলে আমি তাহাদের রহস্য-ভেদে উদ্যত হইয়াছি ভাবিয়া তাহারা হয়ত আমাকে আক্রমণ করিবে; তাহার পর যদি আমাকে সেখান হইতে

নিচে ফেলিয়া দেয়, তাহা হইলে আমার সর্বাঙ্গ চূর্ণ হইয়া যাইবে ; আর যদি তাহাদেয় অজ্ঞাতসারে পিরামিডের অভ্যন্তরে প্রবেশ করি, তাহা হইলেও সেখানে এই গভীর রাত্রে অন্ধকারের মধ্যে আমার বিপদের সম্ভাবনা যথেষ্ট ; কিন্তু আমার কৌতূহল এরূপ বর্ধিত হইয়াছিল যে, নানা বিপদের সম্ভাবনা সত্ত্বেও পিরামিডের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না ; আমার মনে হইল, কেহ যেন আমাকে সবলে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে।

পিরামিডের অভ্যন্তরে প্রবেশের দ্বারটি প্রশস্ত নহে ; আমি অবনত মস্তকে দ্বার অতিক্রম করিয়া একটি পথ পাইলাম, এই পথটি অতি সঙ্কীর্ণ। পথটি আঁকিয়া-বাঁকিয়া নিম্নদিকে গিয়াছে। আমি সেই পথে অন্ধকারের মধ্যেই চলিতে লাগিলাম ; অন্য দিকে অন্য পথ গিয়াছে কি না তাহা বুঝিবার জন্য উভয় দিকে দেওয়াল স্পর্শ করিয়া চলিতে লাগিলাম। চলিতে চলিতে এক স্থানে আসিয়া করস্পর্শে বুঝিতে পারিলাম, সম্মুখে প্রাচীর, সেদিকে আর অগ্রসর হইবার উপায় নাই। দেওয়ালে হাত দিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে অন্য দিকে পথ পাইলাম, আবার সেই পথ দিয়া চলিতে লাগিলাম ; কিন্তু পথ এবার নিচের দিকে নহে, সেখান হইতে ক্রমে ঊর্ধ্বে উঠিতে হইল। পিরামিডের গহ্বরের ভিতর এমন ভয়ঙ্কর গরম যে, অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘর্মে আমার সর্বাঙ্গ সিক্ত হইল, আমি হাঁপাইতে লাগিলাম ; শত শত চর্মচটিকা সেই সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গ-মধ্যে উড়িতে উড়িতে আমার মাথায় ও মুখে ক্রমাগত ডানার আঘাত করিতে লাগিল। ভয়ে আমার বুকের মধ্যে দুরু-দুরু করিয়া উঠিল, মনে হইল, যদি উপর হইতে একটি চাপ ভাঙিয়া পড়ে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমার ইহলীলার অবসান হইবে।

সেই সুড়ঙ্গ-পথে ঘুরিতে ঘুরিতে কত দূর উঠিলাম বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু বোধ হইল অনেক ঊর্ধ্বে উঠিয়াছি। দুই একটি গবাক্ষ দিয়া বহির্দেশের সুশীতল নৈশ বায়ু আমার অঙ্গ স্পর্শ না করিলে

সেই গরমে আমার ভয়ানক কষ্ট হইত। মাথায় আঘাত লাগিতে পারে এই ভয়ে অনেকক্ষণ অবনত মস্তকে চলিয়াছিলাম, তাহাতে কষ্ট হওয়ায় পরে সোজা হইয়া দাঁড়াইলাম। মাথায় ছাদ বাধিল না, দুই হাত তুলিয়াও ছাদ স্পর্শ করিতে পারিলাম না; কোনদিকের দেওয়ালও হাতে পাইলাম না; সুতরাং অনুমান করিলাম, কোনও প্রশস্ত কক্ষে প্রবেশ করিয়াছি। পূর্বে কখনও পিরামিডের ভিতরে যাই নাই, সুতরাং স্থানটি কিরূপ, রাত্রে তাহা বুঝিতে পারিলাম না; অনেক ক্ষণ ধরিয়া ঘুরিলাম, কিন্তু সে কক্ষ হইতে বাহির হইতে পারিলাম না।

আমি সেই অন্ধকার কক্ষমধ্যে পথের সন্ধানে ঘুরিতে লাগিলাম, কিন্তু কোনদিকেই পথ পাইলাম না; যে দিকেই যাই, সেই দিকেই প্রাচীর। ঘুরিতে ঘুরিতে দিগ্‌ভ্রান্ত হইলাম, কোন্ দিক দিয়া আসিয়াছিলাম, তাহাও স্থির করিতে পারিলাম না।

এতক্ষণ পরে আমার মনে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হইল, রা-তাইয়ের অনুসরণে এখানে আসিয়া কি কুকর্মই করিয়াছি! এই রাত্রিকালে সাহায্য প্রার্থনায় এখানে চীৎকার করিলেই বা কি ফল হইবে? দিবাভাগে এখানে কোনও মনুষ্যের সমাগম হইবে কি না তাহাও বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ঘুরিতে ঘুরিতে যদি সত্যই গোলকধাঁধার মধ্যে আসিয়া পড়িয়া থাকি, তাহা হইলে হয়ত এখানে অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে।

যাহা হউক, বাল্যকাল হইতে দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়া আমি বিপদে অভ্যস্ত ছিলাম, সুতরাং আমার মনে যতই ভয়ের সঞ্চার হউক কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইলাম না। আমি পথের সন্ধানে ব্যাকুলভাবে সেই স্থানে ঘুরিতে লাগিলাম, কিন্তু আমার চেষ্টা সফল হইল না। ক্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম, আমার সর্বাঙ্গে দরদর করিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল; আমার বুকের মধ্যে কাঁপিতে লাগিল; প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া সাহায্যলাভের আশায় আমি চীৎকার করিতে লাগিলাম। আমার উচ্চ কণ্ঠস্বর সেই সুবিস্তীর্ণ কক্ষের চতুর্দিকে প্রতিধ্বনিত হইয়া

শূন্যে বিলীন হইল ; কিন্তু সেই মধ্যরাত্রে কে সেখানে আমার সাহায্যে অগ্রসর হইবে? কাহারও উত্তর পাইলাম না ; ভয়ে আড়ষ্টপ্রায় হইয়া উচ্চকণ্ঠে রা-তাইকে ডাকিলাম, কিন্তু তাহারও সাড়া পাইলাম না, কেবল প্রতিধ্বনি শতকণ্ঠে আমাকে উপহাস করিয়া উঠিল। আমি তখন ক্ষিপ্তের ন্যায় সেই কক্ষমধ্যে দৌড়াইয়া বেড়াইতে লাগিলাম ; আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল, পদদ্বয় ক্রমে অবসন্ন হইয়া উঠিল, অবশেষে আর আমার চলিবার শক্তি রহিল না ; আমার অন্তিমকাল সমুপস্থিত ভাবিয়া আমি বিহ্বল চিত্তে ধরাতলে নিপতিত হইলাম, মুহূর্তমধ্যে আমার সংজ্ঞা লোপ হইল।

কতক্ষণ আমি অজ্ঞানভাবে পড়িয়াছিলাম, বলিতে পারি না ; যখন চক্ষু মেলিবার শক্তি হইল, তখন চাহিয়া দেখিলাম, সেই কক্ষটি মশালের আলোকে আলোকিত হইয়াছে, এবং রা-তাই আমার পাশে বসিয়া অনিমিষ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। তাহার পশ্চাতে কিছু দূরে কয়েকজন আরবকে দণ্ডায়মান দেখিলাম, তন্মধ্যে পূর্ববর্ণিত জোয়ান আরবটিও ছিল।

আমাকে সংজ্ঞা লাভ করিতে দেখিয়া রা-তাই বলিল, 'বোধহয় এতক্ষণে তুমি সুস্থ হইয়াছ। আমি তোমার সাহায্যার্থে উপস্থিত হইয়াছি, আর তোমার কোন ভয় নাই ; কিন্তু সাবধান, কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া ভবিষ্যতে আর কখনও এরূপ কুকর্ম করিও না। তুমি আমার অনুসরণ করিয়াছিলে, তাহা জানিতাম বলিয়াই এই বিপদ হইতে তোমাকে উদ্ধার করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। আমি এখানে ঠিক সময় না আসিলে তোমার প্রাণরক্ষা কঠিন হইত। আমার অনুগ্রহেই তোমার প্রাণরক্ষা হইল, সুতরাং তুমি এখন আমার সম্পত্তি ; এখন হইতে তোমাকে ক্রীতদাসের ন্যায় আমার সকল আদেশ পালন করিতে হইবে, তোমার ইচ্ছার আর কিছুমাত্র স্বাধীনতা থাকিবে না ; এখন আমার অনুসরণ কর।'

রা-তাই উঠিয়া মশালধারী অনুচরবর্গকে ইঙ্গিত করিবামাত্র তাহারা দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। অদূরে সেই কক্ষের দ্বার

দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। অন্ধকারে এত ঘুরিয়াও কেন যে দ্বারের সন্ধান পাই নাই, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমার সন্দেহ হইল, আমি যে কক্ষে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম ইহা সে কক্ষ নহে, আমার অজ্ঞান অবস্থায় রা-তাই হয়ত আমাকে তুলিয়া কক্ষান্তরে লইয়া আসিয়াছে। যাহা হউক, রা-তাইয়ের সঙ্গে অল্প-ক্ষণের মধ্যেই সেই কক্ষের বাহিরে আসিতে সমর্থ হইলাম। মশালের আলোকে বুঝিতে পারিলাম, রা-তাইয়ের অনুসরণে সোজা পথে না গিয়া অন্য একটি পথে আর এক দিকে গিয়া পড়িয়াছিলাম।

পিরামিডের গহ্বর হইতে বাহির হইয়া আমার দেহে যেন নব প্রাণের সঞ্চার হইল; মুক্ত বায়ু-প্রবাহ আমার পরম তৃপ্তিকর বোধ হইল। কিন্তু সেদিন যদি সেই অন্ধকার গুহায় অজ্ঞান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতাম, তাহাও আমার এই ভারবহ অভিশপ্ত ঘৃণিত জীবন অপেক্ষা লক্ষগুণ অধিক প্রার্থনীয় ছিল : কেন, সে কথা ক্রমে বুঝিতে পারিবে।

পিরামিড হইতে নামিয়া তাহার পাদভূমির বালুকারাশি অতিক্রম পূর্বক চলিতে লাগিলাম, এবং স্ফিংক্স নামক একটি অদ্ভুত বিরাট প্রস্তর-মূর্তির দিকে অগ্রসর হইলাম। এই প্রস্তর-মূর্তি যেমন সুবিশাল সেইরূপ ভীষণদর্শন; এই মূর্তির মুখের গঠন অনেকটা রমণীর মুখের ন্যায়, তাহার দেহের অবশিষ্টাংশ সিংহীর দেহের মত; উচ্চ যেন একটি পর্বতের চূড়া। কত কাল হইতে যে তাহা মিশরের এই মরুভূমিতে এইভাবে অবস্থান করিতেছে তাহা কে বলিতে পারে? আমি সভয়ে ঊর্ধ্ব দৃষ্টিতে সেই বিরাট মূর্তির দিকে চাহিলাম। সেই ভীষণ দৃশ্যে আমার হৃদয় আতঙ্কে পূর্ণ হইল। এমন অন্ধকার রাত্রে এরূপ লোকের সঙ্গে এই স্থানে বোধহয় আর কেহ কখনও পদার্পণ করে নাই।

মস্তকের উপর অনন্ত আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র শুভ্র প্রভা বিকীর্ণ করিতেছিল; পদতলে সুবিস্তীর্ণ বালুকারাশি, সম্মুখে এই অভ্রংলিহ বিরাট পাষাণ-মূর্তি,—যেন তাহা যুগান্তকাল হইতে পৃথিবীর শত পরিবর্তন লক্ষ করিয়া আসিতেছে। রা-তাই সেই মূর্তির পাদদেশে

দণ্ডায়মান হইয়া গম্ভীর স্বরে আমাকে বলিল, 'আজ হইতে তোমার নূতন জীবনের সহিত তোমার অতীত জীবনের কোনও সম্বন্ধ নাই ; অতীতের সকল কথা বিস্মৃত হও। তোমার জীবন ধন্য, কারণ আমার কৃপায় আজ তুমি অতীত যুগের কোন্-কোন অদ্ভুত দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিবে, প্রাচীন মিশরের অতুল সুখ সমৃদ্ধি ও বিলাসের কিছু কিছু পরিচয় পাইবে।'

সে আরব জোয়ানটির কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, সে রা-তাইয়ের ইঙ্গিতমাত্র এক লম্ফে আমার পশ্চাতে আসিয়া আমার উভয় হাত পশ্চাতের দিকে টানিয়া ধরিল ; দেবতার মন্দিরে ছাগ-শিশুকে বলি দিবার সময় খড়্গধারী কামারের ইঙ্গিতে হাড়িকাঠে আবদ্ধ ছাগের সম্মুখস্থ পদদ্বয় যেভাবে পৃষ্ঠের দিকে টানিয়া ধরা হয়, সেই ভীমকায় আরব আমার হস্তদ্বয়ও সেইভাবে আমার পিঠের দিকে টানিয়া ধরিল। তখন রা-তাই পকেট হইতে একটি গোল শিশি ও একটি গ্লাস বাহির করিয়া শিশির আরক গ্লাসে ঢালিল, এবং গ্লাসটি আমার মুখের কাছে ধরিয়া বলিল, 'সঞ্জীবনী সুধা পান কর, নূতন শক্তি লাভ করিবে।'

অন্য সময় হইলে আমি তাহার এই আদেশে কর্ণপাত করিতাম না, কিন্তু তখন আমি তাহার অবাধ্য হইতে পারিলাম না, আমার সে শক্তিও ছিল না ; তাহার আদেশে গ্লাসের সেই তরল পদার্থ এক নিশ্বাসে পান করিয়া ফেলিলাম।

এই তরল পদার্থটি সুরা বা অন্য কোন পানীয় দ্রব্য, তাহা বুঝিতে পারিলাম না ; কিন্তু তাহার আস্বাদন যেমন তীব্র সেইরূপ কটু ; তাহা গলাধঃকরণ করিবামাত্র আমার মাথা ঘুরিয়া উঠিল, চতুর্দিক শূন্য বোধ হইল, নয়ন-সমক্ষে অন্ধকার দেখিলাম। আমার অনুভব হইল, যেন প্রলয়ের ঝটিকা আরম্ভ হইয়াছে ; সেই ভীষণ ঝটিকার বন্-বন্ শব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ কারতে লাগিল। সেই সময় রা-তাই আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অস্ফুট স্বরে কি মন্ত্র উচ্চারণ কারতে লাগিল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ক্রমে আমার সর্বাঙ্গ অবসন্ন হইয়া

উঠিল। আমার পা এমন কাঁপিতে লাগিল যে দাঁড়াইয়া থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল, আমি মাতালের মত টলিতে টলিতে আমার পদপ্রান্তস্থ বালুকারাশির উপর নিপতিত হইলাম, সঙ্গে সঙ্গে আমার সংজ্ঞালোপ হইল।

সংজ্ঞালোপ হইল বটে, কিন্তু আমার মূর্চ্ছা হইল কি নিদ্রা আসিল তাহা বলিতে পারি না, জাগিয়া দেখিলাম, আমি একটি জনবহুল নগরের রাজপথে দণ্ডায়মান রহিয়াছি। তখন মধ্যাহ্নকাল, উজ্জ্বল সূর্যকিরণে চতুর্দিক আলোকিত। আমি বিস্ময়-বিহ্বল নেত্রে চতুর্দিকে চাহিতে লাগিলাম, দেখিলাম স্থানটি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত ; কিন্তু তাহা যে কোন-না-কোন রাজধানীর রাজপথ তাহা বুঝিতে পারিলাম। যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, সেইদিকেই গগনস্পর্শী সুবিশাল অট্টালিকাসমূহ বিরাজিত দেখি ; সেইসকল অট্টালিকার ভাস্করনৈপুণ্য ও কারুকার্য দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম, বর্তমান যুগে সেরূপ বৈচিত্র্যময় হর্ম্যরাজি আর কোথাও দেখি নাই, তাই ভাবিলাম, এ কোন্ যুগের কোন্ রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছি ! আমার সম্মুখবর্তী রাজপথ দিয়া নানা অদ্ভুত আকারের রথ ও যানবাহন ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল ; তাহাদের শোভা দেখিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত হইল। বোধহয় সেদিন কোন উৎসব ছিল, রথ ও বিভিন্ন প্রকার যানসমূহের অগ্রে ও পশ্চাতে ক্রীতদাসগণ নানা বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া কৌতুক-হাস্যে রাজপথ মুখরিত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দলে মহানন্দে গন্তব্যস্থানে যাত্রা করিতে লাগিল।

আমি পথপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সেই উৎসব-মুখর নগরের বিচিত্র শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলাম ; তেমন আর কখনও দেখি নাই, সেরূপ অদ্ভুত অপূর্ব দৃশ্য আমার কল্পনা করিবারও শক্তি ছিল না। রাজপথে জনস্রোত প্রতি মুহূর্তে বর্ধিত হইতে লাগিল ; আমি সেই জনতা ভেদ করিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় চলিতে লাগিলাম। কিন্তু এ কোন্ নগর, কিরূপে এখানে আসিলাম, কেন আসিয়াছি, কোথায় যাইতেছি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এ

কা উৎসব, তাহাও কোন পথিককে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না —পাছে লোকে আমাকে পাগল মনে করে।

অনেকক্ষণ পরে সেই বহুদূরব্যাপী জনতা ঠেলিয়া একজন লোক একটি গলির ভিতর হইতে আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল; লোকটি খর্বাকার, একটি উত্তরীয় দ্বারা তাহার বদন-মণ্ডল আবৃত; অনুমানে বোধ হইল, সে লজ্জায় মুখ ঢাকিয়াছে, যেন নগরবাসীগণকে মুখ দেখাইতেও তাহার সাহস হইতেছে না। আমি তাহার ভাব দেখিয়া সবিস্ময়ে পার্শ্ববর্তী একজন পথিককে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ লোকটি কে? এভাবে মুখ ঢাকিয়া যাইতেছে কেন?'

পথিক মুহূর্তকাল সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, 'দেখিতেছি তুমি বিদেশী; তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? আজিকার এই মহোৎসবের কারণ জান না, ইহা বড়ই বিস্ময়ের কথা!—ঐ যে লোকটি মুখ ঢাকিয়া যাইতেছেন, উঁহাকে এ রাজ্যের কে না চেনে? উঁহার নাম রা-মীস। উনি এখানকার রাজ-পুরোহিত, ও সর্বপ্রধান কুহকী। কিছুদিন পূর্বে মোজেস নামক একজন ঐন্দ্রজালিক আমাদের দেশের বর্তমান রাজা ফারোর নিকট দৈববাণী করে, অল্প দিনের মধ্যেই মহামারী উপস্থিত হইয়া নগরবাসীগণের সর্বজ্যেষ্ঠ সন্তানগুলিকে যমালয় পাঠাইবে, এমনকি, যুবরাজেরও প্রাণরক্ষা হইবে না। কিন্তু কুহক-বিদ্যায় সুনিপুণ রাজপুরোহিত রা-মীস রাজাকে অভয় দান করিয়া বলিলেন, কুহক বিদ্যা বলে তিনি মহা-মারীর আক্রমণ হইতে রাজ্য রক্ষা করিবেন। রাজা কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন বটে, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বুঝিতে পারা গেল, রাজ-পুরোহিতের সেই অভয়বাণী মিথ্যা; ভয়ঙ্কর মহামারীতে রাজ্যের প্রত্যেক প্রজার জ্যেষ্ঠ পুত্র অকালে প্রাণত্যাগ করিল, এমনকি, জ্যেষ্ঠ রাজকুমারও রক্ষা পাইলেন না। ঘরে ঘরে ক্রন্দনের রোল উঠিল, শোকার্তের হাহাকারে নগর পূর্ণ হইল; রাজা পুরোহিতের অক্ষমতা দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে নির্বাসনেয় আদেশ প্রচার কয়িয়াছেন। আজ রাজ-পুরোহিতের নির্বাসনের দিন, নগরবাসীগণ

মহাসমারোহে এই অকর্মণ্য বাক্‌সর্বস্ব দাম্ভিক ঐন্দ্রজালিকের নির্বাসন দেখিতে আসিয়াছে। ঐ দেখ, রাজ-পুরোহিত রা-মীস ক্ষোভে লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া উত্তরীয় দ্বারা বদন আচ্ছাদিত করিয়া নগর ত্যাগ করিতেছেন।'

রা-মীস সহসা অবগুণ্ঠন বস্ত্র অপসারিত করিয়া ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে একবার আমার মুখের দিকে চাহিল; দেখিলাম সেই মুখ আমার অপরিচিত নহে, রা-তাইয়ের মুখের সহিত তাহার মুখের বিন্দুমাত্র পার্থক্য নাই। আমি স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান রহিলাম; বুঝিলাম, রা-তাই এই ঐন্দ্রজালিক রা-মীসের বংশধর নহে, সে-ই স্বয়ং রা-মীস; এই তিন সহস্র বৎসর পরেও সে মনুষ্য-দেহে পৃথিবীতে বর্তমান!—ইহা স্বপ্ন না সত্য?

একাদশ পরিচ্ছেদ

আমার চেতনা-সঞ্চার হইলে দেখিলাম, কায়রো নগরের হোটেলে আমার শয্যায় শায়িত আছি; তখন অনেক বেলা, প্রখর সূর্যালোক বাতায়ন-পথে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে। প্রথমে মনে হইল, পূর্ব রাত্রে সমস্ত ঘটনা একটা উদ্ভট স্বপ্নমাত্র। কিন্তু পিরামিডের প্রাচীরে ক্রমাগত হাত ঘসিয়া আমার করতলে যে দাগ হইয়াছিল, তাহা তখন পর্যন্ত বর্তমান; সুতরাং আমার নৈশ অভিযানকে স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিলাম না। রাত্রের সমস্ত ব্যাপার আমার মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষবৎ পরিস্ফুট হইল, সঙ্গে সঙ্গে রা-তাইয়ের প্রতি আমার অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস শতগুণ বর্ধিত হইল; তাহাকে নরমূর্তিতে পিশাচ বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

তখন বেলা কত জানিবার জন্য ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম, দশটা বাজিয়া গিয়াছে। জীবনে কখনও এত বেলা পর্যন্ত ঘুমাই নাই; কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে এত বিলম্ব হইবার কারণ কি, বুঝিতে পারিলাম না।

বিস্মিতভাবে তাড়াতাড়ি শয্যা হইতে উঠিতে গিয়া দেখি, উঠিবার শক্তি নাই। শরীর এরূপ দুর্বল ও অবসন্ন হইল কেন? হঠাৎ মনে পড়িল, পূর্ব রাত্রে রা-তাই আমাকে যে উগ্র তরল পদার্থ পান করাইয়াছিল, তাহাতেই বোধহয় শরীর এরূপ অবসন্ন হইয়াছে ও এখন পর্যন্ত মাথা ঘুরিতেছে। আমি অতি কষ্টে উঠিয়া বসিলাম। হঠাৎ বাম বাহুমূল দারুণ বেদনায় টন-টন করিয়া উঠিল, মনে হইল যেন বাহুমূলে একটি স্ফোটক হইয়াছে। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য কোটের আস্তিনের ভিতর হইতে হাতখানি বাহির করিলাম; সবিস্ময়ে দেখিলাম, আমার বাহুমূলে একটি ক্ষুদ্র ক্ষত-চিহ্ন রহিয়াছে, বাহুমূলে নূতন টীকা দিলে যেরূপ চিহ্ন হয়, ঠিক সেইরূপ চিহ্ন; তাহার চারিপাশে তখন পর্যন্ত রক্ত জমিয়া লাল হইয়া ছিল। বাহুমূলে কিরূপে ক্ষত হইল, কোনক্রমে তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। কোটের স্থূল আস্তিন ভেদ করিয়া সেখানে কাঁটা ফুটিবারও বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না, তবে আমার অজ্ঞাতসারে কিরূপে সেখানে ক্ষত হইল?

যাহা হউক, আমি স্খলিত পদে স্নানের ঘরে প্রবেশ করিয়া উত্তমরূপে স্নান করিলাম; স্নানের পর মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হইল।

স্নান-শেষে বাহিরে আসিয়া রেবেকার সহিত সাক্ষাতের চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলাম না; দেখিলাম, রা-তাই বারান্দায় বসিয়া গুনগুন করিয়া গান করিতেছে। তাহাকে বড়ই প্রফুল্ল দেখিলাম, তাহার এরূপ প্রফুল্লতা পূর্বে কোনদিন দেখি নাই। সে আমাকে দেখিয়াই গুঞ্জন বন্ধ করিল, এবং আমাকে তাহার পাশে বসিবার জন্য ইঙ্গিত করিল; ইচ্ছা না থাকিলেও আমি তাহার পার্শ্বস্থ চেয়ারে উপবেশন কারলাম।

রা-তাই মুরুব্বিয়ানা করিয়া বলিল, 'কাল রাত্রে তুমি ছোকরা বড়ই বাঁচিয়া গিয়াছ; লম্বা পরমায়ু না পাইলে এমন বিপদে পড়িয়া প্রায় কেহই বাঁচে না। আজ কোনও রকম অসুখ বুঝিতে পারিতেছ না তো?'

আমি বলিলাম, 'অসুখের মধ্যে, মাথাটা বড়ই ঘুরিতেছে, আর শরীর অত্যন্ত দুর্বল ; মনে হইতেছে যেন বিছানায় পড়িয়া ছয় মাস হইতে ভুগিতেছি। কাল কি যে দুর্বুদ্ধি হইয়াছিল, তাই কৌতূহলের বশে পিরামিডে আপনার অনুসরণ করিয়াছিলাম। মনে পড়িতেছে পিরামিডের অন্ধকার গহ্বরে প্রবেশ করিয়া আমি পথ হারাইয়াছিলাম ; পথের সন্ধানে ঘুরিতে ঘুরিতে অতিশ্রমে অজ্ঞান হইয়া পড়িলে আপনি সেখানে উপস্থিত হইয়া আমার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিয়াছিলেন। তাহার পর আমি উঠিয়া আপনার সঙ্গে পিরামিড ত্যাগ করি ; পরে কি হইয়াছিল তাহা ঠিক স্মরণ নাই, কেবল স্বপ্নের মত কতকগুলা অদ্ভুত ঘটনার কথা মনে পড়িতেছে।'

রা-তাই বলিল, 'ভাগ্যে আমি পিরামিডের মধ্যেই ছিলাম, তাই তোমার আর্তনাদ শুনিতে পাইয়াছিলাম : ব্যাপার কি বুঝিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি তোমার নিকটে গিয়া দেখি, তুমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছ। তোমাকে অচেতন দেখিয়া আমার অনুচরবর্গের সাহায্যে অতি কষ্টে তোমাকে হোটেলে লইয়া আসি, এখানে সমস্ত রাত্রি তুমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া ছিলে।'

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, 'আপনি বলেন কী ? পিরামিড হইতে বাহির হইয়া আমি পদব্রজে আপনার সঙ্গে বালুকারাশির উপর দিয়া স্ফিংক্সের নিকট গিয়াছিলাম, সেখানে আপনি বলপূর্বক আমাকে একগ্লাস কি একটা উৎকট আরোক পান করাইয়াছিলেন. এ কথা কি আপনি অস্বীকার করেন ? আমার তখন বিলক্ষণ জ্ঞান ছিল। তবে, তাহার পরের ঘটনা ঠিক মনে নাই বটে।'

আমার কথা শুনিয়া রা-তাই স্তম্ভিতভাবে আমার মুখের দিকে চাহিল,—যেন আমার কথা সে বুঝিতে পারিল না ; তাহার পর বলিল, 'তোমাকে আবার কখন কি পান করাইলাম ? স্বপ্ন দেখিয়াছ নাকি ? পিরামিডের মধ্যে অত্যন্ত গরম, সেখানে দীর্ঘকাল থাকিয়া তোমার মাথা গরম হইয়া উঠিয়াছিল, তাই বোধহয় নিদ্রাঘোরে তুমি এমন অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছ ! পিরামিডের মধ্যে তুমি সম্পূর্ণ চলৎশক্তি-

হীন হইয়া পড়িয়া ছিলে, সে অবস্থায় তুমি পদব্রজে সেখান হইতে নামিয়া আসিতে পারিয়াছিলে, ইহা কি সম্ভব ?'

রা-তাইয়ের কথা শুনিয়াও আমার মনের ধাঁধা কাটিল না। তাহার যেরূপ প্রকৃতি, তাহাতে আবশ্যক হইলে সে যে মিথ্যা কথা বলিবে না, ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। তাহার প্রদত্ত সেই সুতীব্র আরোক পানের পর আমার নয়ন-সমক্ষে যে অদ্ভুত দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল, তাহা স্বপ্নের ন্যায় অপ্রকৃত বলিয়া মনে করিতে পারিলাম না। সেই রাজপথ, তাহার উভয়পার্শ্বে সুসজ্জিত সমুন্নত সৌধশ্রেণী, নানা অদ্ভুত পরিচ্ছদ-পরিহিত সহস্র সহস্র নাগরিকের জনতা, রাজ-দণ্ডে নির্বাসিত রাজ-পুরোহিত রা-মীসের বস্ত্রাবৃত বদনমণ্ডল, রা-তাইয়ের মুখের সহিত তাহার মুখের অদ্ভুত সাদৃশ্য,—সকল কথা একে একে আমার মনে পড়িয়া গেল ; ইহা কি অলীক স্বপ্নমাত্র ?

রা-তাই আমাকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া বলিল, 'তুমি ভাবিতেছ কি ? তুমি যে আজ সুস্থ হইয়াছ ইহা বড় আনন্দের কথা ; আমি আর এখানে বিলম্ব করিতে পারিব না, আজ অপরাহ্নেই লক্সরে যাত্রা করিব। আমার ইচ্ছা তোমাকেও সঙ্গে লই, সেখানে প্রাচীন যুগের অনেক অদ্ভুত স্মৃতিচিহ্ন দেখিতে পাইবে।'

লক্সর প্রাচীন মিশরের অন্যতম প্রধান নগর ; প্রাচীন যুগের অনেক কীর্তির ধ্বংসাবশেষ এখনও সেখানে বর্তমান। আমাদের দেশের দণ্ডকারণ্য, দ্বারকা, বারাণসী, মিথিলা, কামরূপ প্রভৃতি স্থান যেমন পৌরাণিক যুগের বহু কীর্তিসম্ভারে পূর্ণ, মিশরের লক্সরও সেই-রূপ ; তাহা মিশরের প্রাচীন গৌরবের সমাধিক্ষেত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ; যুগ-যুগ কাল ধরিয়া অসংখ্য যশস্বী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মৃতদেহ (মমি) সেখানে সংরক্ষিত আছে ; রা-মীসের মমিও পূর্বে সেই স্থানে ছিল। রা-তাইয়ের কথা শুনিয়া বুঝিলাম, সে সেই মমি সেখানে রাখিতে যাইবে। কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'রেবেকা কোথায় ? তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না কেন ?'

রা-তাই বলিল, 'সে তাহার কুঠুরিতে বোধহয় জিনিসপত্র গুছাইতেছে, তাহাকেও সঙ্গে লইব।'

রেবেকার সঙ্গে আমি নরকে যাইতেও প্রস্তুত, সুতরাং রা-তাইয়ের প্রস্তাবে আপত্তি করিলাম না ; আমিও আমার জিনিস-পত্রগুলি গুছাইয়া লইবার জন্য আমার কুঠুরিতে প্রবেশ করিলাম।

বেলা দুইটার সময় একখানি ঘোড়ার গাড়ী আসিল, রেবেকা ও রা-তাইয়ের সহিত আমি সেই গাড়ীতে উঠিলাম। পূর্ববর্ণিত জোয়ান আরবটা কোচবাক্সে কোচম্যানের পাশে বসিয়া চলিল। সেই গাড়ীতে নদীতীরে আসিয়া দেখিলাম, একখানি ষ্টীমার নদীতে নঙর করিয়া আছে। আমরা সেই ষ্টীমারে আরোহণ করিলাম।

অবিলম্বে ষ্টীমার নদীর স্রোতের প্রতিকূলে চলিতে আরম্ভ করিল ; আমি চিন্তাকুল চিত্তে ডেকের উপর পাদচারণ করিতে লাগিলাম ; রা-তাই জাহাজে উঠিয়াই তাহার কেবিনে প্রবেশ করিয়াছিল। সুপ্রশস্ত নীল নদের সুনীল বারিরাশি ভেদ করিয়া জাহাজ দ্রুতবেগে অগ্রসর হইল। তখন জুন মাসের আরম্ভমাত্র, নীল নদে বর্ষাগমের চিহ্ন পরিস্ফুট দেখিলাম। সেই সুপ্রশস্ত নদের সুবিস্তীর্ণ জলরাশির দিকে চাহিয়া কত কথাই ভাবিতে লাগিলাম।

আমার মনে কিছুমাত্র শান্তি ছিল না, তথাপি সেই অপরাহ্ণকালে জাহাজের ডেকে দণ্ডায়মান হইয়া যে সুমোহন প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিলাম তাহা হইতে দৃষ্টি ফিরাইতে পারিলাম না। দেখিলাম, নদীতীরে সুদীর্ঘ তাল বৃক্ষশ্রেণী সরলভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহাদের শ্যামল পত্রসমূহে অস্তমান তপনের রক্তিম রশ্মি নিপতিত হইয়াছে, নানা জাতীয় বিহঙ্গম বৃক্ষশিরে বসিয়া মনের আনন্দে কূজন করিতেছে, কখনও বা ঝাঁক বাঁধিয়া চঞ্চল পক্ষে সুনীল আকাশের দিকে উড়িয়া যাইতেছে, আবার ফিরিয়া আসিয়া গাছে বসিতেছে ; দূরে দূরে ধূসর-বর্ণ খর্জুর ও নারিকেল কুঞ্জ, তাহার প্রান্তভাগে আরবগণের বিক্ষিপ্ত পল্লী ; আরও দূরে লিবিয়ন গিরিমালার অস্পষ্ট ধূসর শৃঙ্গশ্রেণী। আমি অন্যমনস্কভাবে এই অনুপম দৃশ্য-বৈচিত্র্য নিরীক্ষণ করিতেছি,

এমন সময় রা-তাই সেখানে উপস্থিত হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মিঃ সেন, আজ তোমাকে এত অন্যমনস্ক দেখিতেছি কেন? তুমি বসিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছ?'

আমি বলিলাম, 'আপনি সে কথা শুনিয়া কি করিবেন? গত রাত্রে যে সকল অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়াছে, তাহাই ভাবিয়া আমি বিচলিত হইয়াছি, আমি কোনওমতে তাহার রহস্য ভেদ করিতে পারিতেছি না।'

রা-তাই বলিল, 'গত রাত্রে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা সকলই তো তোমাকে বলিয়াছি; তুমি কি মনে কর আমি মিথ্যা কথা বলিয়াছি?'

আমি বলিলাম, 'আমার বিশ্বাস আপনি অনেক কথা গোপন করিয়াছেন; আপনার ইঙ্গিতে আপনার জোয়ান আরব অনুচরটা আম্যর উভয় হস্ত পশ্চাতে টানিয়া ধরিলে, আপনি এক গ্লাস কটু আরোক আমাকে পান কারতে দিয়াছিলেন, এ কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে; তথাপি আপনি বলিতেছেন, তাহা স্বপ্ন ভিন্ন আর কিছুই নহে!'

রা-তাই বলিল, 'আমার কথা তুমি বিশ্বাস না করিলে আর আমি কি করিব? যাহা হউক, তুমি আর কি দেখিয়াছ তাহা জানিতে আমার কৌতূহল হইতেছে; যদি সকল কথা তোমার স্মরণ থাকে তবে তাহা বলিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ কর।'

আমি যাহা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম তাহা সকলই রা-তাইকে বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া রা-তাই বলিল, 'তুমি রলিতেছ রা-মীস তাঁহার অবগুণ্ঠন অবসারিত করিয়া একবার তোমার মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন; তাঁহার মুখখানি কিরূপ? তাঁহার মুখের সহিত আর কাহারও মুখের সাদৃশ্য আছে কি?'

আমি বলিলাম, 'হাঁ আছে, সেই রাজ-পুরোহিতের মুখখামি ঠিক আপনার মুখের মত; আমি যে মুহূর্তে রা-মীসের মুখ দেখিয়াছিলাম. সেই মুহূর্তেই আমার বিশ্বাস হইয়াছিল, রা-মীস ও আপনি অভিন্ন ব্যক্তি। তিন সহস্র বৎসর পূর্বে যাহার মৃত্যু হইয়াছে, এতদিন পরে

সে অভিন্ন মূর্তিতে কিরূপে পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছে তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। রা-মীসকে দেখিয়া রাজপথে সমাগত জনসাধারণ ঘৃণা ও ক্রোধে অধীর হইয়া যেভাবে তাহাকে ধিক্কার দিতেছিল, তাহা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমার স্মরণ থাকিবে।'

আমার এই কথা শুনিবামাত্র রা-তাইয়ের সংযত শান্ত ভাব সহসা অন্তর্হিত হইল। সে সক্রোধে বলিয়া উঠিল, 'হতভাগ্য ক্রীতদাসদের স্বভাবই এইরূপ ; যত দিন পর্যন্ত রা-মীস রাজার ভক্তি-শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত এইসকল নরাধম তাঁহাকে দেবতার ন্যায় পূজা করিয়াছিল, তাঁহার প্রসন্নতা কামনা করিয়াছিল, কিন্তু রাজা রা-মীসের নির্বাসন দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিলে তাঁহার কয়েকজন ভক্ত বন্ধু ভিন্ন রাজ্যের সমস্ত লোক তাঁহার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছিল ; কি কৃতঘ্নতা, কি স্পর্ধা!'

রা-তাইয়ের এই আকস্মিক উত্তেজনায় আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। কিন্তু সে সহসা আত্মসংবরণ করিয়া নিম্ন স্বরে বলিল, 'তোমার কথা শুনিয়া আমি কিঞ্চিৎ বিচলিত হইয়াছিলাম। আমার পূর্বপুরুষের প্রতি যাহারা অবিচার করিয়াছিল, তাঁহার নির্বাসনে যাহারা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিল তাহারা আমার ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র ; যাহা হউক, আমার পূর্বপুরুষের মুখের সহিত আমার মুখের সাদৃশ্য দেখিয়া তোমার বিচলিত হইবার কারণ নাই, অনেক সময় একই বংশের দুইজন লোকের মুখের যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ আমি যে রা-মীস নহি, তাহার প্রমাণ, রা-মীসের মমি এই জাহাজেই বর্তমান আছে ; সুতরাং এই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত হইতেই তুমি বুঝিতে পারিতেছ, অসম্ভব ব্যাপার স্বপ্নে সম্ভব বোধ হয়। কিন্তু অসম্ভব হইলেও তোমার এই স্বপ্ন-বৃত্তান্তটি উপেক্ষার যোগ্য নহে ; আমার অনুরোধ তুমি স্বপ্নে যাহা যাহা দেখিয়াছ,—সেই সূর্যকরোদ্ভাসিত প্রশস্ত রাজপথ, সুবৃহৎ ও সমুচ্চ হর্ম্যরাজি, রাজপথের বিশাল জনতা, শ্রেণীবদ্ধ যানবাহন ও নগরবাসীগণের বিচিত্র পরিচ্ছদ, তাহাদের উৎফুল্ল মুখ, তন্মধ্যে আমার সেই পূর্বপুরুষ—ক্ষুব্ধ, লজ্জিত

ও অপমানিত রা-মীসের মলিন বদন—একখানি চিত্রপটে অঙ্কিত কর। তোমার কল্পনা যেরূপ প্রখর, তাহাতে অনুমান হয় তুমি চেষ্টা করিলে চিত্রখানি সর্বাঙ্গসুন্দর হইবে।'

রা-তাইয়ের কথা শুনিয়া আমার মনে বড় উৎসাহ হইল ; আমি বলিলাম, 'আপনার অনুরোধে আমি এইরূপ একখানি চিত্র অঙ্কিত করিব ; তাহা দেখিলেই আপনি বুঝিতে পারিবেন, চিত্রের বিষয়টি আমি সত্যই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম।'

রা-তাই বলিল, 'চিত্রপটে যে সকল চিত্র অঙ্কিত হয়, তাহা সকলই যে প্রত্যক্ষভূত বিষয়, এ কথা কোন চিত্রকর বলিতে পারেন না ; উজ্জ্বল কল্পনা ও ভাবপ্রবণতাই চিত্রের প্রধান উপকরণ।'

আমি এ সম্বন্ধে রা-তাইয়ের সহিত আর তর্ক-বিতর্ক না করিয়া গাত্রোত্থান করিলাম।

আমি উঠিয়া কেবিনের দিকে অগ্রসর হইব, এমন সময় রেবেকা একটি কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ; তাঁহাকে দেখিয়া আমি আবার বসিলাম, তিনিও বসিলেন। রা-তাই রেবেকাকে বলিল, 'মিঃ সেন বলিতেছেন, কাল রাত্রে তিনি একটা বড় অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছেন; লোকে তপস্যা করিয়াও এমন স্বপ্ন দেখিতে পায় না। প্রাচীন মিশরের একটি উৎসব-দৃশ্য এই স্বপ্নের বিষয়। আমি তাঁহাকে এই বিষয়াবলম্বনে চিত্র অঙ্কিত করিতে অনুরোধ করিয়াছি।'

রেবেকা আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের চিত্র নিখুঁতভাবে অঙ্কিত করা কি সম্ভব ? আমার বিশ্বাস নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্নের সকল কথা ঠিক মনে পড়ে না।'

আমি বলিলাম, 'কিন্তু আমি যাহা দেখিয়াছি তাহাকে স্বপ্ন বলিতে পারি না ; যদি চিত্রখানি সম্পূর্ণ করিতে পারি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, আমার এ কথা মিথ্যা নহে। কোনও বিষয়ের চিত্র আঁকিতে হইলে সেই বিষয়ের ইতিহাস ভালরকম জানা আবশ্যক, তাহাতে চিত্র নিখুঁত করিবার সুবিধা হয় ; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে

রা-মীসের জীবনের ইতিহাস সম্বন্ধে আমি কোনও কথা অবগত নহি ; সে সকল কথা মিঃ রা-তাইয়ের জানা থাকিতে পারে।'

আমার কথা শুনিয়া রা-তাই একবার বক্র দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর আমাকে বলিল, 'রা-মীস আমার পূর্বপুরুষ, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে আমি যে সকল কথা জানি, অন্যের তাহা জানিবার সম্ভাবনা অল্প। আমি তোমাকে তাঁহার জীবনের বিচিত্র ইতিহাস বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমার এই পূর্ব-পুরুষ "রা" দেবের অনুগৃহীত ছিলেন বলিয়াই তাঁহার নাম রা-মীস ; তিনি আমন দেবের মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ইম্‌হোটেপের পুত্র। রা-মীস দেবতার অনুগ্রহে বাল্যকালেই দৈব শক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। অল্প বয়সেই তিনি কুহক-বিদ্যার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন, কুহক-বিদ্যায় তাঁহার অনুরাগ দেখিয়া তাঁহার পিতা ইম্‌হোটেপ প্রাচীন মিশরের সর্বশ্রেষ্ঠ জাদুকরের হস্তে তাঁহার শিক্ষার ভার অর্পণ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই রা-মীস কুহক বিদ্যায় এমন ব্যুৎপন্ন হইলেন যে, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কুহকীগণকেও তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। ক্রমে তাঁহার খ্যাতি চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল ; মিশরের রাজা ফারো তাঁহার খ্যাতির পরিচয় পাইয়া প্রথমে তাঁহাকে সভাসদের পদে নিযুক্ত করিল ; রা-মীস ক্ষমতাবলে ক্রমে রাজার কুল-পুরোহিত পদ লাভ করিলেন, এবং নানাবিধ দৈব বিপদ হইতে রাজ্য রক্ষা করিয়া তিনি বহু দিন মহা গৌরবে কালযাপন করিলেন। তাঁহার পরামর্শ ভিন্ন রাজা কিছুই করিত না ; তিনিই রাজ্যের সর্বপ্রধান ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন।

'কিছুদিন পরে মিডিয়ার আকাশে একটি সুবৃহৎ ধূমকেতুর উদয় হইল, এই ধূমকেতুর অভ্যুদয়ই রা-মীসের অধঃপতনের কারণ। ইস্রায়েল-বংশীয় মোজেস মিশরে উপস্থিত হইয়া মিশরপতির বিরুদ্ধে এমন ভয়ঙ্কর কুহকের অনুষ্ঠান করিল যে, তাহার মস্তকে রাজমুকুট কম্পিত হইতে লাগিল, তাহার হস্ত হইতে রাজদণ্ড স্খলিত হইবার উপক্রম হইল। ইস্রায়েল-বংশীয় সেই কুহকীর ন্যায় কুহক-বিদ্যা-

'বিশারদ পৃথিবীতে তখন দ্বিতীয় কেহ ছিল না ; কুহকী রা-মীস তখন ইন্দ্রজাল বিদ্যায় মিশরে অদ্বিতীয়, সুতরাং রাজা ব্যাকুল চিত্তে তাঁহার শরণ লইল। রা-মীস জানিতেন, কুহক বিদ্যায় সেই হিব্রুর সমকক্ষ ব্যক্তি ভূমণ্ডলে আর কেহই নাই, সুতরাং নিরাপদ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি সেই বিদেশী কুহকীকে রাজ্য-সীমা হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য রাজাকে অনুরোধ করিলেন।

'রাজা রা-মীসের কথা শুনিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "কুহক বিদ্যায় তুমি মহা পণ্ডিত, তুমি এই বিদেশী জাদুকরকে বিদ্যাবলে পরাস্ত কারবার চেষ্টা না করিয়া স্বয়ং পরাজয়ের আশঙ্কায় তাহাকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিবার পরামর্শ দিতেছ! তোমার বিদ্যায় ধিক, পুনর্বার এরূপ অন্যায় কথা বলিলে আমি তোমার অপরাধ মার্জনা করিব না।"

'কয়েকদিন পরে হিব্রুরা রাজসভায় উপস্থিত হইয়া কুহক-বলে রাজাকে অভিভূত করিল, রাজার নিকট একটি প্রস্তাব করিয়া জানাইল. রাজা তাহাদের প্রস্তাবানুসারে কার্য না করিলে মিশরের সর্বনাশ হইবে। রাজা সে প্রস্তাবে কর্ণপাত করিল না; তখন মোজেসের কুহক-বিদ্যাবলে নদীর মাছ মরিয়া জলে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল, নীল নদের জল পানের অযোগ্য হইল ; প্রজাবর্গ পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠে হাহাকার করিতে লাগিল। কয়েক দিন পর্যন্ত এমন নিবিড় কুজ্ঝটিকায় দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া রহিল যে, সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ হইয়া গেল।—তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া রাজা পুনর্বার রা-মীসকে আহ্বান করিল ; রা-মিসের কুহক বলে মুহূর্তমধ্যে কুয়াসা কাটিয়া গেল, নীল নদের জল পুনর্বার সুপেয় হইল, জলের মাছ প্রাণ পাইয়া আবার জলে প্রবেশ করিল, রাজা প্রজা সকলেই রা-মীসের জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

'কুহক ব্যর্থ হইল দেখিয়া মোজেস অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মিশরে নানা নূতন রোগের সৃষ্টি করিল ; একদিন এমন ঝড় উঠাইল যে, অনেক ঘর বাড়ি পড়িয়া গেল ; বিবিধ পণ্যদ্রব্য ও আরোহীপূর্ণ

সহস্র নৌকা নীল নদে ডুবিয়া গেল ; এইরূপে ধনপ্রাণ নষ্ট হওয়ায় জনপদবাসীগণ শোকদুঃখে হাহাকার করিতে লাগিল ; কিন্তু তখনও নিস্তার নাই, একদিন সহসা আকাশে গাঢ় মেঘের সঞ্চার হইয়া নিবিড় অন্ধকারে জগৎ আচ্ছন্ন হইল; তাহার পর দিবারাত্রি মুষল-ধারে বৃষ্টিবর্ষণ হইতে লাগিল, রাজপথ দিয়া নদীর স্রোতের মত জলের স্রোত বহিতে লাগিল।

'রাজা আবার রা-মীসকে ডাকিল ; রা-মীস মুহূর্তমধ্যে সেইসকল অসুবিধা দূর করিলেন। এবার মোজেস অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া অভিসম্পাত প্রদান করিল, মিশর রাজ্যের প্রত্যেক ব্যক্তির জ্যেষ্ঠ পুত্র কোন অজ্ঞাত রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিবে, এমনকি, যুবরাজও মৃত্যুকবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে না।

'রাজা রা-মীসকে ডাকিয়া এই অভিসম্পাত নিবারণের উপায় জিজ্ঞাসা করিল। রা-মীস শান্তি, স্বস্ত্যয়ন ও দৈবকার্য দ্বারা রাজ্য নিরাপদ করিতে চাহিলেন। যথানিয়মে দৈবকার্য আরম্ভ হইল।

'কিন্তু এবার রা-মীসের চেষ্টা সফল হইল না, একমাস যাইতে না যাইতে মোজেসের অভিসম্পাত ফলিতে আরম্ভ করিল। কি এক অজ্ঞাত রোগে রাজ্যের প্রত্যেক ব্যক্তির জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রাণবিয়োগ হইল ; অবশেষে সেই রোগে যুবরাজও প্রাণত্যাগ করিল। খ্রীস্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলেও প্রাচীন মিশরের এই শোচনীয় বিপদ-কাহিনী লিখিত আছে। প্রত্যেক গৃহ হইতে বিলাপধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল, পতিপুত্রহীনা শোকাতুরা রমণীর আর্তনাদে সোনার মিশর শ্মশানের আকার ধারণ করিল। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া রা-মীসের প্রতি চির-নির্বাসন দণ্ডের ব্যবস্থা করিল ; ক্ষোভে, দুঃখে, লজ্জায় ম্রিয়মান রা-মীস অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া কয়েক জন প্রিয় বন্ধুর সহিত বহুদূরবর্তী নির্জন গিরিগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই নিদারুণ অপমানে মনোবেদনায় সেই স্থানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় তিন সহস্র বৎসর পর একজন ইংরাজ তাঁহার

সমাধি উৎখাত করিয়া তাঁহার মমি সংগ্রহ করিয়াছিল, পরে সেই মমি তোমার পিতার হস্তগত হয়।—ইহাই মিশরের রাজ-কুলপুরোহিত কুহক-বিদ্যাবিশারদ রা-মীসের জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।'

রা-তাই নীরব হইল ; আমি এই বিচিত্র কাহিনী শ্রবণ করিয়া চিন্তাকুল চিত্তে আমার কেবিনে প্রবেশ করিলাম।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আমি কয়েক দিন দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া চিত্রখানি অঙ্কিত করিলাম ; সপ্তম দিনে অঙ্কনকার্য শেষ হইল। এই কয়দিন আমরা ক্রমাগত জাহাজে চলিতেছিলাম।

অঙ্কন শেষ হইলে চিত্রখানি রা-তাইয়ের হস্তে প্রদান করিলাম ; সে তাহা মহা আগ্রহে দেখিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে রা-তাই মাথা তুলিয়া বলিল, 'চিত্রখানি সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে ; অসামান্য প্রতিভা ভিন্ন অত অল্প সময়ে এমন চিত্র অঙ্কিত করা যায় না। এই চিত্রে প্রাচীন অট্টালিকা, যান বাহন ও জন-সাধারণের পরিচ্ছদাদি যেরূপ সুকৌশলে ও যথাযথরূপে অঙ্কিত হইয়াছে, স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না করিলে তাহা অঙ্কিত করা অসম্ভব।'

আমি বলিলাম, 'আমি তো আপনাকে পূর্বেই বলিয়াছি আমি স্বচক্ষে এই উৎসব-দৃশ্য দেখিয়াছি, তাহা স্বপ্ন নহে ; কিন্তু আমি যে কিরূপে যুগান্ত পূর্বের এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলাম, তাহা আমার বুঝিবার শক্তি নাই। আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলে আপনি বলিয়াছিলেন, উহা স্বপ্ন মাত্র ; আবার এখন বলিতেছেন, স্বয়ং প্রত্যক্ষ না করিলে চিত্র এমন সর্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না ; আপনি নিজেই নিজের কথার প্রতিবাদ করিতেছেন।'

রা-তাই আমার এ কথার কোন উত্তর না দিয়া নিবিষ্ট-চিত্তে চিত্রখানি দেখিতে লাগিল ; ইতিমধ্যে রেবেকা সেখানে উপস্থিত

হইলে রা-তাই তাহাকে বলিল, 'মিঃ সেন এই ছবিখানি আঁকিয়াছেন, কেমন হইয়াছে দেখ।'

রেবেকা সাগ্রহে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ছবিখানি দেখিলেন, তাহার পর বলিলেন, 'ছবিখানি বড় সুন্দর হইয়াছে, কিন্তু একটা কথা বুঝিতে পারিতেছি না ; এই চিত্রে একজন লোকের মুখ ঠিক মিঃ রা-তাইয়ের মুখের মত হইল কেন ? দুইজন লোকের মুখের এমন অদ্ভুত সাদৃশ্য আমি আর কখনও দেখি নাই।'

রেবেকার এই প্রশ্নের কি উত্তর দিব বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের সম্মুখে উপবিষ্ট এই বৃদ্ধ রা-তাই যে তিন সহস্র বৎসর পূর্বে মিশর-রাজের কুলপুরোহিত ছিল, এ-কথা তাঁহাকে বলিতে পারিলাম না, আর বলিলেও তিনি সে কথা হয়ত বিশ্বাস করিতেন না। যাহা হউক আমি কোন কথা বলিবার পূর্বেই রা-তাই বলিল, 'মিঃ সেন ইচ্ছা করিয়াই এই ছবির মুখ আমার মুখের মত করিয়া আঁকিয়াছেন, আমাকে সম্মানিত করিবার জন্যই সম্ভবতঃ এরূপ করিয়া থাকিবেন। আমি ইহাতে অসন্তুষ্ট নহি। ইহা আমার স্বদেশের পৌরাণিক যুগের চিত্র, চিত্রখানি আমার বড়ই প্রীতিকর হইয়াছে।'

আমি বলিলাম, 'তাহা হইলে উহা লইতে পারেন ; আপনার অনুরোধেই উহা আঁকিয়াছি, ছবিখানি আপনাকে উপহার দিতে আমার কোন আপত্তি নাই।'

রা-তাই ছবিখানি লইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে উঠিয়া গেল ; আমি রেবেকার সহিত জাহাজের ডেকে উপস্থিত হইলাম। তখন অপরাহ্ণ কাল, নদীর উপর দিয়া সুশীতল সমীরণ প্রবাহিত হইয়া রেবেকার কুঞ্চিত অলকগুচ্ছ কম্পিত করিতে লাগিল। জাহাজ তখন মৃদুমন্দ গতিতে কোন শহরের নিকট দিয়া যাইতেছিল। এই স্থানে প্রতি বৎসর অসংখ্য মক্কা-যাত্রীর সমাগম হয় ; মক্কা-যাত্রী মুসলমানগণ এই আড্ডায় আসিয়া জাহাজে আরোহণ করেন।

রেবেকা অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেই প্রাচীন মুসলমান নগরীর বিবর্ণ ও জীর্ণ অট্টালিকাগুলির দিকে চাহিয়া রহিলেন ; কিন্তু তাঁহার মুখ

দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, তিনি কিছুই দেখিতেছেন না, অন্যমনস্কভাবে কি চিন্তা করিতেছেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'রেবেকা, আজ তোমাকে এত বিমর্ষ দেখিতেছি কেন?'

রেবেকা বলিলেন, 'প্রফুল্ল হইবার বিশেষ কোনও কারণ ঘটিয়াছে কি? আমার নিকট এ সকল দৃশ্য পুরাতন, এ অঞ্চলে আমি পূর্বেও আসিয়াছি।'

আমি বলিলাম, 'এই প্রদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য আমার বড়ই ভাল লাগিয়াছে; বিশেষতঃ রা-তাইয়ের ব্যবহারেরও অনেক পরিবর্তন দেখিতেছি, তাহার মেজাজ আর সেইরূপ খিটখিটে নাই; তুমি কি তাহার এই পরিবর্তন লক্ষ কর নাই?'

রেবেকা বলিলেন, 'করিয়াছি, এবং সেইজন্যই আমার মন অধিক চঞ্চল হইয়াছে; ঝড় আসিবার পূর্বেই প্রকৃতি স্থির হয়। আমরা যেখানে যাইতেছি পূর্বে সেখানে আরও কয়েকবার গিয়াছি, যতবার গিয়াছি ততবারই আমাদের সঙ্গীগণের কাহারও-না-কাহারও ভয়ানক বিপদ ঘটিয়াছে; এবার কাহার ভাগ্যে না-জানি কি বিপদ ঘটিবে, তাহাই ভাবিয়া বড় উৎকণ্ঠিত হইয়াছি।'

আমি বলিলাম, 'রা-তাই তাহার পূর্ব-পুরুষের মমিটি লইয়া তাহার সমাধি-স্থানে রাখিতে যাইতেছে, ইহাতে আমি কোনও বিপদের সম্ভাবনা দেখিতেছি না। আশা করি সেখান হইতে আমরা নিরাপদে কায়রো নগরে ফিরিয়া যাইতে পারিব। তাহার পর ইউরোপে প্রত্যাগমন করা বিশেষ কঠিন হইবে বলিয়া বোধ হয় না।'

রেবেকা নত মস্তকে আমাকে জিজ্ঞাসা কারলেন, 'ইউরোপে ফিরিয়া পরে কি করিবে?'

ইউরোপে প্রত্যাগমনের পর কি করিব, সে কথা কোনও দিন চিন্তা করি নাই; সম্ভবতঃ রেবেকার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া লণ্ডনে উপস্থিত হইব, এবং চিত্র-ব্যবসায়ে মনঃসংযোগ করিব; ভবিষ্যতে আর কখনও রেবেকার সহিত সাক্ষাতের আশা আছে কি

না কে বলিবে? কিন্তু তাঁহার নিকট চিরবিদায় লইব, এ কথা ভাবিতেও কষ্ট হইল; একবার মনে হইল আমি তাঁহাকে যে প্রাণের সহিত ভালবাসি, ইহা এই সুযোগে বলিয়া ফেলি; কিন্তু আমার প্রতি তাঁহার মনের ভাব কিরূপ, তাহা এত দিনেও জানিতে পারি নাই; সুতরাং প্রেমের কথা বলিতে সাহস হইল না। আমি তাঁহার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

দেখিতে দেখিতে সুলোহিত তপন সুবৃহৎ স্বর্ণচক্রের আকার ধারণ করিয়া আরবের সীমান্তে ধূসর গিরিশ্রেণীর অন্তরালে অদৃশ্য হইলেন। অস্তমান তপনের পীত রশ্মি-সম্পাতে তাল-নারিকেল-খর্জুরকুঞ্জ-সমাবৃত নদীতট মনোহর শোভা ধারণ করিল, বহু দূরে কর্নাকের সমতল প্রান্তরস্থ আমন দেবের সমুন্নত মন্দির-চূড়া আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সন্ধ্যাকালে আমরা লক্সর নগরে উপস্থিত হইলাম, জাহাজ নদীমধ্যে নঙর করিল।

জাহাজ নঙর করিবার প্রায় অর্ধঘণ্টা পরে একজন আরব একখানি ক্ষুদ্র নৌকা লইয়া জাহাজের নিকটে আসিল। তাহার সর্বাঙ্গ শুভ্র পরিচ্ছদে আবৃত; কেবল টুপিটি কৃষ্ণবর্ণ।

আগন্তুক জাহাজে উঠিয়া মহাসম্ভ্রমে রা-তাইকে অভিবাদন করিল, তাহার পর অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিল।

রা-তাই তাহাকে বলিল, 'সেলিম, তুমি ঠিক সময়ে আসিয়াছ; এখন সংবাদ কি বল।'

আগন্তুক পুনর্বার কুর্নিশ করিয়া বলিল, 'হুজুর যাহা যাহা আদেশ করিয়াছিলেন তদনুসারে সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছে, এখন হুজুরের অভিপ্রায় কি, তাহাই জানিতে আসিয়াছি।'

রা-তাই বলিল, 'তোমার মনিবকে জানাইবে, আজ রাত্রেই আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।'

আগন্তুক রা-তাইকে সেলাম করিয়া তৎক্ষণাৎ জাহাজ হইতে নামিয়া গেল; তাহার ভাব দেখিয়া বোধ হইল সে যেন ব্যাঘ্রের গুহায় প্রবেশ করিয়াছিল, পালাইতে পারিলে বাঁচে।

রা-তাই আমাকে বলিল, 'মিঃ সেন, এতদিন পরে আমরা রা-মাসের নির্বাসন-ভূমিতে উপস্থিত হইয়াছি, এই অরণ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। এই স্থান এক সময় পৃথিবীতে প্রাচীন সভ্যতার মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছিল, কিন্তু আজ তাহা শ্মশান ভিন্ন আর কিছুই নহে ; সেই আদিম সভ্যতার লালাভূমি ভগ্নস্তূপের আকার ধারণ করিয়া এখনও বর্তমান আছে, তাহাই দেখাইবার জন্য তোমাকে এত দূরে লইয়া আসিয়াছি ; আশা করি ইহা হইতে তুমি অনেক শিক্ষালাভ করিতে পারিবে। ঐ দেখ দূরে লক্সরের মন্দির, আবার ঐ দেখ, কর্নাকে আমন দেবের মন্দির-চূড়া দেখা যাইতেছে। অন্য দিকে নীল নদের পশ্চিম তীরে প্রাচীন মিশরের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের সমাধি-ক্ষেত্র বর্তমান ; সেই সকল প্রাচীন নরপতি, রণকুশল যোদ্ধা, রাজনীতিক কবি ও ঐন্দ্রজালিকগণের কথা আজ স্বপ্নের বিষয় হইয়াছে, তাঁহাদের সমাধি-শয্যা পর্যন্ত দাম্ভিক ইউরোপীয় দর্শকগণের কৌতূহল পরিতৃপ্তির উপাদানে পরিণত হইয়াছে। অনেকে তাঁহাদের সমাধি খনন করিয়া মৃতদেহের সহিত সমাহিত রত্ন-মাণিক্য, এমনকি মৃতদেহ পর্যন্ত তুলিয়া লইয়া গিয়া তাহাদের কৌতুকাগারে রাখিয়াছে! এমন বর্বরতা, এরূপ হৃদয়হীনতা ও অধর্মাচরণ কেবল বর্তমান কালেই উপেক্ষিত হইতে পারে ; কিন্তু সেই নরাধমগণকে শীঘ্রই এই দুষ্কর্মের ফলভোগ করিতে হইবে : দেবতাগণের ভীষণ প্রতিহিংসার অনল জ্বলিরা উঠিয়াছে, শীঘ্রই তাহা দাবানলে পারণত হইবে ; উদ্ধত দাম্ভিক ইউরোপীয় জাতি সেই অনলে পতঙ্গের মত পুড়িয়া মরিবে, আমার জীবন-ব্রত সফল হইবে।—তুমি আমার সঙ্গে লক্সরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে যাইবে কি?'

আমি বলিলাম, 'সেই পবিত্র স্থান দেখিবার জন্য আমার বড় আগ্রহ হইয়াছে, আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে আপনার আপত্তি না থাকিলে আমি আহ্লাদের সহিত সেখানে যাইব।'

রা-তাই বলিল, 'তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে আমার কোনও আপত্তি নাই ; আজ রাত্রি এগারটার সময় আমরা জাহাজ ত্যাগ

করিব ; আমি অন্যের অজ্ঞাতসারে আমার পূর্বপুরুষের মমি যথাস্থানে সংরক্ষিত করিব, ইহাই আমার ইচ্ছা।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আজ রাত্রেই কি আপনি এই কাজ শেষ করিবেন?'

রা-তাই বলিল, 'হাঁ আজ রাত্রেই ; কোনও কাজ আরম্ভ করিয়া তাহা শেষ করিতে বিলম্ব করা উচিত নহে, বিলম্বে অনেক বিঘ্ন ঘটে।'

রাত্রি ঠিক এগারটার সময় পূর্ববর্ণিত জোয়ান আরবটা আমার নিকট আসিল; আমি তখন রেবেকার কাছে বসিয়া গল্প করিতেছিলাম। সেই আরব ভৃত্যের মুখে শুনিলাম, আমাকে অবিলম্বে তাহার প্রভুর সহিত তীরে যাইতে হইবে। অগত্যা আমাকে উঠিতে হইল।

আমাকে রা-তাইয়ের সঙ্গে যাইতে উদ্যত দেখিয়া রেবেকা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা হইলেন, আমাকে বলিলেন, 'এত রাত্রে তুমি জাহাজ হইতে না নামিলেই ভাল করিতে ; কিন্তু যখন যাইতে সম্মত হইয়াছ, তখন বোধহয় যাইতেই হইবে; একটি পিস্তল সঙ্গে লও।'

পিস্তল আমার সঙ্গেই ছিল, রেবেকাকে তাহা দেখাইয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া ডেকে আসিলাম ; রা-তাই আমার প্রতীক্ষায় সোপানপ্রান্তে দণ্ডায়মান ছিল।

জাহাজের পাশে একখানি নৌকা ভিড়িলে আমরা সেই নৌকায় নামিলাম। নৌকাযোগে তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, আমাদের জন্য দুইটি উষ্ট্র সসজ্জ দণ্ডায়মান আছে।

আমি পূর্বে কখনও উটে চড়ি নাই, সেই রাত্রিকালে 'কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ' জানোয়ারের পিঠে উঠিয়া বসিতে বড় ভয় হইল, গড়াইয়া পড়া বিচিত্র নহে। তবে ভরসার কথা এই যে, হাওদার উপর হইতে গড়াইয়া পড়িবার তেমন সুবিধা নাই। চালকের ইঙ্গিতে একটা উট জানু পাতিয়া বসিলে, আমি তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলাম। রা-তাই অন্য উটে অবলীলাক্রমে চড়িয়া বসিল ; তাহার চড়িবার ভঙ্গী দেখিয়া বুঝিলাম, সে উটের পিঠে নূতন চড়িতেছে না।

যে রাত্রে আমি রা-তাইয়ের অনুসরণে পিরামিডে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাহা আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। অদ্য মধ্যরাত্রে রা-তাইয়ের সমভিব্যাহারে প্রাচীন থীবস্ নগরের ভগ্নাবশেষের অভিমুখে যাত্রা করিবার সময় সেই দুর্দিনের কথা আমার মনে পড়িল, ভয়ে এক-একবার আমার বুকের মধ্যে কাঁপিতে লাগিল। আমরা যতই অগ্রসর হইলাম, ততই ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত নানা আকারের ভগ্নস্তূপ সেই পরিস্ফুট চন্দ্রালোকে প্রাচীন সভ্যতার সমাধির ন্যায় আমাদের নয়ন-পথে নিপতিত হইতে লাগিল। নীল নদকে বামে রাখিয়া আধুনিক নূতন নগরের পাশ দিয়া আমরা উত্তর মুখে চলিতে লাগিলাম; পথটি বেশ প্রশস্ত, তাহা তেমন পুরাতন বলিয়াও বোধ হইল না।

এই মরু প্রদেশে দিবাভাগে অসহ্য উত্তাপ অনুভূত হইলেও রাত্রি বেশ সুশীতল; এমন শীতল যে, অল্প অল্প শীত বোধ হয়। চলিতে চলিতে উর্ধ্বে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম, পূর্ণপ্রায় শশধর নীল সরোবরে রজত কমলের ন্যায় নীল আকাশে হাসিতেছে; শশধরের এমন শুভ্র দীপ্তি আমার স্বদেশে—ভারতে ভিন্ন অন্য কোথাও দেখি নাই; ইউরোপের, বিশেষতঃ ইংলণ্ডের কুয়াসাচ্ছন্ন আকাশে চন্দ্রের এমন শোভা কখনও দেখা যায় না।

আমরা সমাধি-ক্ষেত্রে রা-মীসের মমি পুনঃস্থাপিত করিতে যাইতেছি, অথচ মমি সঙ্গে নাই। ইহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া রা-তাইকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, রা-তাই বলিল, 'পূর্বেই তাহা যথাস্থানে প্রেরিত হইয়াছে।'

দীর্ঘ পথ অতিক্রম পূর্বক উট একটি অতি উচ্চ বিরাট ভগ্ন সৌধের সম্মুখে আসিয়া চালকের ইঙ্গিতে দণ্ডায়মান হইল; অনুমানে বুঝিলাম, এই ভগ্ন প্রাসাদের উচ্চতা প্রায় দুই শত ফিট হইবে; রাত্রিকালে চন্দ্রালোকে সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে তাহা একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের মত বোধ হইতে লাগিল। শুনিলাম, এই বিরাট হর্ম্য আমন দেবের সুবিস্তীর্ণ মাঠের সদর দেউড়ি, এমন শিল্পনৈপুণ্য পৃথিবীর কোন দেশে অন্য কোন দেবায়তনে দেখা যায় না; এমনকি, সহস্র-সহস্র বৎসর পরেও প্রাচীন

যুগের এই বিরাট হর্ম্যের শ্রী অনেক স্থলে অবিকৃত রহিয়াছে, দেখিয়া মনে হয় চিত্রকর বুঝি এইমাত্র তুলি রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে, যেন ভাস্কর প্রস্তর কাটিতে কাটিতে শ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম করিতে গিয়াছে।

এই দেউড়ির ভিতর দিয়া একটি সুপ্রশস্ত প্রস্তর-বদ্ধ পথ মন্দির পরিবেষ্টন পূর্বক নদীতীর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল; আমরা সেই পথপ্রান্তে উট হইতে নামিয়া হর্ম্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। একজন মশালধারী ভৃত্য একটি প্রজ্বলিত মশাল লইয়া আমাদের আগে আগে চলিল। মশালের সেই নৈশ বায়ু-বিকম্পিত আলোকে কোন বস্তু স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম না, সকলই যেন বিরাট রহস্যে আচ্ছন্ন বোধ হইতে লাগিল। সেই হর্ম্যের ছাদ এত উচ্চ, যে মশালের আলোক তাহা স্পর্শ করিতে পারিল না।

দেউড়ি অতিক্রম করিয়া আমরা একটি প্রকাণ্ড চকে প্রবেশ করিলাম; চকের চতুর্দিকে শ্রেণীবদ্ধ অত্যন্ত স্থূল প্রস্তর-স্তম্ভ, স্তম্ভগুলি দৈর্ঘ্যে একশত ফিটেরও অধিক। এই চকের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে আমরা একটি স্থানে উপস্থিত হইলে রা-তাই আমাকে সেই মশালধারী ভৃত্য ও জোয়ান আরবটার জিম্বায় রাখিয়া একাকী স্থানান্তরে প্রস্থান করিল; কোথায় গেল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

আমি সেই পরিত্যক্ত জীর্ণ সৌধের অভ্যন্তরে প্রায় আধ ঘণ্টা দাঁড়াইয়া রহিলাম, তথাপি রা-তাই প্রত্যাগমন করিল না; আমি আরব অনুচরকে অসহিষ্ণুভাবে কি জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হইয়াছি, এমন সময় মশালধারী মশালটা ঊর্ধ্বে তুলিয়া সবিস্ময়ে সম্মুখবর্তী দালানের দিকে চাহিল, তাহার বিস্ময়বিহ্বল ভাব দেখিয়া আমিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, একটি বৃদ্ধ ধীরে আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহার আপাদমস্তক শুভ্র পরিচ্ছদে মণ্ডিত, তাহার দীর্ঘ সুপক্ক ভ্রূগুলি চক্ষুর উপর লতাইয়া পড়িয়াছে, শ্বেত চামরের মত শুভ্র শ্মশ্রুজালে তাহার বক্ষঃস্থল আবৃত।

বৃদ্ধ আমার নিকটে না আসিয়া কিছু দূরে দাঁড়াইয়া আমাকে তাহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিল; আমি তাহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ

চলিতে লাগিলাম। নিঃশব্দে কত স্তম্ভ, কত দালান, কত বারান্দা অতিক্রম করিলাম, তাহার সংখ্যা নাই। অবশেষে একটি অন্ধকার-পূর্ণ প্রশস্ত আঙ্গিনায় উপস্থিত হইলাম। সেই গভীর রাত্রে এই অপরিচিত বৃদ্ধের সহিত একাকী এমন ভয়ঙ্কর স্থানে আসিয়া আমার মন অত্যন্ত দমিয়া গেল; সহসা বৃদ্ধ আমার সম্মুখে আসিয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিল, এবং আমাকে কিছু দূরে টানিয়া লইয়া গিয়া শুষ্ক স্বরে বলিল, 'এই স্থানে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাক।'—আমি হতবুদ্ধি হইয়া জড়ের ন্যায় সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলাম; বৃদ্ধ অন্ধকারে অদৃশ্য হইল।

তখন আমার মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল, ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্য কেহ তাহা অনুভব করিতে পারিবেন না; যদি সম্ভব হইত তাহা হইলে আমি সেই মুহূর্তেই সেই ভয়ানক স্থান হইতে পলায়ন করিয়া জাহাজে উপস্থিত হইতাম; কিন্তু সেখান হইতে পলায়ন আমার পক্ষে অসম্ভব।

কতক্ষণ আমি সেই স্থানে দণ্ডায়মান ছিলাম বলিতে পারি না, এক এক মিনিট আমার নিকট এক এক ঘণ্টার ন্যায় দীর্ঘ বোধ হইতেছিল। অনেকক্ষণ পরে দূরে মৃদু আলোক-রশ্মি দেখিতে পাইলাম, বোধ হইল তাহা মশালের আলোক; অবশেষে দেখিলাম, সেই বৃদ্ধই একটা মশাল লইয়া আসিতেছে; সে আমার নিকটবর্তী হইয়া পুনর্বার আমাকে তাহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিল। আমি সেই প্রশস্ত প্রাঙ্গণ পার হইয়া বৃদ্ধের সঙ্গে একটি ক্ষুদ্র ভগ্ন মন্দিরে প্রবেশ করিলাম।

আমার পথ-প্রদর্শক বৃদ্ধটি সেই ভগ্ন মন্দিরের একটি কোণে আসিয়া মশালটা আমার হস্তে প্রদান করিল, তাহার পর সেই স্থানে উপবেশন করিয়া উভয় হস্তে বালুকা ও প্রস্তরের স্তূপ সরাইতে লাগিল। প্রায় দশ মিনিট পরে সেই স্থানে একটি গুপ্ত দ্বারের চিহ্ন দেখা গেল। এই দ্বারটি অতি ক্ষুদ্র, তাহার কপাট লৌহনির্মিত। লোহার-সিন্ধুকের ডালায় যেমন হাতল থাকে, এই কপাটেও সেইরূপ

একটি হাতল ছিল, বৃদ্ধ সজোরে সেই হাতল ধরিয়া ঊর্ধ্বে আকর্ষণ করিবামাত্র কপাট খুলিয়া গেল। আমি মশালের আলোকে দেখিলাম, তাহা একটি ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গের দ্বার, দ্বারের নিম্নে সুড়ঙ্গে প্রবেশের জন্য প্রস্তরনির্মিত সোপানশ্রেণী বর্তমান।

বৃদ্ধ আমাকে তাহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিয়া সেই সোপানশ্রেণীর সাহায্যে সুড়ঙ্গে নামিতে লাগিল, অগত্যা আমিও মশালটি লইয়া তাহার অনুসরণ করিলাম। নামিতে নামিতে মনে হইল, ভূগর্ভস্থ অন্ধকারময় গুহায় যদি মশালটি হঠাৎ নিভিয়া যায়, তাহা হইলে জীবনে আর সেখান হইতে প্রত্যাগমন করিতে পারিব না।

যাহা হউক, আমরা প্রায় পঞ্চাশটি সিঁড়ি পার হইয়া পাতাল-ঘরে প্রবেশ করিলাম। এই কক্ষটি বেশ প্রশস্ত; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গোলাকার স্তম্ভ ছাদটিকে ধরিয়া রাখিয়াছে। স্তম্ভগুলি বিচিত্র কারু-কার্য-খচিত; ভাস্করশিল্প-নৈপুণ্যের আদর্শস্থানীয়। সেই গৃহের উন্নত প্রাচীরেও নানাপ্রকার চিত্র ক্ষোদিত দেখিলাম; প্রাচীন যুগের স্থপতিগণের অদ্ভুত শিল্প-চাতুর্যের পরিচয় পাইয়া এতই মুগ্ধ হইলাম যে, স্থান কাল ও বিপদের আশঙ্কা সমুদয় বিস্মৃত হইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সেইদিকে চাহিয়া রহিলাম; দেখিলাম, সহস্র সহস্র বৎসরেও সেই কক্ষটি জীর্ণ হয় নাই, চিত্রগুলিও বিন্দুমাত্র মলিন হয় নাই। কোন্ স্থপতি কি উপাদানে এই অপূর্ব গৃহ নির্মাণ করিয়াছে, কোন্ শিল্পী এমন অপূর্ব চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে যে সর্বগ্রাসী কালও তাহা জীর্ণ কারতে সমর্থ হয় নাই? আমার মনে হইল, বর্তমান যুগের জ্ঞানের অহঙ্কার ও সভ্যতার দর্প নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

এই পাতাল-ঘরটি প্রাচীন যুগে কি অভিপ্রায়ে নির্মিত হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। অনুমান হইল, আমন দেবের পূজার্চনার সময় এই স্থানে কোনও গুপ্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইত।

আমরা সেই পাতাল-ঘরটির মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলে বৃদ্ধ কাঁশির মত আওয়াজে আমাকে বলিল, 'ওহে হিন্দু, আমাদের এই

মিশর ভূমি ও তোমাদের হিন্দুস্থান দেবদেবীগণের লীলাক্ষেত্র ; প্রাচীন মিশরীয় ও প্রাচীন হিন্দু উভয়েই এক জাতি, তাহা জান কি ? খ্রীস্টান ইউরোপ ক্ষমতাদর্পে অন্ধ হইয়া আমাদের সেই পৌরাণিক দেব দেবীগণকে অগ্রাহ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাঁহাদের অপমান করিতেও তাহারা কুণ্ঠিত নহে ; দেবগণ এজন্য ইউরোপীয় জাতিসমূহের প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াছেন। তুমি জান কি না বলিতে পারি না, কিন্তু আমাদের দেবরাজ আমন ও তোমাদের দেবরাজ ইন্দ্র উভয়ে অভিন্ন। এতদিন পরে তাঁহার বজ্র বিধর্মী ইউরোপীয়গণের মস্তকোপর উদ্যত হইয়াছে, দৈববাণী হইয়াছে, একজন মিশরবাসী ও একজন হিন্দুস্থানবাসীর সাহায্যে অবিলম্বে তাহাদের পাপের ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইবে। তুমিই সেই হিন্দুস্থানবাসী ; তুমি দেবানুগৃহীত, সুতরাং এই পুণ্যপীঠের মহিমা প্রত্যক্ষ করিবার তোমার অধিকার আছে ; এ পর্যন্ত কোন বিদেশী বা বিধর্মীর ভাগ্যে এরূপ সুযোগ উপস্থিত হয় নাই। তোমার কোনও অনিষ্ট হইবে এরূপ আশঙ্কা করিও না ; কারণ সর্বশক্তিমান দেবগণ তোমার সহায় ; দৈবকার্য সম্পাদনের জন্য তাঁহারা তোমার রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং তোমার কোন বিপদের আশঙ্কা নাই ; আমার অনুসরণ কর।'

আমি সূত্র-চালিত পুত্তলিকার ন্যায় বৃদ্ধের অনুসরণ করিলাম। তাহার পর যে সকল অদ্ভুত ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইল, তাহার বিবরণ শ্রবণ করিলে তাহা সত্য বলিয়া কাহারও বিশ্বাস হইবে না ; তথাপি শ্রবণ কর।

আমার পথপ্রদর্শক বৃদ্ধ আমাকে আর একটি কক্ষে লইয়া গেল। এই কক্ষে প্রবেশ করিয়াই দ্বারের উভয় পার্শ্বে দুইটি অদ্ভুত মূর্তি দেখিলাম ; এই মূর্তিদ্বয়ের দেহের নিম্নাংশ সিংহের ন্যায়, কিন্তু মস্তক মেষের ন্যায়। ইহা ধাতুময় মূর্তি কি মৃন্ময় মূর্তি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সেই মূর্তিদ্বয় অতিক্রম করিয়া আমরা একটি সুদীর্ঘ কক্ষে প্রবেশ করিলাম, সেই কক্ষে শত শত মনুষ্য-মূর্তি শ্রেণীবদ্ধ

দুইখানি পুঁথি লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন; তাঁহার পশ্চাতে রাজার জ্যোতিষী ও প্রধান মুন্সী সেই স্থানে প্রবেশ করিলেন। তাহার পর আরও কতকগুলি রমণী বীণা ও বেণু বাজাইয়া গান করিতে করিতে সেই স্থানে সমবেত হইল। গায়িকাগণ মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলে মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ব্যাঘ্র-চর্মনির্মিত পরিচ্ছদ পরিধান-পূর্বক দ্বাদশ জন অনুচরসহ আমার দৃষ্টি-পথবর্তী হইলেন। প্রধান পুরোহিতের পশ্চাতে একদল রাজসৈন্যের সমাগম হইল; তাহাদের দেহ বর্মাবৃত, মস্তকে লৌহনির্মিত উজ্জ্বল শিরস্ত্রাণ, হস্তে সুদীর্ঘ বল্লম; মধ্যাহ্নের দীপ্ত সূর্যালোক তাহাদের শিরস্ত্রাণ, বর্ম ও বল্লমাগ্রে প্রতিফলিত হইয়া চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। সৈন্যদলের পশ্চাতে রৌপ্য-দণ্ডধারী লোহিত পরিচ্ছদ-সজ্জিত একদল নাবিক; অনন্তর পঞ্চাশ জন সুন্দরী যুবতী গায়িকা সুস্বরে প্রমোদ-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে অঞ্চলস্থিত নানা বর্ণের প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি রাজপথে ছড়াইতে ছড়াইতে মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইল; এই সুন্দরীদলের পশ্চাতে একদলের অস্ত্রধারী সৈন্যে পরিবেষ্টিত, সামন্ত নরপতিগণের স্কন্ধে সংস্থাপিত হীরক-রত্নখচিত সিংহাসনে মিশরের রাজচক্রবর্তী মহা-পরাক্রান্ত ফারোকে উপবিষ্ট দেখিলাম; তাঁহার পরিধানে মহামূল্য রাজবেশ, হস্তে হীরকখচিত সুবর্ণনির্মিত রাজদণ্ড, মস্তকে রাজমুকুট; কয়েকজন সম্ভ্রান্ত-বংশীয় যুবক সেই সিংহাসনের উপর নীলবর্ণের চন্দ্রাতপ প্রসারিত করিয়া নরপতিগণের সঙ্গে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল; এই চন্দ্রাতপের বস্ত্র বহুমূল্য, এবং তাহার ঝালর মণি-মুক্তায় খচিত। রাজার বাম পার্শ্বে তাঁহার কুলপুরোহিত কুহকবিদ্যা-বিশারদ রা-মীস উপবিষ্ট; তাহার মুখ দেখিবামাত্র রা-তাইয়ের মুখ আমার মনে পড়িল। দুইটি রাজপুত্র উজ্জ্বল পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া সিংহাসনের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রাজাকে চামর ঢুলাইতেছিল; সেই শুভ্র চামরের দণ্ড সুবর্ণনির্মিত ও সুদৃশ্য কারুকার্যখচিত।

রাজার অনুগত ও বিশ্বস্ত সেনাপতিবর্গ নানাপ্রকার যানে আরোহণ করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। এই সকল সেনাপতি

অধীনস্থ বিভিন্ন সৈন্যদল ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া তালে তালে চলিতে লাগিল ; রণ-বাদ্যকরগণ নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে বাজাইতে তাহাদের অনুগমন করিল। সৈন্যগণ প্রস্থান করিলে অসংখ্য নগরবাসী উৎসবের বেশে সজ্জিত হইয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে সমাগত হইতে লাগিল। নাগরিকগণের সেই সজ্জা, তাহাদের আনন্দ ও উৎসাহ, তাহাদের পরিচ্ছদ-পারিপাট্য বর্ণনা করি, এরূপ আমার শক্তি নাই ; কোন চিত্রকর তুলিকা-সম্পাতে চিত্রপটে সেই চিত্র যথাযথরূপে অঙ্কিত করিতে সমর্থ নহেন।

মন্দিরের সম্মুখবর্তী বিরাট সিংহদ্বারের সমীপস্থ হইয়া সৈনিক মণ্ডলী, নর্তকীবৃন্দ ও বাদ্যকরসমূহ সেই সিংহদ্বারের উভয় পার্শ্বে বিশ্রাম করিতে লাগিল। সিংহাসনাধিরূঢ় রাজা মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।—সঙ্গে সঙ্গে এই বিচিত্র দৃশ্য যেন শূন্যে বিলীন হইল। আমি সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলাম, ঘোর নৈশ অন্ধকারে একাকী সেই স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছি, কোন দিকে জনমানবের চিহ্নমাত্র নাই।

কতক্ষণ আমি সেইভাবে সেই স্থানে দণ্ডায়মান ছিলাম বলিতে পারি না, কিন্তু পুনর্বার আমার নয়ন-সমক্ষে উজ্জ্বল আলোক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, ক্রমে সেই আলোক দিবালোকের ন্যায় পরিস্ফুট হইল। সেই আলোকে দেখিতে পাইলাম, আমি একটি প্রকাণ্ড সমতল প্রান্তরে দণ্ডায়মান রহিয়াছি ; কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই আলোক নির্বাপিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে নিবিড় নৈশ অন্ধকারে চরাচর আচ্ছন্ন হইল ; কিন্তু সেই অন্ধকারের মধ্যেও আমার দৃষ্টিশক্তি অক্ষুণ্ণ রহিল। দেখিলাম, সেই বিপুল প্রান্তর জনমানব-সংস্পর্শবিহীন ; উৎসবসঙ্গীত নীরব ; লক্ষ কণ্ঠের সেই বিচিত্র কলরব নিস্তব্ধ ;—সহসা প্রলয়ের ঝটিকা সেই মুক্ত প্রান্তর আলোড়িত করিয়া ভীষণ গর্জনে মহাবেগে সমস্ত প্রকৃতি লণ্ডভণ্ড হইয়া যাইবার উপক্রম হইল, এবং আকাশমণ্ডল সজল-কৃষ্ণ নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ জলদজালে সমাচ্ছন্ন হইল ; মেঘমণ্ডিত গগনের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত নীলাভ বিদ্যুতের সহস্র জিহ্বা প্রতিমুহূর্তে প্রসারিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে অন্তর্হিত হইতে লাগিল ;

চপলার সেই চঞ্চল প্রভা আমার পদপ্রান্তস্থ সুন্দর-প্রসারিত শুভ্র বালুকারাশিতে প্রতিফলিত হইয়া চক্ষু ধঁাধিয়া দিতে লাগিল, সগম্ভীর জলদ-মন্দ্রে আমার কর্ণ বধির হইল। চতুর্দিকে প্রলয়ের সেই ভীষণ বিভীষিকা দর্শনে আমার মনে হইল, সেই মধ্যরাত্রে মিশরের সুবিস্তীর্ণ মরুময় শ্মশান-ক্ষেত্রে কোনও অলৌকিক কাণ্ডের অভিনয় হইবে।

সেই সূচীভেদ্য গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে আমি নির্ণিমেষ দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দেখিতে পাইলাম, চারিজন লোক একখানি শিবিকা স্কন্ধে লইয়া আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে, সেই শিবিকায় মৃতদেহ সংস্থাপিত; বাহকগণ শিবিকাখানি স্কন্ধে হইয়া আমার নিকটে উপস্থিত হইলে শিবিকাসংস্থাপিত মৃত ব্যক্তির মুখের দিকে চাহিয়া চিনিতে পারিলাম, তাহা রা-মীসের মৃতদেহ। তাহার দেহ বিবর্ণ ও অস্থিচর্মসার; পরিধেয় বস্ত্র জীর্ণ ও মলিন। রা-মীসের এরূপ দুর্গতি কেন হইল সে কাহিনী পূর্বেই শুনিয়াছিলাম, সুতরাং এ দৃশ্যে আমি বিস্মিত হইলাম না; কেবল রুদ্ধ নিশ্বাসে স্তম্ভিত হৃদয়ে পার্থিব ঐশ্বর্য, গৌরব ও দম্ভের পরিণাম চিন্তা করিতে লাগিলাম।

সেই দৃশ্য দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, রা-মীসের বন্ধুগণ তাহার মৃতদেহটি গোপনে সমাহিত করিতে যাইতেছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই এই দৃশ্য মায়াচিত্রের ন্যায় আমার নেত্রপথ হইতে অদৃশ্য হইল। আবার আমি ঘোর অন্ধকারের মধ্যে কিয়ৎকাল দণ্ডায়মান রহিলাম; তাহার পর দেখিতে পাইলাম, শবধাহকগণ রা-মীসের মৃতদেহ একটি পর্বতের অভিমুখে লইয়া যাইতেছে। সেই পর্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইয়া তাহারা গিরি-উপত্যকায় আরোহণ করিতে লাগিল, আমিও মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহাদের অনুসরণ করিলাম। শববাহকেরা পর্বতের একটি গুহায় রা-মীসের মৃতদেহ সংস্থাপিত করিয়া অবনত মস্তকে বিষণ্ণ বদনে স্খলিত চরণে ধীরে ধীরে সেই স্থান পরিত্যাগ করিল।

সহসা আমার কর্ণে পথ-প্রদর্শক বৃদ্ধের গম্ভীর কণ্ঠস্বর প্রবেশ

করিল ; সে বলিল, 'হে বিদেশী, তুমি কুহকী রা-মীসের সৌভাগ্যের দিনে তাঁহার বিপুল সম্মান ও অতুল গৌরবের দৃশ্যও সন্দর্শন করিয়াছ ; আবার তাঁহার শোচনীয় অধঃপতনের দৃশ্যও প্রত্যক্ষ করিলে ; কাল-চক্রনেমীর আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যজীবনের এই রূপ পরিবর্তন নিত্য সঙ্ঘটিত হইতেছে ; উত্থান ও পতন জগতের চিরন্তন নিয়ম। একদিন যিনি সামন্ত নৃপতিবৃন্দের স্কন্ধে আরোহণ পূর্বক সম্রাটের সহিত হীরক-রত্নখচিত সিংহাসনে উপবেশন করিয়া রাজকীয় মহোৎসব উপলক্ষে মহাসমারোহে দেব-দর্শনে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃতদেহ বহুদূরবর্তী পর্বতের একটি নিভৃত গুহায় রাত্রিকালে গোপনে সমাহিত করিতে হইল। রাজার বিরাগ উৎপাদনের ভয়ে তাঁহার প্রিয়তম বন্ধুগণও প্রকাশ্যে তাঁহার মৃতদেহ সমাধিভূমিতে লইয়া যাইতে সমর্থ হইলেন না। মৃত্যুর পরও রা-মীসের আত্মার সদ্গতি হয় নাই ; কিন্তু আশা আছে, দেব-শত্রুগণের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিয়া তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভে সমর্থ হইবে। হে বিদেশী ! এখন আমার সঙ্গে স্থানান্তরে চল।'

আমি পথ-প্রদর্শক বৃদ্ধের অনুসরণ করিয়া সেই সুবিস্তীর্ণ মঠের আর একটি কক্ষে প্রবেশ করিলাম। যে দুইজন বৃদ্ধ আমার অঙ্গে গন্ধদ্রব্য লেপন করিয়াছিল, তাহাদিগকেও সেই কক্ষে দেখিতে পাইলাম। তাহারা বৃদ্ধের আদেশে একটা সিন্ধুকের ভিতর হইতে একটি মমি বাহির করিল। এই মমিটি বস্ত্রাবৃত ছিল, বস্ত্র অপসারিত হইলে মশালের আলোকে দেখিতে পাইলাম, তাহা রা-তাইয়ের মৃতদেহ। চক্ষুকে সহসা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না, উভয় হস্তে চক্ষু মুছিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পুনর্বার চাহিলাম, দেখিলাম, সে মুখ রা-তাই ভিন্ন অন্য কাহার নহে ;—আমি তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান রহিলাম।

বৃদ্ধ তাহার হস্তস্থিত প্রজ্জ্বলিত মশালটি সেই মমির সম্মুখে স্থাপন করিয়া আবেগ-কম্পিত স্বরে বলিতে লাগিল, 'রা-মীস, তুমি বহুদিন পূর্বে ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছ বটে, কিন্তু আমার আদেশ, একবার তুমি চক্ষু খুলিয়া চাহিয়া দেখ, পুনর্বার শ্রবণশক্তি লাভ করিয়া আমার

বাক্য শ্রবণ কর। তুমি জীবিতাবস্থায় অসামান্য দৈব বলের অধিকারী হইয়াছিলে, ক্ষমতাদর্পে অন্ধ হইয়া দেবগণের অসন্তোষ উৎপাদন করিয়াছিলে; সেই অপরাধে মৃত্যুর পূর্বে তোমাকে অবমানিত ও লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল, সেই অপরাধেই মৃত্যুর পর তোমার আত্মার সদ্গতি হয় নাই। কিন্তু এতকাল পরে তোমার সদ্গতির উপায় হইয়াছে; আজ যে সকল নূতন জাতি ঐশ্বর্যগর্বে ও ক্ষমতাদর্পে অন্ধ হইয়া প্রাচীন দেবগণের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিতেছে, তাঁহাদের অসীম মহিমাগাথা কবি-বর্ণিত উপকথা বলিয়া উপহাস করিতেছে, তোমার আত্মা সেই দাম্ভিক পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহকে উপযুক্ত দণ্ডদানের উপায়-বিধান করিয়া দেবগণের প্রসন্নতা লাভের অধিকারী হইয়াছে। অতএব তুমি এই সমাধিগহ্বরে নিষ্ক্রিয়ভাবে নিপতিত থাকিও না, গাত্রোত্থান করিয়া তোমার জীবনের মহৎ ব্রত উদ্‌যাপনে প্রবৃত্ত হও। যতদিন তোমার এই ব্রত সফল না হইবে, ততদিন তোমার আত্মার সদ্গতি হইবে না, তোমার শান্তিহীন পতিত আত্মা শ্মশানচারী প্রেতের ন্যায় জগতে বিচরণ করিতে বাধ্য হইবে। হে রা-মীস, হে আদিযুগের রাজপুরোহিত, হে কুহকী, আমার আদেশ পালন কর, মৃতদেহে পুনর্বার আবির্ভূত হও, গাত্রোত্থান করিয়া স্বকার্যে প্রবৃত্ত হও।'

বৃদ্ধের কথা শেষ হইবামাত্র যুগান্ত-পূর্বের মৃতদেহ চক্ষু খুলিয়া চাহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। সেই ভয়াবহ দৃশ্য সন্দর্শন করিয়া ভয়ে আমার সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইল, আমি সেই স্থানে মূর্ছিত হইয়া পড়িলাম।

মূর্ছাভঙ্গে দেখিলাম, শীতে আমি থর-থর করিয়া কাঁপিতেছি, আমার সর্বাঙ্গে ভয়ানক বেদনা; কিন্তু যেখানে উপস্থিত হইয়া আমি এইসকল অদ্ভুত দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, সেই স্থান হইতে এখানে আমাকে কে আনিল? কয়েক ঘণ্টা পূর্বে রা-তাই আমাকে যে স্থানে রাখিয়া গিয়াছিল, দেখিল্যাম আমি সেই কক্ষেই নিপতিত রহিয়াছি, সুতরাং ইতিপূর্বে যে সকল অলৌকিক দৃশ্য আমার প্রত্যক্ষী-ভূত হইয়াছিল, তাহা অদ্ভুত স্বপ্ন বলিয়াই অনুমান হইল।—তখন

রাত্রি শেষ হইয়াছিল, উষালোকে চতুর্দিক পরিষ্কার হইয়াছিল; সেই আলোকে দেখিতে পাইলাম, রা-তাইয়ের দুইজন আরব অনুচর অদূরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আমি অতি কষ্টে গাত্রোত্থান করিলাম; আমার বাম বাহুমূলে টিকার মত যে ক্ষুদ্র ক্ষতচিহ্নটি ছিল, তাহার চারি পাশ অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল, বেদনায় আমি হাতখানি নাড়িতে পারিলাম না। আমি রাত্রে নিদ্রাঘোরে স্থানান্তরে গমম করিয়াছিলাম কি না, একজন আরব অনুচরকে সেকথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, আমি সমস্ত রাত্রি সেইখানেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিলাম।

সমস্ত রাত্রি ঠাণ্ডা লাগিয়া আমার অত্যন্ত সর্দি ও কাশি হইল; শ্রান্ত দেহে অনেকক্ষণ পর্যন্ত চারিদিকে রা-তাইয়ের অনুসন্ধান করিলাম; কিন্তু তাহাকে দেখিতে না পাইয়া বিরক্তভাবে আমি একাকী সেই স্থান ত্যাগ কারলাম; কিছু দূরে আসিয়া দেখিলাম, রা-তাই আর একটি পথ দিয়া মন্থর গতিতে আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে; সে আমার নিকটে আসিয়া বলিল, 'মিঃ সেন, একটু বিশেষ কার্যানুরোধে তোমাকে ছাড়িয়া আমাকে কিছু দূরে যাইতে হইয়াছিল; রাত্রে তুমি বোধহয় বড় কষ্ট পাইয়াছ; বোধ হইতেছে, সমস্ত রাত্রি ঠাণ্ডা লাগায় তুমি অসুস্থ হইয়াছ। যাহা হউক, যাহাতে তুমি শীঘ্র সুস্থ হইয়া উঠিতে পার, তাহার ব্যবস্থা করিতেছি।'

পূর্বরাত্রে যেখানে আমরা উট হইতে নামিয়াছিলাম, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, উটদুটি সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমরা উষ্ট্রে আরোহণ করিলাম।

দেখিলাম, এবার উটদুটি একটি নূতন পথ দিয়া চলিতে লাগিল; আমার মনে হইল, নদীর দিকে না গিয়া আমরা অন্য দিকে যাইতেছি। রা-তাইকে আমার সন্দেহের কথা বলিলাম, কিন্তু কোনও সদুত্তর পাইলাম না; শুনিলাম, ভিন্ন পথ দিয়া আমরা নদীতীরেই উপস্থিত হইব। আমার শরীর এমন অবসন্ন ও অসুস্থ বোধ হইতে লাগিল যে, উটের পিঠে বসিয়া থাকিতে অসহ্য কষ্ট হইল; ক্রমে আমার

নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল, গলার বেদনায় আমি অস্থির হইয়া উঠিলাম ; মনে হইল, অবিলম্বেই শ্বাসরোধে আমার মৃত্যু হইবে। ইহা কি ডিপ্‌থিরিয়ার পূর্বলক্ষণ ?—আমি আর চক্ষু মেলিয়া চাহিতে পারিলাম না, জগৎ অন্ধকারপূর্ণ বোধ হইল, মস্তকের দারুণ যন্ত্রণায় আমি উটের পিঠেই শুইয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ পরে বলিতে পারি না, রা-তাই উষ্ট্র-পরিচালককে থামিতে আদেশ করিল ; তাহার পর কি হইল আমার স্মরণ নাই, কারণ আমার চেতনা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছিল।

চেতনা-সঞ্চার হইলে দেখিলাম, একটি বিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যে একটি ক্ষুদ্র তাম্বুতে আমি একখানি জীর্ণ খট্টায় শয়ন করিয়া আছি ; শরীর এত দুর্বল যে, মাথা তুলিতেও কষ্ট হইল ; বহির্দেশে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, মধ্যাহ্নের সূর্যালোকে চতুর্দিকে মরু-বালুকা ধূ-ধূ করিতেছে, এবং বহুদূরে সমুন্নত তালবৃক্ষশ্রেণী গগনপ্রান্তে মিশিয়া গিয়াছে ; কোথাও জনমানবের সাড়া-শব্দ নাই। অনেকক্ষণ পরে একটি আরব ভৃত্য এক পেয়ালা ব্রথ্‌ লইয়া আমার তাম্বুতে প্রবেশ করিল, এবং আমাকে ধরিয়া তুলিয়া সেই ব্রথের পেয়ালাটি আমার মুখের কাছে ধরিল। আমি সেই ব্রথ্‌টুকু পান করিয়া একটু বল পাইলাম ; ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ কোন্‌ স্থান, আমি এখানে কবে আসিয়াছি, আমার সঙ্গীরা কোথায় ?'—কিন্তু ভৃত্য আমার প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না। আমি শয়ন করিয়া পুনর্বার গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলাম। কতক্ষণ পরে নিদ্রাভঙ্গ হইল বলিতে পারি না, কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে চাহিয়া দেখিলাম, রা-তাই আমার শিয়র-প্রান্তে উপবিষ্ট রহিয়াছে। আমাকে সচেতন দেখিয়া সে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আমাকে কোথায় আনিয়াছেন, এখানে কবে আসিয়াছি ?'

রা-তাই বলিল, 'এখানে তুমি আজ তিন দিন আছ ; তোমাকে লইয়া এই পথ দিয়া জাহাজে ফিরিয়া যাইবার সময় তোমার অসুখ হঠাৎ এত বাড়িয়া উঠে যে, তোমাকে জাহাজ পর্যন্ত লইয়া যাইতে

সাহস হয় নাই, তোমাকে এই তাম্বুর মধ্যে রাখিয়া আমার একটি আরব ভৃত্যের হস্তে তোমার পরিচর্যার ভার দিয়াছিলাম ; যাহা হউক, তুমি যে বাঁচিয়া উঠিয়াছ ইহাই সৌভাগ্যের কথা। আমার মিশরের কাজ শেষ হইয়াছে, তুমি এরূপ অসুস্থ না হইলে এতদিন আমি ইউরোপে যাত্রা করিতাম।'

আমি বলিলাম, 'এই ভয়ানক স্থানে আমার আর এক মুহূর্তও থাকিবার ইচ্ছা নাই ; আমার শরীর সুস্থ ও সবল না হইলেও আমাকে লইয়া চলুন, এ মরুভূমির মধ্যে আমাকে এভাবে ফেলিয়া রাখিবেন না। আপনার যে আরব ভৃত্যটি আমার পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিল, সে কোথায়? তাহার সুশ্রূষাগুণেই আমি বাঁচিয়া উঠিয়াছি।'

রা-তাই বলিল, 'প্রায় দুই ঘণ্টা পূর্বে তাহার মৃত্যু হইয়াছে ; এই আরবগুলা রোগযন্ত্রণা সহ্য করতে পারে না, রোগ হইলেই মরে।'

রা-তাইয়ের কথা শুনিয়া আমি স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিলাম। তিন ঘণ্টা পূর্বে যে সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল ছিল, দুই ঘণ্টা পূর্বে তাহার মৃত্যু হইয়াছে! এ কী ভয়ানক রোগ! আমার পরিচর্যা করিয়াই কি সে রোগাক্রান্ত হইয়াছিল? আমি কি কোনও ভীষণ সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলাম?···ব্যগ্রভাবে এ সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়াও রা-তাইয়ের নিকট কোন সন্তোষজনক উত্তর পাইলাম না। আমার মনে হইল সে আমার নিকট প্রকৃত কথা গোপন করিতেছে। যখন আমার জীবনের আশঙ্কা নাই, তখন সত্য কথা বলিতে তাহার আপত্তি কি বুঝিলাম না। কয়েকদিন হইতে রা-তাইয়ের সকল কার্যই অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ বলিয়া বোধ হইতেছিল ; তাহার সেই গভীর রহস্য ভেদ করা আমার ন্যায় অদূরদর্শী প্রবাসী বাঙালীর পক্ষে সম্ভব নহে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

রা-তাইয়ের সহিত নেপল্‌স্ ত্যাগের পর হইতে ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইতেছি ; কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া যে কয়েক দিন শয্যাগত

ছিলাম, সেই কয়দিন মাত্র বিশ্রাম ঘটিয়াছিল। রোগশয্যা হইতে উঠিয়া আমি রা-তাইয়ের সঙ্গে কায়রো নগরে প্রত্যাবর্তন করিলাম, তাহার পর যথাকালে সৈয়দ বন্দরে আসিয়া সমুদ্রপথে কনস্টান্টিনোপলে উপস্থিত হই, ও সেখান হইতে রেলযোগে ভিয়েনায় গমন করি। রা-তাই কোনও স্থানে দুই রাত্রি বাস করিতে সম্মত হয় নাই, তাহার ন্যায় বৃদ্ধের এইরূপ দ্রুত দেশভ্রমণের প্রবৃত্তি দেখিয়া আমার বিস্ময়োদ্রেক হইয়াছিল। দেশের পর দেশ ক্রমাগত ভ্রমণ করিয়া আমি পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু এই বৃদ্ধের শ্রান্তি ক্লান্তি নাই।

রা-তাই সঙ্গে না থাকিলে বোধহয় আমি কঠিন ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিতাম না ; আমার স্বাস্থ্যের প্রতি তাহার বিশেষ লক্ষ ছিল, সেইজন্য তাহার প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত ; কিন্তু কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে তাহার প্রতি আমার ঘৃণা দিন দিন বর্ধিত হইতে লাগিল ; কিন্তু বিষধর সর্পকে সম্মুখে দেখিলে মনে যেরূপ ভয়ের সঞ্চার হয়, তাহাকে দেখিলেও আমার সেইরূপ ভয় হইত ; কিন্তু তথাপি সে আমাকে এরূপ মোহাবিষ্ট করিয়াছিল যে, আমি তাহার সহিত কথা না কহিয়া থাকিতে পারিতাম না। যেদিন প্রত্যুষে আমরা কনস্টান্টিনোপলে উপস্থিত হইলাম, সেইদিনই অপরাহ্নে রেলপথে ভিয়েনা যাত্রা করিলাম। ভিয়েনা নগরে ট্রেনের প্রতীক্ষায় কয়েক ঘণ্টা মাত্র বাস করিয়াছিলাম; তাহার পর প্রেগ নগরে উপস্থিত হই। সেখান হইতে কোথায় যাইতে হইবে তাহা জানিতাম না ; রা-তাইও সে সম্বন্ধে আমাকে কোনও কথা বলে নাই। রেবেকাকে ছাড়িয়া যাইবার আশঙ্কা না থাকিলে আমি সেই স্থানেই রা-তাইয়ের নিকট বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিতাম , কিন্তু রেবেকাকে ছাড়িয়া যাইতে আমার ইচ্ছা ছিল না।

আমার আরোগ্য লাভের পর রেবেকার স্বভাবের যথেষ্ট পরিবর্তন লক্ষ করিয়াছিলাম, তিনি সর্বদাই অত্যন্ত বিমর্ষভাবে বসিয়া থাকিতেন, পূর্বের ন্যায় সরলভাবে আমার সহিত গল্প করিতেন না,

অধিকাংশ সময় তাঁহার কেবিনে বসিয়া মৃদু স্বরে গান করিতেন ; তাঁহার সেই সঙ্গীত বিষাদ ও বেদনায় পূর্ণ ; কিন্তু রা-তাইয়ের ভাব অন্য প্রকার, যেন তাহার যৌবনের উৎসাহ ফিরিয়া আসিয়াছিল, সর্বদাই তাহাকে প্রফুল্ল ও হাস্যময় দেখিতাম।

প্রেগ নগরে উপস্থিত হইয়া আমি রেবেকাকে সঙ্গে লইয়া নগর-ভ্রমণে বাহির হইলাম ; নানাস্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে উভয়ে একটি সুবৃহৎ উপবনে প্রবেশ করিলাম। কয়েক ঘণ্টা পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া আমরা শ্রান্ত হইয়াছিলাম, একটি নিবিড় কুঞ্জের অন্তরালে একখানি বেঞ্চি দেখিতে পাইয়া তাহাতে উপবেশন পূর্বক আমরা বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। রেবেকা তখনও অত্যন্ত অন্যমনস্ক, যেন কি গভীর চিন্তায় তাঁর হৃদয় আচ্ছন্ন।

আমি কোমল স্বরে ডাকিলাম, 'রেবেকা !'

রেবেকা নিদ্রোত্থিতের ন্যায় আমার মুখের দিকে চাহিলেন, কোন কথা কহিলেন না। আমি বলিলাম, 'রেবেকা, ঘুরিতে ঘুরিতে আমাদের অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, চল ফিরিয়া যাই।'

রেবেকা বিমর্ষভাবে বলিলেন, 'কোথায় যাইব ? সকল স্থানই যে আমার নিকট সমান, সমস্ত পৃথিবী মরুভূমি তুল্য। যাহার জীবনে আশা নাই সুখ শান্তি নাই, কেবল কষ্ট সহ্য করিবার জন্য সে কেন বাঁচিয়া থাকে ? মরিতে পারিলে বোধহয় আমার সকল জ্বালা জুড়াইত, কিন্তু আমার মরিবারও সাধ্য নাই ; জগতে আমার মত দুর্ভাগিনী আর কে আছে ?'

আমি স[illegible]স্বরে বলিলাম, 'আমি ; কিন্তু আমি তোমার মত হতাশ হই নাই, তোমাকে ভালবাসি বলিয়াই বোধহয় জীবনের আশা রাখিয়াছি ; যেদিন তোমার আশা ত্যাগ করিব, সেইদিন এ দেহ-ভার বহন করা দুরূহ হইবে।'

আমার কথা শুনিয়া রেবেকা কোন উত্তর করিলেন না, একবার কাতর দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

আমি মনে করিলাম, রেবেকাকে আজ আমার মনের কথা

বলিতেই হইবে, তাঁহার নিকট মনের ভাব আর দীর্ঘকাল গোপন রাখিতে পারি না ; তাই বলিলাম, 'রেবেকা, তুমি নির্বাক রহিলে কেন ? আমি তোমাকে ভালবাসি, এ কথা কি তুমি বিশ্বাস কর না ? যেদিন তোমাকে সর্বপ্রথম দেখিয়াছি, সেই দিনই আমার হৃদয় তোমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে ; তাহার পর এতদিন তোমার সহিত বাস করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি নারীরত্ন, তোমাকে লাভ করা পরম সৌভাগ্যের বিষয়।'

এবার রেবেকার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি আবেগভরে বলিলেন, 'না, না, তুমি ও কথা আমাকে বলিও না, তোমার কথা শুনিয়া আমার বড় লজ্জা বোধ হইতেছে ; নিজের হৃদয় না বুঝিয়া কেন আমাকে ভালবাসিয়াছ ? তুমি জান না, ইহাতে কত বিঘ্ন, কত বিপদ ; আমি দুর্ভাগিনী অক্ষম নারীমাত্র ; তোমার কথা শুনিয়া আমি মনে বড় বেদনা পাইলাম।'

আমি বলিলাম, 'রেবেকা, তোমার হৃদয়ে আঘাত লাগিতে পারে, এরূপ কোন কথা তো আমি বলি নাই ; তুমি যাহাতে অসুখী হও এমন কাজ আমি কখনও করিব না। আমি তোমাকে ভালবাসি, এ কথা শুনিয়া তুমি কি দুঃখিত হইলে ?'

রেবেকা বলিলেন, 'তুমি পাগলের মত কথা বলিতেছ ; আমাদের অবস্থা এখন যেরূপ শোচনীয়, তাহাতে প্রেমের কথা স্বপ্নেও আমাদের মনে উদিত হওয়া উচিত নহে। মিঃ সেন, আমি পূর্বেই তোমাকে সাবধান করিয়াছিল্যম, তোমাকে এই পিশাচের সংস্রব ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম ; যদি সেই সময় তুমি আমার অনুরোধে কর্ণপাত করিতে, তাহা হইলে আজ তোমাকে এই মোহপাশে বন্দী হইতে হইত না।'

আমি উত্তেজিত স্বরে বলিলাম. 'সুপবিত্র প্রেমকে যদি মোহ বলিতে চাও তো বল, আমি তাহাতে আপত্তি করিব না ; কিন্তু আমি তাহা সকল সুখের আকর বলিয়া মনে কার। তোমাকে ভালবাসিয়া আমি মুহূর্তের জন্যও অনুতপ্ত হইবার কোন কারণ দেখিতেছি না।

আমি তো পূর্বেই তোমাকে বলিয়াছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি নিরাপদ না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ছায়ার ন্যায় তোমার কাছে থাকিব, তোমাকে ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইব না।' সত্য বটে আমি বিদেশী, কিন্তু বিদেশীকে ভালবাসা কি তোমার পক্ষে অসম্ভব ?'

রেবেকা বলিলেন, 'সেন, তোমার আশা অপরিমিত, তাহা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি না। তোমাকে প্রতারিত করা আমার কর্তব্য নহে। যদি সত্য কথা শুনিতে চাও, তাহা হইলে বলিতেছি শুন, আমিও তোমাকে ভালবাসি ; কিন্তু তথাপি আমি কোনও দিন তোমাকে উৎসাহ প্রদান করি নাই, কারণ আমি জানি এ প্রণয়ে সুখের আশা নাই, জীবনে আমাদের মিলন অসম্ভব। তাই বলিতেছি, আমার আশা ত্যাগ করিয়া তুমি চলিয়া যাও ; আমার ন্যায় হতভাগিনীর সঙ্গে জীবনে কখনও যে তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহা চিরদিনের মত বিস্মৃত হও।'

আমি আবেগভরে বলিলাম, 'না, কখনও নহে ; তুমি আমাকে ভালবাস, এ কথা যখন জানিতে পারিয়াছি তখন কোন কারণেই তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইব না ; এজন্য যদি শত সহস্র বিপদকে আলিঙ্গন করিতে হয়, প্রাণের আশা ত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও সম্মত আছি। তোমার জন্য সকল দুঃখ সকল বিপদ অকুণ্ঠিত চিত্তে সহ্য করিব, পরমেশ্বর আমাদের সহায় হউন।'

রেবেকা গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, 'সকল আশা ফুরাইয়াছে সত্য, কিন্তু পরমেশ্বরের দিকে চাহিয়াই এখনও বাঁচিয়া আছি, তিনি ভিন্ন অনাথার আর কে আছে ?'

আমি রেবেকার আরও কাছে সরিয়া বসিলাম, বলিলাম, 'রেবেকা, ভবিষ্যতে আমরা কি করিব, সে সম্বন্ধে আজ এখানেই একটা মীমাংসা করা যাউক। তুমি যখন আমাকে ভালবাস, তখন রা-তাইয়ের কবল হইতে উদ্ধার লাভের জন্য আমার সঙ্গে পলায়ন করিতে তোমার আপত্তি কি ?'

রেবেকা বলিলেন, 'প্রধান আপত্তি এই যে, আমার পলায়ন

নিষ্ফল, সম্পূর্ণ নিষ্ফল ; সে কথা তো পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি।'

আমি বলিলাম, 'কিন্তু পলায়ন ভিন্ন আমাদের মিলনের তো অন্য কোনও উপায় দেখিতেছি না। তুমি দুইবার পলায়নের চেষ্টা করিয়াছ, সে চেষ্টা সফল হয় নাই ; তথাপি নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না ; এবার আমার সঙ্গে চল, আমিও রা-তাইকে যত ভয় করি তত ভয় বোধ হয় শয়তানকেও করি না। আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি, প্রতি মুহূর্তেই সে আমাকে অধিকতর মোহে আচ্ছন্ন করিতেছে ; কিন্তু এখনও সময় আছে, এ সময় যদি তাহার কবল হইতে মুক্তি লাভ করিতে না পারি, তাহা হইলে আর কখনও পারিব না। এই অল্প দিনের মধ্যেই তাহার প্রকৃতির যে পরিচয় পাইয়াছি, তাহা তোমার কল্পনা করিবারও শক্তি নাই।'

রা-মীসের মমির অদ্ভুত কাহিনী হইতে আরম্ভ করিয়া আমার কঠিন পীড়া, যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্তই রেবেকার গোচর করিলাম। সে অদ্ভুত কাহিনী শুনিয়া রেবেকা অনেকক্ষণ পর্যন্ত স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিলেন ; তাহার পর হতাশভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখন কর্তব্য কি?'

আমি বলিলাম, 'পলায়ন করা ভিন্ন অন্য কর্তব্য কিছুই নাই ; ইহা যে বিশেষ কঠিন তাহাও বোধ হয় না ; কারণ রা-তাই আমাদিগকে নজরবন্দী করিয়া রাখে নাই ; আমরা যেখানে ইচ্ছা সেইখানেই যাইতে পারি ; এমন কি, কিছুকাল আমাদিগকে দেখিতে না পাইলেও আমরা পলায়ন করিয়াছি বলিয়া সহসা তাহার সন্দেহ হইবে না ; সেই অবসরে আমরা ট্রেনে চড়িয়া দূরদেশে প্রস্থান করিতে পারিব। তবে, তুমি আমার উপর নির্ভর করিতে পারিবে কি না তাহা তুমিই বলিতে পার।'

রেবেকা বলিলেন, 'তোমার উপর আমি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারি ; কেবল আমার ভয়. রা-তাই হয়ত তাহার অলৌকিক শক্তিবলে আমাদিগকে পুনর্বার কর-কবলিত করিবে।'

আমি বলিলাম, 'সে যাহাতে তাহা না পারে তাহার উপায়

করিতে হইবে ; আমরা অত্যন্ত সাবধান হইয়া চলিব ; সে যেমন চতুর, তাহার দৃষ্টিশক্তি সেইরূপ তীক্ষ্ণ ; সে যেন আমাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া সন্দেহ করিতে না পারে। কাল অতি প্রত্যূষে আমরা এখান হইতে গোপনে বার্লিন যাত্রা করিব, পরশু এক সময় হাম্বার্গে উপস্থিত হইব, তাহার পর তিন দিনের মধ্যেই লণ্ডনে পলায়ন করিতে সমর্থ হইব। লণ্ডনে আমার সম্ভ্রান্ত ও ক্ষমতাশালী বন্ধুর অভাব নাই, তাঁহাদের আশ্রয়ে তোমাকে অনায়াসেই কিছুদিন লুকাইয়া রাখিতে পারিব। আমি তোমাকে বিবাহ করিব শুনিলে আমার ইংরাজ বন্ধুগণ সকলেই আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। আমাদের বিবাহের পর তোমার উপর রা-তাইয়ের কোন অধিকার থাকিবে না।'

এই পরামর্শ স্থির করিয়া হোটেলে প্রত্যাগমন করিলাম। রা-তাই আমাদিগকে দেখিয়া সহাস্যে বলিল, 'তোমরা এতক্ষণ কোথায় ছিলে ? আমাদের পরিচিত একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আজ রাত্রে আমার ও রেবেকার নিমন্ত্রণ করিয়াছেন ; আমাদের উভয়কেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতে হইবে।'

আমি বলিলাম, 'সে তো সুখের কথা ; আপনার নিমন্ত্রণে যাইবেন, আমি সে সময়টা ঘুমাইয়া লইব। আজ আমরা নগর দেখিতে বাহির হইয়াছিলাম, ঘুরিয়া ঘুরিয়া বড় পরিশ্রান্ত হইয়াছি।'

রা-তাই আমার মুখের উপর বক্র কটাক্ষপাত করিয়া বলিল, 'কেবল নগর দর্শন নহে, আজ তোমরা উভয়ে অনেকক্ষণ ধরিয়া পরামর্শ করিয়াছ ; তোমাদের মনের ভাব আমার অজ্ঞাত নহে।'

আমি সবিস্ময়ে রা-তাইয়ের মুখের দিকে চাহিলাম, অজ্ঞাত ভয়ে বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল ; সঙ্কুচিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি কি বুঝিয়াছেন ?'

রা-তাই হাসিয়া বলিল, 'বুঝিয়াছি তোমরা পরস্পরকে ভালবাস। আমার কথা শুনিয়া তুমি কুণ্ঠিত হইতেছ কেন ? রেবেকা যেরূপ রূপবতী ও গুণবতী, তাহাতে সে যে তোমার হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার

করিবে, ইহাতে বিস্ময়ের কথা কি আছে? তোমরা যদি পরস্পরের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া থাক, তাহা আমি দোষের বিষয় মনে কার না। এতদিন তোমার সহিত একত্র বাস করিয়া আমি তোমার যে পরিচয় পাইয়াছি তাহাতে বুঝিয়াছি, তুমি রেবেকার অযোগ্য নহ; সেইজন্যই রেবেকার সহিত তোমাকে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করিতে দেখিয়া আমি কোনদিন তাহাতে আপত্তি করি নাই। সত্য কথা বলিতে কি আমি তোমার বড়ই পক্ষপাতী; তোমরা দুইজন আমার দুই চক্ষুর মত, সুতরাং তোমরা পরস্পরকে ভালবাসিয়া যদি সুখী হইয়া থাক, আমার পক্ষে তাহা আনন্দের কথা। আমার এই কথা শুনিয়াই তোমরা বুঝিতে পারিবে, আমাকে তোমরা যত মন্দ লোক মনে কর, আমি তত মন্দ লোক নহি। যদি তোমরা আমার অনুগত হইয়া থাক, বিনা প্রতিবাদে আমার সকল আদেশ পালন কর, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তোমাদের মিলনের কোনও বিঘ্ন ঘটিবে না।'

আমি বলিলাম, 'আমরা কি কোনও দিন আপনার কোন আদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছি? আপনার প্রতি কখনও কিছুমাত্র অসম্মান প্রকাশ করিয়াছি?'

রা-তাই বলিল, 'না, তাহা কর নাই, কিন্তু যুবক যুবতীদের মন বড়ই চঞ্চল, তাহাদের বুদ্ধিও নিতান্ত তরল, সেইজন্যই মনে হয়—এ পর্যন্ত তোমরা যাহা কর নাই, বা করিতে সাহস কর নাই, তাহা করিবার জন্য তোমরা ব্যস্ত হইয়া উঠিতে পার; এইজন্য আজ তোমাদিগকে সাবধান করিলাম।'

আমি বলিলাম, 'বয়স অধিক হইলে মানুষের সাবধানতার বৃদ্ধি হয়; যাহা হউক, আপনার উপদেশের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, আমি ইংলণ্ডে প্রত্যাগমনের জন্য অত্যন্ত অধীর হইয়াছি; এবং দুই মাস কাল ক্রমাগত নানা দেশে ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়াছি। এই দীর্ঘ পর্যটন আমার আর ভাল লাগিতেছে না, আর এক সপ্তাহের মধ্যেই আমাকে ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইতে হইবে; যদি আপনি যাইতে না চান, তাহা হইলে আমি একাকীই যাইব।'

রা-তাই বলিল, 'না তাহা হইবে না ; তুমি অঙ্গীকার করিয়াছ, আমার কোনও কথায় আপত্তি করিবে না, তবে আবার আমাকে ছাড়িয়া একাকী ইংলণ্ডে চলিয়া যাইবার কথা কেন বলিতেছ? আমাকে ছাড়িয়া যাইলেও রেবেকাকে তুমি কিরূপে ছাড়িয়া যাইবে? ইহাই কি তোমার প্রেমের নিদর্শন? কিন্তু তুমি ভয় পাইও না ; আমি এ অঞ্চলে আর অধিক দিন থাকিতেছি না ; চারিদিকে যেরূপ অবস্থা দেখা যাইতেছে, তাহাতে যত শীঘ্র এখান হইতে পলায়ন করিতে পারা যায় ততই মঙ্গলের বিষয়।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনার কথা শুনিয়া ব্যাপার কি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না ; আপনাকে তো কখনও কোন কারণে ভীত হইতে দেখি নাই ; আপনি পর্যন্ত ভয় পাইয়াছেন, তখন ব্যাপার বোধহয় কিছু গুরুতর।'

রা-তাই গম্ভীর স্বরে বলিল, 'হাঁ, ভয়ঙ্কর গুরুতর ; সে কথা তোমরা শোন নাই বুঝি? ভূমধ্যসাগরের অপর প্রান্তে ভয়ঙ্কর মহামারী উপস্থিত হইয়াছে ; গত পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে এমন মহামারীর কথা কখনও শুনা যায় নাই। এই সংক্রামক ব্যাধি ক্রমে বিভিন্ন দেশে বিস্তৃত হইতেছে ; শুনিলাম, তুরস্কে ও বলকান রাজ্যে দারুণ জনক্ষয় আরম্ভ হইয়াছে।'

আমি সভয়ে বলিলাম, 'এ কথা তো পূর্বে শুনি নাই ; তবে, মধ্যে একদিন সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম বটে, পূর্বাঞ্চলের কোন কোন স্থানে প্লেগ দেখা দিয়াছে ; তাহা যে এমন ভয়ঙ্কর ব্যাপার এরূপ মনে হয় নাই।'

রা-তাই বলিল, 'অতি ভয়ঙ্কর ; আজিকার দৈনিক কাগজ এখনও দেখা হয় নাই, একখানি কাগজ আনাইয়া দেখিতে হইতেছে নূতন কি খবর আছে।'

অবিলম্বে একটি ভৃত্য একখানি জর্মান দৈনিক সংবাদপত্র লইয়া আসিয়া তাহা রা-তাইয়ের হস্তে প্রদান করিল। আমি জর্মান ভাষা জানিতাম না ; সুতরাং রা-তাই তাহাতে প্লেগ-সম্বন্ধীয় টেলিগ্রাম পাঠ

করিয়া তাহার মর্ম আমাকে বুঝাইয়া দিল। সেই টেলিগ্রামের মর্ম এইরূপ :—'তুরস্ক রাজ্যে প্লেগের আক্রমণ প্রতিদিন অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া তুর্কীরা আতঙ্কে অধীর হইয়া উঠিয়াছে ; প্লেগ্ ক্রমেই চতুর্দিকে বিস্তৃত হইতেছে। গতকল্য তুরস্ক দেশে প্রায় এক হাজার লোক প্লেগে আক্রান্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে শতকরা নব্বই জনেরও অধিক এক দিনেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। রুশিয়া দেশেও প্লেগ প্রবেশ করিয়াছে। ডাক্তারেরা এই রোগের নিদান স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই ; তাঁহাদের সন্দেহ, এশিয়া বা আফ্রিকা দেশে ইহার প্রথম উৎপত্তি।'

পাঠ শেষ করিয়া রা-তাই আমাকে বলিল, 'আমার মনে হইতেছে, অল্পদিনের মধ্যেই এই ভাষণ ব্যাধি সমগ্র ইউরোপে বিস্তৃত হইবে ; তাহা হইলে পৃথিবীতে মহা জনক্ষয় অনিবার্য। আমার যৌবনকালে একবার প্লেগের প্রতাপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম ; বিপদের কথা এই যে, বিশেষ সাবধানে থাকিলেও ইহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায় না।'

আমি বলিলাম, 'তথাপি সাবধানে থাকাই কর্তব্য, প্লেগাক্রান্ত স্থান হইতে দূরে দূরে থাকিবার চেষ্টা করিতে হইবে।'

আর কোন কথা হইল না। আমি গোপনে রেবেকার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বলিলাম, 'প্রত্যূষে ছয়টার সময় একখানি ট্রেন ড্রেসডেনে যায়, আমরা সেই ট্রেনেই যাত্রা করিব। কিন্তু আমরা শহরের কোনও স্টেশনে ট্রেনে উঠিব না, ঘোড়ার গাড়িতে কয়েক মাইল গিয়া শহরতলীর কোনও স্টেশনে ট্রেন ধরিব ; সুতরাং আমাদিগকে পাঁচটার পূর্বেই যাত্রা করিতে হইবে। আজ রাত্রে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া তোমার ফিরিতে বিলম্ব হইবে, তত সকালে উঠিতে পারিবে তো ?'

রেবেকা বলিলেন, 'নিশ্চয়ই পারিব।'—তাহার পর তিনি রা-তাইয়ের সঙ্গে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে চলিলেন, আমি আমার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া শয়ন করিলাম, কিন্তু নিদ্রাকর্ষণ হইল না।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

রাত্রিশেষে হোটেলের দ্বিতলস্থ কক্ষ হইতে নামিয়া নিচের হলে আসিলাম, তখনও চতুর্দিক অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ; হলে একটা ল্যাম্প মিট-মিট করিয়া জ্বলিতেছিল, তাহা সেই বিস্তীর্ণ কক্ষের অন্ধকার দূর করিতে পারে নাই। দেখিলাম একটি বৃদ্ধ প্রহরী হলের দ্বারপ্রান্তে বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে, আমি তাহার নিকট গিয়া বলিলাম, 'বিশেষ কাজে আমাকে একবার গোপনে বাহিরে যাইতে হইতেছে, কথাটা যেন প্রকাশ না হয়।'—সঙ্গে সঙ্গে তাহার হস্তে একটি রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করিলাম ; ইতিমধ্যে রেবেকা তাঁহার বেহালাটি লইয়া দ্বিতল হইতে নামিয়া আসিলেন। পূর্বেই একজন কোচম্যানকে বলিয়া রাখিয়াছিলাম, সে প্রত্যূষে পাঁচটার সময় হোটেলের দরজায় গাড়ি লইয়া উপস্থিত হইল। তখন আমরা উভয়ে সেই গাড়িতে কয়েক-মাইল দূরবর্তী রেলওয়ে স্টেশনে যাত্রা কারলাম। ছয়টা বাজিবার কয়েক মিনিট পূর্বেই আমরা স্টেশনে উপস্থিত হইলাম। ধরা পড়িবার ভয়ে মন বড় অস্থির হইয়াছিল, ট্রেন আসিলে, গাড়িতে উঠিয়া দুর্ভাবনা অনেকটা দূর হইল ; কিন্তু আমি বিস্তর চেষ্টা করিয়াও রেবেকার মন প্রফুল্ল করিতে পারিলাম না, কি এক অজ্ঞাত ভয়ে তাঁহার হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া রহিল।

ড্রেসডেন স্টেশনে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম একখানি বার্লিনগামী ট্রেন প্ল্যাটফরমে দাঁড়াইয়া আছে, সুতরাং ড্রেসডেনে বিলম্ব না করিয়া সেই ট্রেনেই বার্লিন যাত্রা করিলাম। দ্বাদশ ঘণ্টার পর সেইদিন সন্ধ্যা ছয়টার সময় আমরা বার্লিন নগরে পদার্পণ করিলাম।

ট্রেন হইতে নামিয়া রেবেকা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখন কোথায় যাওয়া যায় ?'

আমি বলিলাম, 'আপাততঃ একটা হোটেলে গিয়া কিছু আহার করা আবশ্যক।'

রেবেকা বলিলেন, 'বার্লিনে আমি অনেকবার আসিয়াছি, চল একটা পরিচিত হোটেলে তোমাকে লইয়া যাই।'

স্টেশনের বাহিরে একখানি ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিয়া আমরা হোটেলে চলিলাম। চলিতে চলিতে রেবেকা বলিলেন, 'এই হোটেল-ওয়ালার সহিত আমার পরিচয় আছে, রা-তাইয়ের সঙ্গে আসিয়া কয়েকবার এই হোটেলে উঠিয়াছিলাম।'

আমি বলিলাম, 'তাহা হইলে সেখানে গিয়া কাজ নাই; রা-তাই আমাদের সন্ধানে এই হোটেলে উপস্থিত হইলে হোটেলওয়ালার কাছে সকল কথা জানিতে পারিবে।'

রেবেকা বলিলেন, 'না, সে ভয় নাই, আমি হোটেলওয়ালাকে নিষেধ করিলে রা-তাইয়ের নিকটে সে কোনও কথা প্রকাশ করিবে না।'

আমরা হোটেলের অফিস-ঘরে উপস্থিত হইলে রেবেকা একটি সুবেশধারী দ্বারবানকে বলিলেন, 'তোমার মনিবকে আমার সেলাম জানাও।'

দ্বারবানটি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল। অল্লক্ষণ পরে প্রায় পাঁচ হাত লম্বা একটি প্রৌঢ় জর্মান সেই অফিস-ঘরে উপস্থিত হইল, তাহার পায়ে কার্পেটের চটি, মাথায় একটি লাল টুপি এবং মুখে তামাকের সুদীর্ঘ পাইপ; আগন্তুকের মুখখানি সুগোল, আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত তাহার দাড়ি-গোঁপ কামানো।

বুঝিলাম, এই লোকটিই হোটেলের মালিক। হোটলওয়ালা চঞ্চল দৃষ্টিতে চতুর্দিকে চাহিতে লাগিল।

রেবেকা কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া সহাস্য বদনে তাহাকে বলিলেন, 'পিটার, তুমি কি এত শীঘ্র আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ?'

হোটেলওয়ালা রেবেকাকে অভিবাদন করিয়া সবিস্ময়ে বলিল, 'আপনি কতক্ষণ আসিয়াছেন? প্রথমে আপনাকে দেখিতে পাই

নাই, আমার কসুর মাফ করিবেন।'—তাহার পর সে সভয়ে ইতস্ততঃ চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কই, মিঃ রা-তাইকে দেখিতেছি না কেন?'

রেবেকা বলিলেন, 'না, এবার তিনি আমার সঙ্গে আসেন নাই।'—তাহার পর নিম্নস্বরে বলিলেন, 'পিটার, তোমাকে সত্য কথা বলিতে বাধা নাই, আমি তাঁহারই ভয়ে পলাইয়া আসিয়াছি।'

পিটার খুশি হইয়া বলিল, 'সত্য নাকি? আপনার কথা শুনিয়া বড় সুখী হইলাম; যাঁহাকে দেখিবামাত্র আমার মত জোয়ানের অন্তরাত্মা কাঁপিতে থাকে, তাঁহার সঙ্গে আপনি এতকাল যে কী করিয়া বাস করিলেন, তাহা ভাবিয়া পাই না; যাহা হউক, এখন আমাকে কি করিতে হইবে বলুন।'

রেবেকা বলিলেন, 'দেখ পিটার, আমরা পথশ্রমে বড় ক্লান্ত হইয়াছি, ক্ষুধারও অভাব নাই; কিছু আহার ও একটু আশ্রয় চাই; আর, যদি রা-তাই আমাদের সন্ধানে এখানে আসে, তাহা হইলে আমরা এখানে আসিয়াছিলাম এ কথা প্রকাশ করিও না।'

পিটার বলিল, 'এ অতি সামান্য কথা, আপনি নিশ্চিন্ত হউন; আমি আপনাদের জন্য দুইটি নির্জন কক্ষ ঠিক করিয়া দিতেছি; খানাও শীঘ্র প্রস্তুত হইবে।'

রেবেকা হাসিয়া বলিলেন, 'পিটার, এই অনুগ্রহের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।'

পিটার বলিল, 'এমন কথা বলিবেন না, আপনার ধন্যবাদে আমার আবশ্যক নাই; তবে, একবার আপনার বেহালা শুনিতে চাই বটে; এমন বেহালা আর কখনও শুনি নাই, রা-তাইয়ের নিকট হইতে পলাইয়া আসিবার সময় বেহালাখানি ভুলিয়া আসেন নাই দেখিতেছি; এখন চলুন বিশ্রাম করিবেন।'

আধঘণ্টার মধ্যেই একটি নির্জন কক্ষে আমাদের দুইজনের উপযুক্ত ভোজ্য দ্রব্য আনীত হইল। পিটার স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া আমাদের পরিবেশনের ব্যবস্থা করিতে লাগিল। আহার শেষ হইলে রেবেকা

বলিলেন, 'পিটার, তোমার সঙ্গে আমার এই সঙ্গী ভদ্রলোকটির এখনও পরিচয় হয় নাই ; উনি হিন্দুস্থানের লোক, উঁহার নাম মিঃ সেন ; উঁহার সহিত শীঘ্রই আমার বিবাহ হইবে।'

রেবেকার কথা শুনিয়া পিটার একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল, তাহার পর কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিল, 'আপনি জানেন আমার বিদ্যাবুদ্ধি অতি সামান্য; কখনও ভূগোল পড়ি নাই ; হিন্দুস্থানটা ইউরোপের কোথায় তাহা বুঝিতে পারিতেছি না, বোধহয় অনেক দূরে ; আইসল্যাণ্ড বা নিউজিল্যাণ্ডের কাছাকাছি হইবে।'

আমি হাসিয়া বলিলাম, 'না, হিন্দুস্থান ইউরোপের বাহিরে, এশিয়ায় ; কিন্তু ইংরাজ সেখানকার রাজা।'

পিটার আমার কথা শুনিয়া বোধহয় কিছু কৌতূহল অনুভব করিল, 'ইংরাজের রাজ্য ! এখান হইতে সেখানে যাইতে কয় ঘণ্টা লাগে ?'

তাহার কথা শুনিয়া আমার হাস্য সংবরণ করা কঠিন হইল ; কিন্তু পাছে সে অপদস্থ হয়, এই ভয়ে অতি কষ্টে হাস্য সংবরণ করিলাম। বলিলাম, 'এখান হইতে আমাদের দেশ যাইতে আঠার বিশ দিন লাগে।'

আমার কথা শুনিয়া বেচারা যেন আকাশ হইতে পড়িল, হাঁ করিয়া অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, 'বুঝিয়াছি, সে স্থান ল্যাপল্যাণ্ডের অন্য পারে ; সেখানে বোধ করি ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাত্রি হয় ! যাহাই হউক, পৃথিবীতে আপনার মত সুখী আর কেহই নাই ; মিস্ রেবেকাকে বিবাহ করিয়া আপনি দিবারাত্রি পেট ভরিয়া বেহালা শুনিবেন, আহার নিদ্রার অবসর থাকিবে না। কিন্তু আমি বাজে কথায় আপনাদের বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাইব না ; আপনারা পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, আপনাদের জন্য শয্যা প্রস্তুত করিতে বলিয়া আসি।'

পিটার প্রস্থান করিলে আমি রেবেকাকে বলিলাম, 'দীর্ঘ পথ ভ্রমণে তুমি বোধহয় বড় পরিশ্রান্ত হইয়াছ।'

রেবেকা বলিলেন, 'দেশে দেশে ভ্রমণই যাহার কাজ, রেল-পথে দুই একদিন চলিয়া তাহার বিশেষ পরিশ্রম হয় না; তোমার এরূপ অনুমান করিবার কারণ কি?'

আমি বলিলাম, 'বার্লিনে আমরা বোধহয় নিরাপদ নহি; আমরা যে পলাইয়াছি, রা-তাই এতক্ষণ তাহা নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছে, সম্ভবতঃ এতক্ষণ সে প্রেগ হইতে ড্রেসডেনে যাত্রা করিয়াছে; আমরা এখানে অধিক বিলম্ব করিলে সে এখানে আসিয়া আমাদিগকে ধরিয়া ফেলিতে পারে।'

রেবেকা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি এখন কি করিতে চাও?'

আমি বলিলাম, 'তুমি যদি বিশেষ পরিশ্রান্ত না হইয়া থাক, তাহা হইলে এখানে অধিক বিলম্ব না করিয়া কাল সকালে সাতটার ট্রেনেই উইটেনবার্গে যাইতে চাহি; তাহার পর আমরা হামবার্গে যাইব, সেখান হইতে কোনও জাহাজে লণ্ডনে যাত্রা করা যাইবে। রা-তাই আমাদের সন্ধান পাইবার পূর্বেই আমরা জাহাজে উঠিতে পারিব।'

আমাদের কথা শেষ হইলে পিটার সেই কক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিল, 'আপনাদের শয্যা প্রস্তুত।'

রেবেকা বলিলেন, 'আমরা প্রত্যুষে এখান হইতে চলিয়া যাইব, আমাদের আহার ও ঘর ভাড়া বাবদ তোমার যাহা প্রাপ্য হইয়াছে এখনই লইয়া রাখ।'

পিটার বলিল, 'আপনি এ কথা বলিবেন না, আপনার নিকট আমি কিছুই লইব না; এতদিন পরে যে আপনার দেখা পাইলাম ইহাই আমার যথেষ্ট পুরস্কার। আমি হোটেল করি বটে, কিন্তু আমারও হৃদয় আছে; আজ অতিথি সৎকার করিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম; যদি আমাকে কিছু পুরস্কার দিতে চান, তবে দয়া করিয়া একটু বেহালা শুনান।'

আমি বলিলাম, 'উহার নিকট কিছু না লও, আমার কাছে খানার দাম লও, না লইলে তুমি বেহালা শুনিতে পাইবে না।'—আমি পিটারের হস্তে কয়েকটি টাকা দিলাম।

টাকা কয়টি লইয়া পিটার ক্ষুণ্ণভাবে বলিল, 'এ টাকা আমি হোটেলের তহবিলে জমা করিব না, আমার পাচকদের বকশিশ দিব। মিস্ কোহেনের সহিত যখন আপনার বিবাহ স্থির হইয়াছে, তখন আপনিও আমার বন্ধু ; বন্ধুর নিকট কিছু লওয়া আমি সঙ্গত মনে করি না, কেবল দায়ে পড়িয়াই লইলাম।'

দেখিলাম পিটার সাধারণ হোটেলওয়ালার মত নহে। লোকটি বেশ সরলহৃদয় ও রসিক, গীতবাদ্যে তাহার অত্যন্ত অনুরাগ। বেহালা শুনিবার আশায় সে দেওয়ালে পিঠ রাখিয়া তাল গাছের মত সোজা হইয়া দাঁড়াইল। রেবেকা বুঝিলেন, সে একটু বেহালা না শুনিয়া সেখান হইতে নড়িবে না, অগত্যা তাঁহাকে দুইটা গৎ বাজাইতে হইল। রেবেকার বেহালা আমি অনেকবার শুনিয়াছি ; প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, সায়ংকালে. সকল সময়েই শুনিয়াছি ; কিন্তু কখনও তাহা পুরাতন হইল না, আমার কর্ণে চিরদিনই তাহা নূতন ; আমি স্থান কাল,সঙ্কটজনক অবস্থা, সমস্তই ভুলিয়া তদগতচিত্তে সেই সুধাময় মোহন সঙ্গীত শ্রবণ করিতে লাগিলাম। পিটার বেহালা শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া বেহালার তালে তালে মাথা নাড়িতে লাগিল, অবশেষে সে ভাবাবেগে বিহ্বল হইয়া দুই হাত তুলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। বাদ্য শেষ হইলে পিটার নৃত্য বন্ধ করিয়া বলিল, 'এমন আর কখনও শুনিব না, বহুদিন পরে আজ একটু আনন্দ লাভ করা গেল।'

এক ঘুমেই রাত্রি কাটিয়া গেল, প্রভাতে উঠিয়া এক এক পেয়ালা চা খাইয়া আমরা স্টেশনে চলিলাম।

ডাকগাড়িতে যথা সময়ে আমরা উইটেনবার্গে উপস্থিত হইলাম, সেখানে একখানি দৈনিক সংবাদপত্র ক্রয় করিয়া রেবেকাকে তাহা পাঠ করিতে দিলাম ; তাহা পাঠ করিতে করিতে রেবেকার মুখ সহসা বিবর্ণ হইয়া উঠিল। আমি তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ করিয়া জিজ্ঞাসা

করিলাম, 'হঠাৎ তোমার মুখ এমন গম্ভীর হইয়া উঠিল কেন, রেবেকা?'

রেবেকা কাগজ হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিলেন, 'ভয়ানক দুঃসংবাদ। টেলিগ্রামে দেখিতেছি, তুরস্ক দেশে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সহস্রাধিক লোক প্লেগ রোগে আক্রান্ত হইয়াছে; প্লেগের আক্রমণ ওডেসা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। পরবর্তী টেলিগ্রামে দেখিতেছি, ভিয়েনা নগরেও প্লেগ দেখা দিয়াছে। সেদিন রাত্রে যে সম্ভ্রান্ত বন্ধুর গৃহে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল, তিনি পর্যন্ত প্লেগে শয্যাগত!'

আমি বলিলাম, 'অতি দুঃসংবাদ! অবস্থা দেখিয়া বোধ হইতেছে; কয়েক দিনের মধ্যেই অস্ট্রিয়ার ঘরে ঘরে প্লেগ ছড়াইয়া পড়িবে। প্রেগে যখন প্লেগ দেখা দিয়াছে, তখন রা-তাই সেখানে আর এক ঘণ্টাও থাকিবে না; সে এইদিকে আসিয়া পড়িলেই আমাদের বিপদ।'

রেবেকা বলিলেন, 'কিন্তু সে এদিকে আসিতে আসিতে আমরা জাহাজে চড়িয়া ইংলণ্ডের কাছাকাছি উপস্থিত হইতে পারিব; তবে রা-তাইকে বিশ্বাস নাই, ইচ্ছা করিলে সে অসাধ্য সাধন করিতে পারে।'

আমি বলিলাম, 'এখন সে কথা ভাবিয়া আর ফল কী? পরমেশ্বর আমাদিগের প্রতি চিরদিন বিমুখ থাকিবেন এরূপ মনে হয় না। ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া আমাদের বিবাহটা যাহাতে তাড়াতাড়ি শেষ হইয়া যায় তাহা করিতেই হইবে: কিন্তু তুমি মধ্যে মধ্যে এমন অন্যমনস্ক হইতেছ কেন?'

রেবেকা বলিলেন, 'সে কথা আমি তোমাকে ঠিক বুঝাইতে পারিব না। বার্লিন ত্যাগের পর হইতেই কে যেন পশ্চাৎ হইতে আমাকে ক্রমাগত আকর্ষণ করিতেছে, কোন অজ্ঞাত কারণে আমার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে, কোন প্রকারে আমি মন সংযত করিতে পারিতেছি না।'

আমি বলিলাম, 'জাহাজে না উঠিলে আর তোমার মন নিরুদ্বেগ হইবে না; কল্য এতক্ষণ বোধহয় আমরা সমুদ্রে ভাসিব।'

উইটেনবার্গে আমাদিগকে অধিক কাল প্রতীক্ষা করিতে হইল না। আহারাদি শেষ করিয়া বেলা নয়টার পূর্বেই হামবার্গে উপস্থিত হইলাম; কিন্তু রেবেকার অবস্থা দেখিয়া বড়ই চিন্তিত হইলাম; তাঁহার প্রফুল্লতা, উৎসাহ ক্রমে অন্তর্হিত হইতে লাগিল; তাঁহার মুখ মলিন ও বিবর্ণ হইয়া উঠিল, এবং অবশেষে তাঁহার বসিয়া থাকিতেও কষ্ট হইল।

আমি উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'রেবেকা, তোমার অসুখ হইয়াছে কি?'

রেবেকা বলিলেন, 'আমার শরীর বড় ভাল নাই, মাথা অত্যন্ত ঘুরিতেছে; বোধহয় দীর্ঘ পথভ্রমণেই এরূপ হইয়াছে, মনের উৎসাহে প্রথম পথের কষ্ট বুঝিতে পারি নাই। যাহা হউক, তুমি আমার জন্য চিন্তিত হইও না, কয়েক ঘণ্টা ঘুমাইলেই বোধহয় সুস্থ হইতে পারিব।'

রেবেকার কথা শুনিয়া মনে বড় ভরসা পাইলাম না, পথশ্রমে তিনি যে এত কাতর হইয়াছেন ইহা বিশ্বাস হইল না। যাহা হউক, হামবার্গ স্টেশনে একখানি ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিয়া কন্টিনেণ্টাল হোটেলে উপস্থিত হইলাম। হোটেলে পদার্পণ করিয়াই রেবেকার আর দাঁড়াইবার শক্তি রহিল না, কিছু আহার না করিয়াই তিনি একটি কক্ষে শয়ন করিলেন; আমি আহারাদি শেষ করিয়া জাহাজের সন্ধানে ষ্টীমার অফিসে চলিলাম।

ষ্টীমার অফিসে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সেখানে বিন্দুমাত্র শৃঙ্খলা নাই; প্রকাণ্ড অফিস যেন শূন্য পড়িয়া আছে; কোন দিকে লোক-জনের সাড়াশব্দ নাই, অফিসের ভিতরে কেরানীদের চেয়ার খালি ও চতুর্দিক নিস্তব্ধ, যেন কোন কারণে অফিস বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

ইহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া আমি টিকিট-ঘরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম, দুইজন কেরানী মাথায় হাত দিয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া আছে। আমি একজনকে লক্ষ করিয়া জিজ্ঞাসা

করিলাম, 'মহাশয়, আপনাদের কোনও জাহাজ আজ ইংলণ্ডে যাইবে কি?'

কেরানীটি সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন? এ দেশ হইতে ইংলণ্ডে জাহাজ যাওয়া বন্ধ হইয়াছে, এ কথা কি আপনি শুনেন নাই?'

আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল! ইংলণ্ডে জাহাজ না যাইবার কারণ কি? যাহা হউক, আনি বলিলাম, 'মহাশয় আমি এ শহরে ঘণ্টাখানেক পূর্বে আসিয়াছি, ব্যাপার কি কিছুই জানি না; কিন্তু যেমন করিয়াই হউক, আজ আমাকে ইংলণ্ডে যাত্রা করিতেই হইবে।'

কেরানীটি বলিল, 'আজ এই নগরে প্লেগ দেখা দিয়াছে, বার্লিন নগরে শত শত ব্যক্তি প্লেগে শয্যাগত হইয়াছে; সেইজন্য এখানকার ব্রিটিশ কন্সল সংবাদ দিয়াছেন জর্মনীর কোন জাহাজ দ্বিতীয় আদেশ না পাইলে ইংলণ্ডের কোনও বন্দরে যাইতে পারিবে না; শুনিলাম ফ্রান্স দেশেও এই আদেশ প্রচারিত হইয়াছে; সুতরাং দুই-এক সপ্তাহের মধ্যে আপনি ইংলণ্ডে যাইতে পারিবেন, এরূপ বোধ হয় না।'

আমি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া বলিলাম, 'কিন্তু আমার যে অবিলম্বে ইংলণ্ডে উপস্থিত হওয়া চাই; আজ নিতান্ত না হয়, কল্য যাইতেই হইবে।'

কেরানীটি বলিল, 'তাহা হইলে আপনাকে উড়িয়া যাইতে হইবে, অন্য উপায় নাই; এখান হইতে কবে জাহাজ ছাড়িবে তাহা বলিতে পারি না।'

আমি হতাশভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তবে কি লণ্ডনে যাইবার কোনও উপায় নাই?'

কেরানী বলিল, 'উড়িয়া যাওয়া ভিন্ন কোনও উপায় দেখিতেছি না। কিন্তু দুঃখের বিষয় মনুষ্যের উড়িবার যন্ত্র এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই, তবে পরীক্ষা চলিতেছে বটে। এখন কোন জাহাজেরই ইংলণ্ডের সীমায় যাইবার উপায় নাই; সুবিধা থাকিলে আমরাও

ইংলণ্ডে পলায়ন করিতাম, সে পথ বন্ধ বলিয়াই চুপ করিয়া এখানে বসিয়া আছি।'

আমি হতাশ হৃদয়ে হোটেলে ফিরিলাম। এখানে যদি আমাদের কয়েক দিন বিলম্ব হয় তাহা হইলে রা-তাই আমাদের সন্ধানে নিশ্চয়ই এখানে উপস্থিত হইবে; কিরূপে তাহার কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিব স্থির কারতে পারিলাম না। আরও একটি গুরুতর আশঙ্কা ছিল; হোটেলে আসিয়াই রেবেকা অসুস্থ হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহার এই অসুস্থতা যদি প্লেগের পূর্বলক্ষণ হয়, তবে তাহাকে লইয়া কি করিব, কোথায় যাইব?—আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিলাম; অত্যন্ত ব্যস্তভাবে হোটেলে প্রত্যাগমন করিয়া রেবেকার শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত হইলাম। তাঁহার শরারের অবস্থা কিরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, তিনি অনেকটা ভাল আছেন, কিছুকাল বিশ্রাম করিলে শরীর সুস্থ হইতে পারে।

অল্পক্ষণ পরে হোটেলের ম্যানেজারের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। এই স্থান ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে যাইবার কোনও উপায় আছে কি না তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, 'আপনারা অতি দুঃসময়ে এখানে আসিয়া পড়িয়াছেন, এখানেও প্লেগ দেখা দিয়াছে; প্রায় এক ঘণ্টা পূর্বে সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের একজন ডাক্তারের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাঁহার মুখে শুনিলাম, দুই ঘণ্টার মধ্যে দশ বার জন লোক এই শহরে প্লেগে আক্রান্ত হইয়াছে। সংবাদপত্রে পাঠ করিলাম, তুরস্কে ও রুশিয়ায় প্রতিদিন সহস্র সহস্র লোকের মৃত্যু হইতেছে; ভিয়েনা নগরে প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই প্লেগ প্রবেশ করিয়াছে; ড্রেসডেন ও বার্লিন নগরের অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়; ফ্রান্স দেশ ভাল ছিল, কিন্তু সেখান হইতেও প্লেগের আক্রমণ-সংবাদ আসিয়াছে। কেবল সমুদ্রমধ্যবর্তী ইংলণ্ডে এখনও প্লেগ প্রবেশ করে নাই; তবে, ইউরোপের আর সর্বত্র যখন এই ভীষণ ব্যাধি বিস্তৃত হইয়াছে, তখন ইংলণ্ড যে দীর্ঘকাল ইহার আক্রমণ হইতে মুক্ত থাকিবে এরূপ অনুমান হয় না। কিন্তু

ইংলণ্ডের রাজ-পুরুষগণ অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন, প্লেগাক্রান্ত দেশের কোনও জাহাজ ইংলণ্ডের কোন বন্দরে যাইতে পারিতেছে না। আপনারা তো বিদেশী লোক, কোন উপায়ে এদেশ ছাড়িতে পারিলেই আপনারা নিরাপদ হইবেন; আমাদের বিপদই সর্বাপেক্ষা অধিক; ঘর বাড়ি ছাড়িয়া আমরা কোথায় পালাইব?'

'আমাদের সকলেরই সমান বিপদ।' এই বলিয়া আমি পুনর্বার রেবেকার কক্ষে প্রবেশ করিলাম। তিনি উঠিয়া বাতায়নের কাছে বসিয়া আছেন, কিন্তু তাঁহার মুখ দেখিয়া আমার আতঙ্ক শতগুণ বর্ধিত হইল: আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'রেবেকা, তোমার অসুখ কি বাড়িয়াছে?'

রেবেকা অস্ফুট স্বরে বলিলেন, 'আস্তে কথা বল, দেখিতেছ না, রা-তাই আসিতেছে!'

দেখিলাম রেবেকার চক্ষু কপালে উঠিয়াছে, সুন্দর মুখখানিতে কালি পড়িয়া গিয়াছে; তিনি উন্মাদিনীর ন্যায় বিস্ফারিত নেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'হাঁ, রা-তাই আসিতেছে, আর আমাদের পালাইবার উপায় নাই; আমি দেখিতেছি, সে হোটেলের সম্মুখে আসিয়াছে।'

ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া রেবেকা পুনর্বার বলিলেন, 'এইবার রা-তাই হোটেলে প্রবেশ করিল!'

আবার একটু থামিয়া রেবেকা বলিলেন, 'রা-তাই আমাদের এই ঘরে আসিতেছে, আর রক্ষা নাই!'—সহসা সেই কক্ষের দ্বারে কে ধাক্কা দিল; সঙ্গে সঙ্গে রেবেকার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল। আমি তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ধরিলাম, তাহার পর মস্তক ফিরাইয়া দ্বারের দিকে চাহিলাম, দেখিলাম রা-তাই লাঠিতে ভর দিয়া প্রস্তর-মূর্তির ন্যায় আমাদের অদূরে দণ্ডায়মান।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

আমি প্রায় দুই মিনিট কাল মূর্ছিতা রেবেকাকে ধরিয়া স্তম্ভিতভাবে সেই স্থানে দণ্ডায়মান রহিলাম; আমার পদদ্বয় যেন মৃত্তিকায় প্রোথিত হইল, রা-তাইকে কি বলিয়া সম্ভাষণ করিব স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না; রা-তাই অচঞ্চল দৃষ্টিতে নির্বাকভাবে কিছুকাল আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তখন আমার মনে যে ভাব হইয়াছিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করি এরূপ আমার শক্তি নাই।

রা-তাই প্রায় দুই মিনিট পরে আমাকে বলিল, 'মিঃ সেন, তোমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় অত্যন্ত খুশি হইলাম; তুমি আমার অতিথি হইয়া আমার পালিতা কন্যাকে অপহরণ পূর্বক যেভাবে পালাইয়া আসিয়াছ, এরূপ পলায়ন সকলের সাধ্যে নহে; সকলে এভাবে আতিথ্যের মর্যাদাও রাখিতে পারে না; তুমি পূর্ব দেশের লোক, কিন্তু তোমার সাহসে ইউরোপের লোকও লজ্জা পাইতে পারে! ইউরোপেও অনেক যুবক সম্ভ্রান্ত ঘরের যুবতীদের ফুসলাইয়া কুলের বাহির করে বটে, কিন্তু ইউরোপে তোমার তুলনা মিলিবে না। যাহা হউক, এ বৃদ্ধকে তুমি ফাঁকি দিতে পার নাই; তোমার মনের ভাব আমি পূর্বেই বুঝিয়াছিলাম, সেইজন্য সাবধানও হইয়াছিলাম। তোমরা ভাবিয়াছিলে আমি তোমাদের অনুসরণ করিবার পূর্বেই তোমরা সাগর লঙ্ঘন করিবে, আর আমি তোমাদের ধরিতে পারিব না; কিন্তু এখানে আসিয়া দেখিতেছ, লম্ফ প্রদান না করিলে সাগর লঙ্ঘনের উপায় নাই!'

আমি কঠোর স্বরে বলিলাম, 'মহাশয়, দেখিতেছেন না রেবেকার জীবন-সংশয় উপস্থিত; আপাততঃ রক্তৃতা বন্ধ করিয়া যেরূপে তাহার প্রাণ রক্ষা হয় তাহাই করুন।'

আমার কথা শুনিয়া বৃদ্ধ এক লম্ফে আমার পাশে আসিয়া

দাঁড়াইল, উত্তেজিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি বলিতেছ কি? কি হইয়াছে দেখি!'

রা-তাই রেবেকাকে ধরিয়া তাঁহার সংজ্ঞাহীন দেহ অতি সাবধানে কোচের উপর রাখিল, তাহার পর এক মিনিট কাল তাঁহার ধমনীর বেগ পরীক্ষা করিল।

রা-তাই হঠাৎ সিংহের ন্যায় গর্জন করিয়া উঠিল; ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, 'তুমি অতি নির্বোধ, তোমার দোষেই এই বিপদ উপস্থিত; রেবেকার কি অসুখ তাহা এখনও বুঝিতে পার নাই?'

আমি জড়িত স্বরে বলিলাম, 'না, কি হইয়াছে?'

রা-তাই বলিল, 'প্লেগ। তুমি আমার অজ্ঞাতসারে রেবেকাকে লইয়া এভাবে পালাইয়া না আসিলে কখনই এ বিপদ ঘটিত না; রেবেকার যদি মৃত্যু হয়, তবে সেজন্য তুমিই দায়ী!'

রা-তাইয়ের কথা শুনিয়া আমার সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল; বক্ষের স্পন্দন থামিয়া গেল, আমার শ্রবণ-বিবরে যেন প্রলয়ের ঝটিকার শব্দ প্রবেশ করিতে লাগিল। আমি ব্যাকুলভাবে বলিলাম, 'এখন উপায় কি? আপনি রেবেকাকে রক্ষা করুন; আমি জানি আপনার সে শক্তি আছে; আপনি রেবেকার প্রাণদান করিলে আমি চিরজীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব, কখনও আপনার অবাধ্য হইব না।'

রা-তাই বলিল, 'এই ভীষণ রোগের একটিমাত্র ঔষধ আছে; সেই ঔষধ প্রয়োগ ভিন্ন প্লেগের অন্য চিকিৎসা নাই; কিন্তু রোগাক্রান্ত হইবার অল্পকাল পরেই সেই ঔষধ উদরস্থ হওয়া আবশ্যক, নতুবা তাহার প্রয়োগ নিষ্ফল। ঔষধটি আমার সঙ্গে নাই, এখানকার কোনও ডিসপেন্সারিতে পাওয়া যাইবে কি না জানি না; যাহা হউক, আমি প্রেসক্রিপশন লিখিয়া দিতেছি, যেখান হইতে পার ঔষধটা সংগ্রহ করিয়া আন।'

রা-তাই তাড়াতাড়ি প্রেসক্রিপশন লিখিয়া তাহা আমাকে দিল, বলিল, 'এক ঘণ্টার মধ্যে ঔষধ আনিতে না পারিলে সে ঔষধে কোনও ফল হইবে না, ইহা স্মরণ রাখিও।'

বৃদ্ধ বলিলেন, 'আপনি চেষ্টা করিয়া যে এই ঔষধদুটি মিলাইতে পারিবেন, এরূপ বোধ হয় না, সমস্ত দিন শহরে ঘুরিলেও আপনার কৃতকার্য হইবার আশা অল্প; আমার একটি বন্ধু নূতন ডাক্তার হইয়াছেন, দুষ্প্রাপ্য ঔষধ সংগ্রহ করিয়া রাখা তাঁহার একটা বাতিক; আপনি বসুন, তাঁহার কাছে একবার সন্ধান করিয়া আসি।'

বৃদ্ধ আমাকে কথা বলিবার অবসর না দিয়াই দোকান হইতে দ্রুত নামিয়া চলিলেন। আমি সেই ডিসপেনসারির বারান্দায় অধীর-ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, এক এক মিনিট এক এক ঘণ্টার মত দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল। ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম, এক ঘণ্টার আর দশ মিনিট মাত্র বাকি আছে।—এই দশ মিনিটের মধ্যে রেবেকাকে ঔষধ সেবন করাইতে না পারিলে তাঁহার জীবনের আশা ত্যাগ করিতে হইবে।

তিন মিনিট-মধ্যে বৃদ্ধ ব্যস্তভাবে দুইটি বোতল লইয়া ডিসপেন-সারিতে প্রত্যাগমন করিলেন; আমাকে বোতলদুটি দেখাইয়া বলিলেন, 'সমস্ত হামবার্গ খুঁজিলেও আপনি ইহা সংগ্রহ করিতে পারিতেন না।'

বৃদ্ধ আমার ধন্যবাদের অপেক্ষা না করিয়াই তাড়াতাড়ি ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রেসক্রিপশনখানিও ফেরত দিলেন; আমি তাহা লইয়া আমার পকেট হইতে সোনার ঘড়িটি বাহির কারয়া বৃদ্ধের সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিলাম; বলিলাম, 'আপনি আমার যে মহা উপকার করিলেন তাহার স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ ইহা আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে।'

বৃদ্ধ অবাক হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিলেন, কিন্তু তিনি কোনও কথা বলিবার পূর্বেই আমি পথে আসিয়া দাঁড়াইলাম, এবং তৎক্ষণাৎ একখানি ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিয়া যথাসাধ্য দ্রুতবেগে হোটেলে চলিলাম। তখন এক ঘণ্টা পূর্ণ হইতে যৎসামান্য বিলম্ব ছিল।

হোটেলে উপস্থিত হইয়া আমি হাঁপাইতে হাঁপাইতে রেবেকার

কক্ষে প্রবেশ করিলাম ; রা-তাই ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, 'ঔষধ পাইয়াছ কি ?'

আমি বলিলাম, 'হাঁ পাইয়াছি, বহু কষ্টে পাইয়াছি।'

রা-তাই ঔষধের শিশি হাতে লইয়া বলিল, 'আর পাঁচ মিনিট বিলম্ব হইলে ঔষধ আনা না-আনা সমান হইত ; এখন আমাদিগকে খুব সাবধানে থাকিতে হইবে ; কথাটা অত্যন্ত গোপনে রাখিতে হইবে ; এখানে প্লেগের রোগী আছে,—এ কথা প্রকাশ হইলেই সর্বনাশ ! রেবেকাকে তৎক্ষণাৎ বলপূর্বক হাসপাতালে লইয়া যাইবে ; হাসপাতালে কোনরূপেই তাহার প্রাণরক্ষা হইবে না, দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু অনিবার্য।—এই ঔষধ সেবনে যদি ফল হয় তাহা হইলে এক ঘণ্টার মধ্যেই তাহার নিদ্রা আসিবে।'

আমি ব্যগ্রভাবে বলিলাম, 'আপনি এখনও কথা কহিতেছেন ? আগে ঔষধটা খাওয়াইয়া তাহার পর আপনার যাহা বলিবার থাকে বলিবেন।'

আমাকে কক্ষান্তরে যাইতে বলিয়া রা-তাই রেবেকার কক্ষের দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

সন্ধ্যার পর রা-তাই সেই কক্ষ হইতে বাহির হইলে, আমি তাহাকে অধীরভাবে রেবেকার অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম।

রা-তাই বলিল, 'আর ভয় নাই। কিন্তু এমন রোগে মানুষ প্রায়ই বাঁচে না ; ঠিক সময়ে আমি এখানে আসিয়া না পড়িলে তুমি রেবেকাকে কোনও মতে বাঁচাইতে পারিতে না।'

আমি বলিলাম, 'তাহা হইলে আমিও বোধহয় বাঁচিতাম না। রোগেই হউক আর শোকেই হউক, আমার মৃত্যু হইত।'

রা-তাই হাসিয়া বলিল, 'তোমার মত দুর্বল প্রকৃতির লোক কথায় কথায় মরে ; যেমন অল্পে মরে, সেইরূপ অল্পেই বাঁচে। যাহা হউক, আশা করি তুমি এবার যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিয়াছ, ভবিষ্যতে আর কখনও আমার সঙ্গে চালাকি করিতে যাইও না ; তাহা হইলে ইহা অপেক্ষাও কঠোর শাস্তি পাইবে।'

রা-তাই বলিল, 'সে কথা আমি বলিতে পারি না ; জানিয়া রাখ, রাত্রি বারোটার সময় আমি জাহাজে উঠিব ; যদি আমার এই আদেশ পালনে অসমর্থ হও, তাহা হইলে তুমি যে দণ্ড পাইবে তাহার কথা বলিয়া তোমাকে এখন ভীত করিব না। আমি কন্টিনেণ্টাল হোটেলের ২৬ নম্বর ঘরে আছি, সকল আয়োজন শেষ করিয়া সেখানে আমাকে সংবাদ দিও।'

কাপ্তেন আর অসম্মতি প্রকাশ করিতে সাহস করিল না, বিমর্ষ-ভাবে বলিল, 'যেরূপ অসুবিধায় জাহাজ লইয়া যাইতে হইবে তাহাতে ভাড়া সম্বন্ধে আপনার বিবেচনা কবা আবশ্যক।'

রা-তাই বলিল, 'এ ভার তোমার উপর দিলাম, তুমি যে ভাড়া ঠিক করিয়া দিবে আমি তাহাই দিব ; তবে, আমি যেখানে বলিব সেইখানেই জাহাজ লাগানো চাই। আর এক কথা, এখানকার ইংরাজ কর্মচারীরা ইহার সন্ধান না পায়, সে জন্য এ কথা গোপন রাখিবে।'

কাপ্তেন জনসনের গৃহ হইতে আমরা হোটেলে প্রত্যাগমন করিলাম। এক ঘণ্টা পরে কাপ্তেনের একজন ভৃত্য রা-তাইয়ের নিকট একখানি পত্র লইয়া গেল ; রা-তাই পত্র পাঠ করিয়া আমাকে বলিল, 'কাপ্তেন জনসন সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়াছে, আমাদের জন্য "নাইটিঙ্গেল" জাহাজ ভাড়া হইয়াঝে। আজ রাত্রি বারোটার সময় আমরা জাহাজ উঠিলে, জাহাজ ছাড়িবার পঞ্চাশ ঘণ্টা পরে আমরা ইংলণ্ডে উপস্থিত হইব : ইহাতে বোধহয় তোমার আপত্তি নাই!'

রা-তাইয়ের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া আমি স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিলাম ; জর্মানপতি কৈশরের পক্ষে যে কার্য অসম্ভব—রুশিয়ার যথেচ্ছাচারী জার যে কার্যে অসমর্থ, রা-তাই অবলীলাক্রমে তাহা সম্পন্ন করিতে পারে। কোন্ শক্তির সাহায্যে সে অঙ্গুলি-সঙ্কেতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে দাসের ন্যায় পরিচালিত করিতেছে, কে বলিবে?

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রভাতে সূর্যোদয়ের পর নিদ্রাভঙ্গে দেখিলাম, আমরা অকুল সমুদ্রে ভাসিতেছি। 'নাইটিঙ্গেল' জাহাজখানি বৃহৎ নহে, তেমন দ্রুতগামীও নহে ; শুনিলাম একটি ইহুদি কোম্পানী এই জাহাজের মালিক। শয্যা ত্যাগ করিয়া কামরার বাহিরে আসিলে জাহাজের কাপ্তেনের সহিত সাক্ষাৎ হইল ; কিন্তু সে কোন্ দেশের লোক, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। শুনিলাম লোকটা ইংরাজ, কিন্তু তাহাকে দেখিয়া বা তাহার কথা শুনিয়া ইংরাজ বলিয়া বোধ হইল না ; তাহার ইংরাজী উচ্চারণও ইংরাজের মত নহে ; সে ইউরোপের নানা ভাষায় কথা কহিতে পারে, কিন্তু কোন্‌টি তার মাতৃভাষা, উচ্চারণ শুনিয়া তাহা স্থির করা কঠিন। অনেক জাহাজের কাপ্তেন বাল্যকাল হইতে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত ক্রমাগত সমুদ্রে ঘুরিয়া বেড়ায়, সমুদ্রই তাহাদের ঘরবাড়ী, এবং সকল দেশই তাহারা সমান মনে করে ; দরকার মত দুই-এক বোতল উৎকৃষ্ট সুরা ও পেট ভরিয়া খাবার পাইলেই তাহারা মহা সুখী ; পৃথিবী রসাতলে যাউক, তাহাতেও তাহাদের আপত্তি নাই।

নিদ্রাভঙ্গে আমার হৃদয় নানা চিন্তায় আলোড়িত হইতে লাগিল ; ভাবিলাম, ইংলণ্ডে যাইতেছি, কিন্তু সেখানে গিয়া রেবেকার সহিত কোনও সম্বন্ধ থাকিবে কি-না অনুমান করা কঠিন ; রা-তাই এভাবে আসিয়া না পড়িলে আমি রেবেকাকে ইংলণ্ডে লইয়া গিয়া বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারিতাম, কিন্তু এখন সে সম্ভাবনা বড় অল্প। রেবেকাকে রা-তাইয়ের কবল হইতে উদ্ধার করিবার উপায় কী, বিস্তর চিন্তাতেও তাহা স্থির করিতে পারিলাম না।

প্রভাতে ভোজন-কক্ষে বসিয়া আমি একাকী চা খাইলাম ; রেবেকা অসুস্থ, তিনি তাঁহার শয়ন-কক্ষ হইতে উঠিয়া আসিতে পারিলেন না। রা-তাইয়ের কামরার দরজা বন্ধ দেখিলাম। চা-পান

শেষ করিয়া আমি দিগন্তের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম, সমস্ত জীবনটা ব্যর্থ মনে হইতে লাগিল।

মধ্যাহ্নে রা-তাই ডেকে আসিল ; দেখিলাম আজ সে বড় প্রফুল্ল ; পরের সর্বনাশ-সাধনের কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলেই শয়তানটা বড় প্রফুল্ল হইত, সুতরাং তাহার প্রফুল্লতায় আমার মনে কেমন আতঙ্ক উপস্থিত হইল ; মনে হইল, হয়ত সে আবার আমাকে নূতন বিপজ্জালে জড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। স্থির করিলাম, এখন হইতে আর তাহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিব না, বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন কথাও কহিব না।

আমাকে ডেকে উপবিষ্ট দেখিয়া রা-তাই একখানি চেয়ার টানিয়া আমার পাশে বসিয়া পড়িল, তাহার পর প্রফুল্লভাবে আমাকে বলিল, 'মিঃ সেন, দুই দিনের মধ্যেই তুমি ইংলণ্ডে পদার্পণ করিবে। আমি হঠাৎ না আসিলে তুমি এত শীঘ্র ইংলণ্ডে যাত্রা করিতে পারিতে না, রেবেকার জীবন রক্ষা হইত না, তুমিও প্লেগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে ; আমার নিকট যে উপকার পাইয়াছ, সেজন্য তোমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কতক লোক দেখিয়া শেখে, অনেকে ঠেকিয়া শেখে, তুমি উভয় শিক্ষাই পাইয়াছ ; ইহার পরও যদি তুমি বিশ্বাসঘাতকতা কর, তবে তাহার ফল বিশেষ সুখকর হইবে না। যাহা হউক, তুমি যে রেবেকাকে ভালবাসিয়াছ, ইহাতে আমি বড় আনন্দ লাভ করিয়াছি।'

অল্পক্ষণ পূর্বে স্থির করিয়াছিলাম রা-তাইয়ের সঙ্গে কথা কহিব না ; কিন্তু তাহার এই শেষ কথাটি শুনিয়া আমি কৌতূহল দমন করিতে পারিলাম না, বলিলাম, 'আমি রেবেকাকে ভালবাসি, ইহাতে আপনার আনন্দিত হইবার কারণ কি বুঝিতে পারিলাম না।'

রা-তাই স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, 'তোমাদের এই প্রণয়ে আমার বিস্তর সুবিধা হইবে। আমি কি জন্য প্রফুল্ল হইয়াছি তাহা বুঝিতে না পারিয়া তুমি অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছিলে, সেইজন্য এ কথা তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনার কি সুবিধা হইবে ?'

রা-তাই বলিল, 'তোমরা উভয়েই পরস্পরকে প্রাণের অধিক ভালবাস ; রেবেকা আমার সকল আদেশ নতশিরে পালন করে, কিন্তু তুমি কখন-কখন আমার অবাধ্য হও ; রেবেকার প্রতি প্রেমের অনুরোধে তোমার এই ঔদ্ধত্য কালে দূর হইবে, ভবিষ্যতে তুমি আর আমার অবাধ্য হইতে সাহস করিবে না।'

আমি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম ; উত্তেজিত স্বরে বলিলাম, 'রা-তাই সাহেব, দেখিতেছি আপনি আমাকে পাইয়া বসিয়াছেন, শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন করিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতেছেন ! আপনি আমাকে এভাবে ভয় দেখাইবেন না। আপনি কেন আমার সহিত এরূপ অভদ্র ব্যবহার করিতেছেন ?'

রা-তাইও চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল, কিন্তু কিছুমাত্র উত্তেজিত না হইয়া ধীরভাবে বলিল, 'তোমার এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমি অনাবশ্যক মনে করি ; তবে এইমাত্র স্মরণ রাখিও, যতক্ষণ তুমি আমার অনুগত ও আজ্ঞাবহ থাকিবে, ততক্ষণ তোমার মঙ্গল ; কিন্তু আমার অবাধ্য হইলে, কিংবা আমার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলে তোমার মঙ্গল নাই; তোমাকে আমি ক্ষুদ্র কীটের ন্যায় টিপিয়া মারিব !'

রা-তাই আমার প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ডেক পরিত্যাগ করিল, আমি হতবুদ্ধির ন্যায় বসিয়া রহিলাম।

সমস্ত দিন রা-তাইয়ের সহিত আমার আর সাক্ষাৎ হইল না ; সে দরজা বন্ধ করিয়া একাকী তাহার কামরায় কি করিতে লাগিল, বুঝিতে পারিলাম না। সন্ধ্যার সময় রা-তাই দরজা খুলিয়া জাহাজের কাপ্তেনকে তাহার কেবিনে ডাকিয়া পাঠাইল। প্রায় পনের মিনিট পরে কাপ্তেন রা-তাইয়ের কামরা হইতে বাহির হইয়া আসিলে দেখিলাম, তাদের মুখখানি অত্যন্ত বিমর্ষ এবং চক্ষুতে ভয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট। আমি তাহার ভয়ের কারণ বুঝিতে পারিলাম না।

রা-তাইয়ের সহিত কথান্তর হওয়ায় সেদিন আমার মন অত্যন্ত অপ্রসন্ন ছিল ; রাত্রে একাকী আহার করিয়া আমার কেবিনে

শয়নান্তে নিদ্রার আরাধনা করিতেছি, এমন সময় কে দরজায় ধাক্কা দিল।

আমি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দেখি, জাহাজে কাপ্তেন ; সে নিম্ন স্বরে বলিল, 'মহাশয়, আমি আপনার সঙ্গে একটু পরামর্শ করিতে আসিয়াছি, বড়ই বিপদ উপস্থিত !'

আমি সঙ্কুচিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি বিপদ ? জাহাজ কি চড়ায় ঠেকিয়াছে, না অন্য কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে ?'

কাপ্তেন বলিল, 'সেরূপ কোনও বিপদ হইলে আমি এত ভাত হইতাম না ; পরমেশ্বরের মনে কি আছে বলিতে পারি না, আমাদের জাহাজে প্লেগ দেখা দিয়াছে !'

কাপ্তেনের কথা শুনিয়া আমি স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম, অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার কথা বাহির হইল না, ভয়ে বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল। অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি বলেন কি ? কয়জনের প্লেগ হইয়াছে ? আপনি কখন ইহা প্রথম জানিতে পারিলেন ?'

কাপ্তেন বলিল, 'আজ সকালে জানিতে পারিয়াছি। প্রত্যূষে আমাদের বাবুর্চি ও সর্দার-খানসামা প্লেগে আক্রান্ত হয় ; খানসামা নয়টার পূর্বেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে, মৃতদেহ সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়াছি। বাবুর্চির অবস্থাও শোচনীয়, দুই এক ঘণ্টার মধ্যে সে-ও বোধহয় মরিবে। ভয়ে আমার প্রাণ উড়িয়া গিয়াছে ; দেশে আমার স্ত্রী পুত্র আছে, আমি ভিন্ন তাহাদের প্রতিপালন করিবার আর কেহই নাই। কি কুক্ষণেই যে জাহাজ ছাড়িয়াছিলাম, এবার বোধহয় আমাদের কাহারও রক্ষা নাই। এখন কি সদ্যুক্তি তাহাই বলুন।'

আমি কয়েক মিনিট কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর বলিলাম, 'আমি তো কোন উপায় দেখিতেছি না, আপনি রা-তাই সাহেবের নিকট না গিয়া আমার কাছে কেন আসিয়াছেন ? তাঁহাকেই প্রথম সংবাদ দেওয়া উচিত ছিল।'

কাপ্তেন বলিল, 'তিনি অতি ভয়ানক লোক, একথা তাঁহার নিকট

প্রকাশ করিতে আমার সাহস হয় না ; আজ অকারণে তিনি আমাকে যেরূপ তিরস্কার করিয়াছেন, জীবনে কখনও কাহারও এমন তিরস্কার সহ্য করি নাই। আমার অপরাধ, জাহাজ জোরে চলিতেছে না। আমি কি জাহাজ টানিয়া লইয়া যাইতেছি? এ জাহাজে এ পর্যন্ত অনেক আরোহী উঠিয়াছে, কিন্তু এমন অদ্ভুত লোক আর কখনও দেখি নাই!'

আমি বলিলাম, 'আমি আপনাকে কোনও সদুপদেশ দিতে পারিতেছি না ; আজ রাত্রে আবার কাহাকে যে প্লেগে ধরিবে তাহার নিশ্চয়তা নাই, ঈশ্বর যাহা করেন তাহাই হইবে।'

আমার কথা শেষ না হইতেই আমার কেবিনের দ্বারদেশে একজন খালাসীর আবির্ভাব হইল ; তাহাকে দেখিয়া কাপ্তেন একটু দূরে *সরিয়া গিয়া তাহার সঙ্গে কি আলাপ করিল, এবং দুই-এক মিনিট* পরে আমার নিকট ফিরিয়া আসিয়া জড়িত স্বরে বলিল, 'সত্যই আমাদের সর্বনাশ উপস্থিত! আমাদের ইঞ্জিনিয়ারকেও প্লেগে ধরিয়াছে, এইমাত্র খালাসী আমাকে সংবাদ দিয়া গেল। এইভাবে যদি আমাদের সকলকেই একে একে প্লেগে ধরে, তাহা হইলে জাহাজ চালাইবার আর লোক থাকিবে না।'

ইঞ্জিনিয়ারের প্লেগের সংবাদ শুনিয়া আমার আতঙ্কের সীমা রহিল না ; কাপ্তেনকে বিদায় করিয়া কিংকর্তব্য সম্বন্ধে রা-তাইয়ের সহিত পরামর্শ করিতে চলিলাম ; কিন্তু তাহার কেবিন পর্যন্ত যাইতে হইল না, ডেকের উপরেই তাহার সাক্ষাৎ পাইলাম। কাপ্তেনের নিকট যে সকল কথা শুনিয়াছিলাম, তাহা আনুপূর্বিক রা-তাইয়ের গোচর করিলাম।

রা-তাই সম্পূর্ণ অচঞ্চলভাবে আমার কথাগুলি শুনিল, তাহার পর বলিল, 'জাহাজে যখন প্লেগ দেখা দিয়াছে. তখন আমরাও যে তাহার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব, এ আশা অল্প ; এক জনের প্লেগ হইবামাত্র আমাকে সে সংবাদ না দিয়া কাপ্তেন বড় অন্যায় করিয়াছে, এখন সে তাহার উপযুক্ত দণ্ডভোগ করুক। আমি

এখনই প্লেগাক্রান্ত রোগীদের অবস্থা দেখিয়া আসিতেছি। জাহাজের কর্মচারীগণের মধ্যে অধিক লোকের প্লেগ হইলে জাহাজ লইয়া যাওয়া কঠিন হইবে; যাহাতে সেই অসুবিধা না ঘটে, অবিলম্বে তাহার উপায় করিতে হইবে।'

রা-তাই কাপ্তেনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিল। ইতিমধ্যে রেবেকা ডেকের উপর আমার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন; জাহাজে আসিয়া অধিকবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই; দেখিলাম, সমুদ্রবায়ুতে তাঁহার শরীর অনেকটা সুস্থ হইয়াছে। দুই-একটি কথার পর রেবেকা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আর কতক্ষণ জাহাজে থাকিতে হইবে?'

আমি বলিলাম, 'রাত্রি বারোটার মধ্যেই জাহাজ নঙর করিতে পারে, তবে সমুদ্রপথে যাত্রা, কখন কোন্ বিপদ ঘটিবে কে বলিতে পারে?'

আমার কথা শুনিয়া রেবেকা একবার চঞ্চল দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিলেন, উজ্জ্বল দীপালোকে তিনি বোধহয় আমার মুখে উদ্বেগের চিহ্ন পরিস্ফুট দেখিলেন। বিমর্ষভাবে আমাকে বলিলেন, 'পরশু রাত্রি হইতে চারিদিকে যে কি কাণ্ড চলিতেছে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না; এক একবার মনে হইতেছে, যাহা কিছু করিতেছি এ যেন স্বপ্ন, যেন স্বপ্নঘোরে জাহাজে চলিয়াছি। আমরা নিরাপদে ইংলণ্ডে উপস্থিত হইতে পারিব, এক দিনও এরূপ আশা করি নাই; আমি জানিতাম, রা-তাই আমাকে সহজে ছাড়িবে না, জীবনে তাহার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব না। আমি কি সত্যই সচেতন আছি? স্বপ্নের ন্যায় এক একবার মনে পড়িতেছে, হোটেলে আমি অসুস্থ হইলে তুমি স্টীমার অফিসে গিয়াছিলে, আমি তোমার প্রতীক্ষায় বসিয়া ছিলাম; তাহার পর কি হইল, কোনও কথা আমার মনে নাই; সে সকল কথা আমাকে বল, শুনিবার জন্য আমার বড় আগ্রহ হইয়াছে।'

হামবার্গে রা-তাইয়ের আবির্ভাবের সময় হইতে আমাদের

সমুদ্র-যাত্রা পর্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সংক্ষেপে তাহা রেবেকার গোচর করিলাম।

আমার সকল কথা শুনিয়া রেবেকা বলিলেন, 'আমার কোনও কথা মনে পড়ে না, কিরূপে এই জাহাজে আসিয়াছি তাহাও স্মরণ করিতে পারিতেছি না। দেখিতেছি পৃথিবীতে মানুষের কোনও ইচ্ছা সফল হয় না ; আমাদের ইচ্ছা ছিল জীবনের অবশিষ্ট কাল সুখে দুঃখে একত্র বাস করিব, কিন্তু সে আশা আকাশ-কুসুমের ন্যায় শূন্যে বিলীন হইয়াছে।'

আমি বলিলাম, 'তুমি অনর্থক ভয় পাইয়াছ, এ পর্যন্ত আমাদের মিলনের পথে কোনও বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই ; অবশ্য ভবিষ্যতের কথা কেহই বলিতে পারে না, কিন্তু এখনও আশা আছে ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া বিবাহ করিয়া আমরা সুখী হইতে পারিব।'

রেবেকা বলিলেন, 'মানুষের আশার সীমা কোথায় ? আমাদের আশা অপরিমিত, কিন্তু আমাদের শক্তি নিতান্ত অল্প। এখন এ সকল কথা থাক, অন্য একটি কথা ভাবিয়া আমার মন বড় চঞ্চল হইয়াছে। হামবার্গে তোমার নিকট শুনিয়াছিলাম, ইংলণ্ডে এখনও প্লেগ দেখা দেয় নাই ; একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে প্লেগের বীজ লইয়া গুপ্তভাবে আমাদের ইংলণ্ডে যাওয়া কি সঙ্গত হইবে ? এই কাজটি আমার অত্যন্ত অন্যায় মনে হইতেছে। সেখানকার রাজপুরুষগণের সতর্কতা নিষ্ফল করিয়া আত্মসুখের জন্য আমরা কোটি কোটি লোকের জীবন বিপন্ন করিতে যাইতেছি ; আমাদের এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে ? নরহন্তা দস্যুর সহিত আমাদের কি পার্থক্য ?—আমি যতই এ কথা চিন্তা করিতেছি, ততই আমার মন অনুশোচনায় দগ্ধ হইতেছে।'

রেবেকা যে সকল কথা বলিলেন, আমিও যে সে সকল কথা চিন্তা করি নাই এরূপ নহে, কিন্তু আমি আত্মসুখের চিন্তায় এরূপ বিভোর হইয়া ছিলাম যে, কথাগুলি আমার তেমন গুরুতর মনে হয় নাই। আমি তাঁহাকে সান্ত্বনা দানের জন্য বলিলাম, 'এই ব্যাপারে

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জাহাজে চার জনের প্লেগ হইয়াছে, তন্মধ্যে দুই জন ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছে।'

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, 'আমি তো এক জনের মাত্র মৃত্যু-সংবাদ জানিতাম, ইতিমধ্যেই দুই জন মরিল, আরও দুই জন মৃতপ্রায়!'

রা-তাই বলিল, 'ইহাতে বিস্ময়ের কথা কি আছে? প্লেগ বায়ুর ন্যায় দ্রুতগামী। যদি তোমরা জাহাজ হইতে নামিতে অসম্মত হও, তাহা হইলে কোথায় যাইবে বল? এই জাহাজখানি তেমন বৃহৎ নহে, তোমরা চির জীবন যে এই জাহাজে চড়িয়া অনাহারে সাগরে সাগরে ঘুরিয়া বেড়াইবে তাহারই বা সম্ভাবনা কোথায়?'

আমি অসহিষ্ণুভাবে বলিলাম, 'আপনি বিদ্রূপ করিতে পারেন, কিন্তু আমরা সঙ্কল্প করিয়াছি, এখন পর্যন্ত যে দেশে প্লেগ প্রবেশ করে নাই সেই দেশে উপস্থিত হইয়া প্লেগের বীজ ছড়াইয়া সে দেশের সর্বনাশ করিব না; ইহা বোধহয় নিতান্ত অমানুষের মত কথা নহে।'

রা-তাই বিদ্রূপ করিয়া বলিল, 'না, যীশুখ্রীস্টের মত কথা! কিন্তু তোমাদের এত সাধু সাজিবার আবশ্যক নাই, ইংলণ্ডে সত্য-সত্যই প্লেগ প্রবেশ করিয়াছে, তবে কর্তৃপক্ষ এখনও তাহা জানিতে পারেন নাই। সুতরাং তোমরা বুঝিতেছ, ইংলণ্ডে প্লেগ আমদানির জন্য ঈশ্বর বা মানুষ কাহারও নিকট তোমরা দায়ী হইবে না।'

সহসা রা-তাই তাহার দক্ষিণ হস্ত ঊর্ধ্বে তুলিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, 'তুমি পূর্বেও কয়েক বার আমার সঙ্কল্পের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছ, সেজন্য তোমাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছি; কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। তুমি পুনর্বার আমার সঙ্কল্প ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিতেছ, তোমার এ অপরাধ আমি মার্জনা করিব না, তোমাকে অতি কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিব! আর রেবেকাকে আমি বহুবার ক্ষমা করিয়াছি, তাহার বহু অপরাধ মার্জনা করিয়াছি; আমি ইচ্ছা করিলে এই মুহূর্তেই তাহার দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, বাক্‌শক্তি নষ্ট করিতে পারি।—রেবেকা! তুমি এখনই আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া

যাও, আমার রাগ বাড়াইও না ; তুমি আমার ক্ষমতার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছ, এখন তুমি আমার সম্মুখে থাকিলে হঠাৎ তোমার বিপদ ঘটিতে পারে।'

রেবেকা বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন, রা-তাইও অন্যদিকে চলিয়া গেল ; আমি একাকী ডেকে বসিয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ পরে আমি সেখান হইতে উঠিয়া আমার কেবিনে যাইবার সময় দেখিলাম, একটা লোক মাতালের মত টলিতে টলিতে ও আপন মনে বকিতে বকিতে আমার দিকে আসিতেছে ; লোকটি নিকটে আসিলে দেখিলাম, সে কাপ্তেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কাপ্তেন, ব্যাপার কি ? আপনার শরীর ভাল আছে তো ?'

কাপ্তেন শূন্য দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, যেন আমার কথা শুনিতে পায় নাই এইভাবে আপন মনে বলিতে লাগিল, 'আমি তোমার জন্য অনেক করিয়াছি, কিন্তু এ কাজ কিছুতেই করিতে পারিব না, তুমি আমাকে অনুরোধ করিও না।'

কাপ্তেনের ভাব দেখিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি এত অসংলগ্ন কথা বলিতেছেন কেন ? চলুন, আপনাকে আপনার কেবিনে রাখিয়া আসি।'

আমি ভাবিলাম, অতিরিক্ত নেশা করিয়া লোকটা মাতাল হইয়া পড়িয়াছে ; সেইজন্য আমি তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে তাহার কামরায় টানিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু যে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় এক লম্ফে আমাকে আক্রমণ করিল ; আমি সময়ে সাবধান না হইলে হয়ত সে আমাকে রেলিংএর উপর দিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দিত। আমি তাহার হাত ছাড়াইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারিলাম না। দেখিলাম, লোকটা একেবারে উন্মত্ত হইয়াছে।—অনেকক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তির পর কাপ্তেন আমাকে ডেকের উপর ফেলিয়া আমার বুকের উপর চাপিয়া বসিল, এবং দুই হাতে এরূপ জোরে আমার গলা চাপিয়া ধরিল যে, আমার

শ্বাসরোধের উপক্রম হইল ; ইতিমধ্যে রা-তাই সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া সবলে কাপ্তেনের কেশাকর্ষণ করিল। কাপ্তেন চিত হইয়া ডেকের উপর পড়িয়া গেল, লোহার রেলিংএ তাহার মস্তকে গুরুতর আঘাত লাগিল। ডেকের ল্যাম্পের আলোকে দেখিলাম, তাহার গলদেশের দক্ষিণাংশ অত্যন্ত ফুলিয়াছে। এ কি প্লেগ ?—আমি উঠিয়া বিহ্বল দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

রা-তাই আমাকে বলিল, 'উহার গলা কিরূপ ফুলিয়াছে দেখিতেছ না ? উহাকে প্লেগে ধরিয়াছে, ইহাই প্লেগের সাংঘাতিক লক্ষণ ; আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই উহার মৃত্যু হইবে।'

অর্ধ ঘণ্টার মধ্যে সত্যই কাপ্তেনের মৃত্যু হইল।

কাপ্তেনের মৃত্যুর পর তাহার সহকারী জাহাজ চালাইবার ভার গ্রহণ করিল। তাহারও যদি প্লেগ হয় তাহা হইলে কে জাহাজ চালাইবে বুঝিতে পারিলাম না। তবে ভরসার কথা এই যে, তখন আমরা ইংলণ্ডের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলাম।

ইংরাজ প্রহরীরা পাছে আমাদের জাহাজ দেখিতে পায়, এই ভয়ে ডেকের ল্যাম্পগুলি নির্বাপিত করিয়া, দীপালোকিত কক্ষসমূহের কাচময় গবাক্ষগুলি নীল বস্ত্রাবরণে আবৃত করা হইল।

অনেকক্ষণ পরে রা-তাই ডেকে আসিয়া আমার পাশে দাঁড়াইল ; তখন চন্দ্রোদয় হইয়াছিল, চন্দ্রালোকে বহুদূরস্থ সমুদ্রতটবর্তী ধূসর গিরিশ্রেণী নীল মেঘের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল ; সেইদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া রা-তাই আমাকে বলিল, 'ঐ দেখ, দূরে ইংলণ্ডের তটরেখা অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে।'

আমি এ কথার কোন উত্তর দিলাম না, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেইদিকে চাহিয়া রহিলাম।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ক্রমে জাহাজ ইংলণ্ডের উপকূলের এত নিকটে আসিল যে, সমুদ্রতটস্থ গিরিশ্রেণী ও গিরি-পাদমূলে সংস্থাপিত ক্ষুদ্র পল্লীগুলি আমরা সুস্পষ্ট

দেখিতে পাইলাম। আমরা অবিলম্বে ইংলণ্ডে পদার্পণ করিব, এ কথা ভাবিয়া আমার মনে আর তেমন আনন্দ হইল না ; এখন আমার জীবন কোন্ পথে পরিচালিত হইবে, কে বলিতে পারে? রেবেকার সহিত জীবনে মিলন হইবে কি না, তাহাই বা কিরূপে বুঝিব? রা-তাই তাহার অলৌকিক শক্তি-প্রভাবে আমাদিগকে যেভাবে পরিচালিত করিতেছে, তাহাতে ভবিষ্যৎ সুখশান্তির আশা কোথায়?

রা-তাই তখনও আমার পার্শ্বে ডেকের উঁপর নীরবে দণ্ডায়মান ছিল, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া আপনি কি করিবেন স্থির করিয়াছেন?'

রা-তাই বলিল, 'এখন পর্যন্ত কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই ; তবে লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া সেখানে কিছুদিন বাস করিবার সঙ্কল্প আছে। মিঃ সেন, আজ আমি কঠোর ব্যবহারে তোমার মনে যে কষ্ট দিয়াছি, সেজন্য বড়ই অনুতপ্ত হইয়াছি ; আমার ন্যায় বৃদ্ধের মন অল্প কারণেই কিরূপ উত্ত্যক্ত হইয়া উঠে, তোমার মত যুবকের তাহা ধারণা করিবার শক্তি নাই। তুমি আমার সম্বন্ধে যাহাই মনে কর, আমি সত্যই মন্দ লোক নহি ; যদি প্রকৃতই আমি তেমন অসৎ হইতাম, তাহা হইলে এত দিন তোমার প্রতি সদয় ব্যবহার করিতাম না, নানারূপে তোমাকে বিপন্ন করিতাম। কিন্তু তুমি প্রথম হইতেই আমাকে অন্যায় সন্দেহ করিতেছ। তুমি যে আমাকে ঘৃণা কর, তাহাও আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারি ; তথাপি অনেকবার তোমাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছি, এমনকি, আমার অনুগ্রহেই তুমি মৃত্যু-কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছ। তুমি আমার অতিথি ; অতিথির প্রাত আমার যাহা কর্তব্য, তাহারও বোধহয় বিশেষ ত্রুটি হয় নাই। তুমি আমার পালিতা কন্যা রেবেকাকে লইয়া পলায়ন কারয়াছিলে, কিন্তু তোমার সে অপরাধও মার্জনা করিয়া তাহাকে তোমার হস্তে সম্প্রদান করিতে আমি অসম্মত নহি। তোমার জন্য এতদূর করিয়াও যদি আমি মন্দ লোক হই, তাহা হইলে আর কিরূপে ভাল লোক হইব?'

প্রবেশ করিল। স্টেশন-মাস্টার একখানি প্রথম শ্রেণীর গাড়ির দরজা খুলিয়া সেই কামরায় আমাদের তিন জনকে উঠাইয়া দিল।

ট্রেন আবার দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল, এবং রাত্রি সাড়ে তিনটার সময় নরউইচ্ স্টেশনে উপস্থিত হইল। আমরা সেই ট্রেন পরিত্যাগ-পূর্বক লণ্ডনগামী ট্রেনে উঠিলাম; এই ট্রেন ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল চলে।

আমরা লণ্ডনের দিকে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলাম। রা-তাই অদূরে অন্য একখানি বেঞ্চির উপর বসিয়া ছিল, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'লণ্ডনে নামিয়া আপনি কোথায় বাসা লইবেন? আমি মনে করিতেছি আমার নিজের বাসায় গিয়া উঠিব।'

রা-তাই বলিল, 'দেখ মিঃ সেন, এত দিন আমরা সুখে দুঃখে একত্র কাটাইলাম, আর লণ্ডনে আসিয়াই তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, ইহা বড়ই ক্ষোভের কথা। আমার ইচ্ছা, তুমি আমার সঙ্গে এক বাড়িতেই থাক; লণ্ডনে আমার জন্য যে বাড়ি ভাড়া লওয়া হইয়াছে, আমার এজেণ্টের পত্রে জানিতে পারিয়াছি সেই বাড়িটি ছোট নহে, আমরা সকলেই সে বাড়িতে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারিব। আমি যখন বলিয়াছি রেবেকাকে তোমার হস্তে সম্প্রদান করিতে আমার আপত্তি নাই, তখন শীঘ্র হউক বিলম্বে হউক তোমাদের বিবাহ হইবেই; এ অবস্থায় আমাদের ছাড়িয়া তোমার অন্যত্র বাস করিবার আবশ্যক কি?'

রা-তাইয়ের কথায় রেবেকার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। রা-তাইয়ের প্রস্তাবে আমি কি উত্তর দিব তাহাই ভাবিতে লাগিলাম; তাহার ন্যায় হৃদয়হীন নরপ্রেতের সহিত বাস করা আমার পক্ষে সুখকর নহে তাহা জানিতাম, কিন্তু রেবেকাকে ছাড়িয়া দূরে বাস করিতেও ইচ্ছা হইল না। রা-তাই যে নিতান্ত নিঃস্বার্থভাবে আমাকে তাহার গৃহে বাস করিতে অনুরোধ করিতেছে, ইহা বিশ্বাসযোগ্য কথা নহে; তথাপি আমি তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম।

লণ্ডনের লিভারপুল স্ট্রীট প্রকাণ্ড রাজপথ; কলিকাতার চৌরঙ্গী

অঞ্চলের ন্যায় সেই পল্লীতে অনেক সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস করেন। এই পল্লীর বাড়ি ভাড়া অত্যন্ত অধিক, সেইজন্য মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা এই পল্লীতে বাস করিতে পারেন না। রেলের গাড়ী হইতে নামিয়া ঘোড়ার গাড়ীতে যখন রা-তাইয়ের নূতন বাসার দরজায় উপস্থিত হইলাম, তখন সেই প্রকাণ্ড হর্ম্য দেখিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না; এই বাড়ির মাসিক ভাড়া সহস্রাধিক মুদ্রা। পূর্বে একজন লর্ড এই বাড়িতে বাস করিতেন।

পূর্বেই আমার বাসের জন্য একটি কক্ষ নির্দিষ্ট হইয়াছিল। ঘোড়ার গাড়ি হইতে নামিয়া সেই কক্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, কক্ষটি সুসজ্জিত; প্রেগের হোটেলে আমার যে লগেজ ছিল, এই কক্ষের এক প্রান্তে তাহা দেখিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এ সকল জিনিস এখানে কে আনিল? কিরূপেই বা আসিল? আমরা তিন জনে খালি হাত পা লইয়া 'নাইটিঙ্গেল' জাহাজ হইতে নামিয়াছিলাম; আমার লাগেজ জাহাজেও তুলিয়া লওয়া হয় নাই, এবং ইংলণ্ডে তাহা যে অন্য কোনও জাহাজে আসিয়াছে, তাহারও বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না; অথচ প্রেগে যাহা ফেলিয়া আসিয়াছি, আমার সম্মুখে তাহা উপস্থিত!—ইহা স্বপ্ন, না ভৌতিক কাণ্ড?

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

দীর্ঘ পথশ্রমে ও অনিয়মে রেবেকার শরীর অত্যন্ত অবসন্ন ও দুর্বল হইয়াছিল; রা-তাই তাঁহার অবস্থা দেখিয়া অবিলম্বে তাঁহাকে শয়ন কারতে উপদেশ প্রদান করিল; রেবেকা বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

পর দিন রা-তাই আমাকে বলিল, 'এখন তুমি স্বাধীন; দীর্ঘকাল বান্ধবহীন বিদেশে বড় কষ্ট পাইয়াছ, এখন তুমি কিছুদিন আমোদ-

আহ্লাদ কর। তোমাদের বিবাহটা যাহাতে শীঘ্র হয় আমি তাহার ব্যবস্থা করিব।'

আমি বলিলাম, 'রেবেকার সহিত আমার বিবাহে আপনার আপত্তি নাই বটে, কিন্তু আমার আর্থিক অবস্থা কিরূপ, আমি পারবার প্রতিপালনে সমর্থ কি না, একথা তো আপনি একবারও জিজ্ঞাসা করেন নাই?'

রা-তাই বলিল, 'এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক নাই বলিয়াই আমি জিজ্ঞাসা করি নাই; তোমার ন্যায় প্রতিভাবান চিত্রকর কখনও অর্থাভাবে কষ্ট পাইবে না, একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। তদ্ভিন্ন আমার যাহা কিছু আছে রেবেকাই তাহার উত্তরাধিকারিণী; যদি তুমি আমার অবাধ্য না হও, আমার সকল আদেশ বিনা প্রতিবাদে পালন কর, তাহা হইলে আমার পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তি তোমারই হস্তগত হইবে। যাহা হউক, এ সকল কথার আলোচনা পরে হইবে; আপাততঃ এক বিষম বিপদে পড়া গিয়াছে। আমরা লণ্ডনে ফিরিয়াছি এই সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র কতকগুলি নিমন্ত্রণ-পত্র আসিয়াছে; সকল নিমন্ত্রণ রক্ষা করা সম্ভব না হইলেও কোন-কোন নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইতেই হইবে।'

রা-তাই বিশ পঁচিশখানি নিমন্ত্রণ-পত্র আমার হাতে দিল; দেখিলাম অধিকাংশ স্থলে আমিও নিমন্ত্রিত হইয়াছি। আমরা লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিয়াছি, এ সংবাদ কিরূপে প্রচারিত হইল?—যাহা হউক, এই সকল নিমন্ত্রণ-পত্রের মধ্যে ডচেস্ অব্ আমারসামের নিমন্ত্রণ-পত্রখানি বিশেষ লোভনীয় ও সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য; সেখানে বল-নাচে যোগ দিবার জন্য আমার নিমন্ত্রণ। ডচেস্ রা-তাইকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

আমি রা-তাইকে বলিলাম, 'ডচেস্ অব্ আমারসামের সহিত আপনার পারচয় আছে?'

রা-তাই মৃদু হাসিয়া বলিল, 'তাঁহার সহিত আমার অনেক দিনের বন্ধুত্ব; আর কোথাও যাইতে না পারি তাঁহার নিমন্ত্রণ রাখিতেই

হইবে। সেখানে রেবেকারও নিমন্ত্রণ আছে; আমরা তিন জনেই একসঙ্গে যাইব।'

আমি বলিলাম, 'শিষ্টাচারের অনুরোধে এ নিমন্ত্রণ রক্ষা করা কর্তব্য হইলেও, রেবেকাকে লইয়া যাওয়া কি সঙ্গত হইবে? আমার মনে হয় তাঁহার বিশ্রামে ব্যাঘাত না করাই উচিত।'

রা-তাই বলিল, 'রেবেকাকে তুমি যেরূপ পীড়িত মনে করিয়াছিলে প্রকৃতপক্ষে তাহার পীড়া সেরকম কঠিন হয় নাই, তবে, ঠিক সময়ে ঔষধ না পড়িলে রোগ সাংঘাতিক হইত সন্দেহ নাই। এখন তাহার শরীরের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইলে তাহার কোনও অপকারের আশঙ্কা নাই। ডচেসের বাড়ী রাত্রি এগারোটার পর যাইলেও চলিবে, তাহার পূর্বে তোমাকে সঙ্গে লইয়া এই শহরের দুই চারিটি স্থানে বেড়াইয়া আসিব ভাবিতেছি; অনেক দিন জীবনটা একঘেয়ে ভাবে কাটিয়াছে, আজ একটু বৈচিত্র্য উপভোগ করা যাউক। প্রথমতঃ আমরা "অ্যারিস্টোক্রাটিক ক্লাবে" যাইব; সেখানে আহারাদি শেষ করিয়া লণ্ডনে যে সকল আমোদ-প্রমোদের স্থান আছে, সেই সকল স্থানে এক একবার যাওয়া যাইবে। আমার সঙ্গে যাইলে আমোদের সঙ্গে তুমি যথেষ্ট শিক্ষালাভও করিবে। এই সকল স্থানে ঘুরিয়া রাত্রি বারোটার মধ্যে এখানে ফিরিয়া আসিব, তাহার পর রেবেকাকে সঙ্গে লইয়া ডচেসের বাড়ি যাইব। আমার এ প্রস্তাবে তোমার আপত্তি আছে কি?'

আপত্তির কোনও কারণ ছিল না; ঠিক সন্ধ্যার সময় আমরা সান্ধ্য ভ্রমণের পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া একখানি গাড়ীতে 'অ্যারিস্টোক্রাটিক ক্লাবে'র দিকে চলিলাম। এই ক্লাবে উপস্থিত হইতে আমাদের দশ মিনিটের অধিক সময় লাগিল না। এই ক্লাবটি লণ্ডনের সর্বোৎকৃষ্ট ক্লাব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; ক্লাবের সভ্যেরা সকলেই অতি সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোক। রা-তাই কবে কিরূপে এই ক্লাবের সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ইহাতে বিস্মিত হইলাম না, কারণ কেবল লণ্ডনেই নহে, পম্পি, কায়রো, হামবার্গ, প্রেগ

প্রভৃতি সকল স্থানেই—ইউরোপের সকল রাজধানীতেই সম্ভ্রান্ত সমাজে রা-তাই সুপরিচিত ও সম্মানিত। এ যে কি রহস্য তাহা আমি কোন দিন বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

ক্লাবের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে ভৃত্যগণ সসম্ভ্রমে আমাদের অভিবাদন করিল। তাহার পর আমরা সুচিত্রিত মার্বেলের প্রস্তর-নির্মিত সুপ্রশস্ত সোপানশ্রেণী অতিক্রম পূর্বক হলের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম এই হলে ক্লাবের বহুসংখ্যক পরলোকগত ও জীবিত সভ্যের সুবৃহৎ তৈলচিত্র সংরক্ষিত আছে। সেই হল হইতে আমরা ভোজনকক্ষে উপস্থিত হইলাম; এমন সুসজ্জিত ভোজন-কক্ষ আমি জীবনে অধিক দেখি নাই। কক্ষটি যেরূপ প্রশস্ত সেইরূপ উচ্চ; বোধহয় ইউরোপের মহা সমৃদ্ধ সম্রাটগণের ভোজন-কক্ষও এরূপ সুদৃশ্য, সুসজ্জিত ও মনোরম নহে। ভোজন-কক্ষটির বহির্ভাগেই নদীর বাঁধ, বাতায়নপথ দিয়া নদীর বৈচিত্র্যময় দৃশ্য সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। রা-তাই সেই বাতায়ন-প্রান্তে সংস্থাপিত একখানি টেবিলের সম্মুখে উপবেশন করিল, তাহার পর তাহার দক্ষিণাংশে সংরক্ষিত একখানি চেয়ার দেখাইয়া আমাকে বসিতে অনুরোধ করিল। আমি বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া সেই চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম।

রা-তাই বলিতে লাগিল, 'আহার সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত উদাসীন হইলেও কোন্ দেশের কোন্ হোটেলে উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হয়, সে সংবাদ আমার অজ্ঞাত নহে; সমগ্র ইউরোপের মধ্যে কেবলমাত্র চারিটি হোটেলে মনের মত খানা পাওয়া যায়: প্রথম, সেন্টপিটার্স-বর্গের ব্লাডিমার ক্লাব; দ্বিতীয়, ভিয়েনার মেটার্নিক রেস্টরেন্ট; তৃতীয় প্যারিসের কাভে-ডি-পার্নাশশ্‌; চতুর্থ, লণ্ডনের এই অ্যারিস্টোক্রাটিক ক্লাব।—বোধহয় তুমি পূর্বেও এ ক্লাবে আসিয়াছ?'

আমি বলিলাম, 'না, এই ক্লবে আমি আজ প্রথম আসিলাম; কিন্তু আমি পূর্বে এখানে আহার না করিলেও, আপনি ক্লাবের যে প্রশংসা করিলেন, তাহা সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে।'

অল্পক্ষণ পরে টেবিলে আমাদের খানা আসিল; এরূপ উৎকৃষ্ট

ভোজ্য দ্রব্য জীবনে দুই এক বারের বেশী অদৃষ্টে জুটিয়াছে বলিয়া মনে হইল না; রা-তাইয়ের সম্মুখে বহুবিধ খাদ্য-সামগ্রী প্রদত্ত হইয়াছিল, কিন্তু সে প্রায় কোনও খাদ্য স্পর্শ করিল না।. সুতরাং সে এই ক্লাবে কেন আসিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমি যতক্ষণ ভোজন করিলাম, ততক্ষণ ধরিয়া রা-তাই গল্প করিল; যেন সে আমার কতই বন্ধু।

রাত্রি আটটা হইতে ক্লাবের সভ্যগণের সমাগম হইতে লাগিল: এই ক্লাবের অধিকাংশ সভ্যই অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশসম্ভূত; দেখিলাম সকলেই সুবেশধারী, সুরসিক ও সামাজিক শিষ্টাচারে নিপুণ; ক্লাবের সেইসকল সুরসিক সভ্যের উচ্চহাস্যে ও খোশগল্পে সুবিস্তীর্ণ কক্ষটি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, এবং হাস্য ও গল্পের তরঙ্গে বোতলবাসিনী সুরা-তরঙ্গিনীর যে মধুর মিলন হইল, তাহা বোধ হয় সভ্যগণের সম্মুখে সুরলোকের বিলাস-বিভ্রম উপস্থিত করিল; ক্ষণকালের জন্য মনে হইল, তাপদগ্ধ সংসার-মরুভূমিতে ইহাই বুঝি নন্দন-ভবন।

রা-তাই সেই বিদেশী অভিজাতবর্গের দিকে অবজ্ঞাপূর্ণ কটাক্ষ-পাত করিয়া নিম্নস্বরে আমাকে বলিল, 'আজ তুমি এখানে যে দৃশ্য দেখিতেছ ইহা লণ্ডনের বিলাসী সমাজের দৃশ্য; তুমি বৈদেশিক, বোধহয় এ দৃশ্যে তেমন অভ্যস্ত নহ। পূর্বে যখন এই দেশ এত সভ্য হয় নাই, শিক্ষার অভিমান এত প্রবল হয় নাই, ইংরাজ জাতি যখন এতদূর বিলাসী হয় নাই, তখন ইহাদের জাতীয় অধঃপতনের আশঙ্কার কোনও কারণ ছিল না। যে কঠোর আত্মত্যাগ, সত্যানুরাগ ও ধর্মভয় ইংরাজ জাতির জাতীয় গুণ ছিল, সেই সকল গুণেই ইংরাজ পৃথিবীর সকল জাতির শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে, এবং সেই সকল গুণের কিয়দংশ তাহাদের মধ্যে এখনও বর্তমান আছে বলিয়াই আজ তাহারা পৃথিবীতে মহাপরাক্রান্ত ও অজেয়; কিন্তু এখন ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠতম সমাজেও এইসকল গুণের অভাব লক্ষিত হইতেছে। যে সকল সম্ভ্রান্ত বংশের বংশধরগণ পান-ভোজন ও অসার আমোদ-

প্রমোদের জন্য আজ এখানে সমাগত হইয়াছে, তাহাদের অনেকেই আমার পরিচিত ; অনেকেই পূর্বপুরুষের গুণগ্রাম শক্তি-সামর্থ্যে বঞ্চিত হইয়া ঘোড়-দৌড়ে, নানারূপ ব্যসনে, বিলাসিতায় পিতৃ-পিতামহের সঞ্চিত অগাধ অর্থ নষ্ট করিতেছে। ইহাদের অনেকেরই তোমার সহিত পরিচিত করিতে পারিতাম ; কিন্তু আমাদের সময় অল্প, এখন এখান হইতে প্রস্থান করাই সঙ্গত। একবার সাধারণের আমোদাগারগুলিতে উপস্থিত হইয়া, এদেশের জনসাধারণ কিরূপ আমোদে অমূল্য সময় ও কষ্টসঞ্চিত অর্থ নষ্ট করিতেছে তাহা দেখিলে তাহাদের রুচি প্রবৃত্তি ও রীতি-নীতির কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইবে।'

রা-তাইয়ের সঙ্গে আমি নিঃশব্দে সেই ক্লাব পরিত্যাগ করিয়া পুনর্বার গাড়ীতে উঠিলাম, এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই একটি রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইলাম। এই রঙ্গমঞ্চের নাম 'প্যারাডাইস থিয়েটার।' দেখিলাম, রঙ্গমঞ্চটির বহির্দেশ আলোক-মালায় ও পুষ্পদামে সুসজ্জিত; থিয়েটারের দ্বারদেশে অসংখ্য লোকের জনতা ; আমরা বহু কষ্টে সেই জনতা ভেদ করিয়া ম্যানেজারের অফিসে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, ম্যানেজার সাহেবের সহিত রা-তাইয়ের বিলক্ষণ পরিচয় আছে। ম্যানেজার সসম্মানে রা-তাইকে অভিবাদন করিয়া আমাদের দুইজনকে একটি 'বক্সে' বসাইয়া দিয়া আসিলেন। তখনও অভিনয় আরম্ভ হয় নাই. যবনিকাও উত্তোলিত হয় নাই ; অভিনয়ের পূর্বাভাসস্বরূপ ঐকতানিক বাদ্য চলিতেছিল ; দেখিলাম, রঙ্গমঞ্চের সর্বস্থান আমোদলিপ্সু দর্শকবৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে ; তাহাদের হর্ষ, উৎসাহ উদ্দীপনার অন্ত নাই।

রা-তাই সমবেত দর্শকমণ্ডলীর প্রতি ঘৃণামিশ্রিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আমাকে বলিল, 'লণ্ডন-সমাজের আর একটি অংশের দৃশ্য দেখ। অভিনয় আরম্ভ হইলে তুমি দেখিবে দর্শকগণের অনেকে গল্প আরম্ভ করিয়াছে, কেহ কেহ মাতাল হইয়া শৃগালের মত সমস্বরে হুয়া হুয়া করিতেছে, কেহ কেহ বা লোলুপ দৃষ্টিতে অভিনেত্রীদিগের রূপ দেখিতেছে। অভিনয় দেখিয়া শিক্ষা লাভ কয়জনের উদ্দেশ্য ?

যে অল্প কয়েক জন লোক নাট্যানন্দ উপভোগ করিতে আসিয়াছে, তাহারা যে সুস্থির হইয়া শেষ পর্যন্ত শুনিবে, তাহারও আশা নাই।'

অভিনয় আরম্ভ হইলে দেখিলাম, দর্শকগণের সম্বন্ধে রা-তাইয়ের ধারণা অমূলক নহে; যেমন শ্রোতা, তেমনি নাটক; নাটকখানি নিতান্ত অসার ও কুরুচিপূর্ণ, অথচ সেই নাটকের অভিনয় দর্শনে লোকের কি আগ্রহ! অভিনয় দেখিতে দেখিতে আমার মনে ঘৃণা জন্মিয়া গেল। মনে হইল, যে সকল লোক এমন তুচ্ছ আনন্দ উপভোগের জন্য এভাবে অর্থ ও সময় নষ্ট করে, তাহাদের মঙ্গলের আশা কোথায়? রা-তাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম,—সে চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিয়া হর্ষোন্মত্ত দর্শকগণের চপলতা নিরীক্ষণ করিতেছে, তাহার চক্ষু ক্রোধে বিস্ফারিত, অধর ঘৃণায় কুঞ্চিত; তাহার মুখের ভাব দেখিয়া বোধ হইল, সাধ্য হইলে সে তখনই সমগ্র দর্শকমণ্ডলীর সহিত রঙ্গালয়টি ভস্ম করিয়া ফেলিত।

রা-তাই আমার দিকে চাহিয়া ঈষৎ উত্তেজিত ভাবে বলিল, 'তুমি অভিনয় দেখিতেছ? ভদ্রলোকে এমন নাটকের অভিনয় দেখিবার জন্য স্ত্রী-কন্যাকে সঙ্গে লইয়া কেন যে এখানে উপস্থিত হয়, তাহা আমার বুঝিবার শক্তি নাই; দর্শকগণ যেরূপ লুব্ধ, অভিনেত্রীরাও সেইরূপ শ্লীলতাবর্জিত; দেখ, ইহারা কিরূপ অর্ধোলঙ্গ বেশে নির্লজ্জার ন্যায় নাচিতেছে! ইহারা মনে করিতেছে যথেষ্ট নৃত্যকলা প্রকাশ করিতেছে; কিন্তু ইহাদের নৃত্যে কলা-নৈপুণ্যের চিহ্নমাত্র নাই; ইহা ভদ্রলোকের বিরক্তিজনক হইয়া কিরূপে তৃপ্তিকর হইতেছে, তাহাও সহজে বোধগম্য হয় না। মানুষের অত্যন্ত অধঃপতন না ঘটিলে কেহ এভাবে জনসাধারণকে আমোদিত করিতে সাহস করে না, এমন আমোদে কেহ যোগদানও করে না। এই সকল লোক আবার পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতার সমালোচনা করে; এশিয়া ও আফ্রিকাখণ্ডের অধিবাসীরা অসভ্য বর্বর বলিয়া বিদ্রূপ করে। কিন্তু এই দম্ভ স্থায়ী হইবে না, শীঘ্রই এমন দিন আসিবে যখন ইহাদের আর্তনাদে সমস্ত ইউরোপ বধির হইবে, অশ্রুর ধারায় রাজপথ কর্দমিত

হইবে। ঐ দেখ, প্রথম অঙ্কের পর যবনিকা পতিত হইল। আমরা যথেষ্ট দেখিয়াছি, আর এখানে বিলম্ব করিবার আবশ্যক নাই; চল অন্য আমোদাগারের সন্ধানে যাই।'

রঙ্গালয় পরিত্যাগ করিয়া আমরা গাড়ীতে উঠিলাম, এবং চেয়ারিং ক্রসের দিকে অগ্রসর হইলাম। তখন রাত্রি অধিক হয় নাই, দেখিলাম, ফুটপাথগুলি শত-শত পথিকে পূর্ণ, আলোকমালায় সুসজ্জিত সুপ্রশস্ত রাজপথে নানা আকারের শত-শত শকট চলিতেছে। অনেকক্ষণ পরে আমরা 'অক্সিডেন্টাল মিউজিক হল' নামক সঙ্গীত-ভবনের দ্বার-দেশে উপস্থিত হইলাম।

রা-তাই গাড়ী হইতে নামিয়া আমাকে বলিল, 'চল, এখানকার আমোদ-প্রমোদ একবার দেখিয়া আসি।'

আমরা মিউজিক-হলের দ্বারদেশে টিকিট কিনিয়া কার্পেট-মণ্ডিত সোপানশ্রেণী দিয়া দ্বিতলে আরোহণ করিলাম। দ্বিতলে সম্ভ্রান্ত দর্শকগণের আসন নির্দিষ্ট ছিল; আমাদের সেখানে উপস্থিত হইবার পূর্বেই আসনগুলি প্রায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। আমরা কোন দিকে না চাহিয়া দুইখানি শূন্য আসনে উপবেশন করিলাম; তামাকের ধূমে ও বহু লোকের নিশ্বাস-বিষাক্ত বায়ুতে আমাদের শ্বাসরোধের উপক্রম হইল। স্টলের মধ্যে পানীয় জল ও ফলবিক্রেতারা তাহাদের পণ্য-দ্রব্য ফেরি করিয়া বেড়াইতেছে, যুবক ও বৃদ্ধের দল এক এক স্থানে জটলা করিতেছে, ঐকতানিক বাদ্যযন্ত্রগুলির কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই। কতকগুলি যুবতী রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া প্রায় উলঙ্গ দেহে এমন উদ্দাম নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে যে, প্রতি মুহূর্তে মনে হইতে লাগিল, তাহাদের পাদতাড়নে স্টেজ ভাঙিয়া পড়িবে।

সেদিন সেখানে একখানি অপেরার (গীতনাট্য) অভিনয় হইতে-ছিল; এই অপেরার যেমন গান, তেমনি বিষয়! কয়েক মিনিট সঙ্গীত শ্রবণের পর রা-তাই আমাকে বলিল, 'ইহাদের আমোদলিপ্সার পরিচয় পাইতেছ? সমাজের যতই নিম্ন স্তরে যাইবে, ততই বীভৎস রুচির পরিচয় পাইবে; এখানে আর সময় নষ্ট করিয়া কাজ নাই।'

প্রায় দশ মিনিট পরে আমরা ব্রিটিশ মহাসভার দিকে চলিলাম। পার্লিয়ামেন্ট-ভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, প্লেগের আক্রমণ নিবারণকল্পে কোন্ কোন্ নিয়ম বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত, এই বিষয় লইয়া মহাসভায় মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে; সভায় ও দর্শকগণে মহাসভা পরিপূর্ণ।

সেখানে কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া আমরা সভ্যগণের বাক্‌বিতণ্ডা শ্রবণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, নিজের দলের জিদ বজায় রাখিবার জন্য অনেকেই প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে অতি কঠোরভাবে আক্রমণ করিতেছেন। এক পক্ষ কোন ন্যায়সঙ্গত কথা বলিলেও অন্য পক্ষ কেবল জিদ বজায় রাখিবার জন্য তাহার ঘোরতর প্রতিবাদ করিতেছেন। যেন প্রতিপক্ষকে বাক্‌যুদ্ধে পরাস্ত ও অপদস্থ করাই তাঁহাদের জীবনের ব্রত; অনেক বক্তার ঔদ্ধত্য ও দম্ভ দেখিয়া আমার মনে বিস্ময়ের সঞ্চার হইল।

ক্রমে রাত্রি অধিক হইতেছিল, রেবেকাকে লইয়া ডচেস্ অব্ আমারসামের নাচের মজলিসে উপস্থিত হইতে হইবে বলিয়া আমরা তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরিলাম।

রেবেকা তখন বলনাচের পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া ড্রয়িংরুমে আমাদের অপেক্ষা করিতেছিলেন; এই পরিচ্ছদে তাঁহাকে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল, আনন্দে ও উৎসাহে তাঁহার মুখখানি প্রফুল্ল, ও প্রশান্ত চক্ষুদুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। বাসায় আর বিলম্ব না করিয় রেবেকাকে সঙ্গে লইয়া ডচেসের গৃহে যাত্রা করিলাম।

নাচের মজলিসে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সেখানে লণ্ডনের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমাগম হইয়াছে; মন্ত্রীসমাজের কয়েকজন সদস্যকেও উপস্থিত দেখিলাম। যে সকল পল্লীবাসী লর্ড নিমন্ত্রিত হইয়া সেখানে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রায় কাহাকেও চিনিতাম না; তাঁহাদের পরিচ্ছদের আড়ম্বরে আমার চক্ষু ঝলসিয়া গেল। কয়েকজন মার্কিন ধনকুবেরের কন্যাও নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন; সম্ভ্রান্ত-বংশীয় অনেক বিত্তহীন অবিবাহিত ইংরাজ যুবক তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে

ঘুরিয়া মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিতেছিল,—যদি সৌভাগ্যক্রমে অর্ধরাজ্য ও রাজকন্যা লাভ হয়। শুভ্রবদনা সুন্দরীগণের চারিধারে তাহাদিগকে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়া আমার মনে হইল, এক একটি যুবতী যেন এক একটি সদ্যপ্রস্ফুটিত শতদল, আর এই সকল কৃষ্ণপরিচ্ছদপরিহিত যুবকের দল ভৃঙ্গ মাত্র, কিঞ্চিৎ মধুর প্রত্যাশায় তাহারা ক্রমাগত পদ্মের চারিপাশে গুঞ্জন করিতেছে। সেই মজলিসে অনেক রূপসীকে দেখিলাম, রূপবান পুরুষও অনেক দেখিলাম; কিন্তু রেবেকার মত সুন্দরী ও রা-তাইয়ের মত কুৎসিত আর একজনকেও দেখিলাম না। এখানে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট রা-তাইয়ের সমাদর দেখিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না; আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, পদগৌরবে বা অর্থগৌরবে যিনি যতই সম্মানিত হউন, রা-তাইকে দেখিয়া তাঁহারা সকলেই যেন সঙ্কুচিত। ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত সমাজে রা-তাইয়ের এরূপ অসাধারণ প্রতিপত্তি আছে, তাহা পূর্বে জানিতে পারি নাই। রেবেকাকে দেখিয়া অনেক রূপসী শ্বেতাঙ্গনা ঈর্ষ্যাকুল নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন; এবং অনেক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ যুবক সেই রূপবতী ইহুদী-তনয়ার রূপমাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া সবিস্ময়ে অস্ফুট স্বরে বন্ধুগণের নিকট তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

নৃত্য আরম্ভ হইল। বল নাচে আমি তেমন অভ্যস্ত নহি, কিন্তু মোগলের হাতে পড়িয়া আমাকেও খানা খাইতে হইল, ইচ্ছা না থাকিলেও একটি লর্ড-দুহিতার সহিত আমি নৃত্য করিলাম; সত্য কথা বলিতে কি, এত দিন বিলাতে বাস করিয়াও আমি কোনক্রমেই সভ্য ইউরোপের সামাজিক নৃত্যের পক্ষপাতী হইতে পারিলাম না; ইহা বোধ হয় আমার সংস্কারগত রুচির দোষ। লোলচর্ম পক্ককেশ বৃদ্ধেরা সুন্দরী যুবতীগণকে আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিয়া কণ্ঠে-কণ্ঠে বাহুতে-বাহুতে ও বক্ষে-বক্ষে মিলাইয়া, কখনও চঞ্চল চরণে কখনও বা লম্ফ প্রদানে উন্মত্তের মত নৃত্য করিতেছে, জোড়ায় জোড়ায় দলে দলে প্রচণ্ড বেগে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এ দৃশ্য আমার ন্যায় প্রাচ্যদেশ-বাসীর নিকট অত্যন্ত বিসদৃশ; কিন্তু ভিন্ন দেশের এরূপ বহু প্রাচীন

সামাজিক পদ্ধতির সমালোচনা করিতে যাওয়া আমার ন্যায় বিদেশীর পক্ষে ধৃষ্টতার পরিচায়ক।

রাত্রি দুই ঘটিকার সময় নৃত্য শেষ হইল; মজলিস ভাঙিলে রেবেকাকে সঙ্গে লইয়া আমরা বাসায় যাত্রা করিলাম। সেদিন রাত্রিটা অতি পরিষ্কার ছিল, বাতাস অত্যন্ত শীতল হইলেও তাহা আমার নিকট সুখস্পর্শ বোধ হইল। আকাশের কোনও দিকে বিন্দুমাত্র মেঘ ছিল না, উজ্জ্বল নক্ষত্ররাশিতে গগনমণ্ডল দীপ্যমান।

পথে আসিতে আসিতে রা-তাই বলিল, 'আমাদের নৈশ ভ্রমণ এখনও শেষ হয় নাই; রেবেকা এই গাড়ীতেই বাসায় যাউক; চল আমরা দুজনে আর একটু ঘুরিয়া আসি।'

রাত্রি অনেক হইয়াছিল, যথেষ্ট পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম; আমার আর ভ্রমণের উৎসাহ ছিল না; কিন্তু রা-তাইয়ের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতে পারিলাম না। গাড়ি থামাইয়া উভয়ে নামিয়া পড়িলাম। রা-তাইয়ের আদেশে কোচম্যান রেবেকাকে বাসায় লইয়া চলিল।

কিছু দূর পদব্রজে আসিয়া আমরা একখানি গাড়ী ভাড়া করিলাম, এবং সেই গাড়ীতে 'কন্‌ভেণ্ট সার্ডেম' নামক পল্লীতে 'ফ্যান্সি-ড্রেস বল' দেখিতে চলিলাম। রা-তাই বলিল, 'এখানে ইংরাজ সমাজের আর এক রকম আমোদের নমুনা দেখিতে পাইবে।'

এই নাচঘরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, অসংখ্য নর্তক ও নর্তকী অদ্ভুত পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া সামরিক ব্যাণ্ডের তালে তালে নাচিতেছে; সে দৃশ্য অতি অদ্ভুত। অন্য সময় হইলে হয়ত এই নৃত্যগীত উপভোগ করিতে পারিতাম, কিন্তু সেই শেষ রাত্রে শ্রান্ত দেহে এই আমোদ আমার পক্ষে বিরক্তিকর হইয়া উঠিল; তাহার উপর রা-তাইয়ের সমালোচনার স্রোত। পরের কথা লইয়া অনর্থক কেন যে এত আলোচনা, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। সে যেখানে যাইতেছিল সেই স্থানেই জনসাধারণের আমোদ-স্পৃহা ও উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিয়া দৈববাণী করিতেছিল, শীঘ্রই ইহাদের সর্বনাশ

হইবে, ইহাদের দেশ শ্মশানে পরিণত হইবে।—কিন্তু তখন তাহার সেই দৈববাণীর অর্থ বুঝিতে পারি নাই।

'ফ্যান্সি-ড্রেস বল' দেখিয়া আমরা সেখান হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। পথে আসিয়া রা-তাই বলিল, 'সন্ধ্যা হইতে এই শেষ রাত্রি পর্যন্ত আজ অনেক স্থানে ঘুরিলাম ; অতি সম্ভ্রান্ত সমাজ হইতে সাধারণ সমাজের লোকেরা পর্যন্ত কিরূপ আমোদে নিশাযাপন করে, এই এক রাত্রেই তাহার কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছ ; কিন্তু এ দেশের অশিক্ষিত ইতর শ্রমজীবি-সম্প্রদায়ের লোক কিরূপ আমোদে রাত্রি কাটায়, তাহা না দেখিলে আমাদের নৈশ ভ্রমণ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। আমরা প্রায় নরকের দ্বারে আসিয়া পড়িয়াছি, চল, একবার নরক দর্শন করিয়া আসি।'

এ প্রস্তাবেও আমি আপত্তি করিলাম না ; দেখি এই বৃদ্ধই কতক্ষণ ঘুরিতে পারে। আমরা উভয়ে আলোকিত রাজপথ দিয়া চলিতে চলিতে শহরের দরিদ্র পল্লীতে প্রবেশ করিলাম ; একটা গির্জার ঘড়িতে ঠং-ঠং করিয়া রাত্রি তিনটা বাজিয়া গেল।

একটি অপরিচ্ছন্ন সঙ্কীর্ণ গলির ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম, একটা খোলা জায়গায় পঁচিশ ত্রিশ জন লোক একত্র জুটিয়া মহা সোরগোল করিতেছে ; বুঝিলাম সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর তাহারা পেট ভরিয়া মদ খাইয়া একটু নির্মল আনন্দ উপভোগ করিতেছে। দুই চারি পদ অগ্রসর হইয়াই দেখা গেল, একটা গুণ্ডা একটি নিরাশ্রয়া স্ত্রীলোকের হাত ধরিয়া টানাটানি করিতেছে, কিন্তু স্ত্রীলোকটির আর্তনাদের প্রতি কাহারো দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে না। কয়েক গজ দূরে দুই জন লোক তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে, পরস্পরকে আক্রমণপূর্বক সবেগে মুষ্ট্যাঘাত করিতেছে। সে অঞ্চলে শান্তিরক্ষক প্রহরীদের কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না ; বুঝিলাম, এই স্থান সত্যই নরকতুল্য, এখানে কাহারও ধনপ্রাণ নিরাপদ নহে, এমনকি দিবাভাগেও এসকল পল্লীতে প্রাণ হাতে করিয়া আসিতে হয়। আমি একাকী এই রাত্রে এমন স্থানে আসিতে কখনও সাহস

করিতাম না; কিন্তু রা-তাই সঙ্গে ছিল বলিয়াই আমি নির্ভয়ে চলিতে লাগিলাম।

এই গলি দিয়া কিছু দূর গমন করিয়া রা-তাই একটি রাস্তার সম্মুখে দাঁড়াইল। বাড়িটি একতলা, বাহিরের দিকে একটিমাত্র দ্বার, তাহাও রুদ্ধ। রা-তাই সেই দ্বারে কয়েকবার করাঘাত করিল। অল্পক্ষণ পরে একটি স্ত্রীলোক দরজাটি অল্প ফাঁক করিয়া মুখ বাহির করিল; রা-তাই তাহার কানে কানে কি বলিল।

স্ত্রীলোকটি বলিল, 'আপনি আসিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারি নাই, দ্বার খুলিয়া দিতেছি; কিন্তু আপনার এই সঙ্গীটি?'

রা-তাই বলিল, 'উনি আমার বন্ধু, কোন ভয় নাই।'

'তবে আসুন।' বলিয়া দ্বার খুলিয়া স্ত্রীলোকটি ভিতর হইতে পুনর্বার অর্গল রুদ্ধ করিয়া ও একটি বাতি ধরাইয়া কক্ষান্তরে অগ্রসর হইল। আমরা তাহার অনুসরণ করিলাম।

সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দুর্গন্ধে আমার বমনোদ্রেক হইল; এমন নোংরা দুর্গন্ধময় গৃহে আমি জীবনে প্রবেশ করি নাই। সেই কক্ষে অন্য লোক দেখিতে পাইলাম না। আমাদের পথপ্রদর্শিকা আর একটি কক্ষের দ্বার-প্রান্তে আসিয়া দেওয়ালে হাত দিল, এবং একটি গুপ্ত স্প্রিং টিপিয়া ধরিল; সঙ্গে সঙ্গে ঠং-ঠং শব্দ করিয়া ঘণ্টা বাজিল ও দ্বারটি খুলিয়া গেল।

দ্বার উন্মুক্ত হইলে দেখিলাম, সেই কক্ষমধ্যে একটি উজ্জ্বল গ্যাসের আলো জ্বলিতেছে, কক্ষের মধ্যস্থলে একটি প্রকাণ্ড টেবিল; সেই টেবিলের চতুর্দিকে বিশ-পঁচিশ জন পুরুষ রমণী বসিয়া জুয়া খেলিতেছে।

আমাদিগকে দেখিবামাত্র লোকগুলা একসঙ্গে লাফাইয়া উঠিল, এবং টেবিলের উপর বাজি ধরিবার জন্য যে টাকাগুলি ছিল, তাহা তাহারা তাড়াতাড়ি সরাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল। আমার মনে হইল, এই উন্মত্তপ্রায় নর-পশুগুলা আমাদিগকে পুলিশের গোয়েন্দা ভাবিয়া এখনই আমাদের আক্রমণ করিবে; বলিতে লজ্জা নাই, আমি সভয়ে রা-তাইয়ের পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইলাম।

সেই বর্বরেরা গ্যাসালোকে রা-তাইকে চিনিবামাত্র সংযত ভাব ধারণ করিল ; রা-তাই পকেট হইতে একটি গিনি বাহির করিয়া তাহাদিগকে মদ খাইতে দিল। মদ খাইবার টাকা পাইয়া তাহারা হর্ষধ্বনি করিতে করিতে পুনর্বার খেলায় প্রবৃত্ত হইল। দেখিলাম, তাহারা সকলেই জুয়ায় সুনিপুণ। টেবিলের উপর অনেক টাকা ; কেহ ক্রমাগত হারিতেছে, কেহ পুনঃ পুনঃ জিতিতেছে ; কেহ-বা শেষ ফার্দিং পর্যন্ত হারিয়া ঘড়ি, চেন বা অঙ্গুরী বাঁধা দিয়া যে টাকা পাইতেছে, তাহা লইয়া পুনর্বার খেলায় মত্ত হইতেছে।

কয়েক মিনিট পরে রা-তাই আমাকে একটু দূরে টানিয়া লইয়া গিয়া নিম্নস্বরে বলিল, 'এই বাড়িটি লণ্ডনের বড় বড় চোরের আড্ডা। ইহাদের সকলেই পাকা চোর, নরঘাতক দস্যুও ইহাদের মধ্যে অনেক আছে। নরহত্যার অপরাধে ইহাদের কাহারও কাহারও বিরুদ্ধে দুই চারিখানি ওয়ারেন্টও বাহির হইয়াছে। কিন্তু ইহাদিগকে গ্রেপ্তার করা পুলিশের অসাধ্য। ঐ যে লম্বা জোয়ানটিকে দেখিতেছ, উনি চুরিবিদ্যায় সিদ্ধহস্ত। এই মহাপুরুষ বড় বড় লোহার সিন্ধুকগুলা এত সহজে খুলিয়া সিন্ধুকের জিনিস আত্মসাৎ করে যে, না দেখিলে বিশ্বাস হয় না। উহার পাশে যে সুন্দরী বসিয়া আছে, সে উহার উপপত্নী ; এই স্ত্রীলোকটি বড় লোকের দারোয়ানদের সঙ্গে ভাব করিয়া বাড়ীতে কোথায় কি আছে তাহার সন্ধান লয়, সেই সন্ধান অনুসারে চোরেরা চুরি করিতে যায়। ঐ পাশে যে তিনটি লোক অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে জুয়া খেলিতেছে, ইহাদিগকে ধরিবার জন্য পুলিশ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছে ; পুরস্কারের লোভে শত শত গোয়েন্দা উহাদের সন্ধানে ঘুরিতেছে, তথাপি দেখ, উহারা কেমন নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া বসিয়া জুয়া খেলিতেছে। আর যে স্ত্রীলোকটি আমাদের দরজা খুলিয়া দিয়াছে, সে প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্বে একটি ধনাঢ্য বৃদ্ধের প্রাণবধ করিয়া এখানে গোপনে বাস করিতেছে, পুলিশ এখন পর্যন্ত ইহার কোন সন্ধান পায় নাই।'

আমি সবিস্ময়ে রা-তাইকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ সকল কথা

আপনি কিরূপে জানিলেন ? ইহাদের দলের লোক ভিন্ন অন্যের তো এ সকল জানিবার সম্ভাবনা দেখি না।'

রা-তাই বলিল, 'তুমি কি মনে করিতেছ, আমিও ইহাদের দলের একজন ? তোমার সঙ্গে যেদিন আমার প্রথম আলাপ হয়, সেই-দিনই কি তোমাকে বলি নাই, আমার অজ্ঞাত বিষয় কিছুই নাই ? তুমি বোধহয় আমার এ কথা বিশ্বাস করিতেছ না; কিন্তু তোমাকে পুনর্বার স্মরণ করাইয়া দিতেছি, তোমাদের দেশের প্রাচীন যুগের যোগী তপস্বীগণ যোগশক্তি-প্রভাবে বিশ্ব সংসারের সকল রহস্যই জানিতে পারিতেন; যোগের সেই শক্তি এখনও বিলুপ্ত হয় নাই, তবে, প্রকৃত সাধকের অভাব হইয়াছে বটে।—আমি কিরূপে সকল কথা জানিতে পারি তাহা তোমার জানিবার আবশ্যক নাই, আমি যে সকলই জানিতে পারি, সে পরিচয় তুমি বহুবার পাইয়াছ। যাহা হউক, বিলাতী সমাজের নিম্নতম স্তরের লোকেরা কিরূপ আমোদে কালক্ষেপ করে, তাহার কিছু পরিচয় পাইলে কি ?'

আমি বলিলাম. 'যথেষ্ট; আজ এই এক রাত্রে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি, তাহা অন্যে বহু বর্ষেও লাভ করিতে পারে কি না সন্দেহ।'

রা-তাই খুশি হইয়া বলিল, 'তবে চল, এই নরককুণ্ডে আর বিলম্ব করিবার আবশ্যক নাই। রাত্রিও শেষ হইয়া আসিয়াছে, আমরা বাসায় যাইতে না যাইতে প্রভাত হইবে; যদি আরও দুই-এক ঘণ্টা রাত্রি থাকিত, তাহা হইলে তোমাকে লইয়া আর একটু ঘুরিতাম।'

আমি বলিলাম, 'রক্ষা করুন মহাশয়, আর আমি ঘুরিতে পারিব না; আমার চক্ষু জ্বালা করিতেছে, সমস্ত রাত্রি পথে পথে ঘুরিয়া অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছি, কিছুকাল বিশ্রাম করা আবশ্যক।'

আমরা সেই গুণ্ডার আড্ডা হইতে বাহির হইয়া নানা পথে ঘুরিতে ঘুরিতে যখন বাসায় আসিলাম, তখন বেলা প্রায় সাতটা। আমি আমার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া, পরিচ্ছদ পারবর্তন না করিয়াই

শয্যায় শয়ন করিলাম, এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইলাম।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

সমস্ত রাত্রি জাগিয়া অনেক বেলায় আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। জাগরণের পর মনে হইতে লাগিল, পূর্বরাত্রে যাহা যাহা দেখিয়াছি তাহা সত্য নহে, স্বপ্ন মাত্র; নিদ্রিত অবস্থাতেই আমি সমস্ত রাত্রি ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। রা-তাইয়ের সেই ঘৃণাপূর্ণ ও সর্পের ন্যায় ক্রূর দৃষ্টি চেষ্টা করিয়াও আমি ভুলিতে পারিলাম না; সে কি উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া সমস্ত রাত্রি আমাকে সঙ্গে লইয়া নগর পরিদর্শন করিল, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

রা-তাইয়ের সহিত আমার অধিক দিনের পরিচয় নহে, কিন্তু এই অল্প দিনেই তাহাকে উত্তমরূপে চিনিয়াছিলাম; তাহার কোন ভবিষ্যদ্বাণী প্রায়ই ব্যর্থ হইত না। সুতরাং যখন সে বলিল শীঘ্রই ইংরাজ জাতির সর্বনাশ হইবে, সহরে নগরে হাহাকার উঠিবে, নরনারীগণের অশ্রুধারায় রাজপথ কর্দমিত হইবে, তখন তাহার সে কথা বৃদ্ধের প্রলাপ মাত্র এরূপ মনে করিতে পারি নাই; সেই কথা শুনিয়া আমার মনে ভয়ঙ্কর আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল। আমি বুঝিয়াছিলাম তাহার এই ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হইবে না, হয়ত শীঘ্রই ইংলণ্ডের মহা বিপদ উপস্থিত হইবে। কিন্তু ইংরাজ জাতি কিরূপ বিপদে আক্রান্ত হইবে, বিস্তর চিন্তা করিয়াও তাহা অনুমান করিতে পারিলাম না। কোনও বহিঃশত্রুর আক্রমণে ইংরাজ জাতিকে যে সহসা বিপন্ন হইতে হইবে, তাহার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা দেখিলাম না; রুশ, ফরাসী ও জর্মন প্রভৃতি পরাক্রান্ত ইউরোপীয় জাতি সহসা যে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে, তাহারও সম্ভাবনা নাই। সত্য বটে সুদূর আফ্রিকায় বলদর্পিত ও তেজস্বী মুসলমান-সম্প্রদায় সমগ্র

পৃথিবীর মুসলমানকে ঐক্য-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া সুবিশাল ধর্মসঙ্ঘের আয়োজন করিতেছে, এবং সম্ভবতঃ একদিন তাহারা সমুদায় খ্রীস্টান জাতির বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারে ; কিন্তু তাহাতেও হঠাৎ ইংলণ্ডের কোনও ভয়ের কারণ দেখিলাম না। কিছুদিন হইতে ইউরোপীয় জাতিসমূহের 'পীতাতঙ্ক' উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, প্রাচ্য ভূখণ্ডবাসী পীতবর্ণ জাতিসমূহ পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ত করিয়া ইউরোপীয়গণকে প্রাচ্য ভূখণ্ড হইতে অর্ধচন্দ্র দানে সমুদ্রপারে প্রেরণ করিবে। নববলদৃপ্ত রুশবিজয়ী জাপানের অদ্ভুত রণনৈপুণ্য দর্শনে শ্বেতাঙ্গ জাতিসমূহের মধ্যে এই ভয় সংক্রামিত হইয়াছে। যদি কোনও দিন চীন ও জাপান অভিন্ন মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া প্রাচ্য ভূখণ্ডে প্রভুত্ব-সংস্থাপনে বদ্ধপরিকর হয়, তাহা হইলে প্রাচ্য ভূখণ্ড-প্রবাসী ইউরোপীয়গণের সুদূর ভবিষ্যতে বিপদের আশঙ্কা থাকিতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে রা-তাইয়ের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবার সম্ভাবনা দেখিলাম না।

তবে, একটিমাত্র সম্ভাবনার কথা পুনঃ পুনঃ আমার মনে হইতে লাগিল : যদি কোনরূপে ইংলণ্ডে প্লেগ প্রবেশ করে তাহা হইলেই ইংরাজ জাতির মহা বিপদ উপস্থিত হইবে ; কিন্তু প্লেগ যাহাতে ইংলণ্ডে প্রবেশ করিতে না পারে, সেজন্য কর্তৃপক্ষ যেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে এই সমুদ্রমধ্যবর্তী দ্বীপে প্লেগ প্রবেশ করিবার সম্ভাবনাও নিতান্ত অল্প। সত্য বটে রা-তাই নাইটিঙ্গেল জাহাজে আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছিল যে ইংলণ্ডে পূর্বেই প্লেগ প্রবেশ করিয়াছে, কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত তাহা জানিতে পারেন নাই ; কিন্তু ইহা তাহার স্তোকবাক্য কি না কে বলিবে ? রা-তাইয়ের সহিত কথাবার্তায় আমি বুঝিয়াছিলাম, ইংরাজের প্রতি তাহার ভয়ানক বিদ্বেষ ; কারণ যে সকল ইউরোপীয় জাতি মিশর ও অন্যান্য প্রাচীন দেশে গমন করিয়া প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, ও অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া ভূগর্ভ হইতে প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ উত্তোলনপূর্বক অতীত যুগের সমৃদ্ধি ও গৌরবের পরিচয় প্রদান করেন, ইংরাজ সেই

সকল জাতির অগ্রগণ্য। রা-তাই প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য ইংরাজ জাতির বিরুদ্ধে গোপনে কোনরূপ ষড়যন্ত্র করিতেছে কি না বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তু তাহার অসাধ্য কর্ম কিছুই নাই, তাহার বুদ্ধির মধ্যে সহজে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না।

রা-তাই যদি সাধারণ মনুষ্য হইত, তাহা হইলে আমি তাহাকে মুহূর্তের জন্যও সন্দেহ করিতাম না; কিন্তু সে মনুষ্য-মূর্তিতে প্রেত; স্নেহ, মমতা, করুণা, সহানুভূতি, পরোপকার প্রভৃতি মানবীয় ধর্ম কোনও দিন তাহার হৃদয়ে স্থান লাভ করিতে পারে নাই। পরের দুঃখ যন্ত্রণা দেখিলেই তাহার আনন্দ, অন্যের সর্বনাশেই সুখ, অন্যের শোকাশ্রু দর্শনেই তাহার তৃপ্তি। রা-তাইয়ের মত পিশাচ-প্রকৃতির লোক পৃথিবীতে অধিক থাকিলে এত দিন বোধ হয় ভগবানের সৃষ্টি ব্যর্থ হইত। খ্রীস্টানের ধর্মশাস্ত্রে শয়তান নামক যে পরাক্রান্ত জীবের উল্লেখ আছে, তাহার মহিমার কথা কোথাও পাঠ করিয়াছি; এক এক সময় আমার মনে হইত, সেই খ্রীস্টানের শয়তান চামড়া টুপি বদলাইয়া সমুদ্র পার হইয়া আমার স্কন্ধে ভর করিয়াছে।

হাত মুখ ধুইয়া কক্ষান্তরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, রেবেকা আমার প্রতীক্ষায় সেখানে বসিয়া আছেন। তিনি আমাকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কাল রাত্রে বলের মজলিস হইতে বাসায় ফিরিবার সময় তোমরা হঠাৎ গাড়ি হইতে নামিয়া কোথায় গিয়াছিলে? দুশ্চিন্তায় সমস্ত রাত্রি আমার নিদ্রা হয় নাই, প্রত্যূষে বারান্দায় পদশব্দ শুনিয়া বুঝিলাম, সমস্ত রাত্রি বাহিরে কাটাইয়াছ।'

আমি রেবেকাকে আমার নৈশ অভিযানের কথা সংক্ষেপে বলিলাম। সকল কথা শুনিয়া রেবেকা চিন্তিত ভাবে বলিলেন, 'রা-তাই তোমাকে এই সকল স্থানে কী জন্য লইয়া গিয়াছিল? বিনা উদ্দেশ্যে সে যে কেবল আমোদ দেখিবার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছে, ইহা বিশ্বাসযোগ্য কথা নহে; তুমি কি তাহার মতলব বুঝিতে পার নাই?'

আমি বলিলাম, 'না ; রা-তাই যে খুব মতলববাজ লোক তাহা আমার অজ্ঞাত নহে ; কিন্তু তাহার মনের ভাব কি, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।'

প্রাভাতিক জলযোগ শেষ করিয়া আমার বাসাটি দেখিতে চলিলাম। আমি বিদেশ যাত্রা করিবার সময় একটি ভৃত্যের হস্তে বাসার ভার দিয়া গিয়াছিলাম, এই দীর্ঘ কালের মধ্যে তাহার নিকট হইতে কোনও সংবাদ পাই নাই।

আমি পদব্রজে যাইতে যাইতে হ্যামিল্টন প্লেসের নিকট জাদুঘরের অধ্যক্ষ স্যর জর্জ ম্যাক্সওয়েলকে দেখিতে পাইলাম। আমি তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইবামাত্র তিনি সস্নেহে আমার হাত ধরিয়া সহাস্যে বলিলেন, 'মিঃ সেন, অনেক দিন পরে আজ তোমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় বড় সুখী হইলাম ; তুমি যে লণ্ডনে ফিরিয়াছ তাহা আমি জানিতাম না।'

আমি বলিলাম, 'আমি কাল এখানে আসিয়াছি ; আমি এদেশে ছিলাম না, তাহা কিরূপে জানিলেন ?'

স্যর জর্জ বলিলেন, 'একদিন তোমার বাসায় বেড়াইতে গিয়াছিলাম ; সেখানে তোমার ভৃত্যের মুখে শুনিয়াছিলাম, বিশেষ প্রয়োজনে তুমি বিদেশে গিয়াছ। বিদেশে গিয়া তোমার বোধ হয় কঠিন পীড়া হইয়াছিল, অন্ততঃ তোমার আকার দেখিয়া এইরূপ অনুমান হয়।'

আমি বলিলাম, 'না, প্রবাসে আমার বিশেষ কোনও অসুখ হয় নাই। আজ হঠাৎ আপনার সঙ্গে দেখা হইল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব মনে করিতেছি।'

স্যর জর্জ আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, 'কি কথা বল।'

আমি বলিলাম, 'আমার বিদেশযাত্রার পূর্বে যেদিন আপনার অফিসে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম, সেইদিনই আপনি কথা-প্রসঙ্গে আমাকে বলিয়াছিলেন, রা-তাইয়ের কবলে

নিপতিত হওয়া অপেক্ষা আমার মৃত্যু অধিক বাঞ্ছনীয় ; এ কথা আপনার স্মরণ হয় কি ?'

স্যর জর্জ হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এতদিন পরে এ কথা তোমার মনে পড়িল কেন ?'

আমি বলিলাম, 'কারণ আমি গত দুই মাস কাল রা-তাইয়ের সহিত একত্র বিদেশে বাস করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু আমার মৃত্যুই যে অধিক বাঞ্ছনীয়, আজ পর্যন্ত তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।'

আমার কথা শুনিয়া স্যর জর্জ যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। অত্যন্ত ভীতভাবে বলিলেন, 'কি সর্বনাশ ! তুমি বলিতেছ কি ?'

আমি বলিলাম, 'হাঁ, সত্য কথাই বলিতেছি ; এই দুই মাস কাল রা-তাইয়ের সহিত একত্র বাস করিয়া আমি তাহার সম্বন্ধে যে সকল কথা জানিতে পারিয়াছি, আপনি তাহা শুনিলে—'

স্যর জর্জ ব্যস্তভাবে বলিলেন, 'না, না, সে সকল কথা আমার শুনিবার আবশ্যক নাই !'

অগত্যা আমি চুপ করিয়া রহিলাম, স্যর জর্জও অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোন কথা বলিলেন না ; তাহার পর তিনি হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আজ খবরের কাগজ পড়িয়াছ ?'

আমি কহিলাম, 'না, আজ আমি অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমাইয়া-ছিলাম, উঠিয়া কিছু খাইয়াই তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িয়াছি, কাগজ দেখিবার অবসর পাই নাই। আপনি একথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন ? কোন নূতন সংবাদ আছে কি ?'

সার জর্জ বলিলেন, 'অতি ভয়ঙ্কর সংবাদ আছে, লণ্ডনে হঠাৎ প্লেগ দেখা দিয়াছে।'

আমি বলিলাম, 'এ কথা আমি পূর্বে জানিতে পারি নাই ; প্লেগ কি দুই এক দিনের মধ্যে দেখা দিয়াছে ?'

স্যর জর্জ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'প্লেগের আবির্ভাবে নগরবাসীগণ মহা আতঙ্কিত হইয়াছে ! লণ্ডনে যাহাতে প্লেগ প্রবেশ করিতে না পারে, কর্তৃপক্ষ সে চেষ্টায় ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু তাঁহাদের সকল

চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে। কাল সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, সমুদ্র-তীরবর্তী কোন দূরস্থ পল্লীতে এক জনের প্লেগ দেখা দিয়াছে, আজ সকালে সংবাদ পাওয়া গেল, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই ভীষণ রোগে প্রায় পাঁচ শত লোক আক্রান্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে আমাদের সম্ভ্রান্ত বন্ধু অনেকেই আছেন; আরও ভয়ের কথা এই যে, এই রোগ সমাজের সকল সম্প্রদায়েই প্রবেশ করিয়াছে, সুতরাং কখন কাহার প্রাণ যায় কে বলিবে?—আমি এখন একটু কাজে যাইতেছি, সুবিধা হইলে এক দিন আমার সঙ্গে দেখা করিও।'

স্যর জর্জের নিকট বিদায় হইয়া আমার বাসায় আসিয়া দেখিলাম, যেখানে যে জিনিস রাখিয়া গিয়াছিলাম, তাহা ঠিক সেইখানেই আছে; টেবিলের উপর ঘড়িটি তখনও টিক্-টিক্ করিতেছে, আমার নামে যে সকল চিঠিপত্র আসিয়াছিল, ভৃত্য টেবিলের উপর তাহা গুছাইয়া রাখিয়াছে। আমি পত্রগুলি পাঠ করিলাম; কতক ছিঁড়িয়া ফেলিলাম, যেগুলির উত্তর দেওয়া আবশ্যক তাহা পকেটে পুরিয়া লইলাম। আমার ভৃত্য তখন বাসায় ছিল না; কিন্তু তাহাতে কোন অসুবিধা হইল না, দরজায় যে কুলুপ লাগান ছিল তাহার একটি চাবি আমার ভৃত্যের কাছে, অন্যটি আমার কাছে থাকিত। আমি আসিয়াছি, এই কথা ভৃত্যের অবগতির জন্য এক-টুকরা কাগজে লিখিয়া তাহা টেবিলের উপর রাখিয়া দরজা বন্ধ করিলাম, তাহার পর রা-তাইয়ের বাসায় ফিরিয়া চলিলাম।

পথে যাইতে যাইতে কিছু দূরে আমার একটি বন্ধুকে দেখিতে পাইলাম, তাঁহাকে ধরিবার জন্য তাড়াতাড়ি চলিয়াও তাঁহাকে ধরিতে পারিলাম না, তিনি ব্যস্তভাবে পথিপ্রান্তস্থ একটি ক্লাবে প্রবেশ করিলেন; আমিও সেই ক্লাবে উপস্থিত হইয়া কিছুকাল তাঁহার সহিত আলাপ করিলাম, তাহার পর ক্লাবের বিভিন্ন কক্ষগুলি ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম।

একটি কক্ষে দেখিলাম, চারি জন লোক কি পরামর্শ করিতেছেন; এই চারিজনের সকলেই আমার পরিচিত; তাঁহারা সকলেই বিজ্ঞ,

সকলেরই মুখ গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন। দেখিলাম এই চারিজনের মধ্যে একজন ইউরোপের একখানি মানচিত্র টেবিলের উপর রাখিয়া তাহার স্থানে স্থানে পেন্সিলের চিহ্ন দিতেছিলেন; অন্য তিন জন সেই মানচিত্রের নিকটে দাঁড়াইয়া যেন কোনও গুরুতর বিষয় বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

কথাটা তেমন গোপনীয় নহে বুঝিয়া আমিও সেখানে দাঁড়াইলাম। বক্তা বলিতে লাগিলেন, 'আমার সিদ্ধান্তে যে ভ্রম-প্রমাদ নাই, তাহা তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছি। যে দিন টেলিগ্রামে সর্বপ্রথম পাঠ করিলাম কনস্টান্টিনোপলে প্লেগ দেখা দিয়াছে, তাহা কাঁচি দিয়া কাটিয়া পর-পর একখানি সাদা কাগজে জুড়িয়া রাখিয়াছি; এবং যখন যে দেশ হইতে প্লেগের প্রথম আক্রমণ-সংবাদ পাইয়াছি, তখনই সেই দেশের সেই সকল নগর মানচিত্রে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছি। এই চিহ্নগুলির অনুসরণ করিলে তোমরা বুঝিতে পারিবে প্লেগ কোন্ পথে ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্য আক্রমণ করিতে করিতে অবশেষে ইংলণ্ডে প্রবেশ করিয়াছে।'

বক্তার কথা শুনিয়া আমার কৌতূহল অত্যন্ত বর্ধিত হইল, আমি তাঁহার আরও কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম, এবং তাঁহার কাঁধের উপর দিয়া মানচিত্রখানির উপর দৃষ্টিপাত করিলাম।

বক্তা বলিতে লাগিলেন, 'প্লেগ প্রথমে কনস্টান্টিনোপল হইতে রুশিয়া ও বালকান রাজ্যে প্রবেশ করে; তাহার দুই দিন পরে ভিয়েনা ও প্রেগে প্লেগ দেখা যায়; তাহার পরেই বার্লিন, উইটেনবর্গ ও হামবর্গ নগর প্লেগে আক্রান্ত হয়; বার্লিন হইতে প্লেগ ফ্রান্সে প্রবেশ করে; গতকল্য যে টেলিগ্রাম আসিয়াছে তাহা পাঠে জানা গিয়াছে, ফ্রান্সে দেড় হাজার ও জর্মনীতে প্রায় আঠার হাজার লোক এ পর্যন্ত প্লেগাক্রান্ত হইয়াছে; জর্মনীর হামবর্গ নগরেই সাত হাজার সাড়ে ছয় শত লোকের প্লেগ হইয়াছে। ইটালীতে প্লেগাক্রান্ত লোকের সংখ্যা চারি হাজার তিন

শত সত্তর, স্পেন ও পর্টুগালে এক শত ছাপ্পান্ন, কিন্তু তুরস্কে সাতচল্লিশ হাজার ও রুশিয়ায় চল্লিশ হাজার নয় শত কুড়ি। ইউরোপের অন্যান্য দেশেও আট দশ হাজার লোক আক্রান্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে গ্রীসেই সর্বাপেক্ষা অধিক, আঠার হাজার সাত শত ত্রিশ। অতএব দেখা যাইতেছে, তুরস্কে ও তৎসন্নিহিত দেশসমূহে অর্থাৎ গ্রীস, রুশিয়া ও অস্ট্রিয়ায় প্লেগের আক্রমণ সর্বাপেক্ষা অধিক হইল কেন, তাহা স্থির করা কঠিন। ইংলণ্ড এ পর্যন্ত ভাল ছিল, কিন্তু এদেশে প্লেগ প্রবেশ করিবার পর অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রায় পাঁচশত লোক এই ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইয়াছে।'

বক্তার এই সকল কথা শুনিয়া আমি জড়ের ন্যায় সেইখানে দণ্ডায়মান রহিলাম, আমার পদদ্বয় যেন মৃত্তিকায় প্রোথিত হইল, নড়িবার পর্যন্ত শক্তি রহিল না; সহসা যেন আমার চক্ষুর উপর হইতে একখানি পরদা খুলিয়া পড়িল। এতক্ষণে আমি বুঝিতে পারিলাম প্লেগ কিরূপে ইউরোপে প্রবেশ করিল।

বক্তা বলিতে লাগিলেন, 'প্লেগ কোন্ পথে লণ্ডনে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাও তোমাদের বুঝাইয়া দিতেছি। ইংলণ্ডের মধ্যে সর্বপ্রথমে নরফোকে প্লেগ দেখা যায়, টেবওয়ার্থ নামক রেল-স্টেশনের এক জন প্রহরী ও স্টেশন-মাস্টার প্রায় একই সময়ে এই রোগে আক্রান্ত হয়; তাহার পরই প্লেগ লণ্ডনে প্রবেশ করিয়াছে। গত রাত্রে যে সকল ভদ্রলোক "প্যারাডাইস থিয়েটারে" অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে পঁচাত্তর জনের প্লেগ হইয়াছে; যাঁহারা "অ্যারিস্টোক্রাটিক ক্লাবে" উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ত্রিশ জন প্লেগে আক্রান্ত হইয়াছেন, ইঁহারা সকলেই সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তি। যাঁহারা "অক্সিডেণ্টাল মিউজিক হলে" গান শুনিতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একাশি জনের, কনভেণ্ট গার্ডেনে "ফ্যান্সি-ড্রেস বলে" উপস্থিত পঁচাশি জনের, ও পার্লিয়ামেণ্ট মহা-সভায় উপস্থিত আটাশ জনের প্রায় এক সময়েই প্লেগ হইয়াছে। গতকল্য রাত্রে ডচেস অব্ আমারসামের গৃহে নাচের মজলিস

ছিল ; সেখানে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও চল্লিশ জন প্লেগে আক্রান্ত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন এই এক দিনেই নগরের বিভিন্ন অংশে কোন কোন পল্লীতে সাধারণ লোকের মধ্যে কত জন প্লেগে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহার ঠিক সংবাদ এখনও পাই নাই।'

আমি আর শুনিতে পারিলাম না, কর্ণে যেন অগ্নিবর্ষণ হইতে লাগিল ; আমি মাতালের মত টলিতে টলিতে সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিলাম, এবং ক্লাবের বাহিরে আসিয়া একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া সেই গাড়ীতে অর্ধমূর্ছিত ভাবে বাসায় চলিলাম। গাড়ী রাজপথ দিয়া সশব্দে ছুটিয়া চলিল, কিন্তু আমি কোথায় যাইতেছি, আমার তখন সে জ্ঞান ছিল না ; আমার বোধ হইতে লাগিল, কেহ আমার সর্বাঙ্গে কেরোসিন ঢালিয়া তাহাতে অগ্নি-সংযোগ করিয়াছে ! আমি বুঝিলাম, আমার জীবনে আর বিন্দুমাত্র সুখ নাই, আমি মনুষ্য-নাম কলঙ্কিত করিয়াছি ; যদি সেই মুহূর্তেই আমার মৃত্যু হইত, তাহা হইলেই আমি বাঁচিতাম।

আর বাঁচিয়া সুখ কি ? সত্য কথা এতদিনে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। যে গভীর রহস্য দুই মাসের মধ্যে বুঝিতে পারি নাই, পাঁচ মিনিটেই তাহার মর্ম গ্রহণে সমর্থ হইয়াছি। আমার বাহুমূলে যে ক্ষতচিহ্নটি ছিল, এতদিন তাহার কারণ নির্দেশ করিতে পারি নাই ; এতদিনে বুঝিলাম, নরপ্রেত রা-তাই আমাকে মিশরে লইয়া গিয়া, পিরামিড দর্শনের রাত্রে কৌশলে আমাকে অজ্ঞান করিয়া আমার শোণিতে প্লেগের বিষ মিশ্রিত করিয়াছিল। বাহুমূলের এই চিহ্ন যে টিকার চিহ্ন, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না। প্লেগে আক্রান্ত হইয়া আমি মরু-প্রান্তরে তাম্বুর মধ্যে পড়িয়া রোগ-যন্ত্রণায় ছটফট করিয়াছি ; যে আরব ভৃত্য আমার শুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিল, প্লেগেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। সে মরিল, আমি মরিলাম না ; দুর্বহ কলঙ্ক-ধ্বজা স্কন্ধে বহিয়া দেশ-দেশান্তরে এই ভীষণ মৃত্যু-বীজ ছড়াইবার জন্যই কি ভগবান আমাকে জীবিত রাখিলেন ? রা-তাইয়ের শয়তানির কথা যতই মনে পড়িতে

লাগিল, ততই আমি ক্রোধে, ক্ষোভে ক্ষিপ্তবৎ হইয়া উঠিলাম; বুঝিলাম, সে লণ্ডনে আসিয়া সমগ্র নগরে এই বিষ পরিব্যাপ্ত করিবার জন্যই গতকল্য সমস্ত রাত্রি আমাকে লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে; সমাজের সর্বোচ্চ স্তর হইতে নিম্নতম স্তর পর্যন্ত সে প্লেগের বিষ ছড়াইয়া দিয়াছে। আমি নির্বোধ, আমি মূর্খ, আমি সুখলিপ্সু হতভাগ্য বাঙালী, সেই পিশাচের ছলনা বুঝিতে না পারিয়া তাহার হস্তের ক্রীড়াপুত্তলিকা হইয়াছি; আমার সাহায্যেই সে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণবধ করিতেছে! হায়, আমার এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে! ক্ষোভে, দুঃখে, লজ্জায়, অনুতাপে আমার মস্তক যেন মাটির সহিত মিশিয়া গেল, আমার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল।

বাসায় ফিরিয়া আমি দ্রুতপদে গৃহে প্রবেশ করিলাম; প্রচণ্ড ঝটিকার পূর্বে প্রকৃতি যেমন স্থির হয়, আমার মনও সেইরূপ স্থির হইল। কিন্তু তাহা শান্তি নহে; দুর্ভাগ্যের একটি সামান্য ফুৎকারে আমার সকল আশা, সকল কামনা, সকল সঙ্কল্প, সমস্তই মুহূর্তমধ্যে নির্বাপিত হইয়া গেল; তবে আর ব্যাকুলতা কি জন্য? আমার ব্যাকুলতা থামিল বটে, কিন্তু হৃদয়ের হাহাকার নিবৃত্ত হইল না, অনুশোচনার জ্বালাময় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তিল তিল করিয়া আমার হৃদয়কে দগ্ধ করিতে বিরত হইল না। বজ্রাহত বিশাল বনস্পতি যেমন সকল সৌন্দর্য, রস, মাধুর্য ও শ্যামলতায় বঞ্চিত হইয়া স্থাণুবৎ বিরাট প্রান্তরে দণ্ডায়মান থাকে, আজ আমার অবস্থাও সেইরূপ! যদি প্রাণ খুলিয়া রোদন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে বোধহয় সেই অসহ্য যন্ত্রণারও কিছু লাঘব হইত, কিন্তু দগ্ধ হৃদয়ের নিদারুণ যন্ত্রণায় আমার অশ্রুর উৎস পর্যন্ত শুষ্ক হইয়াছিল।

মনে করিলাম, সর্বপ্রথমে রা-তাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পদাঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণ করিব, শয়তানের গলা টিপিয়া মারিব। কিন্তু ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করিয়া রা-তাইয়ের সাক্ষাৎ পাইলাম না;

রেবেকা বাতায়ন-সন্নিকটে বসিয়া মনের আনন্দে বেহালা বাজাইতেছিলেন। বেহালায় কী গৎ বাজিতেছিল তাহা এখন স্মরণ নাই, বোধ হয় কোনও সুখের গান হইবে, ভবিষ্যৎ সুখের সুরঞ্জিত সুমোহন কল্পনায় তখন তাঁহার হৃদয় পূর্ণ; বেহালায় বোধ হয় তাঁহার সেই উৎফুল্ল আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হইতেছিল; কিন্তু আমার নিকট তাহা শ্মশানের বৈরাগ্য-সঙ্গীতের ন্যায় প্রতীয়মান হইল; আমি নিদাঘাপরাহ্নের মেঘের ন্যায় বিদ্যুৎ-প্রবাহপূর্ণ স্তম্ভিত হৃদয়ে রেবেকার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলাম।

রেবেকা সহাস্য মুখে আমার মুখের দিকে চাহিলেন; কিন্তু মুহূর্তমধ্যে তাঁহার হাস্য ওষ্ঠপ্রান্তে মিলাইয়া গেল, প্রফুল্ল মুখ পাংশু-বর্ণ ধারণ করিল; তাঁহার হাতের বেহালা ক্রোড়দেশে পড়িয়া গেল; তিনি আমাকে ভীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হইয়াছে শীঘ্র বল, তোমার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে আমাদের নিশ্চয়ই আবার কোন বিপদ উপস্থিত হইয়াছে!'

রেবেকা আমার হাত ধরিবার জন্য সাগ্রহে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিলেন।

আমি এক লম্ফে দুই হাত সরিয়া দাঁড়াইয়া উন্মাদের ন্যায় বিকৃত স্বরে বলিলাম, 'সরিয়া যাও; আমাকে স্পর্শ করিও না; আমি তোমার স্পর্শের যোগ্য নহি!'

রেবেকা বজ্রাহতের ন্যায় মুহূর্তকাল স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর রোরুদ্যমান কণ্ঠে বলিলেন, 'কি হইয়াছে শীঘ্র বল, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি কেন এ কথা বলিতেছ? কেন আমি তোমার স্পর্শের যোগ্য নহি?'

আমি বিকৃত স্বরে বলিলাম, 'তোমার সহিত আমার সকল সম্বন্ধ শেষ হইয়াছে; আমি আর মনুষ্য-নামের যোগ্য নহি! নরমাংস-ভোজী, হিংস্র আরণ্য পশু অপেক্ষাও আমি অধম! আমার ছায়া স্পর্শ করাও কাহারও কর্তব্য নহে! রাজদ্রোহী ও সমাজদ্রোহী নরহন্তার পাপেরও প্রায়শ্চিত্ত থাকিতে পারে, কিন্তু আমার পাপের

প্রায়শ্চিত্ত নাই ; আমি সহস্র নিরপরাধ নরনারীর প্রাণবধ করিয়াছি। শত শত সুখের সংসারে শোকের আগুন এই হস্তে জ্বালিয়া দিয়া আসিয়াছি, সেই অগ্নি দেশব্যাপী হইয়া এখন আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে।'

আমার কথা শুনিয়া রেবেকা বোধ হয় কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, বোধ হয় মনে করিলেন, আমি রা-তাইয়ের অবাধ্য হওয়ায় সে আমার বুদ্ধি নষ্ট করিয়া দিয়াছে, আমাকে উন্মত্ত করিয়াছে।—রেবেকা ধীরে ধীরে ছিন্নমূলা কুসুমকুন্তলা বনলতার ন্যায় সেই শুভ্র মার্বেলের মেঝের উপর বসিয়া পড়িলেন, তাঁহার অস্ফুট রোদনধ্বনিতে সেই স্তব্ধ কক্ষ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

এমন সময় রা-তাই নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সে কক্ষে উপস্থিত হইয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইল ; সে কিছুমাত্র বিস্মিত বা বিচলিত হইল না, উভয় হস্ত বক্ষে স্থাপন করিয়া নির্নিমেষ নেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া অকম্পিত স্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মিঃ সেন, ব্যাপার কি ? তুমি কি পাগল হইয়াছ ?'

প্রথমে আমার মুখে কোন কথা বাহির হইল না, যেন কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। ক্রোধে আমার সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, ঘৃণায় আমি রা-তাইয়ের মুখের দিকে চাহিতেও পারিলাম না। তাহার পর অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলাম, 'রা-তাই সাহেব, এত দিনে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে! অনেক বিলম্বে তোমার মনের কথা জানিতে পারিয়াছি। যদি পূর্বে ইহা বুঝিতে পারিতাম!'

রা-তাই কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া আমার মুখের উপর তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া অচঞ্চল স্বরে বলিল, 'আমার মনের কথা কি বুঝিতে পারিয়াছ ? পূর্বে বুঝিতে পারিলে কি করিতে, বল শুনি!'

আমি আর আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া নিদারুণ উত্তেজনায় বিকৃত স্বরে বলিলাম, 'কী আর বলিব ? তোমার প্রকৃতি কিরূপ ভয়ঙ্কর, তুমি আমার অজ্ঞাতসারে আমাকে কি ভীষণ পাপে লিপ্ত করিয়াছ, এত দিনে তাহাই জানিতে পারিয়াছি। আমাকে তুমি

নরহত্যার সাঙ্ঘাতিক অস্ত্রে পরিণত করিবার জন্যই এত দিন সাদরে অতিথি-সংকার করিয়াছ; ইন্দ্রজালবলে আমাকে তোমার অধম দাস করিয়া, আমার সাহায্যে তুমি সুদূর আফ্রিকা দেশ হইতে এই নগরে প্লেগের বীজ আমদানি করিয়াছ! আজ প্লেগে সমস্ত ইউরোপ সংক্ষুব্ধ; যাহার আক্রমণে লক্ষ লক্ষ পরিবার অনাথ; শোকার্তের আর্তনাদে সমস্ত ইউরোপ প্রতিধ্বনিত, লক্ষ লক্ষ শান্তিপূর্ণ পরিবারে অশান্তির কলরোল সমুত্থিত, তাহার ব্যাপকতার জন্য তুমিই দায়ী; তুমি স্বেচ্ছাক্রমে আমাকে এই ভীষণ নরহত্যায় লিপ্ত করিয়াছ। কিন্তু নিশ্চয় জানিও, তোমারও এবার পরিত্রাণ নাই, এখন তুমি কিরূপে আত্মরক্ষা কর, তাহাই দেখিব; এক ঘণ্টার মধ্যে সমগ্র পৃথিবীতে তোমার দুষ্কর্মের বিবরণ প্রচারিত হইবে, পিশাচের মুখের মুখোস আর এক ঘণ্টার মধ্যে খসিয়া পড়িবে; পিশাচের মৃত্যু যদি সম্ভব হয়, তবে রাজদণ্ডে তোমার মৃত্যু অনিবার্য। আমার রুদ্ধ নেত্র উন্মুক্ত হইয়াছে, তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি; আর তুমি আমাকে হাতে পাইবে না; তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত অতি নিকট!'

রেবেকা আমার পদতলে লুটাইয়া উভয় হস্তে মুখ ঢাকিয়া ব্যাকুল ভাবে রোদন করিতেছিলেন; তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া রা-তাই দুর্জয় ক্রোধে অধীর হইয়া গর্জন করিয়া উঠিল। পিশাচের ন্যায় হাসিয়া বলিল, 'ওরে নির্বোধ, জানিস তুই কাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এমন স্পর্ধিত ভাবে কথা কহিতেছিস? তোর চাপল্য, তোর স্পর্ধা আমি অনেকবার ক্ষমা করিয়াছি, আর তোকে ক্ষমা করিব না, তোর সর্বনাশ করিব! দাম্ভিক মানব, তুই আমাকে কি ভয় দেখাইতেছিস? আমি কি মনুষ্যের ভয়ে কাতর? মিশরের রাজ-পুরোহিত কুহক-বিদ্যাবিশারদ তিন সহস্র বৎসর বয়স্ক রা-মীস কি ক্ষুদ্র মানবকে গ্রাহ্য করে? আমি এখনই তোকে ক্ষুদ্র কীটের ন্যায় পদতলে পিষিয়া মারিতে পারি, কিন্তু উন্মত্তের প্রাণবধ করিয়া আমার হস্ত কলঙ্কিত করিব না। আজ তোকে সকল কথা বলিতেছি; তুই

মিশরের পিরামিডে ও আমন দেবের ভগ্ন মন্দিরে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলি, তাহা স্বপ্ন নহে, সত্য ; সে সকল ঘটনা তিন সহস্র বৎসর পূর্বে সত্যই ঘটিয়াছিল। আমিই সেই রা-মীস, রা-তাই নাম গ্রহণ করিয়া তিন হাজার বৎসর কাল পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছি। দেবতার অভিশাপে আমার আত্মার সদগতি হয় নাই, তাই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যতদিন আমার গতি না হয়, ততদিন মনুষ্য-মূর্তি ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অশান্তি ও অকল্যাণের বীজ বপন করিব। এজন্য সর্বপ্রথমে একটি স্ত্রীলোকের আবশ্যক বুঝিয়া কৌশলে রেবেকার পিতা সোলেমান কোহেনের প্রাণ বধ করি, পরে তাহার সুন্দরী কন্যাটিকে হস্তগত করিয়াছিলাম ; অনন্তর একটি পুরুষ অনুচরের আবশ্যক হইল। সমস্ত ইউরোপ ঘুরিয়াও তাহা সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। তখন মনে করিলাম, প্রাচ্য দেশের কোন লোককে দিয়া আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ করিব। ইউরোপীয় জাতিগুলার প্রতি বহুকাল হইতেই আমি জাত-ক্রোধ ; তাহারা দাম্ভিক, অবিশ্বাসী, আত্মসর্বস্ব ; তাহারা প্রাচীন মিশরের দেবতাগণের অতুল কীর্তি হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চায় ; দেশ-দেশান্তর হইতে তাহারা মিশরে উপস্থিত হইয়া প্রাচীন দেবমন্দির লণ্ডভণ্ড করে, দেবগণের প্রাচীন স্মৃতির অবমাননা করে ; এজন্য তাহাদের প্রতিফল প্রদান করিতে না পারিলে আমার আত্মার মুক্তি হইবে না, ইহাই আমার ধারণা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমি ক্রমাগত এই তিন হাজার বৎসর হৃদয়ে শ্মশানের ভার বহন করিয়া শান্তিহীন প্রেতের ন্যায় দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি ; অবশেষে দেবানুগ্রহে সুসময়ে তোকে লাভ করিয়াছিলাম। আমার কুহকেই তুই রেবেকার প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়াছিলি ; ছায়ার ন্যায় সর্বত্র আমার অনুসরণ করিয়াছিস। এতদিনে আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইয়াছে, এখন তুই যাহা ইচ্ছা কর।'

আমি স্তম্ভিত ভাবে রা-তাইয়ের এই অদ্ভুত কাহিনী শ্রবণ করিতে লাগিলাম ; আমি স্থান কাল বিস্মৃত হইলাম, আমার অস্তিত্ব পর্যন্ত বিস্মৃত হইলাম। রা-তাই ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনর্বার

বলিতে আরম্ভ করিল, 'তুমি আরও কিছু শুনিতে চাও? আমার কুকার্যের কথা জনসমাজে ঘোষিত করা তোমার অভিপ্রেত হইলে আমার সকল বৃত্তান্তই তোমার জানা আবশ্যক; এ সকল কথা যতদিন পর্যন্ত তোমার নিকট গোপন করা আবশ্যক হইয়াছিল, তত দিন তাহা গোপন রাখিয়াছিলাম; আমার জীবনের সঙ্কল্প সিদ্ধ হইয়াছে, আর কোনও কথা গোপন করিব না।—সত্য কথা বলিতে কি, এখন তুমি সম্পূর্ণরূপে আমার আয়ত্তে, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আর তোমার চলিবার শক্তি নাই। তুমি আমার অসম্ভব কাহিনী জনসমাজে প্রচারিত করিলেও আমার কোন ক্ষতির আশঙ্কা নাই; তোমার একটি কথাও কেহ বিশ্বাস করিবে না, সকলেই তোমাকে উন্মাদ মনে করিবে; সকলেরই ধারণা হইবে, প্লেগের আতঙ্কে তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে। সর্বপ্রথম যে দিন তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ, সেইদিন তুমি আমাকে একজন দোকানদারের হত্যাকারী বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলে; তখন আমি সে কথা স্বীকার করি নাই; কিন্তু তোমার সন্দেহ অমূলক নহে, এখন স্বীকার করিতেছি, আমিই সেই দোকানদারের হত্যাকারী; সেই দোকান-দারের নিকট মিশরের প্রাচীন রাজবংশের একটি মন্ত্রপূত অঙ্গুরী ছিল, আমার কোন গুপ্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সেই অঙ্গুরীটি আবশ্যক হওয়ায়, তাহা হস্তগত করিবার জন্য নানা চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার চেষ্টা সফল হয় নাই; অগত্যা আমি দোকানদারের প্রাণ বধ করিয়া তাহার নিকট হইতে সেই অঙ্গুরী গ্রহণ করিলাম, এবং কুহক-মন্ত্রবলে একটি নির্বোধকে বশীভূত করিয়া তাহাকে দিয়া অপরাধ স্বীকার করাইলাম। আমার কুহকে মুগ্ধ হইয়াই তুমি ইটালি হইতে আমার সঙ্গে মিশরে যাত্রা করিয়াছিলে, এবং আমার ইচ্ছাক্রমেই তুমি পিরামিডে আমার অনুসরণ করিয়াছিলে; পিরামিডে প্রবেশ করিয়া আমার কুহকেই তুমি পথ হারাও; সেখানে তুমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলে, আমি প্লেগের বীজ তোমার শোণিতের সহিত মিশ্রিত করি; পরে তুমি তোমার বাহুমূলে টিকার চিহ্ন দেখিয়া

বিস্মিত হইয়াছিলে। প্লেগাক্রান্ত হইয়া তুমি মিশরের মরুভূমিতে কয়েক দিন অচৈতন্য ভাবে পড়িয়া ছিলে, আমার চেষ্টাতেই তোমার মৃত্যু হয় নাই; তাহার পর তুমি আরোগ্য লাভ করিলে আমার সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য তোমাকে ইউরোপে লইয়া আসিলাম। কনস্টান্টি-নোপল, ভিয়েনা, প্রেগ, বার্লিন, হামবার্গ,—ইউরোপের যে যে নগরে তুমি পদার্পণ করিয়াছ, সেই সকল নগরেই তোমার দেহস্থ প্লেগের বীজ নগরবাসীগণের দেহে প্রবেশ করিয়াছে, এখন তাহার ফল ফলিতেছে। এতদিনে আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়াছে, আর আমার পৃথিবীতে থাকিবার আবশ্যক নাই; এবার আমার আত্মার সদগতি হইবে, আমি অবিলম্বেই আমার সমাধি-গহ্বরে প্রবেশ করিয়া চির বিরাম লাভ করিব।

'ঐ শুন, লণ্ডনের প্রতি গৃহ হইতে শোকার্তের ক্রন্দনোচ্ছ্বাস দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছে; দীর্ঘকালের চেষ্টায় আমি যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছি, তাহা সহজে নির্বাপিত হইবে না; এই ভীষণ নরকানলে কেবল লণ্ডন কেন, সমগ্র ইংলণ্ড দগ্ধ হইবে, এবং ইউরোপের মহা সমৃদ্ধ রাজধানী-সমূহও অবিলম্বে জনশূন্য হইয়া নিস্তব্ধ শ্মশানের আকার ধারণ করিবে। শস্যক্ষেত্রে শস্যরাশি সুপরিপক্ক হইলে কৃষকের অস্ত্রাঘাতে যেমন তাহা সমূলে কর্তিত হয়, দেবতার অভিসম্পাত-স্বরূপ এই ভীষণ ব্যাধিও সেইরূপ ওই দেশের বালক, যুবক, বৃদ্ধ, পুরুষ ও রমণী, শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী ও দরিদ্র সকলকে সমভাবে নিপাতিত করিবে; বংশের গর্ব, ধনের অহঙ্কার, উচ্চপদের গৌরব ইহার নিকট নিরর্থক; মৃত্যুর সুললিত সঙ্গীত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল গৃহ হইতে সমস্বরে উত্থিত হইবে, আর আমি তিন সহস্র বৎসর পূর্বের মিশর রাজ-পুরোহিত কুহকবিদ্যা-বিশারদ রা-মীস সেই শ্রুতি-সুখকর সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে চক্ষুদ্বয় চির-মুদ্রিত করিব। এখন যাও, এই অপূর্ব সংবাদ পৃথিবীর জনসাধারণের নিকট মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা কর।'

উত্তেজনা ভরে রা-তাইয়ের সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, তাহার মুখ

পিশাচের মুখের ন্যায় অতি কুৎসিত, অতি বীভৎস ভাব ধারণ করিল, তাহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল ; সে উন্মত্তের ন্যায় আমার দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল, 'ওরে অহঙ্কারী অল্পজীবী মানব! ক্ষণস্থায়ী জীবন লইয়া, মৃত্তিকার অক্ষম পুত্তলিকা হইয়া আমাকে শাসন করিবার স্পর্ধা করিতেছিস? কিন্তু এখনও কাল পূর্ণ হয় নাই, এইজন্য এখনও তোকে পরিত্যাগ করিব না ; তোকে আমার আরও কিছু কাজ করিতে হইবে, এইজন্য আদেশ করিতেছি, তুই এই মুহূর্তে নিদ্রিত হ ; নিদ্রাঘোরে উঠিয়া তুই আমার অবশিষ্ট আদেশ পালন করিবি।'

আমি মোহাবিষ্টের ন্যায় চাহিয়া দেখিলাম, রা-তাইয়ের দেহ ক্রমে দীর্ঘতর হইয়া তাহার মস্তক কড়িকাঠ স্পর্শ করিল। তাহার চক্ষু দুটি কপালে উঠিয়া অগ্নিময় গোলকের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল, সেই অগ্নিতে আমার সর্বাঙ্গ দগ্ধ হইতে লাগিল ; কিন্তু আমার নড়িবার শক্তি রহিল না। আমি দেখিলাম, রেবেকা উন্মাদিনীর ন্যায় এক লম্ফে আমার পদপ্রান্ত হইতে উঠিয়া সেই কক্ষ-প্রাচীরবিলম্বিত একখানি তীক্ষ্নধার সুদীর্ঘ ছোরা সবলে আকর্ষণ করিলেন, এবং ব্যাঘ্রীর ন্যায় এক লম্ফে রা-তাইয়ের উপর নিপতিতা হইয়া সেই ছোরা তাহার বক্ষস্থলে প্রোথিত করিতে উদ্যতা হইলেন। কিন্তু আঘাতের পূর্বেই রেবেকা যেন অদৃশ্য তড়িৎশক্তি-বলে সবেগে কয়েক হাত দূরে নিক্ষিপ্তা হইয়া মূর্ছিতা হইয়া পড়িলেন, ছোরাখানি তাঁহার হাত হইতে খসিয়া মার্বেলের মেঝের উপর ঝন-ঝন শব্দে নিপতিত হইল। কিন্তু তাহার পর কি হইল দেখিতে পাইলাম না, আমার আর চক্ষু মেলিবার শক্তি রহিল না ; আমি হতচেতন ভাবে সেই স্থানে নিপতিত হইলাম।

বিংশ পরিচ্ছেদ

পাঁচ দিন ও ছয় রাত্রি রা-তাইয়ের কুহক-বলে আমি অজ্ঞান হইয়া রহিলাম, কিন্তু আমার অনুভব-শক্তি নষ্ট হইল না ; আমি বুঝিতে পারিতাম, অজ্ঞানাভিভূত হইয়া শয্যায় নিপতিত না থাকিয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, নানাপ্রকার কার্য করিতেছি ; কিন্তু কি করিয়াছি বা কখন কোথায় গিয়াছি, তাহা আমার স্মরণ নাই। প্রকৃতিস্থ হইয়া অনেক চেষ্টাতেও আমি সেই কয় দিনের কোন কথা স্মরণ করিতে পারি নাই ; স্বপ্নের মত দুই একটা কথা মনে পড়িত মাত্র। আমি সুস্থ হইলে রেবেকা আমাকে বলিয়াছেন, সেই কয় দিন আমি রা-তাইয়ের সঙ্গে সজীব পুত্তলিকার মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি; আশ্চর্যের কথা এই যে, যথাকালে আহার করিয়া শয়ন ও বিশ্রাম করিয়াছি ; কিন্তু রেবেকার সঙ্গে বাক্যালাপ করি নাই ; সে কয় দিন রা-তাই আমাকে রেবেকার কাছেও যাইতে দেয় নাই। আমি এক এক দিন অতি প্রত্যূষে রা-তাইয়ের সহিত বাহিরে যাইতাম, গভীর রাত্রে বাসায় ফিরিয়া আসিতাম ; আমাকে আমার শয়নকক্ষে শয়ন করাইয়া পরে সে বিশ্রাম করিতে যাইত।

এইরূপ অজ্ঞানাভিভূত অবস্থায় কয়েক দিন অতিবাহিত হইল ; ষষ্ঠ দিন প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গে চাহিয়া দেখিলাম, আমার চক্ষুর সম্মুখে পৃথিবীটা যেন বন-বন করিয়া ঘুরিতেছে, মস্তিষ্কে দারুণ প্রদাহ অনুভব করিলাম, আমার চিন্তাসূত্রগুলি এরূপ বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল যে আমি কে, কোথায় আসিয়াছি, কেন আসিয়াছি, কোন কথা স্মরণ করিতে পারিলাম না। ক্রমে আমার ইন্দ্রিয়গুলিতে স্বাভাবিক শক্তি ফিরিয়া আসিল, চিন্তার বিচ্ছিন্ন সূত্রগুলি আমি ধীরে ধীরে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইলাম ; তাহার পর শয্যায় উঠিয়া বসিলাম।

প্রাতঃসূর্যের আলোক গবাক্ষপথে গৃহকক্ষে প্রবেশ করিতেছিল, বুঝিলাম, অনেকক্ষণ সূর্যোদয় হইয়াছে। আমার পরিধানে ভ্রমণের

পরিচ্ছদ, কিন্তু কখন যে তাহা পরিধান করিয়াছি, আর কখনই বা শয়ন করিয়াছিলাম, তাহা মনে আসিল না। রা-তাইয়ের আদেশে আমি এই কয় দিন মোহাচ্ছন্ন ছিলাম তাহা স্মরণ হইল, অজ্ঞান অবস্থায় আবার যে কিরূপ দুষ্কর্মে তাহার সাহায্য করিয়াছি, কিরূপে বুঝিব ?

নিদ্রাভঙ্গে আমি পূর্বসঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিতে উৎসুক হইলাম ; শয্যা ত্যাগ করিয়া নিচে আসিলাম ও ঘুরিতে ঘুরিতে রাজপথের সম্মুখে দাঁড়াইলাম ; দেখিলাম, নগরের অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিয়াছে। চতুর্দিক নিস্তব্ধ, কোনও দিকে জনকোলাহল শুনিতে পাইলাম না ; মধ্যরাত্রে বহুজনপূর্ণ সুবৃহৎ নগরী যেমন নিস্তব্ধ হয়, সেই প্রভাতেও নগরের সেই অবস্থা দর্শন করিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। দেখিলাম, রাজপথে একখানিও গাড়ী নাই, পথে এক জনও লোক চলিতেছে না, দূরে কলের চিমনি হইতে ধূমরাশি উদ্গীরিত হইতেছে না ; শহরের সকল কলের বংশী নীরব। তখন বেলা নয়টা, অথচ তখন পর্যন্ত এক জনও ফেরিওয়ালাকে হাঁকিয়া যাইতে দেখিলাম না, অফিস আদালতের কোনও কর্মচারী অফিস যাইতেছেন না, বিদ্যুৎ-বাহিত ট্রাম গাড়ির ঘর্ঘর শব্দ নীরব। উভয়পার্শ্বে যতদূর দৃষ্টি গেল, দেখিলাম পথের দুই ধারের দোকানগুলি বন্ধ। আমার সঙ্কল্প ভুলিলাম না ; রা-তাইয়ের পৈশাচিক কার্য অবিলম্বে কর্তৃপক্ষের গোচর করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিলাম। তৎক্ষণাৎ পথে বাহির হইয়া পড়িলাম।

হোম অফিসে যাইতে হইবে ; বাসা হইতে সেই অফিস অনেক দূর, তত পথ হাঁটিয়া যাইতে পারিব না ভাবিয়া একখানি গাড়ীর সন্ধানে ঘুরিতে লাগিলাম ; কিন্তু একখানিও গাড়ী দেখিতে পাইলাম না। অগত্যা পদব্রজেই চলিলাম। যতদূর চলিলাম, পথের দুই ধারে সমুদয় বাড়ীর দ্বার রুদ্ধ ; শহরে যে লোক আছে, এরূপ অনুমান হইল না।

ঘুরিতে ঘুরিতে বার্কলি স্ট্রীটে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, পথ দিয়া

দুই একজন মাত্র লোক যাতায়াত করিতেছে ; অন্য দিন সে সময় সে পথে রথ দোলের লোক চলিয়া থাকে। ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম, দশটা বাজিতে তখনও কিছু বিলম্ব আছে ; সেখানে আর-এক বার গাড়ীর সন্ধান করিলাম, একখানিও গাড়ী দেখিলাম না। পথের ধারের বাগানগুলিতে জনপ্রাণী নাই, গাছে দুই একটা পাখী বসিয়া আছে মাত্র।

সেণ্ট জেমস্ পার্কের মোড় ঘুরিয়া দ্রুতপদে হোম অফিসের দিকে চলিতে লাগিলাম ; সে পথটিও সেইরূপ জনহীন, পথে কদাচিৎ দুই একটি লোককে অতি বিমর্ষ ভাবে চলিতে দেখিলাম। দূর হইতে বোধ হইল, বাগানের মধ্যে স্থানে স্থানে অনেক লোক যেন দলবদ্ধ হইয়া এই মধ্যাহ্ন রৌদ্রে আরামে শয়ন করিয়া আছে ; নিকটে গিয়া দেখি, তাহাদের অধিকাংশই মৃত ; যাহাদের প্রাণ তখম পর্যন্ত বহির্গত হয় নাই, তাহারা নিদারুণ মৃত্যু-যন্ত্রণায় বিহ্বল ভাবে মাটির উপর লুটাইতেছে। সেই ভীষণ দৃশ্য আমি জীবনে বিস্মৃত হইব না।

আমি সভয়ে মৃত ব্যক্তিগণের মুখের দিকে চাহিলাম। তাহাদের মুখ এমন বিকৃত হইয়াছে যে, দেখিলে আতঙ্ক হয়। এক স্থানে কয়েকটা কুকুর একটি মুমূর্ষুর দেহ লইয়া টানাটানি করিতেছিল। লণ্ডনের রাজপথে প্রকাশ্য দিবালোকে মুমূর্ষুর দেহ কুকুরে ছিঁড়িয়া খাইতেছে, ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা? আমি সভয়ে কয়েক পদ সরিয়া দাঁড়াইলাম ; আমার দুই একবার সন্দেহ হইল, হয়ত এখনও আমি মোহাচ্ছন্ন আছি, রা-তাইয়ের কুহকে কাল্পনিক দৃশ্য সত্যবৎ সম্মুখে দেখিতেছি।

আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, একটি লোক অন্য পথ দিয়া ব্যস্তভাবে আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে ; আকার ও পরিচ্ছদ দেখিয়া তাহাকে ভদ্রলোক বলিয়াই বোধ হইল। সে নিকটে আসিলে দেখিলাম, মূত্র-পুরীষাদিতে তাহার পরিধেয় বস্ত্র অপরিষ্কৃত হইয়াছে। আগন্তুকের শূন্য দৃষ্টি দেখিয়া বুঝিলাম, সে উন্মত্ত।

লোকটি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'মহাশয়, আমার ছেলে

মেয়ে কোথায় বলিতে পারেন ? তাহাদের বাড়ীতে রাখিয়া কয়েক ঘণ্টার জন্য বাহিরে গিয়াছিলাম, বাড়ী ফিরিয়া আর তাহাদের দেখিতে পাইলাম না। তাহারা কি প্লেগে মারয়াছে ? এ রোগ নয়, এ একটা রাক্ষস, তাজা মানুষ ধরিয়া ধরিয়া তাহার রক্ত চুষিতেছে! রাক্ষসটা কয় মুখে মানুষ খায় ? এক মুখ হইলে সে এক দিনে হাজার হাজার লোকের রক্ত খাইতে পারিত না ; উঃ কত বড় পেট! যত ঢালে কিছুতে ভরে না!'

পাগলের সঙ্গে আর কি কথা বলিব ? আমি তাড়াতাড়ি হোম সেক্রেটারির অফিসের দ্বারে উপস্থিত হইলাম। স্যর এডওয়ার্ড ব্রেকফিল্ড তখন ইংলণ্ডের হোম-সেক্রেটারি ছিলেন, তাঁহার সহিত আমার আলাপ ছিল ; এমন কি, অনেক মজলিসে অনেকবার তাঁহার সহিত ঘরোয়া কথাও হইয়াছে। তিনি সামাজিক, মিষ্টভাষী ও সুরসিক লোক ; খুব বড় দরের সাহেব হইলেও তাঁহার প্রকৃতি বড় কোমল ও আত্মম্ভরিতা-বর্জিত ; তিনি যে প্রার্থনামাত্র আমার সহিত সাক্ষাতে সম্মত হইবেন, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ হইল না।

হোম অফিসে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, প্রকাণ্ড অফিসটা একেবারে খালি। অন্য সময় এই অফিস সহস্রাধিক কর্মচারীতে পূর্ণ থাকে ; কিন্তু সেদিন দ্বারের প্রহরী ভিন্ন কোথাও একটি জনপ্রাণী দেখিতে পাইলাম না।

প্রহরী আমাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ; জিজ্ঞাসা করিল, 'এখানে মহাশয়ের কি আবশ্যক ?'

আমি বলিলাম, 'হোম সেক্রেটারি মহাশয়ের সহিত একবার দেখা করিব, জরুরী কাজ আছে।'

প্রহরী সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, 'সাহেবের এখন ফুরসৎ নাই।'

আমি বলিলাম, 'আমি চাকুরির উমেদার নহি, একটা জরুরী সংবাদ দিতে আসিয়াছি ; আমি আসিয়াছি জানিলে শত কাজ ফেলিয়াও তিনি আমার সহিত দেখা করিবেন।'

প্রহরী মাথা নাড়িয়া বলিল, 'তাঁহার নিকট কাহাকেও লইয়া যাইবার হুকুম নাই ; বেশি কথা না বলিয়া সরিয়া পড়ুন।'

আমি উত্তেজিত ভাবে বলিলাম, 'তাঁহার সঙ্গে একবার দেখা না করিলেই নয়, তুমি যদি আমাকে তাঁহার কাছে লইয়া না যাও, তাহা হইলে আমি নিজেই তাঁহার নিকট যাইব।'

প্রহরী আমার কথা শুনিয়া এমন রুখিয়া উঠিল যে, বুঝিলাম অবিলম্বেই আমাকে অর্ধচন্দ্র লাভ করিতে হইবে ; কিন্তু সৌভাগ্য-ক্রমে প্রহরীর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইলাম ; প্রহরী হঠাৎ কাহাকে অদূরে দেখিয়া সঙ্কুচিতভাবে সরিয়া দাঁড়াইল ; আমি ফিরিয়া চাহিতেই স্যর এডওয়ার্ড ব্রেকফিল্ডকে দেখিতে পাইলাম।

স্যর এডওয়ার্ডকে কয়েক দিন পূর্বেই ডচেস্ অব্ আমারসামের বলের মজলিসে দেখিয়াছিলাম, তাঁহার হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ, মুখে প্রসন্ন হাস্য, চক্ষুদুটি অসাধারণ দীপ্তিশীল ; আজ দেখিলাম, তাঁহার সেই উৎসাহ নাই, স্ফূর্তি নাই, মুখ গম্ভীর ও শুষ্ক, চক্ষু দুটি নিষ্প্রভ ; এই কয়েক দিনেই যেন তাঁহার বয়স দশ পনের বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে। স্বদেশের দুর্গতি দর্শনে, রোগে, শোকে ও নিদারুণ মনঃ-কষ্টে যৌবনেই তিনি অকাল বার্ধক্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আমাকে দেখিয়া স্যর এডওয়ার্ড প্রায় দুই মিনিট কাল আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, বুঝিলাম, আমাকে তিনি চিনিতে পারেন নাই ; আমি বলিলাম, 'স্যর এডওয়ার্ড, আপনি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না, আমি তো আপনার অপরিচিত নহি!'

আমার কথা শুনিয়া স্যর এডওয়ার্ড সবিস্ময়ে বলিলেন, 'মিঃ সেন! আমি তোমাকে সত্যই চিনিতে পারি নাই, তোমার আকৃতির অত্যন্ত অধিক পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু এখানে কেন? আমার সঙ্গে কোন কথা থাকিলে এখন আমার তাহা শুনিবার অবসর নাই ; হেল্‌থ্-কমিশনার এখনই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন।'

আমি বলিলাম, 'কিন্তু আমার যাহা বক্তব্য আছে তাহা এখনই আপনাকে শুনিতে হইবে ; এখানে দাঁড়াইয়া আমি অধিকক্ষণ

আপনার সঙ্গে কথা কহিব না, ফাঁকা যায়গায় চলুন, নতুবা আমার দেহ হইতে প্লেগের বীজাণু আপনার দেহে সংক্রামিত হইতে পারে।'

স্যর এডওয়ার্ড হতবুদ্ধির ন্যায় ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, 'সে ভয় নাই, আমাকে প্লেগে ধরিয়াছিল, বহুকষ্টে এযাত্রা রক্ষা পাইয়াছি ; যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় প্লেগের আক্রমণ জীবনে এক বারের অধিক হয় না ; তবে, তোমার যদি কোন গোপনীয় কথা থাকে, আমার সঙ্গে আসিতে পার, কিন্তু তোমাকে অধিক সময় দিতে পারিব না।'

স্যর এডওয়ার্ড আমাকে সঙ্গে লইয়া একটি বিস্তীর্ণ হলে প্রবেশ করিলেন ; হলটি জনশূন্য, তিনি তাহার দরজা বন্ধ করিয়া আমার দিকে চাহিলেন ; বলিলেন, 'কি বলিবার আছে সংক্ষেপে বল।'

আমি বলিলাম, 'সম্প্রতি যে ভীষণ প্লেগে সমগ্র ইউরোপ সন্ত্রস্ত, যে রোগ ইংলণ্ডে দারুণ জনক্ষয় উপস্থিত করিয়াছে, ইউরোপখণ্ডে সেই রোগ আমদানির জন্য আমিই অপরাধী!'

স্যর এডওয়ার্ড বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্লেগের আমদানির জন্য তুমিই অপরাধী, এ কথার অর্থ কি? তুমি কি তোমার স্বদেশ হইতে এ দেশে প্লেগ আমদানি করিয়াছ?'

আমি বলিলাম, 'স্বদেশের সহিত দীর্ঘকাল আমার কোনও সম্বন্ধ নাই, আমার স্বদেশেও এ পর্যন্ত প্লেগের আবির্ভাব হয় নাই ; অন্য দেশ হইতে প্লেগ আমার ঘাড়ে চাপিয়া এ দেশে আসিয়াছে।'

স্যর এডওয়ার্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার কি প্লেগ হইয়াছিল?'

আমি বলিলাম, 'সেই কথাই বলিতে আসিয়াছি ; আমার এই কাহিনী বড়ই অদ্ভুত ; মিশর দেশে পিরামিডের মধ্যে আমার প্লেগের টিকা হইয়াছিল, তাহার পর লক্সরের নিকটবর্তী মরুভূমিতে একটি তাম্বুর মধ্যে আমি কয়েক দিন মৃতবৎ পড়িয়া ছিলাম ; আমি সুস্থ হইয়া উঠিলে একজন লোক আমাকে কনস্টান্টিনোপলে লইয়া যায় ; কনস্টান্টিনোপল হইতে অষ্ট্রিয়া ও জর্মনীর ভিতর দিয়া নগরে নগরে

প্লেগের বিষ ছড়াইতে ছড়াইতে কয়েক দিন হইল ইংলণ্ডে আসিয়াছি; ডচেস্ অব্ আমারসামের গৃহে নাচের মজলিসে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, এক রাত্রেই তাঁহাদের অনেকে প্লেগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, আপনিও তাঁহাদের মধ্যে একজন। সেই রাত্রে আমারই শরীর হইতে প্লেগের বিষ নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের দেহে প্রবেশ করে।'

স্যর এডওয়ার্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে তোমাকে প্লেগের টিকা দিয়াছিল? সে ব্যক্তি কি তোমার পরিচিত?'

আমি বলিলাম, 'সে ব্যক্তি কেবল আমার নহে, সে ইংলণ্ডে বহু জনের পরিচিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজে সম্মানিত; তাহার নাম রা-তাই। সে মিশর দেশের লোক,—লোক বলিলে ঠিক হইল না, সে নরদেহী পিশাচ; প্রাচীন যুগে মিশরে রা-মীস নামক একজন ঐন্দ্রজালিক ছিল, কুহক-বিদ্যাবলে তিন হাজার বৎসর পূর্বে সে অনেক অদ্ভুত কার্য করিয়াছিল; সেই রা-মীস নরদেহ ধারণ করিয়া ইউরোপীয় জাতিসমূহের সর্বনাশ সাধনে উদ্যত হইয়াছে; সে এ পর্যন্ত নরহত্যাদি বহুবিধ দুষ্কর্ম করিয়াছে। সেই নরপ্রেতই আমাকে হামবার্গ হইতে গোপনে ইংলণ্ডে লইয়া আসিয়াছে; তাহার সঙ্গে আমি যে সকল স্থানে ঘুরিয়াছি, সেই সকল স্থানের লোক কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্লেগে আক্রান্ত হইয়াছে। ইংলণ্ডে প্লেগের বিস্তৃতির ইহাই কারণ। আমিই এই বিপুল জনক্ষয়ের একমাত্র কারণ, ইহা বুঝিতে পারিয়া আমার মনে ভয়ঙ্কর আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছে; মনের ভার অসহ্য হওয়ায় আপনাকে সকল কথা খুলিয়া বলিতে আসিয়াছি।'

স্যর এডওয়ার্ড বলিলেন, 'ডচেস্ আমারসামের বলের মজলিসে আমার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; সেদিন এ সম্বন্ধে কোনও কথা না বলিয়া আজ বলিতেছ কেন?'

আমি বলিলাম. 'আমিই যে প্লেগের বীজাণু ছড়াইয়া বেড়াইতেছি তখন তাহা জানিতে পারি নাই।'

স্যর এডওয়ার্ড ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'তোমার

গল্পটি খুব নূতন বটে ; এরূপ গল্পে উপন্যাস জমিতে পারে, কিন্তু বিশ্বাস করা কঠিন। যাহা হউক, আমার এখানে বিলম্ব করিবার উপায় নাই ; তোমার নিকট বিদায় লইবার পূর্বে তোমাকে একটি উপদেশ দিব, তুমি বাসায় ফিরিয়া গিয়া মস্তিষ্কের পুষ্টিকর কোন ঔষধ ব্যবহার কর। প্লেগে আক্রান্ত হইয়া তোমার মস্তিষ্কের বিকার ঘটিয়াছে ; আমাকে বলিলে বলিলে, এই অসম্ভব গল্প আর কাহারও কাছে বলিও না ; তাহাতে কোনও লাভ নাই, কেবল উপহাসাস্পদ হইবে।'

আমি চেয়ার হইতে উঠিয়া বলিলাম, 'স্যর এডওয়ার্ড, আপনি আমার কথা অবিশ্বাস্য মনে করিতেছেন কেন বুঝিতে পারিলাম না ; আমার একটি কথাও অতিরঞ্জিত বা মিথ্যা নহে ; রা-তাই এখনও এই শহরে আছে, অল্প চেষ্টাতেই তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন ; কিন্তু বিলম্ব করিলে সে ইংলণ্ড হইতে সরিয়া পড়িবে।'

স্যর এডওয়ার্ড সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, 'তুমি এখন বাসায় যাও, প্রকৃতিস্থ হইয়া আর এক দিন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও, আশা করি তখন তুমি এই উদ্ভট গল্পের কথা ভুলিয়া যাইবে।'

ক্ষোভে দুঃখে অধীর হইয়া আমি উত্তেজিত স্বরে বলিলাম, 'আমার মত একজন ভদ্রলোকের কথা আপনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, ইহা বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় ; কিন্তু যে দিন আমার কথা সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিবেন, সে দিন সহস্র চেষ্টাতেও সেই দুর্বৃত্তকে ধরিতে পারিবেন না। প্রকৃত অপরাধী বিনা দণ্ডে মুক্তিলাভ করিবে, ইহা অসহ্য।'

হঠাৎ আমার মনে পড়িল, রেবেকা প্লেগে আক্রান্ত হইলে তাঁহার ঔষধের জন্য রা-তাই হামবার্গ নগরে আমাকে যে প্রেসক্রিপশন দিয়াছিল তাহা আমার পকেটেই আছে ; সেই প্রেসক্রিপশনখানি বাহির করিয়া স্যর এডওয়ার্ডকে দিয়া বলিলাম, 'আপনি আমার কথা অবিশ্বাস করিলেন বটে, কিন্তু এই প্রেসক্রিপশনখানি আমার উক্তির

সমর্থন করিতেছে ; একটি রমণী হামবার্গ নগরে প্লেগে আক্রান্ত হইলে রা-তাই স্বহস্তে আমাকে এই প্রেসক্রিপশন লিখিয়া দিয়াছিল। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ইহা প্লেগের অব্যর্থ মহৌষধ ; আপনি হেল্‌থ্‌ অফিসারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন, তাঁহাকে ইহা দেখাইলে এ কথা সত্য কি না বুঝিতে পারিবেন ; তখন আমার কথা নিতান্ত অবিশ্বাস্য বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিবেন না।'

স্যর এডওয়ার্ড বলিলেন, 'আমি তোমার এ অনুরোধ রক্ষা করিব ; যদি ইহা প্লেগের অব্যর্থ মহৌষধ হয়, তাহা হইলে এই ঔষধ গভর্মেণ্ট কর্তৃক প্লেগ রোগে ব্যবহৃত হইবে।'

হোম সেক্রেটারির অফিস হইতে বাহির হইয়া আমি আর বাসায় যাইলাম না ; রা-তাই যে বাড়ীতে বাস করে সেই বাড়ীর বাতাসও আমার অসহ্য ; আমি পদব্রজে চলিতে চলিতে সেণ্ট্‌ জেম্‌স্‌ পার্কে প্রবেশ করিলাম, এবং একটি বৃক্ষতলে তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া দুর-দৃষ্টের কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম। ক্রমে আমার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল।

চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আমি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন আছি, এমন সময় ললাটে কাহার মৃদু করস্পর্শ অনুভব করিলাম; চক্ষু খুলিয়া দেখিলাম, অশ্রুমুখী রেবেকা আমার শিয়র-প্রান্তে বসিয়া আছেন।

আমি রেবেকাকে সেখানে দেখিবার আশা করি নাই। উঠিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'রেবেকা, তুমি এখানে ? আমি এই বাগানে আসিয়াছি তাহা তোমাকে কে বলিল ?'

রেবেকা বলিলেন, 'আমার মনই তাহা আমাকে বলিয়া দিয়াছে ; আমার মনের যে অদ্ভুত শক্তি আছে তাহার বলেই আমি জানিতে পারিয়াছি, তুমি কি অভিপ্রায়ে কোথায় গিয়েছিলে ; তোমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হয় নাই, তাই মনের দুঃখে এই বাগানে আসিয়া গাছতলায় পড়িয়া আছ।'

আমি বলিলাম, 'রেবেকা, আমার চেষ্টা বৃথা হইল, হোম সেক্রেটারি আমাকে পাগল মনে করিয়াছেন ; তিনি আমার কথা

বিশ্বাস করিলেন না। এখন আমি কি করিব, কোথায় যাইব, তাই ভাবিতেছি; এখন পৃথিবী আমার নিকট মরুতুল্য, এই দুস্তর মরুভূমিতে আমি একাকী, জগতে আমার মাথা রাখিবার স্থান নাই; এখন আমার মৃত্যু হইলেই বাঁচি।'

রেবেকা কোমল স্বরে বলিলেন, 'না না, ও কথা বলিও না; এত হতাশ হইলে চলিবে কেন? উঠিয়া বাসায় চল। আজ রা-তাইয়ের সম্পূর্ণ ভাবান্তর দেখিলাম, তাহার পরিবর্তন আশ্চর্য! ব্যাপার কিছু বুঝিতে পারিতেছি না; মনে হইতেছে নূতন কিছু ঘটিবে; কিন্তু তাহাতে ভীত হইবার কারণ নাই।'

রেবেকার কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইতে পারিলাম না; অবসন্নভাবে তাঁহার সঙ্গে বাসায় চলিলাম। চলিতে চলিতে রেবেকা আমাকে বলিলেন, 'রা-তাই আজ ইংলণ্ড ত্যাগ করিতেছে, টেম্‌স্‌ নদীতে তাহার জাহাজ নঙর করিয়া আছে; কতদিনের জন্য সে কোথায় যাইতেছে তাহা জানিতে পারি নাই।'

আমি উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আমাদিগকেও সঙ্গে লইবার মতলব করিয়াছে নাকি? ভাগ্যে যাহাই থাক, আমি আর তাহার সঙ্গে যাইব না, তোমাকেও যাইতে দিব না।'

রেবেকা বলিলেন, 'তাহার মতলব কিছুই বুঝিতে পারি নাই; তবে, তাহার ভাব দেখিয়া বোধ হইল, সে একাই যাইবে। আজ যেন সে সম্পূর্ণ নূতন মানুষ, তাহার এরূপ পরিবর্তন আর কখনও দেখি নাই।'

বাসায় ফিরিয়া রা-তাইয়ের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তাহার আকৃতির অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিয়াছে; তাহার শরীর সঙ্কুচিত হইয়া যেন আধখানা হইয়া গিয়াছে, লোল চর্ম ঝুলিয়া পড়িয়াছে, চক্ষু কোটরে প্রবেশ করিয়াছে। তাহাকে জীবিত ব্যক্তি বলিয়া মনে হইল না; তাহার অবস্থা দেখিয়া আমার মনে ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার পরিবর্তে করুণার সঞ্চার হইল।

রেবেকাকে দেখিয়া রা-তাই ক্ষীণ স্বরে বলিল, 'তুমি কোথায়

গিয়াছিলে ? একবার আমার কাছে এস, আমার হাতে তোমার হাত দাও ; ভয় নাই, আর তোমাকে কোনও বিপদে ফেলিব না ; আমার ভবিষ্যৎ কি, তাহাই একবার জানিয়া লইব ।'

রা-তাই রেবেকার হাত ধরিয়া তাঁহাকে চক্ষু মুদিত করিতে বলিল। রেবেকা উভয় চক্ষু নিমীলিত করিলে রা-তাই জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কিছু দেখিতে পাইতেছ কি ?'

রেবেকা মুদিত নেত্রে বলিলেন, 'একটি প্রকাণ্ড হল, তাহার চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড থাম, দেওয়ালগুলি নানা প্রকার চিত্রে পূর্ণ ; হলের মধ্যস্থলে একটি বৃদ্ধ দুই হাত মাথায় দিয়া বসিয়া আছে, তাহার লম্বা পাকা দাড়িতে বুক ঢাকিয়া গিয়াছে ।'

রা-তাই চিৎকার করিয়া বলিল, 'ঐ বৃদ্ধ মানুষ নহে, নরক-দ্বারের প্রহরী ; দেখিতেছি আমাকে উহার নিকটেই যাইতে হইবে। আর আমার উদ্ধার নাই ! আমার সর্বনাশ হইল ! দেবগণের সন্তোষ সাধনের জন্য ইউরোপের লক্ষ-লক্ষ লোকের প্রাণবধ করিলাম, সহস্র সহস্র বৎসরের সঙ্কল্প সাধন করিলাম, তাহার কি এই ফল ?— বুঝিলাম, অন্যের সর্বনাশ করিয়া নিজের স্বর্গের পথ কখনও মুক্ত করা যায় না !' তাহার পর সে তাহার শোণিতবিহীন, বিশীর্ণ হস্তে ললাটে আঘাত করিয়া বলিল, 'হায় রা-মীস, তোমার অদৃষ্টে এই ছিল ! তুমি সুদীর্ঘ তিন সহস্র বৎসর পর সদ্গতি লাভের আশায় কত অসাধ্য সাধন করিলে, তাহা সকলই অনর্থক হইল ! ঐ নরকের আগুন হু-হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে, আমাকে দগ্ধ করিতে আসিতেছে ! হে দেবাদিদেব আমন-রা, তোমার মনে কি এই ছিল ?'

দেখিতে দেখিতে সেই কক্ষ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, কক্ষ-মধ্যে যেন ঝটিকার আবির্ভাব হইল ; রা-তাই উন্মত্তের ন্যায় শয্যা হইতে লম্ফ দিয়া ভূতলে পতিত হইল এবং তাহার উভয় হস্তের তীক্ষ্ণ নখর দ্বারা নিজের চোখ মুখ বিদীর্ণ করিতে লাগিল ; শোণিত-তরঙ্গে তাহার পরিচ্ছদ সিক্ত হইল, তাহার কোটরগত চক্ষুদুটি বাহির হইয়া পড়িল। তাহার সেই ভীষণ মূর্তি দেখিয়া, তাহার চক্ষুর দিকে

চাহিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া উঠিল, আমি সেই স্থানে মূর্ছিত হইয়া পড়িলাম।

*　　　　*　　　　*

আমার জ্ঞান সঞ্চার হইলে দেখিলাম, আমি একখানি জাহাজের কেবিনের মধ্যে সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া আছি, শরীর অত্যন্ত দুর্বল ; রেবেকা আমার পাশে বসিয়া আমার মস্তকে হাত বুলাইতেছেন। আমি কোথায় আসিয়াছি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। উৎকণ্ঠিত ভাবে রেবেকার মুখের দিকে চাহিলাম।

রেবেকা অস্ফুট স্বরে বলিলেন, 'আর আমাদের ভয় নাই, আমরা সেই নরপিশাচের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছি। ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া আমেরিকার দিকে যাত্রা করিয়াছি ; ইংলণ্ড এখন আমাদের বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। রা-তাই মরিয়াছে ; মৃত্যুকালে সে আমাদিগকে বিপুল অর্থ দান করিয়া গিয়াছে, তাহাতেই আমাদের চির জীবন স্বচ্ছন্দে চলিবে।'

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলাম, 'কিন্তু জীবনে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না ; আমি মোহে আচ্ছন্ন হইয়া অর্ধ-পৃথিবীর মানব-সমাজের সে সর্বনাশ করিলাম, হে করুণাময় পরমেশ্বর, সেই মহাপাতক হইতে আমাকে উদ্ধার কর ; মানব সমাজে আর আমার স্থান নাই, আমার অভিশপ্ত জীবনে শান্তি দান কর!'

সেই আমার অজ্ঞাতবাসে যাত্রা, জীবনে এ যাত্রার অবসান হইবে না।

বিশালগড়ের দুঃশাসন

(বাংলায় ড্র্যাকুলা)

হেমেন্দ্রকুমার রায়

আমার কথা

বিখ্যাত বিলাতী ভৌতিক উপন্যাস 'ড্র্যাকুলা' অবলম্বনে 'বিশালগড়ের দুঃশাসন' রচিত হয়েছে।

'ড্র্যাকুলা' হচ্ছে অত্যন্ত জনপ্রিয় উপন্যাস, এবং চলচ্চিত্রে স্থান পেয়ে আরো বেড়ে উঠেছে তার জনপ্রিয়তা।

'ড্র্যাকুলা'র উপন্যাস-রূপ এবং চিত্ররূপের মধ্যে পার্থক্য আছে যথেষ্ট। 'বিশালগড়ের দুঃশাসন'কেও 'ড্রাকুলা'র ঠিক অনুবাদ বলা চলবে না। কয়েকটি বিশেষ কারণে অধিকাংশ স্থলেই আমাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা গ্রহণ করতে হয়েছে। মূল 'ড্র্যাকুলা' হচ্ছে প্রাপ্ত-বয়স্কদের পাঠ্য। কিন্তু আমাকে রচনা করতে হয়েছে ছোটদের মুখ তাকিয়ে। মূল গ্রন্থের কয়েকটি চরিত্র ও ঘটনা একেবারেই বর্জন করেছি। এবং অনেক জায়গাতেই মূল গ্রন্থের সঙ্গে আমার রচনার কোনই সম্পর্ক নেই—সে সব স্থলে আমি হয়েছি মৌলিক কাহিনীর লেখক। উপরন্তু এ-কথাও আমি কোথাও ভুলিনি যে 'ড্র্যাকুলা' হচ্ছে সেকালের উপন্যাস এবং আমার পাঠকরা হচ্ছেন অতি-আধুনিক।

কলকাতা
২৩০/১, আপার চিৎপুর রোড
বাগবাজার

হেমেন্দ্রকুমার রায়

শ্রীমতী অরুণা দেবী বি, এ

করকমলেষু

আঁধিয়ারে জাগে মোর অরুণার অরুণিমা !
কালো মুছে রাঙা আলো—পুলকের কোথা সীমা ।
মুখ-ভরা শ্যামলতা বুক-ভরা কী মমতা !
করুণা কোমল প্রাণ, কত তার তরুণিমা !

জননীর মত সে যে নেয় এসে মোর ভার,
মাতৃহারা প্রাণ পেলে অমৃতের পারাবার !
বোঝালে সে, পৃথিবীতে জননী যে চারিভিতে,
'মা অরুণা !' 'মা অরুণা !' ডাকি তাই বার-বার ।

হেমেন্দ্রকুমার রায়

বিশালগড়ের দুঃশাসন

পূর্বার্ধ

এক ছিটগ্রস্ত রাজাবাহাদুর

বিশালগড় আগে ছিল স্বাধীন দেশীয় রাজ্য।

বিশালগড়ের স্বাধীনতা আজ আর নেই বটে, কিন্তু তার অধিকারীকে এখনো লোকে স্বাধীন রাজার মতই ভয় ও ভক্তি করে। তাঁর নাম রাজা রুদ্রপ্রতাপ সিংহ।

মধ্যভারতের বিন্ধ্য শৈলমালার ছায়ায় বসে এই বিশালগড় আজও যেন তাকিয়ে আছে সেই সুদূর অতীতের দিকেই। তার চারিপাশেই আধুনিক সভ্যতার চিহ্ন নেই কিছুমাত্র। কারণ, রাজার জমিদারি থেকে অনেক তফাতেই নির্মাণ করা হয়েছে এই বিশালগড় নামে দুর্গপ্রাসাদখানি। তার চারিদিকেই বিরাজ করছে ছোট-বড় পাহাড়ের পর পাহাড়, গিরিশিখরের পর গিরিশিখর, বিপুল অরণ্যের গহন শ্যামলতা, শস্যহীন প্রান্তর, কলরবে মুখরা গিরিতরঙ্গিনী। সেখানে শব্দ সৃষ্টি করে কেবল নিবিড় বনের পত্রমর্মর ও নানান জাতের বিহঙ্গেরা, এবং সেখানে নৈশ আকাশের স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে থেকে-থেকে নিশাচর বাদুড়ের আন্দোলিত পক্ষ, আর কালপেচকের কর্কশ কণ্ঠ, আর বনবাসী হিংস্র পশুদের ভয়াল গর্জন। লোকালয় থেকে অনেক দূরে এমন এক স্থানে বিশালগড়ের দুর্গপ্রাসাদটি নির্মাণ করা হয়েছে যে, হঠাৎ দেখলে মনে হয়, তার মধ্যে সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার নেই। একটিমাত্র পথ দিয়ে প্রাসাদের তোরণদ্বারে গিয়ে উপস্থিত হওয়া যায়। সে পথও এমনি দুর্গম ও বন্ধুর যে, কোন সাধারণ পথিককেই তা আকৃষ্ট করতে পারে না। কখনো নতোন্নত পাহাড়ের উপর দিয়ে, কখনো বেগবতী স্রোতস্বতীর উপরকার জীর্ণ সেতুকে আশ্রয় করে, কখনো ধূ-ধূ প্রান্তরের একটি অংশকে চিহ্নিত করে এবং কখনো বা দিনের বেলাতেও বিজন বনের অন্ধকারকে ভেদ

করে সেই সুদীর্ঘ পথ অজগরের মত এঁকে-বেঁকে অগ্রসর হয়ে গিয়েছে বিশালগড় অভিমুখে।

এই বিচিত্র দুর্গপ্রাসাদের বয়স কত, এখনকার কেউ তা জানে না। তবে আকার দেখে মনে হয়, বহু শতাব্দীর বহু ঋতু তার উপরে রেখে গিয়েছে আপন-আপন হাতের চিহ্ন। অভিশপ্ত তার মূর্তি! কোথাও তার কঠিন পাথরের দেওয়াল ভেদ করে বেরিয়ে শূন্যের দিকে বাহু বিস্তার করেছে রীতিমত বড় বড় অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষের শাখা-প্রশাখা, কোথাও তার দেওয়ালের বাঁধন ছেড়ে নিচেকার ভূমিকে আশ্রয় করেছে ছোট-বড় পাথরের পর পাথরের খণ্ড, এবং কোথাও বা তার সু-উচ্চ দেওয়াল এমনভাবে হেলে পড়েছে যে দেখলেই মনে হয়, তারা সশব্দে মাটির উপরে আছড়ে পড়বে এই মুহূর্তেই। লোকে বিশালগড়ের রাজাবাহাদুরকে জানে ধনকুবের বলে। কিন্তু বিশালগড়ের ছন্নছাড়া মূর্তি দেখলে লোকের এই ধারণাকে একটুও সত্য বলে মনে হয় না। রাজার সম্বন্ধে লোকে আরও অনেক আশ্চর্য কথাই বলে। কিন্তু সে সব কথায় কান পাতবার আগে আপনারা আমার কাহিনী শ্রবণ করুন। আমি যা দেখেছি, যা অনুভব করেছি, তাই এখানে অকপটে লিপিবদ্ধ করতে চাই। এ কাহিনী এতই ভয়াবহ, এতই রোমাঞ্চকর এবং এতই অপার্থিব যে, শেষ পর্যন্ত হয়ত অনেকেই আমার কথা বিশ্বাস করতে চাইবেন না। অনেকে আমাকে যদি উন্মাদগ্রস্ত বলে ভাবেন, তাহলেও আমি বিস্মিত হব না। কিন্তু লোকের বিশ্বাসে অবিশ্বাসে কিছুই এসে যায় না আমার। কারণ আমি নিজে স্বচক্ষে যা দর্শন করেছি তা অসত্য নয় বলেই মনে করি।

এইবারে আমার নিজের কথা আরম্ভ। আমি কলকাতার এক অ্যাটর্নি বাড়ির শিক্ষানবিশ, এবং নিজেও অ্যাটর্নি হবার জন্যে শেষ পরীক্ষা দিয়েছি। বিশালগড়ের রাজা আমাদের অফিসে পত্র লিখে জানিয়েছেন যে, কলকাতার উপকণ্ঠে কয়েক বিঘা জমি সমেত তিনি একখানি সুবৃহৎ বাগানবাড়ি ক্রয় করতে চান। এবং সেইসঙ্গে তিনি আর-একটি অদ্ভুত অনুরোধও করেছেন। বাগানবাড়িখানা খুব জীর্ণ

ও পুরাতন হলেই তিনি অত্যন্ত খুশি হবেন। এ-রকম অদ্ভুত অনুরোধ আমাদের অফিসে আর কখনো আসেনি।

কর্তা আমাকে ডেকে বললেন, 'দেখ বিনয়, লোকটির মাথায় বোধহয় দস্তুরমত ছিট আছে। কিন্তু তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না। সে পাগলই হোক, আর ছিটগ্রস্তই হোক, মক্কেল হচ্ছে মক্কেল। আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য পেলেই আমরা তুষ্ট হব। কি বল, তোমার কী মত?'

—'আজ্ঞে, আমারও ঐ মত।'

—'এখন শোনো। এই ছিটগ্রস্ত রাজাবাহাদুরটি যে-রকম বাড়ি চান, সৌভাগ্যক্রমে ঠিক সেইরকমই একখানা বাড়ি আমাদের হাতে আছে। কলকাতার খুব কাছেই ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের উপরে থাকলেও ঐ বাড়িখানাকে কেউ কিনতে চায় না। কারণ সবাই বলে, ওখানা নাকি ভুতুড়ে বাড়ি। আমি মনে করছি, রাজাবাহাদুরকে ঐ বাড়িখানিই কিনতে বলব।'

আমি বললুম, 'কিন্তু সেটা কি উচিত হবে?'

—'কেন হবে না?'

—'রাজা পুরোনো বাড়ি চেয়েছেন বটে, কিন্তু ভুতুড়ে বাড়ির উপরে তাঁর কোন লোভ না থাকতেও পারে।'

কর্তা বললেন, 'বাপু, আমি মক্কেলকে ঠকাব না; তিনি কেনবার আগেই তাঁকে ঐ দুর্নামের কথা জানিয়ে দেব। কিন্তু সে কথা যাক। এখন তোমাকে ডেকেছি কেন, শোন। রাজা থাকেন মধ্যভারতের বিশালগড়ে। তুমি কি বিশালগড়ের নাম শুনেছ?'

—'আজ্ঞে না, বিশালগড় যে কোথায় তাও আমি জানি না।'

—'তোমার জানবার বিশেষ দরকারও নেই। কারণ, একখানি কাগজে পথের সমস্ত খুঁটিনাটি লিখে তোমার হাতে আমি দেব। তা দেখলেই তুমি অনায়াসে যথাস্থানে গিয়ে হাজির হতে পারবে, কারণ আমি স্থির করেছি, বিশালগড়ের রাজার কাছে পাঠাব তোমাকেই। রাজার সঙ্গে আমার পত্র-ব্যবহারও হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন,

আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'মশাই, ক্ষমা করবেন। আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?'

আমি হেসে বললুম, 'অনায়াসেই।'

—'শুনলুম, আপনি নাকি বিশালগড়ের রাজবাড়িতে যাচ্ছেন?'

—'ঠিকই শুনেছেন।'

—'আপনি এর আগে কখনো এখানে এসেছেন?'

—'না।'

—'বিশালগড়ের রাজাবাহাদুরের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে?'

—'না।'

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'এখান থেকে বিশালগড়ের রাজবাড়ি হচ্ছে ত্রিশ মাইল দূরে। কেমন করে আপনি এই পথটা পার হবেন?'

—রাজাবাহাদুরের গাড়ি আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে সন্ধ্যার সময় এখানে আসবে।'

ঘরের ও-কোণ থেকে হঠাৎ আর-একজন লোক ত্রস্ত কণ্ঠে বলে উঠল—'আজ হচ্ছে অমাবস্যার শনিবার!'

আর-একজন লোক সঙ্গে সঙ্গে ঠিক তেমনি স্বরেই বললে, 'তার উপরে আবার সন্ধ্যার সময়ে!'

আরও তিন চারজন লোকের কণ্ঠে ফুটল অস্ফুট আর্ত ধ্বনি। ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারলুম না। অবাক হয়ে এর-তার-ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগলুম। অমাবস্যার শনিবারের সন্ধ্যা এদের কাছে এমন কী গুরুতর অপরাধ করেছে?

কৌতূহল দমন করতে না পেরে শেষটা জিজ্ঞাসা করলুম, 'মশাই, অমাবস্যার শনিবারের সন্ধ্যা নিয়ে আপনাদের এত বেশি মাথা-ব্যথা কেন? দেখছি, আপনারা তাকে মোটেই পছন্দ করেন না!'

খানিকক্ষণ কেউ আর কোন সাড়া দিলে না; সকলে আহার করতে লাগল নীরবে। খাওয়া-দাওয়া যখন শেষ হয়েছে এবং আমি যখন উঠি-উঠি করছি, তখন প্রথম যে মাঝবয়সী লোকটি কথা

কয়েছিলেন তিনি বললেন, 'আর একটু বসুন। আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

জিজ্ঞাসু চোখে তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে আমি স্থির হয়ে বসে রইলুম।

ভদ্রলোক প্রায় আমার কানের কাছে মুখ এনে অতি মৃদুস্বরে বললেন, 'এ অঞ্চলের সবাই কী বিশ্বাস করে জানেন? বিশালগড়ের দিকে যেতে ঐ যে নিবিড় অরণ্য দেখছেন, প্রতি অমাবস্যার শনিবারে সেখানে যখন রাত্রির অন্ধকার নেমে আসে তখন বনের ভিতরে যে-সব নিশাচর আনাগোনা করে, লোকে বলে তারা মানুষ নয়।'

আমি হেসে বললুম, 'রাত্রে বনে বনে যারা বেড়ায় তারা যে মানুষ নয়, একথা সকলেই জানে। বনের জীব হচ্ছে বাঘ, ভাল্লুক, শেয়াল। তারাই তো নিশাচর।'

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, 'না মশাই, আমি বাঘ-ভাল্লুকের কথা বলছি না।'

—'তবে আপনি কাদের কথা বলছেন?'

ভদ্রলোক ভয়ে ভয়ে জানলা দিয়ে একবার বাইরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তাদের নাম আমি মুখে আনতে পারব না। এইটুকু জেনে রাখুন, তারা বাঘ-ভাল্লুকও নয়, আর মানুষও নয়।'

আমি হো-হো করে হেসে উঠে বললুম, 'ও, আপনি বুঝি ভূত-প্রেতের কথা বলছেন? কিন্তু আমরা হচ্ছি কলকাতার ছেলে, কলেজে বিজ্ঞান পড়েছি। "ভূতপ্রেত" শব্দ আমাদের অভিধানে নেই। ভূত আমি বিশ্বাস করি না। আর ভূত থাকলেও তারা তো অশরীরী, আমাদের মত শরীরী মানুষের কোনই অনিষ্ট তারা করতে পারে না।'

ভদ্রলোক আর কিছু বললেন না। একটা হতাশাব্যঞ্জক মুখভঙ্গি করে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

ওদিক থেকে আর-একজন লোক বললে, 'বাবুজি, আপনি কি শরীরী প্রেতের কথা কখনো শোনেন নি?'

—'না। কখনো শুনিও নি, কখনো দেখিও নি, আর কখনো

দেখবার বা শোনবার আশাও করি না।' এই বলে আমিও আসন ছেড়ে উঠে সে-ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম।

পথশ্রমে শরীরটা কিছু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ঘণ্টাচারেক একটানা নিদ্রার পর জেগে উঠে দেখি, সন্ধ্যাসমাগমের আর বেশি বিলম্ব নেই। জানলা-পথে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, সামনের নিবিড় অরণ্যের উপর দিয়ে দলে দলে বক আর বুনো হাঁস বাসার দিকে উড়ে যাচ্ছে। নিচের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকবার পরও একজন মানুষও নজরে পড়ল না। সবাই যেন সন্ধ্যার আগেই সেখান থেকে সরে পড়েছে কোন্ অজানা আতঙ্কে। কিছুক্ষণ মাথা ঘামিয়েও সেই আতঙ্কটা যে কী তা আন্দাজ করতে পারলুম না। শরীরী প্রেত? প্রেত কি কখনো শরীরী হতে পারে? প্রেতের কথা যদি মানা যায় তাহলেও দেখা যায়, মানুষের আত্মা নিরেট দেহ ত্যাগ করবার পরই 'প্রেতাত্মা' আখ্যা লাভ করে। তার পক্ষে শরীরী হবার কোন সম্ভাবনাই নেই।

এইসব ভাবতে ভাবতে চারিদিক ছেয়ে গেল সন্ধ্যার অন্ধকারে। তারপরেই দেখতে পেলুম, অরণ্যের ওদিককার অন্ধকার ভেদ করে এগিয়ে আসছে তুটো আলো। ঘোড়ার পায়ের ও গাড়ির চাকার শব্দও শুনতে পেলুম।

কিছুক্ষণ পরে একখানা গাড়ি এসে থামল সরাইয়ের সামনে।

ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন সরাইয়ের মালিক সেই বৃদ্ধা। অল্পক্ষণ করুণ চোখে আমার দিকে নীরবে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে তিনি বললেন, 'বাবুজি, রাজাবাহাতুরের গাড়ি এসেছে।'

আমি তখন উঠে পড়ে নিজের সুটকেসটা গুছিয়ে নিতে লাগলুম।

বৃদ্ধা তখনো সেখান থেকে চলে গেলেন না। আমি ভাবলুম, তিনি নিজের পাওনা বুঝে নিতে এসেছেন। মনিব্যাগটা বার করে জিজ্ঞাসা করলুম, 'আপনাকে কত দিতে হবে?'

বৃদ্ধা ম্লান হাসি হেসে বললেন, 'বাবুজি, আপনার যা খুশি হয় দেবেন। আমি পাওনা আদায় করবার জন্যে এখানে আসিনি।'

—'তবে আপনি কী চান ?'

—'আমি কিছু চাইতে আসিনি। আমি খালি জিজ্ঞাসা করতে এসেছি, আপনি কি সত্যসত্যই ঐ গাড়িতে চড়ে আজ রাত্রে বিশালগড়ে যেতে চান ?'

—'নিশ্চয়ই।'

—'কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলে কি চলবে না ?'

—'না। কাল সকালে আবার আমি এখানে ফিরে এসে ছুপুরের ট্রেনে কলকাতায় যেতে চাই।'

বৃদ্ধা বললেন, 'কিন্তু রাজা কি আপনাকে ফিরতে দেবেন ?'

আমি একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'ফিরতে দেবেন না মানে ?'

বৃদ্ধা ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি বললেন, 'না বাবুজি, আমার কথার কোন মানে নেই। আমি শুধু কথার কথা বললুম। আচ্ছা, আজ যদি নিতান্তই যেতে চান, তাহলে একটু অপেক্ষা করুন, আমি আবার আসছি।'

বৃদ্ধা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি আবার স্যুটকেসটা গুছিয়ে নিতে লাগলুম।

একটু পরেই বৃদ্ধা আবার ফিরে এলেন. তারপর আমার কাছে এসে সস্নেহে বললেন, 'আমার একটি ছেলে ছিল, আপনাকে অনেকটা তারই মত দেখতে।'

—'আপনার সে ছেলেটি এখন বেঁচে নেই ?'

বৃদ্ধার ছুই চক্ষু হয়ে উঠল সজল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, 'না বাবু, আজ তিন বছর তাকে হারিয়েছি। আপনাকে দেখে তার কথা আবার নতুন করে আমার মনে জেগে উঠেছে।'

আমি দরদভরা কণ্ঠে বললুম, 'আহা, আপনার কথা শুনে আমারও দুঃখ হচ্ছে। আপনার ছেলের কী অসুখ হয়েছিল ?'

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বৃদ্ধা বললেন, 'বাবুজি, তার কোনই অসুখ হয়নি। এক রাতে ঐ বনের ভিতরে গিয়ে সে আর আমার কাছে ফিরে আসেনি। তাই তো আমি ভয় পাচ্ছি বাবুজি, তাই তো আমার ইচ্ছা নয় যে আজ রাত্রে আপনি ঐ বনের ভিতরে যান।'

বৃদ্ধার দুশ্চিন্তার কারণ বুঝে আমি সহানুভূতি-মাখা স্বরে বললুম, 'না মা, আমার কোন বিপদ হবে না—আমি তো যাচ্ছি রাজা-বাহাদুরের গাড়িতে।'

অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে বৃদ্ধা বললেন, 'তাই তো আমার বেশি ভয় হচ্ছে বাবুজি, তাই তো আমি আপনার জন্যে এত ভাবছি!'

আমি আবার বিস্মিত কণ্ঠে বললুম, 'রাজাবাহাদুরের গাড়িতে যাচ্ছি বলে আপনার ভয় আরও বেড়ে উঠেছে! এ কেমন কথা?'

বৃদ্ধা আবার তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'না বাবুজি, আবার আমি ভুল বলছি। আজ আমার মাথার ঠিক নেই। কিন্তু ও-সব কথা যাক। আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?'

—'কী অনুরোধ?'

কাপড়ের ভিতর থেকে একটা জিনিস বার করে বৃদ্ধা বললেন, 'এই কবচখানা আমি আপনার গলায় পরিয়ে দিতে চাই। এতে আপনি আপত্তি করবেন না তো?'

—'কী আশ্চর্য, আমার জন্যে আপনি কবচ এনেছেন কেন! এ কবচ নিয়ে আমি কী করব?'

—'আপনাকে কিছুই করতে হবে না বাবুজি, এ কবচখানা সর্বদাই যেন আপনার গলায় থাকে।'

—তাতে আমার কী উপকার হবে?'

—'উপকার কী হবে জানিনা, তবে অপকার কিছু হবে না। এ হচ্ছে রক্ষাকবচ। এ কবচ গলায় থাকলে কোন অপদেবতা আপনার কিছুই অনিষ্ট করতে পারবে না।'

আমি বললুম, 'এখানকার আর সকলের মত আপনিও বুঝি অপ-দেবতার ভয় করছেন? কিন্তু জেনে রাখুন, আমি নিজে অপদেবতাকে ভয় করি না, এমনকি অপদেবতার অস্তিত্বও স্বীকার করি না।'

বৃদ্ধা মিনতিভরা কণ্ঠে বললেন, 'বাবুজি, আপনি অপদেবতা মানুন আর নাই-ই মানুন, এই কবচখানা গলায় পরে থাকতে ক্ষতি কী? বুড়ির এই কথাটি কি আপনি রাখবেন না?'

আমি আর 'না' বলতে পারলুম না। কবচখানা পরতে অস্বীকার করলে এই স্নেহময়ী প্রাচীনা নিশ্চয়ই প্রাণের ভিতরে আঘাত পাবেন।

বৃদ্ধা রেশমি সুতোয় বাঁধা একখানি তামার কবচ আমার গলায় ঝুলিয়ে দিলেন। আমিও তাঁর পাওনা-গণ্ডা চুকিয়ে দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলুম।

সরাইখানার বাইরে গিয়ে দেখি, চারিদিকের অন্ধকার হয়ে উঠেছে আরো ঘন, আরো নিরেট—তা ভেদ করে দুই হাত দূরেও নজর চলে না। দুই হাতের ভিতরেও যা দেখা যায়, তাও হচ্ছে আবছায়ার মত।

হঠাৎ সরাইখানার দরজার ভিতর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কে আমার কানে কানে বললে, 'বাবু, রাত বারোটার সময় বিশেষ সাবধানে থাকবেন। বনের যত ভয়, জেগে ওঠে ঐ সময়েই।'

রাস্তার উপর থেকে খনখনে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কে একজন সকৌতুকে হেসে উঠল। ভাল করে তাকিয়ে দেখি, সামনেই রয়েছে একখানা টোঙা গাড়ি, আর তার ঘোড়ার মুখের লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা দীর্ঘ মূর্তি!

সবই দেখা গেল ভাসা-ভাসা, ঝাপসা। কিন্তু হাসল যে ঐ মূর্তিটাই, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। মূর্তি এবার দুই পা এগিয়ে এসে বললে, 'বিনয়বাবু, ঐ লোকটা আপনাকে এমন চুপিচুপি সাবধান হতে বললে যে, এতদূর থেকেও আমি তার কথা শুনতে পেয়েছি।'

বিস্মিত হলুম। কারণ যে আমাকে সাবধান করে দিলে, সত্য-সত্যই সে এত চুপিচুপি কথা কয়েছিল যে, কারুর পক্ষে অতদূর থেকে তা শুনতে পাওয়া সম্ভবপর নয়। তবু সে কথা যদি ঐ লোকটি শুনতে পেয়ে থাকে তাহলে তার শোনবার শক্তি যে অত্যন্ত অসাধারণ, এটাও অস্বীকার করবার উপায় নেই। তার উপরে আর এক কথা। এই অন্ধকারে ঐ মূর্তি আমাকে চিনলে কেমন করে? আমার নাম পর্যন্ত ওর অজানা নয়। তবে উনিই কি রাজাবাহাদুর স্বয়ং?

জিজ্ঞাসা করলুম, 'মহাশয় কি রাজাবাহাদুর?'

মূর্তি জবাব দিলে, 'আজ্ঞে না, আমি তাঁর কর্মচারী। অত্যন্ত বিলম্ব হয়ে গেছে, দয়া করে তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠুন।'

সুটকেসটা নিয়ে গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই রাজার সেই কর্মচারী একখানা দৃঢ় হস্তে আমার বাঁ হাতখানা চেপে ধরে আমাকে গাড়ির উপরে উঠতে সাহায্য করলেন। তাঁর মুষ্টির দৃঢ়তা দেখেই বুঝতে পারলুম, লোকটি হচ্ছে অসাধারণ ক্ষমতাশালী। আমার মতন লোককে সে হয়ত শিশুর মত অনায়াসেই দশ-পনেরো হাত দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে।

তিন — নীল আলো এবং মৃত্যুর দূত

গাড়ি বেগে ছুটেছে বনের পথ দিয়ে। তার দুটো লণ্ঠনের আলোক-শিখায় পথের দুইদিকেই দেখতে পাচ্ছি শুধু নানা জাতের গাছের পর গাছ, আর জঙ্গলের পর জঙ্গল। পৃথিবীর সমস্তই যেন একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছে,—গাছের পাতারা, বন্য বাতাস বা কোন জীব-জন্তুই কিছুমাত্র শব্দের সৃষ্টি করছে না—কেবল শুকনো পাথুরে পথের উপরে জেগে জেগে উঠছে এই গাড়ির তেজি ঘোড়াটার অশ্রান্ত পায়ের শব্দ। গাড়ির চালক রাজার সেই কর্মচারীই।

মাঝে মাঝে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে বনজঙ্গল, এবং তার বদলে দেখা যাচ্ছে এক-একটা মস্ত মাঠের তিমিরাচ্ছন্ন শূন্যতা। আবার কোথাও বা গাড়ি চলছে উঁচু নিচু পাহাড়ে পথের উপর দিয়ে এবং সেখানে এপাশে-ওপাশে দেখা যাচ্ছে অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকারেরও চেয়ে কালো কালিতে আঁকা ছোট-বড় পাহাড়ের শিখর। এ-রকম বন্ধুর পথের উপর দিয়ে কোন সাধারণ টোঙা গাড়ি যে এত বেগে আর এমন অনায়াসে অগ্রসর হতে পারে, এ বিশ্বাস আমার ছিল না। অবাক হয়ে সেই কথাই ভাবতে লাগলুম।

ভাবতে ভাবতে কখন যে চোখে এসেছিল তন্দ্রা তা আমি বুঝতে পারিনি। খানিক পরে কি এক অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ আমার তন্দ্রা গেল ছুটে। ভাল করে উঠে বসে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে

দেখি, আমার হাতঘড়িতে বেজেছে তখন ঠিক রাত বারোটা। সমানে ছুটে চলেছে গাড়ি।

বনের কোথা থেকে একটা কুকুর সুদীর্ঘ স্বরে কেঁদে উঠল। সে আতঙ্কগ্রস্ত কণ্ঠস্বরে জাগছে যেন একটা অত্যন্ত যন্ত্রণার ভাব। সে কান্না শেষ হতে-না-হতেই আবার আর-একটা কুকুর জুড়ে দিলে ঠিক সেই রকমই আতঙ্কগ্রস্ত ক্রন্দন। এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই আর-একটার পর আর-একটা আবার তারপর আর-একটা—এমনি অনেকগুলো কুকুরই সমস্বরে চিৎকার করে কান্না শুরু করে দিলে। বন্য কুকুরদের সেই অদ্ভুত কান্নার ঐকতান ভেসে ভেসে আসতে লাগল যেন পাহাড়ের উপর দিয়ে, অরণ্যের ভিতর দিয়ে, এমনকি অন্ধকারের অন্তঃপুর ভেদ করে।

গাড়ির ঘোড়াটাও চম্‌কে চম্‌কে উঠে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়বার চেষ্টা করলে। কিন্তু চালকের আশ্বাসবাণী শুনে সে যেন কতকটা প্রকৃতিস্থ হল। তারপর, পাহাড়ের ভিতরে দুধার থেকেই সমস্বরে জেগে উঠল আর-এক সুতীক্ষ্ণ ও উচ্চতর চিৎকার। একসঙ্গে চিৎকার করছে অনেকগুলো নেকড়ে বাঘ।

গাড়ির ঘোড়াটা বিষম চম্‌কে আবার থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল। এবং আমারও ইচ্ছা হল, এইবেলা গাড়ির ভিতর থেকে লাফিয়ে পড়ে যেদিক থেকে এসেছি আবার সেইদিকেই দৌড় মারি।

সরাইখানায় যতক্ষণ ছিলুম, ততক্ষণই শুনেছি কেবল আতঙ্ক আর অমঙ্গল আর ভূতপ্রেতের কথা। বিশ্বাস করি আর না-করি, সেইসব জল্পনা কল্পনা আমার অজ্ঞাতসারেই এখন যে মনের ভিতরে কাজ করছে, এটুকু বেশ বুঝতে পারলুম। সরাই ত্যাগ করবার অল্প আগে বৃদ্ধার মুখে শুনেছি, তাঁর ছেলে রাত্রে এই বনের ভিতরেই হারিয়ে গেছে চিরদিনের জন্যে। দরজার কাছে কে আবার বলে দিলে, রাত বারোটার সময় সাবধানে থাকতে। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অন্তরের মধ্যে জাগতে লাগল কেবল এইসব কথাই। নেকড়েগুলো সেই রকমই চিৎকার করছে বটে, তবে, চালকের আশ্বাসবাণী শুনে ঘোড়াটা

আবার ছুটতে আরম্ভ করলে—কিন্তু আর তেমন জোরে নয়, এবং ভয়ে ভয়ে।

আচম্বিতে দেখলুম আর এক অদ্ভুত দৃশ্য। খানিক তফাতে জঙ্গলের ভিতরে জ্বলছে একটা আশ্চর্য নীল রঙের আলো। সে আলোটা অত্যন্ত তীব্র বটে, কিন্তু তবু তার আভায় বনের আশপাশকার অন্ধকারের নিবিড়তা কিছুমাত্র কমে যাচ্ছে না। নীল আলো জ্বলছে, কিন্তু নিজের বাইরে এতটুকু আলো বিকীর্ণ করছে না।

চালকও আলোটা দেখলে। তখনি সে গাড়ি থামিয়ে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে পড়ল এবং এগিয়ে চলল সেইদিকে। আর-একটা ব্যাপার যা লক্ষ করলুম, নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হল না। চালকের মূর্তি ঠিক আমার আর আলোকের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। এমন অবস্থায় আলোটা তার দেহের দ্বারা আবৃত হয়ে যাবারই কথা; কিন্তু দেহটাকে না ঢেকে সেই অস্বাভাবিক নীল আলোটা তার দেহ ভেদ করেই আমার চোখের সামনে জেগে রইল সমানভাবেই। এও কি সম্ভব? যে দেহ ফুটে এমনভাবে আলো বেরুতে পারে, সে কী রকম দেহ? রক্ত-মাংসে গড়া কোন দেহই এমন স্বচ্ছ হতে পারে না।

আমি কি আবার ঘুমিয়ে পড়েছি? ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি কি দুঃস্বপ্ন দেখছি? কিংবা জেগে থেকেও আমার চোখ ভুল দেখছে?

আচম্‌কা গাড়ির ঘোড়াটা আবার সভয়ে লাফিয়ে উঠল। যদিও গাড়ির দুটো লণ্ঠনের আলোতে বেশিদূর পর্যন্ত চোখ চলে না, তবু মনে হল, গাড়ি থেকে কিছু দূরে আমার দুই পাশে আর সামনের দিকে অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যেন অত্যন্ত সন্দেহজনক কতকগুলো জীবন্ত দেহ! থেকে থেকে সেখান থেকেও দপ্‌-দপ্‌ করে জ্বলে উঠছে যেন কতগুলো ক্ষুধিত ও নিষ্ঠুর দৃষ্টি!

টর্চটা তুলে নিয়ে এদিকে-ওদিকে ও সামনের দিকে নিক্ষেপ করলুম সমুজ্জ্বল আলোক-শিখা। কী ভয়ানক! মাটির উপরে সামনের দুই থাবা পেতে বসে আছে দলে দলে নেকড়ে বাঘ—চক্ষে তাদের জ্বলন্ত হিংসা, এবং প্রত্যেকেরই মুখের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ছে টকটকে

লাল ও লকলকে জিহ্বা। সভয়ে কাঁপতে কাঁপতে গাড়ির পিছন দিকেও একবার আলোক-শিখা সঞ্চালন করে দেখলুম, সেখানেও বসে আছে আরো কতগুলো নেকড়ে বাঘ। সর্বনাশ, নেকড়ের দল যে চারিধার থেকেই ঘিরে ফেলেছে আমাদের গাড়িখানা! নিশ্চয় তারা কেবল আমাদের মুখ দেখে খুশি হবার জন্যেই এখানে এসে হাজির হয়নি, যে-কোন মুহূর্তেই তারা তীরের মত ছুটে এসে আক্রমণ করে আমাদের দেহ করে ফেলতে পারে ছিন্নবিচ্ছিন্ন!

চালক তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই অপার্থিব নীল আলোটার কাছে। সেখানে সে যে কী করছে তা সেইই জানে, কিন্তু তার ভাব দেখলে মনে হয়, হয়ত সে নিজের বাহ্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে, এত কাছে এসেছে যে দলে দলে সাক্ষাৎ মৃত্যুর দূত, এটা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে না সে। আর্ত স্বরে চেঁচিয়ে আমি তাকে ডাকলুম।

চালক আবার গাড়ির দিকে পায়ে পায়ে ফিরে আসতে লাগল।

প্রতি মুহূর্তেই মনে হতে লাগল, এই বুঝি নেকড়েগুলো লাফ মেরে চালকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার দেহকে করে দেয় খণ্ডবিখণ্ড! নেকড়েগুলো গাড়ির চারিদিক বেষ্টন করে মণ্ডলাকারে বসে রয়েছে, চালক কি তা দেখতে পাচ্ছে না? কেমন করে হিংস্র পশুদের এই ব্যূহ ভেদ করে গাড়ির কাছে সে আসবে?

কিন্তু আশ্চর্য, আশ্চর্য! চালক যেন নিজের মনেই বিড়্ বিড় করে কী বললে এবং কয়েকবার দিলে হাততালি। তারপর সে খুব সহজভাবেই সোজা গাড়ির কাছে এসে আবার নিজের আসনে উঠে বসল, সম্পূর্ণ নির্বিকারভাবে।

অতটা ভয় ও বিস্ময়ের মধ্যেও আমি দমন করতে পারলুম না আমার কৌতূহল। তাড়াতাড়ি আবার টর্চটা জ্বেলে চারিধারে নিক্ষেপ করলুম আলোক-শিখা।

যে জন্যেই হোক, নিশ্চয় আজ আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, কারণ কোনদিকে তাকিয়ে আমি আর দেখতে পেলুম না একটামাত্র নেকড়ে বাঘকে!

শেষ রাত।

পূর্বাচলে ধরণীর ললাটে তখনো জাগেনি প্রভাতের জ্যোতির্ময় আশীর্বাদ। অন্ধকার একটুখানি পাতলা হয়ে এসেছে বটে, কিন্তু তখনো ঘোচেনি দৃষ্টির অন্ধতা।

বোধহয় আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলুম, কারণ টোঙা যে কখন বিশালগড়ের সিংহদ্বারের মধ্যে প্রবেশ করে তার বিপুল আঙিনার প্রান্তে এসে থেমে দাঁড়িয়েছে, সেটা আমি একটুও টের পাইনি। গাড়ি থামতেই ছুটে গেল আমার তন্দ্রা।

স্পষ্ট তো কিছুই দেখতে পাচ্ছিলুম না, ঝাপসা ঝাপসা যেটুকু দেখা গেল মনে হল, আমরা এক প্রকাণ্ড অট্টালিকার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছি। আকাশের গায়ে যে কালিমালিপ্ত অট্টালিকার বহিঃরেখা আঁকা রয়েছে তা যেমন উচ্চ, তেমনি প্রশস্ত।

সেইদিকে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ টোঙা-চালক আমার উপর-হাতটা চেপে ধরে বললে, 'এইবার আপনাকে নামতে হবে।' তখন যেমন করেছিলুম, এখনো তেমনি অনুভব করলুম, চালকের হস্তে আছে অসুরের মতন শক্তি! সে একটু জোরে চাপ দিলেই হয়ত গুঁড়ো হয়ে যেতে পারে আমার হাতের হাড়!

নিচে নেমে সে দাঁড়াল। তারপর ঘোড়ার মুখ ধরে গাড়ি নিয়ে এগিয়ে হারিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে কোথায়, কে জানে। উঃ! চারিদিক কী স্তব্ধ! একটা কীটপতঙ্গেরও সাড়া নেই। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে সেই অপরিসীম স্তব্ধতা যেন বিরাট একখানা জগদ্দল পাথরের মতন পেষণ করবার চেষ্টা করছে আমার হৃদয়-মনকে।

এমন প্রকাণ্ড অট্টালিকা, অথচ কোথাও নেই একটিমাত্র আলো বা একটিমাত্র মানুষ। প্রায় পনেরো মিনিটকাল ধরে চিন্তা এসে আমার মনকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেললে। 'এ আমি কোথায়,

কার কাছে এসে পড়লুম? আরম্ভেই যেটুকু পরিচয় পেয়েছি, তা মোটেই সন্তোষজনক নয়। রহস্যময় গাড়ির চালক ও রহস্যময় নীল আলো! তারপর সেই সাঙ্ঘাতিক নেকড়েগুলো! তারা আমাকে আক্রমণ করতে এসে চালকদের দেখে নিঃশব্দে আবার অদৃশ্য হল কেন? নেকড়ের মতন হিংস্র পশুদের উপরে কোন মানুষের যে এমন প্রভাব থাকতে পারে, মন এ কথা বিশ্বাস করতে চায় না। তারপর যাঁর বাড়িতে আজ আমি এসেছি, সেই রাজাবাহাদুরই বা কী রকম মানুষ? সরাইখানার লোকগুলি যে কেউ রাজাবাহাদুর সম্বন্ধে ভাল ধারণা পোষণ করে, এমন তো মনে হল না। বরং তারা নানাভাবে, নানা ইঙ্গিতে আমাকে এখানে আসতেই নিষেধ করেছে বারংবার।

এইসব ভাবছি, হঠাৎ হড়্-হড়্ করে একটা শব্দ হল, এবং সেই শব্দ শুনে কেবল আমি নয়, এখানকার সমস্ত অন্ধকার ও স্তব্ধতাও যেন চমকে জাগ্রত হয়ে উঠল। তারপর সামনের দিকে সুবৃহৎ একটা দ্বারপথের ভারি ভারি পাল্লা দু-খানা খুলে গেল ধীরে ধীরে। একটা লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলোকরেখা দরজার ভিতর থেকে বেরিয়ে একেবারে আমার মুখের উপর এসে পড়ল।

ভাল করে চেয়ে দেখি, দ্বারপথে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক দীর্ঘদেহ বৃদ্ধ। তাঁর মুখের মধ্যে সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে একজোড়া লম্বা গোঁফ। কাঁকড়ার দাড়ার মত লম্বা গোঁফের দুই প্রান্ত ওষ্ঠাধরের দুই পাশ দিয়ে চিবুকের তলা পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। পরনে তাঁর ঘন কৃষ্ণবর্ণের কোর্তা ও পায়জামা। ডান হাত তুলে পরিষ্কার কণ্ঠে তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন, 'আসুন বিনয়বাবু, আজ আপনি আমার অতিথি হয়েছেন। বাড়ির ভিতরে আসুন।' আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে বৃদ্ধ আর এক পদও অগ্রসর হলেন না, সেইখানেই নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ঠিক একটা পাথরের মূর্তির মত।

তাঁকে নমস্কার করে আমি যখন বাড়ির দরজার ভিতর প্রবেশ করলুম, তখন তিনি হঠাৎ হাত বাড়িয়ে এত জোরে আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন যে আমার হাতের আঙুলগুলো যেন ভেঙে যাবার

মত হল। কোন বৃদ্ধের হাতে এমন শক্তি থাকতে পারে, আমার পক্ষে এটা ছিল একেবারেই অভাবিত। কেবল তাই নয়, বৃদ্ধের হাত যেন কনকনে তুষারের মত ঠাণ্ডা, আমার হাতের উপর রয়েছে যেন কোন মৃতদেহের হাত !

বৃদ্ধ আবার বললেন, 'স্বাগত, স্বাগত ! স্বেচ্ছায় আমার বাড়ির ভিতরে আসুন ! আবার নিরাপদে যখন ফিরে যাবেন তখন যে আনন্দ আপনি সঙ্গে করে এনেছেন, তার খানিকটা যেন এখানে রেখে যেতে ভুলবেন না।'

তখনো আমি নিজেকে ঠিক সামলে নিতে পারিনি। বৃদ্ধের বাহুর শক্তি আমাকে মনে করিয়ে দিলে সেই টোঙাচালকের বাহুর শক্তিকে। অন্ধকারে সেই চালকের মুখ একবারও আমি দেখতে পাইনি। আমার সন্দেহ হতে লাগল যে, হয়ত সেই টোঙার চালক আর এই বৃদ্ধ দু-জনেই অভিন্ন। তাই সন্দেহ-ভঞ্জনের জন্যে কিঞ্চিৎ দ্বিধাভরে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'রাজা রুদ্রপ্রতাপ সিংহ ?'

—'হ্যাঁ, আমি হচ্ছি সেই ব্যক্তি। বিনয়বাবু, আমি আপনাকে স্বাগত সম্ভাষণ করছি। রাত্রে পথে আসতে নিশ্চয়ই আপনার খুব কষ্ট হয়েছে। আসুন, আগে কিঞ্চিৎ জলযোগ করে নিন।'

যদিও শেষ-রাত্রে সেই জলযোগের প্রস্তাবটা একটু অদ্ভুত শোনাল, তবু আমি কোন প্রতিবাদ করলুম না।

রাজা হেঁট হয়ে পড়ে আমার সুটকেসটা মাটির উপর হতে নিজেই তুলে নিতে গেলেন। আমি তাড়াতাড়ি তাঁকে বাধা দিতে গেলুম, কিন্তু তিনি কোন মানা না মেনেই আমার সুটকেসটা তুলে নিয়ে বললেন, 'না বিনয়বাবু, আপনি আমার অতিথি। বাড়ির লোকজনেরা কেউ এখন জেগে নেই, কাজেই আপনার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সমস্ত ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে। আসুন।'

দ্বারপথ পার হয়ে খানিক গিয়েই পেলুম এক সোপানশ্রেণী। দ্বিতলে উঠে একটা দালানের উপরে এসে পড়লুম, তার মেঝেটা মার্বেল পাথর দিয়ে বাঁধানো।

দালানের একপ্রান্তে এসে রাজা ঠেলে একটা দরজা খুলে দিলেন। ভিতরে ঢুকে দেখলুম, প্রকাণ্ড ঘর, একটা ঝাড়লণ্ঠনের আলোকে সমস্ত ঘরখানাই আলোকিত। মাঝখানে টেবিল ঘিরে খানকয়েক চেয়ার, এবং টেবিলের উপরে সাজানো রয়েছে কয়েক রকম খাবারের থালা। রাজা ঘরের এক কোণে আমার সুটকেসটা রেখে দিয়ে আর-এক দিকের আর-একটা দরজা ঠেলে খুললেন। তারপর ইঙ্গিতে আমাকে সেই ঘরের ভিতরে প্রবেশ করতে বললেন।

ঘরে ঢুকে আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। একদিকে রয়েছে প্রকাণ্ড একখানি পালঙ্ক, তার উপরে ধবধবে সাদা চাদরে মোড়া বিছানা পাতা। খাদ্য দেখে আমার মন কিছুমাত্র লুব্ধ হয়নি, কিন্তু রাত্রের অত কষ্টের পর এই কোমল শয্যা দেখে আমার ইচ্ছে হতে লাগল, এখনি ছুটে গিয়ে সেখানে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ি।

রাজা বোধহয় আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন। কারণ তিনি বললেন, 'বিনয়বাবু, দেখছি আপনি বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আজ আর কোন কথা নয়। এখন আপনি খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ুন। আপনার যা কিছু দরকার এই ঘরেই খুঁজে পাবেন। কাল সকালে একটু কাজে আমায় বাইরে যেতে হবে। সন্ধ্যার চায়ের আসরে আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে।' এই বলে তিনি ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পাঁচ — তিনটে অদ্ভুত স্বপ্ন

পরদিন সকালবেলা। রাজাবাহাদুরকে দেখতে পেলুম না এবং সকালের চা নিয়েও কেউ এল না। কিন্তু দুপুরে পাশের ঘরে টেবিলের উপরে পেলুম অন্যান্য আহার্য। তবে আশ্চর্য এই, সব খাবার ঠাণ্ডা। কোন মানুষের সাড়াও শুনলুম না। কালকের অনিদ্রার ঘোর এখনো যায়নি। তাই এসব নিয়ে আর মাথা না ঘামিয়ে আবার শুয়ে পড়লুম এবং সেই ঘুম যখন ভাঙল তখন সূর্য গিয়েছে অস্তে।

তাড়াতাড়ি গাত্রোত্থান করে মুখ হাত ধুয়ে জামা কাপড় পরছি, এমন সময় ঘরের দরজার ওপাশে শোনা গেল রাজার কণ্ঠস্বর, 'বিনয়বাবু, আপনার দিবানিদ্রা ভেঙেছে কি? এদিকে চা আর খাবার প্রস্তুত।'

দরজা খুলে বাহিরে বেরুতেই রাজা আমাকে নিয়ে পাশের ঘরে প্রবেশ করলেন। মাঝখানে টেবিলের উপর সাজানো রয়েছে দামী দামী চায়ের সরঞ্জাম এবং টোস্ট, ডিম ও অন্যান্য খাদ্য। আমি বললুম, 'রাজাবাহাদুর, চায়ের সঙ্গে এত খাবার খাওয়ার অভ্যাস আমার নেই। এ করেছেন কী?'

রাজা বললেন, 'এ নির্জন বনের ভিতরে এর বেশি আর কিছু আয়োজন করতে পারা যায় না। শহরে থাকলে আপনাকে এর চেয়ে ঢের বেশি খাবার খেতে হত। নিন, এখন আসন গ্রহণ করুন।'

টেবিলের একধারে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে আমি বসে পড়লুম, রাজা বসলেন গিয়ে অন্য প্রান্তে। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'বিনয়বাবু, আমি আগেই চা আর খাবার খেয়ে নিয়েছি, কাজেই এখন আপনাকে একলাই খেতে আর চা পান করতে হবে।'

খাবার খেতে খেতে রাজাবাহাদুরকে ভাল করে দেখবার সুযোগ পেলুম। তাঁর মুখ দেখলেই বোঝা যায়, তিনি একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক। তাঁর মাথার চুলগুলি পেকে সাদা ধবধবে হয়েছে। তাঁর ভ্রূর উপরেও খুব পুরু চুলের গোছা। সুদীর্ঘ নাসিকা। লম্বা ও মস্ত গোঁফজোড়ার মাঝখানে তাঁর ওষ্ঠাধর দেখলে তাঁকে একজন নির্দয় লোক বলেই মনে হয়। ওষ্ঠাধরের ফাঁকে যে দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে, অসাধারণ তাদের তীক্ষ্ণতা।

রাজা কাল যখন আমার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন, তখনই আমি আরো দু-একটা আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ করেছিলুম। তাঁর দুই হাতের তালুর মাঝখানে আছে এক গোছা চুল, এবং তাঁর আঙুলের নখগুলোও যেন অস্বাভাবিক ধারালো। কেবল তাই নয়, আমার নাকেও এমন একটা বিশ্রী ঘ্রাণ এসে লেগেছিল, যে আর-একটু

হলেই আমি বমন করে ফেলতুম। যদিও সেটা অসম্ভব, তবু আমার মনে হয়েছিল, আমি যেন কোন গলিত মাংসের দুর্গন্ধ পাচ্ছি। আমার মুখের ভাব দেখে রাজা তখন তাড়াতাড়ি দূরে সরে গিয়েছিলেন।

চা পান করতে করতে রাজার কাছে আমি ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের সেই পুরোনো ও ভাঙা বাগান-বাড়িটার কথা তুললুম। রাজা নীরবে সমস্ত কথা শ্রবণ করলেন। আমার বক্তব্য শেষ হবার পর তিনি খুশি মুখে বললেন, 'ধন্যবাদ বিনয়বাবু, ধন্যবাদ। আমি ঠিক যেরকম বাড়ি আর জমি চাই, আপনি আজ তারই সন্ধান দিলেন। দেখুন, আমি সেকেলে মানুষ। তার উপরে শহরের বিলাসিতা আর আধুনিকতা ছেড়ে আমি বনের ভিতরে সাদাসিধে জীবন যাপন করতে চাই। আমার এই বিশালগড় দেখছেন? কতকাল আগে আমার পূর্বপুরুষরা এই প্রকাণ্ড অট্টালিকা আর এই গড় তৈরি করে গিয়েছেন, কত যুদ্ধবিগ্রহের স্মৃতি এই বিশালগড়ের প্রত্যেক পাথরের গায়ে মাখানো আছে, অতীতের কত ঐশ্বর্য আগে একে অপূর্ব করে রেখেছিল, আজ আমরা সে সব কল্পনাতেও আনতে পারব না। আজ আমাদের সে গর্ব, ঐশ্বর্য আর সমৃদ্ধি নেই বটে, কিন্তু আজও আমার দেহের ভিতরে, ধমনীতে ধমনীতে রক্তধারার সঙ্গে জীবন্ত হয়ে আছে আমাদের সেই প্রাচীন বংশগৌরব। সেইজন্যেই এই ভাঙা আর পুরোনো বিশাল-গড়কে আজও আমি ভুলতে পারিনি। আর এইখানে থেকে থেকে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে, পরম আধুনিক প্রকাণ্ড কোন রাজপ্রাসাদ পেলেও তার ভিতরে গিয়ে বাস করবার প্রবৃত্তি আমার হবে না। তাই একেলে শহর কলকাতাতে গিয়েও কোন অট্টালিকায় বাস করবার ইচ্ছা আমার নেই। বংশে আমি প্রাচীন, মনে আমি প্রাচীন আর বয়সেও আমি প্রাচীন, তাই তো আমি কিনতে চেয়েছি প্রাচীন কোন বাগান-বাড়ি। সুতরাং আমার এই অদ্ভুত রুচি দেখে আপনারা কেউ বিস্মিত হবেন না, এমন আশা আমি করতে পারি।'

আমি বললুম, 'যেচে কেউ যে পুরোনো বাড়ি কিনতে চায় এটা আমরা জানতুম না। কাজেই আমরা বিস্মিত হয়েছিলুম বৈকি। কিন্তু

এতক্ষণ পরে আপনার কথা শুনে সে রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু আর একটি কথা জানতে আমার আগ্রহ হয়েছে। আপনি বোধহয় বাঙালী নন?'

রাজাবাহাদুর বললেন, 'না, জাতে আমরা রাজপুত।'

—'কিন্তু আপনি এত ভাল বাংলা শিখলেন কী করে? বাংলা দেশে গিয়ে কখনো থেকেছিলেন কি?'

রাজা মৃদু হেসে বললেন, 'না। কিন্তু খালি বাংলা কেন, ভারতবর্ষের আরও অনেক দেশের ভাষাই আমি জানি। ওপাশের ঘরে আমার লাইব্রেরিতে গেলে দেখবেন, সেখানে অন্তত হাজার-দুই বাংলা বই আছে। বাংলা দেশ সম্বন্ধে আমার যা অভিজ্ঞতা, আমি ঐ সব বই পড়েই অর্জন করেছি। এমনকি আপনাদের কলকাতায় কোথায় কোন্ রাস্তা আছে, আর কোন্ কোন্ রাস্তায় কে কে বিখ্যাত ব্যক্তি বাস করেন, সে খবরও আমার নখদর্পণে।'

—'বই পড়তে আমি বড়ই ভালবাসি, পড়বার ইচ্ছা হলে আমি কি আপনার লাইব্রেরিতে যেতে পারি?'

—'নিশ্চয়, নিশ্চয়! এই বিশালগড়ের যেখানে খুশি আপনি যেতে পারেন; কিন্তু দরজা যেখানে বন্ধ দেখবেন সেখানে কোনদিন ঢোকবার চেষ্টা না করলেই আমি খুশি হব। কারণ এই বিশালগড় আপনাদের কলকাতা শহরের কোন অট্টালিকা নয়। এখানে এমন অনেক কিছুই আছে, যার অর্থ আপনি বুঝতে পারবেন না। সেইজন্য আগে থাকতেই আপনাকে সাবধান করে দেওয়া উচিত মনে করছি।'

হঠাৎ আমার মনে পড়ল কালকের রাত্রের রহস্যময় ঘটনাগুলোর কথা। তাই নিয়েই রাজার কাছে আমি কোন কোন প্রশ্ন তুললুম। তিনি কোন প্রশ্নের জবাব দিলেন এবং কখনো নিরুত্তর হয়ে রইলেন।

তখন তাঁর কাছে সেই নীল আলোর প্রসঙ্গ তুললুম। তিনি বললেন, 'আপনি তো শুনেছেন, এখানকার লোকেরা বিশ্বাস করে যে কোন-কোন নির্দিষ্ট রাত্রে—যেমন, অমাবস্যার শনিবারের রাত্রে—এ অঞ্চলের গভীর অরণ্যে প্রেতাত্মাদের আবির্ভাব হয়। সেই সময়ে যেখানে দেখা

যায় নীল রঙের একটা অদ্ভুত আলো সেইখানেই মাটি খুঁড়লে পাওয়া যায় গুপ্তধন। আমার কর্মচারী বোধহয় গুপ্তধনের লোভেই সেই নীল আলোর কাছে গিয়েছিল।'

আমার চা পান শেষ হল। রাজাও উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বিনয়বাবু, আপনাদের অফিসে আমি এখনি খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি যে, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের বাগানবাড়ি আমার পছন্দ হয়েছে। আপনি কলকাতায় যাবার আগেই আমি এখান থেকেই ও-বাড়িখানা কেনবার জন্যে আমার একজন প্রতিনিধি কলকাতায় পাঠিয়ে দিচ্ছি।' এই বলে তিনি ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ঘণ্টা-তুই পরে কামাবার আরশিখানা বার করে টেবিলের উপরে রেখে একমনে দাড়ির উপর ক্ষুর চালনা করছি, হঠাৎ পিছন থেকে কে আমার কাঁধের উপর একখানা হাত রেখে বললে, 'অসুবিধা হচ্ছে না তো?'

এই সম্ভাষণের জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না, চমকে উঠতে ক্ষুর লেগে আমার চিবুক গেল কেটে।

ফিরে দেখি, আমার পিছনে দাঁড়িয়ে রাজাবাহাতুর। বিস্মিত হলুম। কারণ আরশির ভিতর দিয়ে আমার পিছন দিক ও দরজার কাছটা দেখা যাচ্ছিল বেশ স্পষ্ট। অথচ রাজা যে কখন ঘরের ভিতরে এসে ঢুকেছেন আমি তা একটুও দেখতে পাইনি। সন্দেহ দূর করবার জন্যে আর-একবার আরশির দিকে ফিরে ভাল করে তাকিয়ে দেখলুম। কিন্তু কী আশ্চর্য, রাজা দাঁড়িয়ে রয়েছেন আমার ঠিক পিছনেই, অথচ দর্পণের মধ্যে নেই তাঁর মূর্তির ছায়া। এ কী অসম্ভব ব্যাপার! এদেশে এসে পর্যন্ত যেসব অভাবিত কথা শুনছি আর যেসব অপার্থিব দৃশ্য দর্শন করছি, তার কোনটারই অর্থ আমি বুঝতে পারিনি। আজ এখনি যা দেখলুম, তাও কি সেইরকমই কোন আজগুবি ব্যাপার? মানুষ আছে, দর্পণে নেই মানুষের দেহের ছায়া?

কিন্তু তখন এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে পারলুম না, কারণ আমার চিবুকের ক্ষত থেকে ঝর-ঝর করে রক্ত ঝরে পড়ছিল।

'স্টিকিং প্লাস্টার' বার করবার জন্যে সুটকেসের দিকে অগ্রসর হচ্ছি, এমন সময় রাজাও আমার চিবুকের অবস্থাটা দেখতে পেলেন। পরমুহূর্তেই তাঁর মুখের ভাব বদলে গেল অসম্ভব রূপে। মনে হল, আমার সামনে দেখছি যেন একটা রক্তলোভী হিংস্র জন্তুর ভয়াবহ মুখ —তার মধ্যে নেই কিছুমাত্র মানবতার চিহ্ন! রাজা আচম্বিতে বাঘের মতন আমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুই হাতে চেপে ধরলেন আমার দুই স্কন্ধদেশ। তাঁর বিকৃত মুখখানা এগিয়ে এল আমার মুখের খুব কাছে এবং তার পরেই তাঁর চোখ পড়ল আমার গলায় ঝোলানো কবচখানার দিকে। দেখতে দেখতে তাঁর মুখখানা 'আবার শান্ত হয়ে এল। অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে তিনি বললেন, 'বিনয়বাবু, সাবধানে থাকবেন। আমার বাড়িতে রক্তপাত করা নিরাপদ নয়!'

তারপর হঠাৎ সামনের দিকে হেঁট হয়ে পড়ে আরশিখানা তুলে নিয়ে সক্রোধে তিনি বললেন, 'এই আরশিই হচ্ছে সর্বনাশের জিনিস! মানুষ নিজের আমিত্বকে বড় করে দেখবার জন্যে সৃষ্টি করেছে এই আরশি! চুলোয় যাক,—চুলোয় যাক!' বলতে বলতে জানলার ধারে গিয়ে আরশিখানা তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বাইরের দিকে। তারপর আর কোন কথা না বলেই হন্-হন্ করে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমি হতভম্ব হয়ে গেলুম। কী থেকে কী যে হল আর কেন যে হল, তার কোন হদিশ খুঁজে পেলুম না। পরে-পরে মনের ভিতরে জাগল তিনটে অদ্ভুত প্রশ্ন। আরশিতে রাজার ছায়া পড়ল না কেন? আমার চিবুকের রক্ত দেখে রাজার মুখের ভাব অমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল কেন? আর আরশি দেখে তাঁর অতটা রাগের কারণই বা কী?

ছয় রাত্রির সন্তান

আমি বন্দী। হ্যাঁ, এ বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ নেই। আজকেই জানতে পেরেছি এই ভয়াবহ সত্য কথাটা। কেমন খেয়াল হল,

দোতালা থেকে নেমে প্রকাণ্ড সদর দরজাটার কাছে গেলুম। ইচ্ছা ছিল একবার বেরিয়ে বাইরের চারিদিকটা ঘুরে আসি। কিন্তু দরজার পাল্লা টানতে গিয়ে দেখি, বাহিরের থেকে সেটা বন্ধ।

তখন ভিতরে ফিরে এসে একতালার চারিদিক অন্বেষণ করতে লাগলুম, বাইরে বেরুবার যদি আর কোন দরজা থাকে। লম্বায় চওড়ায় প্রায় দুশো ফুট ব্যাপী প্রকাণ্ড চতুষ্কোণ উঠোন, তার চারিধারে প্রশস্ত দরদালান এবং তার পর সারি সারি ঘরের পর ঘর। কিন্তু প্রত্যেক ঘরের দরজাতেই বড়-বড় কুলুপ লাগানো এবং কোন দিকেই জনপ্রাণীর সাড়া নেই। সেখানকার অখণ্ড স্তব্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনে হল, আমি যেন কোন অভিশপ্ত, পরিত্যক্ত হানাবাড়ির ভিতরে এসে পড়েছি।

প্রাঙ্গণের আর একদিক দিয়ে আর একটি পথ আছে। এবং সেই পথের শেষেও আর একটা বন্ধ দরজা। খুব সম্ভব এটা হচ্ছে এ মহল থেকে অন্য মহলে যাবার পথ, কারণ সেখানকার রাজারাজড়াদের প্রাসাদে বা কোন ধনী ব্যক্তির অট্টালিকায় তিন-চারটির কম মহল থাকত না। এখানকার অন্য মহলে কী আছে তা জানবার কোনই উপায় নেই, কেননা ওদিকে যাবার যে একটিমাত্র দ্বার, তাও ওপাশ থেকে বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

আবার উপরে লাইব্রেরি-ঘরে ফিরে এসে বসলুম। এমনভাবে নিজেকে বন্দী বলে বুঝে মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেল। দুই-তিনখানা কেতাব নিয়ে নাড়াচাড়া করলুম, পড়তে ভাল লাগল না। উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

নিচেই দেখা যাচ্ছে বিশালগড়ের বিস্তৃত অঙ্গন। এক সময়ে অঙ্গনের সমস্তটাই যে পাথর দিয়ে বাঁধানো ছিল, দেখলেই সেটা বোঝা যায়। কিন্তু এখন অধিকাংশ প্রস্তরখণ্ডই স্থানচ্যুত বা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে। সেইসব শৈবাল-চিত্রিত শিলাখণ্ড দেখলেই বুঝতে বিলম্ব হয় না, যে তাদের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে বহু শতাব্দীর ঝড় ও বৃষ্টি। অঙ্গনের যে সব জায়গার

পাথর সরে গিয়েছে, সেসব স্থান বন্য লতাগুল্ম ও ঝোপঝাপের দ্বারা সমাবৃত।

অঙ্গনের পরে বিশালগড়ের সু-উচ্চ এবং সুদীর্ঘ প্রস্তর-প্রাচীর। ভূমিতল থেকে তার উচ্চতা ৫০ ফুটের কম নয়। এই প্রাচীর লঙ্ঘন করে কোন মানুষের পক্ষেই ভিতর থেকে বাহির বা বাহির থেকে ভিতরে আসা সম্ভবপর নয়। প্রাচীরের ওপাশে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের পর পাহাড় এবং কোথাও বা সুদূর বনের সুনীল রেখা এবং তার উপরে নত হয়ে পড়েছে সূর্যের অস্তরাগরেখায় বিচিত্র নীলাকাশ। বাহির থেকে ভেসে আসছে স্বাধীন বিহঙ্গদের কলকাকলি। তাদের সেই মুক্ত প্রাণের সঙ্গীত শুনে আমার প্রাণে জাগল দীর্ঘশ্বাস। স্বাধীন, তারা স্বাধীন—কিন্তু আমি? বন্দী!

নিচের সদর দরজা খোলার শব্দ পেলুম। গবাক্ষ দিয়ে হেঁট হয়ে দেখি, রাজা বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করছেন।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলুম। ছয় সাত মিনিট কেটে গেল, রাজা তবু আমার কাছে এলেন না। কৌতূহলী হয়ে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়লুম। দেখলুম, আমার শোবার ঘরের দরজাটা আধখানা খোলা রয়েছে। আলতো পায়ে এগিয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে সবিস্ময়ে দেখলুম, আমার জন্যে রাজা করছেন স্বহস্তে শয্যারচনা। নিঃশব্দে আবার ফিরে এলুম লাইব্রেরি-ঘরে। তাহলে আমি মনে মনে যে সন্দেহ করেছিলুম তা মিথ্যা নয়? এই বিশাল অট্টালিকায় রাজা একাকী বাস করেন। এমনকি, আমার জন্যে তাঁকে আহার্য আর শয্যা পর্যন্ত প্রস্তুত করতে হয়!

এখানে যখন রাজা আর আমি ছাড়া আর তৃতীয় ব্যক্তির অস্তিত্ব নেই তখন টোঙার যে চালক সরাই থেকে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিল, সেও তাহলে রাজা ছাড়া আর কেউ নয়। এতক্ষণ পরে আমার মনে পড়ল, অন্ধকারে আমি টোঙাচালকের মুখ একবারও দেখতে পাইনি, নিশ্চয় রাজা ইচ্ছা করেই গ্রহণ করেছিলেন অন্ধকারের সেই সুযোগ।

দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল আমার সমস্ত হৃদয়-মন। সেই ভয়াবহ টোঙাচালক, যার দেহ ভেদ করে ওপাশের আলো দেখা যায়, যার একটিমাত্র নীরব ইঙ্গিতে ক্ষুধিত নেকড়ে-বাঘের দল শিকার ছেড়ে অদৃশ্য হয় এবং যার দুই বাহুতে আছে ভীমের মতন অসাধারণ শক্তি!

সরাইখানায় যা শুনেছিলুম, আবার সেইসব কথা একে-একে মনে পড়তে লাগল। তারা সকলেই একবাক্যে আমাকে এখানে আসতে মানা করেছিল। অনেকে শরীরী প্রেতের কথা বলে আমাকে ভয় দেখাতেও ছাড়েনি। আর সেই পুত্রহারা বৃদ্ধা, যে রক্ষাকবচ ঝুলিয়ে দিয়েছিল আমার কণ্ঠদেশে, তার কথা ভেবে আমার সমস্ত অন্তর কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। আমার অবিশ্বাসী মন তখন এই কবচের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে পারে নি, কিন্তু এখন এই কবচখানা যে আমার গলায় ঝুলছে, এটা ভেবেও আমি অনেকটা আশ্বস্ত হতে পারলুম।

এর পর আমার কী করা উচিত? আমার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, রাজাকে জানতে না দেওয়া যে আমি তাঁর কোন গুপ্ত কথা আবিষ্কার করতে পেরেছি। রাজা যে ইচ্ছা করেই আমাকে এখানে বন্দী করে রাখতে চান, এটা বেশ ভাল করেই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু নিজেকে আমি যে বন্দী বলে জেনেছি, এই ভাবটা কিছুতেই তাঁর কাছে প্রকাশ করা হবে না। আমার দ্বিতীয় কর্তব্য হচ্ছে, সর্বদাই দৃষ্টিকে সজাগ রাখা এবং রাজা কি করছেন না করছেন পদে পদে সেইদিকে লক্ষ রাখা। জনশূন্য বিশালগড়ে আমি বন্দী; এখন একমাত্র নিজের বুদ্ধি ব্যবহার করা ছাড়া আমার মুক্তিলাভের আর কোন উপায় নেই।

রাজা এই ঘরে এসে প্রবেশ করলেন। তাঁর পরনে সেই ঘনকৃষ্ণ পরিচ্ছদ। আজ নতুন চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলুম, রাজার বর্ণ গৌর বটে, কিন্তু তাঁর হাত ও মুখের শুভ্রতার ভিতরে রক্ত-আভার কোনরকম আভাস নেই। বহুক্ষণ-মৃত মানুষের মতন তাঁর দেহের বর্ণ হচ্ছে পাণ্ডুর। কালো পোশাকের ভিতরে সেই পাণ্ডুরতা আরও বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

রাজা এসেই বললেন, 'বিনয়বাবু, আপনাদের ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের সেই বাড়িখানা কেনবার জন্যে আমার প্রতিনিধি আজকেই কলকাতায় যাত্রা করেছেন।'

আমি বললুম, 'রাজাবাহাদুর, তাহলে আমার কর্তব্য তো শেষ হয়েছে, আমিও তো এখন অনায়াসেই কলকাতায় চলে যেতে পারি?'

—'এত শীঘ্র?'

—'আমি স্বাধীন নই, অপরের কর্মচারী মাত্র। বলে এসেছি, তিন চার দিনের বেশি এখানে থাকব না। যথাসময়ে কলকাতায় না ফিরলে আমার উপরওয়ালা অসন্তুষ্ট হতে পারেন।'

রাজা মাথা নেড়ে বললেন, 'না না বিনয়বাবু, তা হতেই পারে না। আপনাকে আমার ভাল লেগেছে। এত শীঘ্র আপনাকে ছাড়া হবে না। আরো কিছুদিন আমার আতিথ্য স্বীকার করতেই হবে।'

নাচারভাবে বললুম, 'বেশ, তাহলে আর উপায় কী?'

হঠাৎ আমার দিকে দৃষ্টি স্থির করে গম্ভীরভাবে ও কঠিন স্বরে রাজা বললেন, 'আর একটা কথা আপনাকে আর-একবার স্মরণ করিয়ে দিই। আপনাকে যে-কয়টি ঘর ব্যবহার করতে দিয়েছি, তা ছাড়া আর কোন ঘরেই আপনি যেন ঢোকবার চেষ্টা না করেন। এই প্রাসাদ হচ্ছে অনেক কালের পুরোনো, এর মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে বহু কালের বহু প্রাচীন স্মৃতি। অনেক স্মৃতিই সুখের নয়; তারা আনন্দ দেয় না, ভয় দেখায়। নিজের সীমা অতিক্রম করলে আপনাকে রীতিমত বিপদগ্রস্ত হতে হবে। আর সেইসব বিপদ এমন কল্পনাতীত যে—' বলতে বলতে হঠাৎ তিনি থেমে গেলেন এবং উৎকর্ণ হয়ে কি যেন শুনতে লাগলেন।

আমিও শোনবার চেষ্টা করলুম। জানলা দিয়ে দেখলুম, বাহিরের সমস্ত দৃশ্য লুপ্ত করে নেমে এসেছে সন্ধ্যার অন্ধ যবনিকা। চারিদিক স্তব্ধ, পাখিরাও নীরব। কিন্তু সেই স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে দূর থেকে ভেসে ভেসে আসছে এমন এক রোমাঞ্চকর ধ্বনি, যা হিম করে দেয় বুকের রক্ত! তা হচ্ছে একদল নেকড়ে বাঘের গর্জন।

রাজার দুই চক্ষু যেন জ্বলে উঠল উৎকট আনন্দে। ধীরে ধীরে তিনি বললেন, 'শুনুন, শুনুন! রাত্রির সন্তানদের কণ্ঠস্বর শুনুন! আহা, তারা রচনা করছে কী মধুর সঙ্গীত!'

আমি অবাক হয়ে তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে রইলুম, কোন কথাই বলতে পারলুম না।

রাজা অল্প একটু হেসে বললেন, 'ও, বুঝেছি। আপনারা হচ্ছেন শহুরে জীব, শিকারীর বন্য আনন্দ অনুভব করবার শক্তি আপনাদের নেই।' বলেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন দ্রুতপদে।

আমি যেন তলিয়ে গেলুম বিস্ময়-সাগরে। হৃদয় পূর্ণ হয়ে গেল সন্দেহে এবং আতঙ্কে। এমন সব অপার্থিব কথা আমি ভাবতে লাগলুম, বাইরে যা প্রকাশ করা অসম্ভব। ভগবান আমাকে রক্ষা করুন!

সাত ত্রিমূর্তি

খানিকক্ষণ আচ্ছন্নের মত সেইখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। তখন আমার এমন অবস্থা, যে ভাল মন্দ কোনরকম চিন্তা করবার শক্তিই আমার ছিল না। মিনিট কয়েক পরে ধীরে ধীরে কেটে গেল আমার সেই আচ্ছন্ন ভাবটা। বাড়ির ভিতরে রাজার কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে আস্তে আস্তে দোতালার দালানে গিয়ে দাঁড়ালুম। প্রশস্ত সোপানশ্রেণী দোতালা থেকে আরও উপরে উঠে গিয়েছে। আনমনার মত সেই সোপান ধরে আমিও উঠতে লাগলুম উপরদিকে। দোতালার পর তেতালা পার হয়ে পেলুম মস্ত বড় একটা খোলা ছাদ। ছাদের প্রান্তে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। নিজেকে বন্দী জেনে এবং সঙ্কীর্ণ ঘরের ভিতরে বন্ধ হয়ে এতক্ষণ আমার প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠেছিল, এখন মুক্ত আকাশের তলায় এসে দাঁড়িয়ে মনের ভিতরে জাগল একটা পরম আশ্বস্তি।

সেদিন ছিল প্রতিপদের রাত্রি। সুন্দর আলোকে চারিদিক ঝকঝক করছে প্রায় দিনের বেলার মত। রূপোলি কিরণধারায় দূরের পাহাড়গুলো যেন বিগলিত হয়ে যাচ্ছে। বনে বনে আর উপত্যকায়

তুলছে আলোছায়ার বিচিত্র দোলা। ঐ পাহাড়ে যে বিচরণ করে সজাগ মৃত্যুদূতরা, সে কথা ভুলিয়ে দেয় আজকের এই প্রকৃতির জ্যোতির্ময় সৌন্দর্য। তাকিয়ে রইলুম বিমুগ্ধ হয়ে।

আচম্বিতে তেতালার একটা গবাক্ষের দিকে আমার দৃষ্টি হল আকৃষ্ট। সেখানে গবাক্ষের তলা থেকে ভূমিতল পর্যন্ত বাড়ির যে জীর্ণ অংশটা ছিল তার নানাস্থানেই দেওয়ালের পাথরগুলো দেওয়াল থেকে অল্প-সল্প বেরিয়ে বেরিয়ে এসেছে। গবাক্ষের ভিতর থেকে বাহিরে এল আস্তে আস্তে একটি কালো-পোশাক-পরা মানুষের মূর্তি। এত উঁচু থেকে তার মুখ দেখতে না পেয়েও আমার বুঝতে বিলম্ব হল না যে সে মুখ রাজার ছাড়া আর কারুর নয়।

তারপরে সভয়ে দেখলুম এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য। নিচের দিকে মুখ এবং উপর দিকে পা করে রাজা দেওয়ালের গা বেয়ে ধীরে ধীরে নেমে যেতে লাগলেন মস্ত একটা সরীসৃপের মতন! প্রথমটা ভাবলুম আমারই বুঝি দেখবার ভুল হয়েছে। তারপর ভাল করে দেখলুম, রাজা, হাতের আঙুল—এবং যেন পায়ের আঙুলগুলোও—দিয়ে সেই দেওয়াল-থেকে-বেরিয়ে-পড়া পাথরের ধার চেপে ধরে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছেন। তাঁর ঝলঝলে কালো পোশাক দেহের দুই দিকে ছড়িয়ে থাকাতে তাঁকে মনে হচ্ছিল যেন প্রকাণ্ড একটা বাদুড়ের মত।

ভগবান জানেন, এই রাজা কোন্ জাতীয় জীব! এঁকে মানুষের মতন দেখতে বটে, কিন্তু ইনি কি মানুষ? বাড়িতে সিঁড়ি থাকতেও কোন মানুষ কি এমন করে দেওয়াল বেয়ে মাটিতে গিয়ে নামতে চায়?

কী ভয়ানক জায়গাতেই আমি এসে পড়েছি! দেখছি আমার আর উদ্ধার নেই! গবাক্ষ থেকে প্রায় একশো ফুট নিচে আছে পৃথিবীর দৃশ্য। মাটিতে নামবার পর রাজার মূর্তি আর দেখতে পেলুম না। হয়ত একটা গর্ত বা অন্য কোন কিছুর ভিতরে ঢুকে তিনি একেবারে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন।

রাজা বাড়ির ভিতর নেই জেনে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে তেতালার দালানে নেমে এলুম। সেখানে রয়েছে ঘরের পর ঘর।

টর্চটা আমার সঙ্গেই ছিল। টর্চের আলো ফেলে ঘরের দরজাগুলো পরীক্ষা করতে লাগলুম। প্রত্যেক দরজাতেই রয়েছে এক-একটা বড় কুলুপ। দরজাগুলো পুরাতন বটে, কিন্তু কুলুপগুলো নতুন। যেন সবে কিনে এনে লাগানো হয়েছে। দরজার পর দরজার উপরে দৃষ্টি চালনা করতে করতে সেই সুদীর্ঘ দালানের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পেরিয়ে গেলুম। সেখানে দুটো ছোট ছোট কুঠরির দরজা ছিল খোলা, কিন্তু ভিতরে ঢুকে কেবল ধুলো আর আবর্জনা আর দু-চারটে ভাঙাচোরা সেকেলে আসবাব ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলুম না। বোধহয় এ দুটো হচ্ছে পরিত্যক্ত ঘর। তারপরেই আর একটা দরজা এবং বাহির থেকে কেবলমাত্র শিকল তুলে সে-দরজাটা বন্ধ করা আছে। শিকল খুলে ঘরে প্রবেশ করলুম। মস্ত ঘর—হলের মত বড়। একপাশে সার-গাঁথা জানলাগুলোর ভিতর দিয়ে চাঁদের আলো ঢুকে সমস্ত ঘরখানাকে অনেকটা স্পষ্ট করে তুলেছে। একটা জানলা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি চালনা করে দেখলুম, বিশালগড়ের প্রাকারের এক পাশে অদূরেই রয়েছে একটা উপত্যকা। তারপরেই অনেকগুলো পাহাড়ের পর পাহাড় আর শিখরের পর শিখর ক্রমেই আকাশের দিকে উঁচু হয়ে উঠে গিয়েছে।

ঘরের ভিতরটা পরীক্ষা করতে লাগলুম। এ ঘরটা খুব বেশি পরিষ্কার না হলেও এখানে ধুলো-জঞ্জালের কোনই বাড়াবাড়ি নেই। কয়েকখানা সোফা, কৌচ, চেয়ার, লেখবার টেবিল ও সাজপোশাক পরবার টেবিল প্রভৃতি আসবাবও রয়েছে। কিন্তু কোন আসবাবই একালের উপযোগী নয়। তবে, এইটুকু কেবল অনুমান করতে পারলুম, খুব সম্ভব এটা হচ্ছে কোন স্ত্রীলোকের ঘর। সেকালে বোধহয় রাজবাড়ির কোন নারী এই ঘরটা ব্যবহার করতেন।

মনের ভিতরে জাগল কেমন শ্রান্তির ভাব। শরীর যেন এলিয়ে পড়তে চাইলে। একটা সোফার উপরে ঝুপ করে বসে পড়লুম। তারপর সেই আধা-আলো ও আধা-অন্ধকারে আমার চোখের উপরে ধীরে ধীরে ঘনিয়ে এল তন্দ্রার আমেজ। একটা অসীম স্তব্ধতাকে বুকের ভিতরে অনুভব করতে করতে বোধহয় আমি ঘুমিয়েই পড়লুম। রাজা

যে আমাকে বলেছিলেন আমার জন্যে নির্দিষ্ট ঘরের বাহিরে অন্য কোথাও গেলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা, একথা আমার একবারও মনে পড়ল না। এবং মনে পড়লেও হয়ত আমি তাঁর হুকুম মানতুম না। তাঁর অবাধ্য হওয়াও এখন আমার কাছে বিশেষ একটা আনন্দের মত।

খানিকক্ষণ পরে মনে হল, ঘরে আমি আর একলা নই। আমি স্বপ্নলোকে বিচরণ করছিলুম কি না জানিনা, কিন্তু চোখ খুলেই দেখলুম চন্দ্রালোকে সমুজ্জ্বল ঘরের একটা অংশ। সেইখানে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে তিনজন সুন্দরী তরুণী। আশ্চর্য এই, তারা চাঁদের আলোর দিকে পিছন করে দাঁড়িয়ে ছিল বটে, তবু মূর্তিগুলোর সামনের দিকে মেঝের উপরে নেই কারুর দেহের ছায়া।

যেমন সঙ্গীতের ধ্বনি জাগে, তাদেরও হাসির ধ্বনি হচ্ছে সেইরকমই সুমধুর।

একটি মেয়ে বললে, 'দিদি, এগিয়ে যা! প্রথমে তোরই পালা!'

আর-একজন বললে, 'লোকটার বয়স দেখছি কাঁচা। নিশ্চয় এর রক্তও খুব তাজা!'

এই অদ্ভুত উক্তি শুনে আমার বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। কিন্তু কী যেন মোহিনী মন্ত্রে অভিভূত হয়ে আমি একটুও নড়তে, উঠে বসতে বা দাঁড়িয়ে উঠতে পারলুম না। অত্যন্ত অসহায়ের মত বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখলুম, একটি তরুণী এগিয়ে এসে আমার সোফার পাশে হাঁটু গেড়ে মাটির উপরে বসে পড়ল। ধীরে ধীরে তার মুখ আমার দিকে ঝুঁকে পড়তে লাগল এবং তার দুই চক্ষে জাগল একটা উৎকট ও ক্ষুধিত আনন্দের দীপ্তি। তারপরেই আমার কণ্ঠদেশে অনুভব করলুম দুটো ধারালো দাঁতের দংশন।

কিন্তু আমার গলার উপরে তার দাঁতদুটো ভাল করে চেপে বসতে-না-বসতেই ঘরের ভিতরে আবির্ভূত হল আর একটি সুদীর্ঘ মূর্তি। দেখেই চিনলুম। স্বয়ং রাজা রুদ্রপ্রতাপ।

রাজার চোখদুটো জ্বলছে জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ডের মত। সে চক্ষের

দীপ্তি যেন ভয়ানক নরকাগ্নির মতন। যে তরুণী আমার কণ্ঠের উপরে দংশন করেছে, রাজার একখানা বলবান হাত বেগে গলা চেপে ধরে এক টানে তাকে দাঁড় করিয়ে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিলে।

ভীষণ ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে তিনি বললেন, 'কোন্ সাহসে তোরা এর কাছে এসেছিস? কোন্ সাহসে তোরা এর উপরে নজর দিয়েছিস—আমি কি তোদের মানা করিনি? চলে যা, চলে যা এখান থেকে! এ লোকটার উপরে আমি ছাড়া আর কারুর অধিকার নেই!'

তিন তরুণী আনন্দহীন তীক্ষ্ণ হাস্যধ্বনিতে সমস্ত ঘরখানা পরিপূর্ণ করে তুললে। সে কী অলৌকিক হাসি, আমার প্রাণ যেন হৃদয়ের মধ্যে মূর্ছিত হয়ে পড়তে চাইল।

একটি তরুণী বললে, 'আমাদের উপরে তোমার কোন দয়া নেই!'

রাজা খুব মনোযোগের সঙ্গে দৃষ্টিপাত করলেন আমার মুখের উপরে। তারপর ফিরে সহজভাবে সান্ত্বনাভরা মৃদু কণ্ঠস্বরে বললেন, 'তোদের উপরে যে আমার দয়া আছে, এ কথা কি তোরা জানিস না? আচ্ছা, এ লোকটাকে নিয়ে আগে আমার কাজ শেষ হোক, তারপর একে সঁপে দেব তোদের হাতে। এখন যা যা, চলে যা! আমাকে এখন একে জাগাতে হবে!'

আর-একজন তরুণী বললে, 'আজ কি তাহলে আমাদের উপবাস?'

—'না, কে তোদের উপবাস করতে বলছে? এই নে।' বলেই তিনি একটা পোঁটলা মেঝের উপরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। পোঁটলাটা মাটির উপরে পড়েই নড়ে-নড়ে উঠল—যেন তার ভিতরে আছে জীবন্ত কোন-কিছু।

একটা স্ত্রীলোক পোঁটলাটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঘিনীর মতন মহা আগ্রহে। তারপর পোঁটলাটা তাড়াতাড়ি খুলে ফেললে। সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলুম একটা হাঁপিয়ে-ওঠা চাপা গলার কান্নার শব্দ। কেঁদে উঠল যেন কোন কচি শিশু। তারপরেই নিদারুণ ভয়ে স্তম্ভিতের মতন দেখলুম, সেই ভয়ানক পোঁটলাটা নিয়ে স্ত্রীলোক তিনটে একসঙ্গে ছুটে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল। কেমন করে বেরিয়ে গেল

আমি জানিনা, কারণ যেখান গিয়ে তারা অদৃশ্য হল, সেখানে দরজা বা গবাক্ষ কিছুই ছিল না। তারা মিশিয়ে গেল যেন চাঁদের আলোর সঙ্গে। তারপরেই জানলার ভিতর দিয়ে ঘরের বাইরে তাকিয়ে দেখলুম, শূন্যের মধ্যে ভেসে যাচ্ছে যেন তিনটে জীবন্ত ছায়া।

আমি একেবারে অজ্ঞান হয়ে গেলুম।

৮ নেকড়ের খোরাক

জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখি, শুয়ে আছি নিজের বিছানায়।

কেমন করে আমি এখানে এলুম? রাজা কি নিজেই আমাকে বহন করে এনেছেন?

ভাবতে ভাবতে উঠে পড়লুম। রোদের সোনা-মাখা আলো এসে পড়েছে ঘরের ভিতরে। সকালের স্নিগ্ধ বাতাসের স্পর্শ পেয়ে কালকের রাত্রের ঘটনাগুলো মনে হতে লাগল মিথ্যা স্বপ্ন বলে। তারপরেই বোধ হল, আমার গলার এক জায়গা যেন জ্বালা করছে। সেখানে হাত দিয়েই বুঝলুম, আমার গলায় রয়েছে একটা ক্ষত। সামান্য ক্ষত বটে, কিন্তু কাল রাত্রে এইখানেই তো পেয়েছিলুম সর্বনেশে স্ত্রীলোকটার দাঁতের স্পর্শ! বেশ বোঝা যাচ্ছে, কাল রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখিনি। স্বপ্নের ক্ষত কখনো জাগরণে থাকে না। রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল আমার সর্বাঙ্গ। কাল রাত্রে আমি কাদের পাল্লায় গিয়ে পড়েছিলুম? তবে কি তারা প্রেতিনী? চলতি কথায় যাদের বলে পেত্নী? প্রেতিনী এত সুন্দরী হয়? রাজাকে দেখতে তো মানুষের মত, প্রেতিনী কি মানুষের মত; প্রেতিনী কি মানুষের হুকুম তামিল করে? আর এই অদ্ভুত রাজাই কি প্রেতিনীদের খোরাক জোগান?

ভীষণ, ভীষণ এই চিন্তা! আজ থেকে আর আমি রাজার অবাধ্য হব না, সন্ধ্যার পর আর কোনদিন নিজের সীমানা ছাড়িয়ে বাইরে যাবার চেষ্টা করব না! আবার অন্য ঘরে গেলে আর বোধহয় প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারব না। আমার পক্ষে এই ঘরই হচ্ছে সবচেয়ে

নিরাপদ জায়গা।

সেদিন দুপুরে বাইরের অঙ্গন থেকে কয়েকজন লোকের গলার সাড়া পাওয়া গেল। জানলার ধারে গিয়ে দেখি, সেখানে বসে বা দাঁড়িয়ে আছে কয়েক জন লোক। পোশাক দেখে তাদের বেদে বলেই মনে হল।

ভাবলুম, আচ্ছা এদের সাহায্যে আমার অবস্থার কথা লিখে কলকাতায় লুকিয়ে চিঠি পাঠালে কেমন হয়? এই কথা মনে হতেই ছুটে টেবিলের ধারে গিয়ে বসলুম। এবং তাড়াতাড়ি কয়েকটা লাইন লিখে কাগজখানা খামে মুড়ে তার উপরে দিলুম আমার অফিসের ঠিকানা। তারপর সেই খামের সঙ্গে একখানা দশ টাকার নোট একগাছা সুতো দিয়ে বেঁধে আবার জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

আমি হাত নেড়ে ইঙ্গিত করতেই একজন যুবক বেদে আমার জানলার ঠিক তলায় এসে উপস্থিত হল।

যতটা সম্ভব নিচু গলায় তাকে বললুম, 'এই চিঠিখানা যদি ডাকঘরে দেবার ব্যবস্থা করতে পারো, তাহলে দশ টাকা বখসিস পাবে।'

লোকটা আমাকে সেলাম করে হাসিমুখে মাথা নেড়ে জানালে, আমার কথামত কাজ করতে সে নারাজ নয়।

নোটের সঙ্গে চিঠিখানা নিচের দিকে ফেলে দিলুম, লোকটা আরএকবার সেলাম ঠুকে হন্-হন্ করে সেখান থেকে অদৃশ্য হল।

সন্ধ্যাবেলায় রাজা আমার ঘরে এসে হাজির। তিনি আমার পাশে এসে বসলেন এবং অত্যন্ত শান্ত, মিষ্ট স্বরে বললেন, 'একজন বেদে এই চিঠিখানা আমার হাতে দিয়ে গেল।'

আমার বুকের ভিতরটা কাঁপতে লাগল, কিন্তু মুখে কোন কথা বললুম না। রাজা একটুখানি হাসলেন। তারপর পকেট থেকে একটা দেশালাই বার করে একটি কাঠি জ্বেলে চিঠিখানা তার শিখার উপরে তুলে ধরলেন। দেখতে দেখতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল চিঠিখানা।

আর একটিমাত্র বাক্য উচ্চারণ না করে রাজা ধীর পদে বেরিয়ে গেলেন ঘরের বাইরে।

হতাশভাবে বসে রইলুম। ওই বেদেগুলো যে রাজারই লোক সেটা বেশ ভাল করেই বোঝা গেল। চিঠিখানা যে রাজা পড়ে দেখেছেন, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। ব্যর্থ হল আমার মুক্তির চেষ্টা।

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলুম দুঃখিতভাবে।

বাইরে চন্দ্রালোকের মহা সমারোহ। বন থেকে ভেসে আসছে গানের পাখির কণ্ঠস্বর। কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ঐশ্বর্য আজ আমার মন গ্রহণ করতে পারলে না।

আমার দৃষ্টি দেখছিল আর একটা দৃশ্য। চন্দ্রকিরণের স্থানে স্থানে উড়ে বেড়াচ্ছে যেন অনেকগুলো অতি-শুভ্র ধুলোর কণা এবং মণ্ডলাকারে উড়তে উড়তে জায়গায় জায়গায় তারা যেন পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল। দৃশ্যটা দেখতে আমার চোখে ভালই লাগল।

হঠাৎ উপত্যকার দিক থেকে একদল কুকুরের কেঁউ-কেঁউ করে আর্ত স্বরে কান্না জেগে উঠল এবং আমার দেহের ভিতর দিয়ে বয়ে গেল কেমন একটা চমৎকার শিহরণ। কুকুরের কান্না ক্রমশই জোরালো হয়ে উঠছে এবং সেই ধ্বনি-প্রতিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই চন্দ্রলোকে উত্তপ্ত ধুলিপুঞ্জগুলো যেন নূতন নূতন আকার গ্রহণ করতে লাগল। আমার মনে হল, কে যেন কোথা থেকে আমাকে ডাকছে, ডাকছে, আর ডাকছে! সেই অজানার ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য আমার কেমন একটা আগ্রহ হতে লাগল। কানে কানে ও প্রাণে প্রাণে শুনলুম ও অনুভব করলুম সে কী এক অদ্ভুত সম্মোহন-মন্ত্র।

শূন্যে ধূলিপুঞ্জের নৃত্য হয়ে উঠল দ্রুততর। তারা বেগে সঞ্চালিত হতে লাগল এপাশে-ওপাশে, উপরে ও নিচে। চন্দ্রালোকের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেল কিসের একটি কম্পন। তারপরে ক্রমে-ক্রমে সেই ধূলির পুঞ্জগুলো পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে কি রকম সব আকার লাভ করতে লাগল! তারপর দেখলুম যেন চাঁদের আলো দিয়ে তৈরি তিনটে নারীর মূর্তি। কাল রাত্রে যাদের আমি ও-ঘরের ভিতরে স্বচক্ষে দেখেছিলুম, তারা ছাড়া এরা আর কেউ নয়।

রাজা কাল বলেছিলেন, পরে তাদেরই হাতে আমাকে তিনি সমর্পণ করবেন। এরা কি আজ তারই জন্যে আমাকে আবার দাবি করতে এসেছে? সভয়ে তাড়াতাড়ি দুম-দাম শব্দে ঘরের জানলাগুলো বন্ধ করে দিলুম। আমার কাছে এই অন্ধকার ঘরই নিরাপদ, এখানে নেই বাইরের বিপদজনক চন্দ্রালোক! জানলা বন্ধ করে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলুম।

ঘণ্টা-দুই কেটে গেল। আমার ঘরের ঠিক উপরেই ছিল রাজা-বাহাদুরের শয়ন-গৃহ। মনে হল, সেইখানেই চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল যেন এক কিশোর কণ্ঠস্বর। তারপর হঠাৎ কণ্ঠ রুদ্ধ হলে যেমন হয়, তেমনিভাবেই থেমে গেল শিশুর সেই ক্রন্দন। আমার বুকের কাছটা ধড়-ফড় করতে লাগল। তাড়াতাড়ি উঠে ঘর থেকে বেরুতে গেলুম, কিন্তু ঘরের দরজা বাহির থেকে বন্ধ। হতাশভাবে নিজের বিছানায় এসে বসলুম। কী কর্তব্য, তাই চিন্তা করতে লাগলুম।

তারপরে বাড়ির বাইরে নিচের দিক থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আবার কেঁদে উঠল কোন্ এক নারীর কণ্ঠ। আবার উঠে ছুটে গিয়ে আমি তাড়াতাড়ি একটা জানলা খুলে দিলুম। মুখ বাড়িয়ে দেখি জানলার ঠিক নিচেই অঙ্গনের উপরে জানু পেতে বসে আছে উদ্‌ভ্রান্তের মত এক নারী-মূর্তি। তার এলানো চুলগুলো বিশৃঙ্খলভাবে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং দুই হাত দিয়ে এমনভাবে সে নিজের বুকখানাকে চেপে ধরেছে যে দেখলেই বোঝা যায়, অনেক দূর থেকে সে ছুটতে ছুটতে এখানে এসে পড়ে নিজের হাঁপ সামলাবার চেষ্টা করছে।

জানলায় আমার মুখ দেখে সে সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তারপর তীব্র স্বরে চিৎকার করে বললে, 'দে রাক্ষস, আমার খুকিকে ফিরিয়ে দে!'

সে আবার জানু পেতে বসল ও দুই হাত উর্ধ্বে তুলে এমনভাবে আবার সেই কথাগুলো উচ্চারণ করলে যে, নিদারুণ দুঃখে বুকটা যেন আমার ভেঙে গেল। তারপর কাঁদতে কাঁদতে কখনো সে মাটির

উপরে আছড়ে-পিছড়ে পড়তে ও কখনো তুই হাতে বুক চাপড়াতে ও কখনো নিজের মাথার চুলগুলো টেনে ছিঁড়ে ফেলতে লাগল। সে এক মর্মন্তুদ দৃশ্য !

বোধহয় উপরের ঘর থেকেই শুনতে পেলুম রাজার কর্কশ কণ্ঠস্বর। তিনি যা বলছিলেন, তার একটা বর্ণও বোঝা গেল না। কারণ সে যেন কতকগুলো অর্থহীন অদ্ভুত ধ্বনি ছাড়া আর কিছুই নয়। সঙ্গে-সঙ্গে এদিক ওদিক ও সুদূর থেকে আকাশ-বাতাসকে যেন বিষাক্ত করে তুললে দলে-দলে নেকড়ে বাঘের বুভুক্ষু গর্জনের পর গর্জন। রাজা কি তবে তাদেরই আহ্বান করেছেন ? মানুষের পক্ষে তুর্বোধ রাজার এই অর্থহীন ধ্বনির অর্থ কি তাহলে নেকড়েদের কাছে সুস্পষ্ট ? রাজা কি নেকড়েদের ভাষাও জানেন ? আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। মূর্তিমান ঝড়ের মত বেগে একদল নেকড়ে বাঘ রাজার অঙ্গনের ভিতরে এসে অভাগী নারীমূর্তিটার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নারীর কণ্ঠ থেকে আর কোন শব্দ শোনা গেল না, নেকড়েদেরও গর্জন হল স্তব্ধ। খানিক পরে তারা একে-একে লক্লকে জিভ দিয়ে নিজেদের মুখ চাটতে চাটতে অঙ্গনের ভিতর থেকে আবার বেরিয়ে গেল।

মনে মনে বললুম, মৃত্যুই শ্রেয়, অভাগীর মৃত্যুই শ্রেয় ! তার শিশুর কী পরিণাম হয়েছে, তা আমি জানি। এর পরও বেঁচে আর লাভ নেই।

কিন্তু আমি কী করব, আমি কী করতে পারি ? কেমন করে আমি এই ভয়াল রাজা এবং ভীষণ আতঙ্ক এবং অন্ধকার রাত্রির কবল থেকে নিস্তার লাভ করব ? ভাবতে ভাবতে শ্রান্ত হয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়লুম।

পরদিন আকাশের কোলে খেলা করছে আনন্দময়ী তরুণা উষা। রাত্রে যে আমার মতন যম-যন্ত্রণা ভোগ করে, তার কাছে ভোরের

আলো যে কতখানি মিষ্টি, ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেহই তা বুঝতে পারবে না। বিশালগড়ের উচ্চ তোরণের ঠিক উপরেই আকাশপথে দেখা দিলে গৌরবময় প্রভাতসূর্য। তাকে দেখেই আমার সমস্ত ভয় সর্বাঙ্গ থেকে খসে পড়ল বিষধরের খোলসের মত। এইবার আমাকে নামতে হবে কার্যক্ষেত্রে। যা কিছু করবার, দিনের আলো থাকতে থাকতেই সব শেষ করে ফেলতে হবে। উঠে দাঁড়ালুম। সামনের আনলাটার দিকে নজর গেল। সেটা একেবারেই খালি। সেখানে আমার যত জামা-কাপড় ও চাদর সাজানো ছিল, সমস্তই অদৃশ্য হয়েছে। তারপর ফিরে তাকিয়ে দেখি, আমার 'পোর্টম্যাণ্টো'টা পর্যন্ত আর ঘরের ভিতরে নেই।

এ কীর্তি যে রাজার, তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি এখন কী করব? আমি যে একেবারে রিক্ত! আমার পরনে আছে কেবল একখানা আধ-ময়লা কাপড় আর একটি মাত্র গেঞ্জি। আমার পায়ের তিনজোড়া জুতো পর্যন্ত খুঁজে পেলুম না। এমন বেশে, এমন নগ্নপদে আমি যে বাড়ির বাহিরে যেতে পারব না, নিশ্চয় তাই বুঝেই রাজা এই ব্যবস্থা করেছেন।

৯ রাজার দেহ

কিন্তু একটা বিষয় আমার কাছে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কেবল রাত্রিবেলাতেই আমি হই নামান আতঙ্কের দ্বারা আক্রান্ত। রাত্রেই আমার জন্যে যেন অপেক্ষা করে রকম-রকম বিপদ-আপদ। আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার এই, আজ পর্যন্ত দিনের বেলায় সূর্যাস্তের আগে একদিনও আমি রাজার দেখা পাইনি। এর হেতু কী? পৃথিবী যখন জাগে, উনি কি তখন ঘুমোন, আর পৃথিবী যখন ঘুমোয়, তখনই কি তিনি ওঠেন জেগে?

আজ সকালে দেখছি, আমার ঘরের দরজাটা বাহির থেকে আবার খুলে দেওয়া হয়েছে। খালি পায়ে আর প্রায় অর্ধনগ্ন দেহে আমি কে

এই বিশালগড় ছেড়ে পালাতে চেষ্টা করব না, এইটুকু আন্দাজ করেই রাজা বোধহয় নিশ্চিন্ত হয়েছেন আমার সম্বন্ধে।

কিন্তু এই বাড়ির ভিতরে চলাফেরায় আমার যখন বাধা নেই, তখন দিনের বেলায় এখানকার রহস্যের সমাধান করবার চেষ্টা করলে কেমন হয়? খুব সম্ভব সমস্ত রহস্যের মূল তথ্য খুঁজে পাওয়া যেতে পারে রাজার ওই তিনতালার শয়নগৃহে প্রবেশ করলে। কিন্তু কেমন করে সেখানে যাব? দেখছি সে-ঘরের দরজা সর্বদাই তালাবন্ধ থাকে।

হঠাৎ একটা কথা মনে হল। আচ্ছা, রাজা নিজের ঘরের গবাক্ষের ভিতর দিয়ে যেভাবে নিচে নেমে আসেন সেইভাবেই কি কেউ বাহির থেকে দেওয়াল বেয়ে উপরে উঠে তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকতে পারে না? আমি নিজের চোখে তাঁকে ওখান থেকে নামতে দেখেছি, চেষ্টা করলে আমিই বা কেন ঐ পথ দিয়ে উপরে উঠতে পারব না? অবশ্য পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। কিন্তু আসুক বিপদ, আমি এখন মরিয়া। এখানে আর কিছুদিন থাকলেও যখন বাঁচব না, তখন বাঁচবার চেষ্টা করেও যদি মরতে হয়, তবে সেটা হবে মন্দের ভাল। বেশ, দেখা যাক। ভগবান আমাকে সাহায্য করবেন।

জানলার কাছে গিয়ে হেঁট হয়ে দেখলুম, আমার ঘরের গবাক্ষের ঠিক নিচে দিয়ে বাড়ির এদিক আর ওদিকে চলে গিয়েছে দোতালার সুদীর্ঘ কার্নিশটা। সেকালকার বড়-বড় বাড়ির কার্নিশ এমন চওড়া হত যে একটু চেষ্টা করলেই তার উপর দিয়ে অনায়াসেই পদচালনা করতে পারা যেত। রাজার তিনতালার ঘর থেকে জীর্ণ দেওয়ালের যে ধার-বার-করা পাথরগুলো একতালা পর্যন্ত নেমে গিয়েছে, আমার এই গবাক্ষ থেকে দেওয়ালের সেই অংশটার দূরত্ব মাত্র কয়েক হাত। সুতরাং ওখানে গিয়ে পৌঁছতে আমাকে বিশেষ বেগ পেতে হবে না বলেই মনে করি।

গবাক্ষ দিয়ে বেরিয়ে কার্নিশের উপরে গিয়ে দাঁড়ালুম। বুকটা একবার কেঁপে উঠল, কারণ এই সেকেলে বাড়ির অতি পুরাতন কার্নিশ আমার ভারে যদি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে, তাহলে বিদায় আমার

পৃথিবী, বিদায় আমার বাঁচবার আশা !

নিচের দিকে তাকালুম না—হয়ত ভূমিতলের দূরত্ব দেখে মাথা ঘুরে যেতে পারে। দেওয়ালের সঙ্গে গা মিশিয়ে পায়ে পায়ে রাজার ঘরের নিচেকার এবড়ো-খেবড়ো পাথরগুলোর কাছে নিরাপদে গিয়ে পৌঁছলুম। তারপর দুই হাত আর দুই পায়ের সাহায্যে সেই ধার-বার-করা পাথরগুলো অবলম্বন করে সাবধানে ধীরে ধীরে উপর দিকে উঠতে লাগলুম।

এই তো সেই গবাক্ষ, যার ভিতর থেকে বেরিয়ে রাজা সেদিন নিচের দিকে নেমে গিয়েছিলেন। ঘরের ভিতরে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই বুকটা আমার দুরদুর্ করে উঠল। কিন্তু তারপর ভাল করে তাকিয়ে দেখে বুঝলুম, ঘরের ভিতরে জনপ্রাণী নেই। জানলার উপরে হাত চাপড়ে কয়েকবার শব্দ করলুম, ভিতর থেকে তবু কারুর সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। বিশেষ বিস্মিত হলুম। রাজা তাহলে দিনের বেলাতেও ঘরের বাইরে যান ? কিন্তু দিনের বেলায় তাঁর সঙ্গে আমার কোনদিন দেখা হয়নি কেন ? আমার সামনে আভির্ভূত হয়েছেন তিনি কেবল নিশাচর রূপেই।

কতকটা আশ্বস্ত হয়ে গবাক্ষ-পথ দিয়ে ঘরের ভিতরে গিয়ে নামলুম। গৃহতল মর্মর-মণ্ডিত বটে, কিন্তু ধুলোর প্রলেপে ও যত্নের অভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে মর্মরের তাজা শুভ্রতা। সেই প্রশস্ত ঘরের চারিদিকেই রয়েছে হরেক রকম আসবাব। প্রত্যেক আসবাবই অত্যন্ত গুরুভার ও বহুকাল আগেকার। এসব আসবাব যে ব্যবহৃত হয়, এমন কোন প্রমাণও পেলুম না।

এক জায়গায় রয়েছে মস্ত-বড় একটা সেকেলে টেবিল। তার উপরে স্তূপীকৃত হয়ে আছে অনেক রকম স্বর্ণমুদ্রা। সেই স্বর্ণ-স্তূপের উপরেও জমে উঠেছে প্রায় আধ ইঞ্চি পুরু ধুলোর স্তর। বোঝা গেল সেসব মুদ্রাও অনেক কাল স্পর্শ করা হয়নি। মুদ্রাগুলো পরীক্ষা করলুম। কোন মুদ্রারই বয়স তিনশো বছরের কম নয়। তাহলে কি বুঝতে হবে, এইসব স্বর্ণমুদ্রা তিন শতাব্দীর মধ্যে কোন মানুষের ব্যবহারে আসেনি ?

কেবল কি মুদ্রা ? মণিমুক্তাখচিত ভারি ভারি কতরকম জড়োয়া গহনা ! সেরকম গহনাও একালে কারুর দেহেই শোভা পায় না।

অবাক হয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। এ কী অদ্ভুত ঘর ! এখানে এসে দাঁড়ালে বর্তমানের আধুনিকতা যেন চোখের সুমুখ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং সুদূর অতীতের সমস্ত রহস্য যেন কার জাদুমন্ত্রে জীবন্ত হয়ে আবার আত্মপ্রকাশ করে !

শুনেছিলুম এটা নাকি রাজার শয়নগৃহ। কিন্তু তিনি শয়ন করেন কোথায় ? চারিদিকে তাকিয়েও কোন খাট-পালঙ্ক, এমনকি ঘরের মেঝেতে পাতা কোন শয্যা পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারলুম না। এটা শয়নগৃহ হলে মানতে হয়, এর মালিক শয়ন করেন ধূলিধূসর নগ্ন মেঝের উপরে। কিন্তু সেটাও সম্ভবপর বলে মনে হল না। দেখলুম ঘরের ভিতরে একদিকের দেওয়ালের গায়ে রয়েছে আর একটা দরজা। তার পাল্লা দুখানা বন্ধ ছিল বটে, কিন্তু ঠেলতেই খুলে গেল। আলো-আঁধারের মধ্যে দেখা গেল একটা সরু পথ। অগ্রসর হয়ে পথের শেষে দেখলুম, সঙ্কীর্ণ একসার সিঁড়ি ঘুরতে ঘুরতে নিচের দিকে নেমে নীরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে। সে-রকম অন্ধকারের মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে হল না। আবার ঘরের ভিতরে ফিরে এলুম। সেখানে খোঁজাখুঁজি করে একটা টেবিলের তলা থেকে বার করলুম সেকেলে এক বাতিদান, তার উপরে রয়েছে তিন ভাগের এক ভাগ পোড়া একটা বাতি। বাতির মুখে আলো জ্বেলে আবার সেই সরু পথটার ভিতর দিয়ে এগিয়ে সিঁড়িগুলোর কাছে গেলুম। তারপর খুব সাবধানে ধীরে ধীরে নামতে লাগলুম নিচের দিকে।

একটা জিনিস লক্ষ করলুম, সিঁড়ির প্রত্যেক ধাপেই জমে আছে যে কত যুগের পুরাতন ধুলো, আন্দাজে তা হিসাব করে বলা অসম্ভব। মনে হল, শতাব্দীর পরে এই সিঁড়িগুলোর উপরে সর্বপ্রথমে পড়ল আমার পদচিহ্ন। কারণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখেও ধুলার পটে পেলুম না আর কারুর পায়ের দাগ। ভাবতে লাগলুম, প্রাসাদের তিনতালায় রাজার শয়নগৃহের পাশে একসার সিঁড়ি থাকার সার্থকতা কী ? তবে

কি এর নিচে আছে সেকালকার চোরা কুঠরির মত কোন একটা জায়গা, —সমূহ বিপদের সময়ে যার ভিতরে আত্মগোপন করা যায় ?

ক্ষীণ দীপালোকের ধাক্কায় অন্ধকারের নিবিড়তাকে অল্প অল্প সরিয়ে নিচের দিকে যতই নেমে যাচ্ছি, মনের ভিতরে ততই প্রবল হয়ে উঠছে একটা রোমাঞ্চকর অপার্থিব ভয়। আমার আত্মা যেন অনুভব করতে লাগল, ইহলোকের দিকে পিছন ফিরে এগিয়ে চলেছে সে অলৌকিক এক রহস্যের অভিমুখে।

অবশেষে বাঁধানো সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেখানে গিয়ে দাঁড়ালুম সেখানে পায়ের তলায় পেলুম শীতল কাঁচা মাটি স্পর্শ। বোধহয় আমি আবার নেমে এসেছি বাড়ির একতালায়। সামনে আবার একটা গলি-পথ। সেখানে বদ্ধ হাওয়ায় জমে রয়েছে কেমন একটা ভীষণ দুর্গন্ধ। সে যেন কোন গলিত শবদেহের দুর্গন্ধ, তা সহ্য করা অসম্ভব। তাড়াতাড়ি নাকে কাপড় চাপা দিলুম, কিন্তু তবু তার কবল থেকে নিস্তার পেলুম না।

দ্বিগুণতর ভয়ে বুকের ভিতরে জাগল ঘন-ঘন কম্পন। আমি কোথায় যাচ্ছি, কিসের এই দুর্গন্ধ ? প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেলুম না বটে, তবু যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই পদচালনা করে গলিপথটার শেষে গিয়ে পেলুম আর-একটা অত্যন্ত নিচু ও সঙ্কীর্ণ ঘর। সেখানকার বাতাস পর্যন্ত যেন বিষাক্ত, প্রতি মুহূর্তে শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসে। সেখানকার অন্ধকার এমন পুঞ্জীভূত যে, ক্ষীণ দীপশিখাটাকে দেখাতে লাগল তার গায়ে একটা তুচ্ছ, রক্তহীন ও হলদে ক্ষতচিহ্নের মত। সেখানকার আনাচে-আনাচে দৃষ্টিহীন দৃষ্টি মেলে আমার পানে তাকিয়ে আছে যেন এমন সব অভাবিত বিভীষিকা, যে-কোন মুহূর্তে যারা সাক্ষাৎ মৃত্যুর মত দৃশ্যমান হয়ে এক ফুৎকারে নিবিয়ে দিতে পারে জীবন-প্রদীপের শিখা।

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এইসব বিসদৃশ চিন্তাকে মনের ভিতর থেকে তাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলুম। মনে মনে নিজের মনকে ডেকে নিজেই বলে উঠলুম—তুমি জাগ্রত হও, ভুলে যাও অন্য সব তুচ্ছ

ভাবনা। তুমি এসে পড়েছ এখন রহস্যের শেষ প্রান্তে। এখন আর ইতস্তত করলে চলবে না।

ভিজে স্যাঁৎসেঁতে দেওয়ালের গায়ে ছিল একটা কুলুঙ্গি। তার উপরেই রেখে দিলুম বাতিদানটা।

ঘরের কোনদিকেই কোন কিছুই নেই—কেবল মাঝখানে পড়ে আছে প্রকাণ্ড একটা কাঠের বাক্স। মেপে দেখলুম বাক্সটা লম্বায় পাঁচ হাত, চওড়ায় দুই হাত। খুব মজবুত পুরু কাঠ দিয়ে তৈরি সেই বাক্সটা, তার ডালাটা এত ভারি যে টেনে তুলতে যথেষ্ট শক্তির দরকার হয়।

কিন্তু ডালা তুলে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম বিদ্যুতাহতের মত। দুঃস্বপ্নেও এমন দৃশ্য দেখবার জন্যে প্রস্তুত ছিলুম না! কী ভয়ানক, কী ভয়ানক!

বাক্সের মধ্যে লম্বমান হয়ে শুয়ে রয়েছে রাজার দেহ। বুঝতে পারলুম না সে দেহ মৃত কি নিদ্রিত। কারণ, তার দুই চক্ষুই ছিল বটে উন্মুক্ত ও আড়ষ্ট, কিন্তু মৃতের চক্ষে থাকে যে-রকম অস্বাভাবিক ভাব, এখানে তার কোনই চিহ্ন নেই; মুখের বিবর্ণতার মধ্যেও ফুটে আছে যেন জীবনের তপ্ততা এবং ওষ্ঠাধরের আরক্ত আভাও মলিন হয়ে যায়নি কিছুমাত্র।

কিন্তু জ্যান্ত মানুষের বুক যেমন শ্বাসপ্রশ্বাসে ওঠে এবং নামে এই দেহে তার কোন চিহ্নই নেই। বক্ষস্থল একেবারে স্থির। আমি রাজার উপরে নত হয়ে পড়লুম। জীবনের একটুখানি ইঙ্গিত পাবার জন্যে অনেক চেষ্টা করলুম, কিন্তু বৃথা, বৃথা, বৃথা।

আচম্বিতে লক্ষ করলুম, রাজার সেই আড়ষ্ট মৃত চক্ষুর ভিতরেও ফুটে আছে একটা বিজাতীয় ঘৃণার ভাব। সে চক্ষুদুটো আমাকে যে দেখতে পাচ্ছে না এবং আমার সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ অচেতন. এটাও আমি বুঝতে পারলুম বটে, কিন্তু সেই মারাত্মক মরা দৃষ্টি আমার অন্তরাত্মার মধ্যে করতে লাগল আতঙ্কবৃষ্টি। সহ্য করতে পারলুম না, প্রাণপণে ছুটে সেখান থেকে আমি পালিয়ে এলুম—এমনকি, বাতিদানটাও তুলে নিয়ে আসবার অবসর পর্যন্ত পেলুম না।

সূর্য অস্তাচলে নেমে গিয়েছিল, কিন্তু তখনো আকাশের মেঘে মেঘে খেলা করছিল খানিকটা পরিত্যক্ত রক্তরাগ। আর একটু পরেই হবে তিমিরাবগুণ্ঠিতা সন্ধ্যার আগমন।

আজও আমি উপরের খোলা ছাদে একলা দাঁড়িয়ে ছিলুম। আমার বন্দী জীবনে এখানকার মুক্ত আলোক ও বাতাস ছাড়া আর কিছুই উপভোগ করবার উপায় নেই। তাই মাঝে মাঝে ছাদে না এসে থাকতে পারি না।

হঠাৎ দেখলুম রাজার ঘরের গবাক্ষের কাছে কী যেন একটা নড়ে নড়ে উঠছে। ভাল করে দেখেই আমার চোখ উঠল চমকে। এ যে একখানা ভয়ঙ্কর কালো মুখ! মানুষের মুখ নয়, কোন কুৎসিত জন্তুর মুখ। তার দুটো ছোট-ছোট চোখে কী বিষম তীব্রতা! মনে হল, জ্বলন্ত চক্ষে সেই মুখখানা তাকিয়ে আছে আমার পানে।

আলোক তখন অস্পষ্ট, ওটা যে কী জন্তু তা আন্দাজ করা গেল না। তারপর আমার দৃষ্টিকে অধিকতর বিস্মিত করে সেই জন্তুর সমস্ত দেহটা করলে আত্মপ্রকাশ। একটা মস্ত বড় বাদুড়। বাদুড় যে এমনভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে মানুষের ঘরে বসে থাকতে পারে, সে ধারণা আমার ছিল না। তারপরেই মনে হল, রাজা তো মানুষের দেহেও মানুষ নন। তাঁকে অমানুষ বললেও কোন অত্যুক্তি হয় না। এমন অমানুষের সঙ্গে যে বাদুড় ও পেচক প্রভৃতি অমঙ্গলকর জীব বাস করবে, তাতে আর সন্দেহ কী?

বাদুড়টা তখনো মুখ ফিরিয়ে আছে আমার দিকে। অমন করে ও আমাকে দেখছে কেন? আমাকে দেখে ওর তো লুকিয়ে পড়বার কথা। তাকে ভয় দেখাবার জন্যে আমি জোরে কয়েকবার হাততালি দিলুম। তার দুই ক্রুদ্ধ চক্ষে ঠিকরে পড়ল যেন আগুনের ফিনকি! তারপর সে হঠাৎ উঠে ছাদের প্রাচীরের উপরে এসে বসল এবং

আবার দীপ্ত চক্ষে তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে।

এ-রকম আশ্চর্য বাদুড় জীবনে কখনো দেখিনি। মানুষকেও ভয় করে না, উল্‌টে মানুষের কাছে এগিয়ে আসে এবং জ্বলন্ত চোখ পাকিয়ে চেষ্টা করে ভয় দেখাবার!

একবার ইচ্ছা হল ছুটে গিয়ে বাদুড়টার উপরে এক ঘুসি বসিয়ে দিই। কিন্তু তাও পারলুম না, কেমন ভয় হল। হয়ত রাজা যেমন মানুষ হয়েও মানুষ নন, এই বাদুড়ের পিছনেও তেমনি কোন রহস্য আছে। হয়ত এটাকে বাদুড়ের মতন দেখালেও বাদুড় নয়।

দূর থেকে তাকে ছুড়ে মারবার জন্যে ছাদের উপরে হেঁট হয়ে একখণ্ড ইষ্টক তুলে নিলুম। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাত তুলেই দেখি বাদুড়টা আর সেখানে নেই, দুদিকে দুখানা পাখনা বিছিয়ে দিয়ে সবেগে উড়ে যাচ্ছে সান্ধ্য আকাশের তলায় প্রকাণ্ড একটা অভিশপ্ত কালো প্রজাপতির মত।

অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে উঠেছে ধীরে, ধীরে, ধীরে। আর ছাদের উপরে থাকলে বিপদের সম্ভাবনা। এখনি এখানে এসে দেখা দিতে পারে সেই তিন পেত্নীর মূর্তি। তাদের কথা স্মরণ করেই বুক ধড়াস্ করে উঠল। তাড়াতাড়ি নিজের ঘরের ভিতরে পালিয়ে এলুম। তারপর বিছানার উপর শুয়ে পড়তেই অসময়ে চোখে এল ঘুম।

খানিক পরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি, আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে রাজা স্বয়ং। তাঁর মুখ এমন গম্ভীর যে দেখলেও ভয় হয়।

কিন্তু রাজা শোনালেন সুমিষ্ট এক আশ্বাস-বাণী। অত্যন্ত মধুর কণ্ঠে বললেন, 'বন্ধু, এখানে আজই আপনার শেষ রাত্রি। কালকেই আপনি কলকাতায় যাত্রা করতে পারবেন। আমি আজই আপনার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, কারণ আর একটু পরেই আমাকেও করতে হবে বিদেশ যাত্রা। বিশেষ এক গোপনীয় কারণে আমাকে বাইরে যেতে হচ্ছে, কিন্তু আপনার যাওয়ার জন্যে যা কিছু ব্যবস্থা তা আমি করে যাব।'

এই হানাবাড়িতে আমাকে একলা থাকতে হবে? এমন চিন্তাও

আমার পক্ষে ভয়াবহ। বললুম, 'আমিও তো আজকেই যেতে পারি?'

—'তা হয় না বিনয়বাবু। আমার কোচম্যান আজ এখানে নেই।'

—'কিন্তু যদি আপনি আদেশ দেন, তাহলে আমি পায়ে হেঁটেই এখান থেকে যাত্রা করতে পারি।'

রাজা হাসলেন একটুখানি শান্ত হাসি। আমার সন্দেহ হল, এই শান্ত হাসির পিছনে আছে নিশ্চয়ই কোন নূতন অশান্তি। তিনি বললেন, 'সঙ্গের জিনিস-পত্তর না নিয়েই আপনি চলে যেতে চান?'

—'চুলোয় যাক জিনিস-পত্তর! পরে সেগুলো নিয়ে যাবার জন্যে আমি লোক পাঠিয়ে দেব।'

অতিশয় ভদ্রের মত মাথা নাড়তে নাড়তে তিনি বললেন, 'বেশ, তাহলে আসুন, বন্ধু! আপনি যদি এখনি যেতে চান, আমি কোনই বাধা দেব না। আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি আপনাকে ধরে রাখতে ইচ্ছা করি না।'

মন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল বিপুল আনন্দে। কিন্তু মনের ভাব বাইরে গোপন করে রাজার পিছনে পিছনে আমি হলুম অগ্রসর। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে একেবারে সদর দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

রাজা দরজার পাল্লা দুখানা খুলে দিলেন—খানিকটা চাঁদের আলো দ্বারপথের ভিতরে এসে পড়ল। রাজা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'শুনুন।'

সঙ্গে সঙ্গে উর্ধ্বে তুললেন তাঁর দীর্ঘ একখানা বাহু এবং তাঁর বাহু উর্ধ্বোত্থিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার ত্রস্ত কর্ণে প্রবেশ করল একদল নেকড়ে বাঘের বীভৎস চিৎকার-ধ্বনি। তারপরেই সভয়ে দেখলুম, আঙিনা জুড়ে দরজার দিকে পালে পালে ছুটে আসছে নেকড়ের পর নেকড়ে! তাদের ক্রূর চক্ষু ও নির্দয় দাঁতগুলো ঝকঝক করে উঠছে চাঁদের আলোয়।

আমি বাড়ির ভিতর পালিয়ে আসবার চেষ্টা করতেই রাজা বজ্র-মুষ্টিতে ডান হাতটা চেপে ধরলেন। আমি তাঁকে বাধা দেবার চেষ্টা করলুম না, কারণ চেষ্টা করলেও আমি সফল হতুম না—আগেই পেয়েছি ঐ বাহুর শক্তির পরিচয়। নাচার হয়ে তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে

রইলুম।

হঠাৎ মনে হল একটা ভয়ানক কথা। নেকড়েগুলো তখন আমাদের খুব কাছেই এসে পড়েছে। দুরাত্মা রাজা কি এই নেকড়েদের কবলেই আমাকে সমর্পণ করতে চান? তাড়াতাড়ি চেঁচিয়ে বলে উঠলুম, 'দরজা বন্ধ করুন, আজ আমি এখান থেকে যেতে চাই না।'

নির্বাক মুখে সশব্দে রাজা দরজার পাল্লাদুটো আবার বন্ধ করে দিলেন। এবং নির্বাক মুখেই দুজনে আবার দোতালার ঘরে এসে দাঁড়ালুম। তারপর মৌন-ব্রত ভঙ্গ না করেই রাজা আবার ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ঘরের দরজাটা ভিতর থেকে আমি বন্ধ করে দিলুম।

অল্পক্ষণ পরে খাওয়া-দাওয়া সেরে আমি যখন শোবার চেষ্টা করছি, তখন হঠাৎ আমার ঘরের দরজার ওপাশে শুনতে পেলুম কাদের কণ্ঠস্বর। ফিস্-ফিস্ করে কারা কথা কইছে। দরজার উপরে কান পেতে দাঁড়িয়ে রইলুম।

রাজা বলছেন, 'বিদেয় হ, বিদেয় হ! নিজের জায়গায় চলে যা! এখনো তোদের সময় আসেনি। সবুর কর্! ধৈর্য্য ধর্! আজকের রাত হচ্ছে আমার। কাল আসবে তোদের রাত।'

তারপরেই শুনতে পেলুম নিম্ন অথচ মিষ্ট মেয়ে-গলায় খিলখিল করে হাসির রোল।

দুর্জয় ক্রোধে স্থান-কাল-পাত্র সব ভুলে গেলুম। সশব্দে দরজাটা খুলে ফেলে দেখলুম, সেই তিনটে প্রেতিনী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের নিজের জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে। আমাকে দেখেই তারা খলখল অট্টহাস্য করে উঠে দ্রুতপদে সেখান থেকে অদৃশ্য হল।

দাঁড়িয়ে রইলুম পাথরের পুতুলের মত। আজ নয়, কাল? আমার অন্তিম কাল কি এতখানি ঘনিয়ে এসেছে? আজ নয়, কাল—আজ নয়, কাল! ভগবান, ভগবান, ভগবান!

সকাল হবার আগেই আমার ঘুম গেল ভেঙে। আজ আমার মৃত্যুর দিন। কিন্তু মৃত্যু যদি আসে আমি অপ্রস্তুত অবস্থায় আত্মদান করব না।

দূর থেকে একটা মোরগ ডেকে উঠে পৃথিবীকে জানিয়ে দিলে, আবার এসেছে নতুন প্রভাত।

মৃত্যুকে আসন্ন জেনেও মন হল প্রসন্ন। বুঝলুম, রাত্রি যখন বিদায় নিয়েছে, তার বিভীষিকাগুলো এখন আর আমাকে ভয় দেখাতে আসবে না। আকাশে যতক্ষণ সূর্য আছে, আমিও ততক্ষণ নিরাপদ। কিন্তু এই দিনের আলো থাকতে থাকতেই আজ আমাকে প্রাণপণে বাঁচবার চেষ্টা করতে হবে।

প্রথমেই মনে জাগল একটা দুর্দমনীয় ইচ্ছা। রাজা কোথায় আছেন আমি জানি, আমি আর একবার তাঁকে দেখতে চাই।

প্রথম দিন যে উপায়ে রাজার ঘরে ঢুকেছিলুম, সেদিনও তাই করলুম। ভাবলুম, রাজা যদি জেগে থাকেন, তাহলে নিশ্চয় এই মুহূর্তেই আমাকে হত্যা করবেন। কিন্তু আজই যখন আমাকে মরতে হবে, তখন আর মৃত্যুকে ভয় করে লাভ কী? এদিকে ওদিকে তাকিয়ে দেখলুম। না, আজও রাজা ঘরে নেই।

সেদিনও বাতিটা নিয়ে ঘরের ভিতরকার দরজা দিয়ে আবার সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলুম। হঠাৎ মনে পড়ল, এই বাতিদানটা সেদিন আমি ফেলে এসেছিলুম নিচেকার ঘরের কুলুঙ্গিতে। কিন্তু বাতিদানটা আবার উপরে নিয়ে এল কে? নিশ্চয়ই রাজা নিজেই। তাহলে তাঁর কাছে প্রকাশ হয়ে গেছে আমার সব কীর্তি? বুঝেছি, এইজন্যেই হয়েছে আমার উপরে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ। রাজার গুপ্ত কথা যখন

জেনে ফেলেছি, তখন আর আমার রেহাই নেই। উত্তম! তাহলে আমিও আজ রাজাকে একবার ভাল করে দেখে নিতে চাই!

সেই স্যাঁতসেঁতে ভীষণ অন্ধকার গৃহ, সেই অসহনীয় গলিত শবের দুর্গন্ধ। সেই প্রকাণ্ড বাক্সটা আবার পড়ে আছে আমার চোখের সুমুখে।

দুই হাতে টেনে ভারি ডালাটা খুলে ফেললুম। তারপর এমন কিছু দেখলুম যে, আমার আত্মা পর্যন্ত পরিপূর্ণ হয়ে উঠল কল্পনাতীত এক আতঙ্কে।

তেমনিভাবেই চিত হয়ে বাক্সের ভিতরে রাজা শুয়ে আছেন, কিন্তু রাজার জরাগ্রস্ত দেহের ভিতরে আবার ফিরে এসেছে যেন যৌবনের তারুণ্য। মাথার সেই ধবধবে সাদা চুলগুলো পর্যন্ত আবার কালো হয়ে উঠেছে। তাঁর দুই গণ্ড ছিল কোটরগত, এখন হয়েছে পুরন্ত। সারা মুখখানার উপরে ফুটে উঠেছে গোলাপি আভা। কিন্তু রাজার ওষ্ঠাধরের দুই পার্শ্ব দিয়ে বেরিয়ে এসেছে ও কিসের চিহ্ন? রক্ত, রক্ত? হ্যাঁ, রাজার ঠোঁটের দুই পাশ দিয়ে রক্তধারা গড়িয়ে তাঁর চিবুক ও কণ্ঠদেশ পর্যন্ত করে দিয়েছে চিহ্নিত। এমনকি, তাঁর সেই বীভৎস চোখদুটোও হয়ে উঠেছে যেন নবজীবনের উচ্ছ্বাসে জীবন্ত। বোধ হল, এই ভয়াবহ জীবটা কার রক্ত পান করে দেহের ভিতরে আবার সঞ্চয় করেছে নবযৌবনের শক্তি ও স্বাস্থ্য।

বুকটা আমার শিউরে শিউরে উঠতে লাগল, কিন্তু সমস্ত অন্তরাত্মা হয়ে উঠল বিদ্রোহী। ভাল করে একবার রাজার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করলুম। মনে হল, আমাকে দেখে সে মুখ যেন হাসছে বিদ্রূপ-হাস্য। সেই হাসি দেখে রাগে আমি যেন পাগলের মত হয়ে উঠলুম। এই অমানুষিক মানুষ পৃথিবীতে প্রতিদিন করছে নরহত্যার পর নরহত্যা এবং এখনো হয়ত করবে আরও কত নির্দোষ প্রাণীকে হত্যা। এ যখন কলকাতাতেও যেতে চায়, তখন বোধ হচ্ছে সেখানে গিয়েও দিনের পর দিন দেবে আরও কত নরবলি। আর এই পিশাচকেই কলকাতায় নিয়ে যাবার জন্যে সাহায্য করতে আজ আমি এখানে এসে উপস্থিত

হয়েছি! এই মূর্ত মহাপাপ কলকাতায় গিয়ে যদি হাজির হয়, তবে তার সমস্ত অপরাধের জন্যে দায়ী হতে হবে আমাকেই। না, আমি ওকে কিছুতেই সে সুযোগ দেব না!

ঘরের এদিকে ওদিকে তাকিয়ে দেখলুম, মেঝের উপরে পড়ে রয়েছে একটা ভারি শাবল। আমি তখনই শাবলটা নিয়ে মাথার উপরে তুলে ধরলুম, তারপর মূর্তিটাকে লক্ষ করে আঘাত করলুম সবলে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই রাজার মুখখানা হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বিজাতীয় চক্ষু দিয়ে করলে যেন অগ্নিশিখা বর্ষণ। আমার দেহ হয়ে গেল পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত আড়ষ্ট এবং হাতের শাবলটা লক্ষ্যচ্যুত হয়ে রাজার কপালের উপর দিয়ে চলে গিয়ে কেবল একটা গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করলে। শাবলটা আবার যখন টেনে তুলতে গেলুম, তখন তার ধাক্কা লেগে বাক্সের ডালাটা আবার পড়ে গেল সশব্দে। সে ডালাটা আর আমার খোলবার ইচ্ছা হল না। জীবন্ত মৃতদেহের যে দৃশ্য দেখলুম, আমার পক্ষে হল তাই-ই যথেষ্ট।

ভাবতে আর ভাবতে আর ভাবতে লাগলুম, অতঃপর আমার কর্তব্য কী? যেমন করেই হোক, আজ দিনের বেলাতেই এখান থেকে পালাতে না পারলে আমার পক্ষে আজকের রাত্রিই হবে শেষের রাত্রি।

বাড়ির উপরতালা থেকে একতালায় নামবার উপায় তো আমার হাতেই রয়েছে। দেওয়ালের গায়ে যে-পথটা বাড়ি থেকে বেরুবার জন্যে রাজা নিজে ব্যবহার করতেন, যদিও তাকে কুপথ বা বিপথ ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না, তবু সেই পথই আজ আমাকে বাড়ির ভিতর থেকে বাইরে নিয়ে যাবে। কারণ, রাজার মতন আমিও জানি ঐ পথটা কেমন করে ব্যবহার করতে হয়।

কিন্তু কেবল বাড়ির বাইরে গেলেই তো চলবে না, বাইরের অঙ্গনের পরেই আছে বিশালগড়ের অত্যন্ত উচ্চ প্রাচীর। সেই দুরারোহ প্রাচীর পার না হতে পারলে বাড়ির বাইরে গিয়ে কোনই লাভ নেই।

প্রাঙ্গণের ভিতরে কাল রাত্রে দেখেছি রাজার পোষ-মানা সেই নেকড়ে-বাঘগুলোকে। হয়ত আজ দিনের বেলায় তারা এখানে পাহারা দিচ্ছে না। খুব সম্ভব ঐ নেকড়েগুলোও হচ্ছে রাজার মত নিশাচর, দিনের আলোয় আসতে ভয় পায়।

কিন্তু প্রাচীর পার হই কেমন করে—প্রাচীর পার হই কেমন করে! মনে মনে এই কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ির তেতালায় গিয়ে উঠলুম। সেখানে সেই যে ধুলো-জঞ্জাল-আবর্জনাভরা ছোট ছোট ছুখানা কামরা দেখেছিলুম, সে-ছুটোর দরজা তালা দিয়ে বন্ধ থাকে না; হঠাৎ মনে পড়ল তারই একখানার ভিতরে দেখেছিলুম অনেকগুলো নারিকেল-দড়ি। আজও আবার সেই ঘরে ঢুকে দেখলুম, দড়ির গোছা যথাস্থানে সেইভাবেই পড়ে রয়েছে। সেই দড়িগুলো নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে পাকিয়ে ও যুক্ত করে সুদীর্ঘ একগাছা কাছি তৈরি করে ফেললুম। তারপর আবার নিচে নেমে এলুম।

ঘরের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রাঙ্গণ ও প্রাচীরের এধার ওধার পর্যন্ত লক্ষ করে দেখতে লাগলুম। কারণ কাছি ঝুলিয়ে আমি প্রাচীরের বাইরের দিকে নেমে যেতে পারি বটে, কিন্তু ভিতরের দিক থেকে প্রাচীরের উপরে আরোহণ করব কী উপায়ে?

ভগবানের আশীর্বাদে তারও উপায় আবিষ্কার করে ফেললুম। অঙ্গনের ভিতরে প্রায় প্রাচীর ঘেঁসেই দাঁড়িয়ে রয়েছে সুউচ্চ ও প্রকাণ্ড একটা বৃক্ষ এবং তারই কতকগুলো মোটা মোটা ডাল প্রাচীরের উপর দিয়ে বাইরে গিয়ে পড়েছে। ঐ গাছই হবে এখন আমার অবলম্বন।

এর পরের কথা আর বিস্তৃতভাবে বলবার দরকার নেই। মিনিট কয়েকের মধ্যেই বাড়ির বাইরে অঙ্গনের ভিতরে গিয়ে পড়লুম। কোথায়ও জনপ্রাণীর সাড়া নেই, কেউ আমাকে বাধা দিতে এল না। গাছে উঠে ডাল ধরে প্রাচীরের উপরে গিয়ে দাঁড়ালুম। তারপর প্রাচীরের উপর দিয়ে বেরিয়ে-পড়া একটা ডালে কাছিগাছা বেঁধে ঝুলে পড়লুম দুর্গা বলে। পুনর্বার ভূমিষ্ঠ হতে বেশিক্ষণ লাগল না।

আবার আমি স্বাধীন! নরকের ভিতর থেকে আমি ধরিত্রীর শ্যাম কোলে ফিরে এসেছি! নরকের দূতরা আর আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না!

শরীরী প্রেত—শরীরী প্রেত! তার কথা জীবনে কোনদিন শুনিনি, কিন্তু এখানে এসে তাকে দেখেছি স্বচক্ষে। তার কথা আর অবিশ্বাস করতে পারব না।

খুব সম্ভব এর পর এই শরীরী প্রেতের কর্মক্ষেত্র হবে কলকাতার মুক্ত জনতার মধ্যে। শরীরী প্রেতকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিলুম, পারিনি। কিন্তু তার অমানুষিক কবল থেকে কলকাতাকে রক্ষা করতে হবে,—রক্ষা করতে হবেই! এখন আমার সামনে রইল কেবল এই কর্তব্য।

খালি পা। দেহে আছে খালি ময়লা গেঞ্জি ও কাপড়। এই বেশে আমার এই ছন্নছাড়া চেহারা দেখলে কেউ হয়ত আমাকে ভদ্রলোক বলে স্বীকার করবে না। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। এখন যে-কোন উপায়ে একবার কলকাতায় গিয়ে পৌঁছতে পারলে হয়।

পথ-খরচের জন্যে ভাবি না। পথ-খরচের জন্যে যে টাকার দরকার হবে, এটা আমি ভুলিনি। তাই বাড়ির বাইরে আসবার আগে রাজার ঘরের সেই টেবিলের উপর থেকে আমি দুইমুঠো সোনার মোহর পর্যন্ত সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।

(বিনয়ের ডায়েরি আপাতত এইখানেই শেষ হল)

১ কলকাতায় 'ভ্যাম্পায়ার'

অবিনাশবাবু একজন রীতিমত মজলিসি লোক। কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের উপরে ছিল তাঁর বসতবাড়িখানি। সেইখানে রোজ সন্ধ্যায় তাঁর বৈঠকখানায় হত নানা শ্রেণীর লোকের আগমন। এবং রোজই সেখানে তপ্ত পিয়ালার গরম চায়ের ধোঁয়ার সঙ্গে মিশত সিগার সিগারেট বা গড়গড়ার ঘূর্ণায়মান ধূম্ররাশি। তার উপরে প্রতিদিন যে যৎকিঞ্চিৎ জলখাবারের ব্যবস্থা হত না, অবিনাশবাবু সম্বন্ধে এমন অভিযোগও করা যায় না।

অবিনাশবাবু পঞ্চাশের ওপারে গিয়ে পড়েছেন। অর্থাৎ তাঁকে বৃদ্ধ বললেও তিনি আপত্তি করতে পারবেন না—যদিও তাঁর মাথার চুল ও ঠোঁটের উপরকার গোঁফজোড়াটি এখনো পক্কতার উপরে দাবি করতে পারে না। তাঁর দেহ এখনো আছে দস্তুরমত কর্মঠ ও বলিষ্ঠ। তাঁর পিতা পরলোকে যাবার সময় ইহলোকে এমন কিছু রেখে গিয়েছেন যার মহিমায় অবিনাশবাবুকে কোনদিনই ভাবতে হয়নি ভাত-কাপড়ের দুর্ভাবনা। সংসারের ভাবনাকেও জলাঞ্জলি দিতে পেরেছেন, কারণ আজ পর্যন্ত তিনি সুদূরে পরিহার করে এসেছেন বিবাহ নামক সুপ্রসিদ্ধ উপদ্রবটা। বিয়ের পর রাঙা বউ আসা ব্যাপারটা নিতান্ত মন্দ নয়, তবে ঐ পর্যন্ত। তারপর আসতে শুরু করে যখন 'পুত্রকন্যার প্রবল বন্যা,' ব্যাপারটা তখন গুরুতর হয়ে ওঠবার উপক্রম করে। তারপরে সেই সূত্রে আসে যে কতরকম বিপদ, বিভ্রাট ও বিভীষিকা, এখানে তার তালিকা দাখিল করবার দরকার নেই। অতএব আপনারা খালি এইটুকুই জেনে খুশি থাকুন, অবিনাশবাবুর গৃহস্থালিতে তিনি নিজেই হচ্ছেন এক এবং অদ্বিতীয়।

কিন্তু তাঁর বৈঠকখানায় রোজ যে নিয়মিত আসরটি বসে, তার প্রতি তাঁর অনুরাগের সীমা নেই। এই আসরের মাঝখানটিতে বসতে

পারলেই তিনি ছাড়তে পারেন আরামের নিশ্বাস। প্রায় মধ্যরাত্রি পর্যন্ত রোজই সেখানে চলে তাস-দাবা-পাশা খেলা এবং গোটা দুনিয়াকে নিয়ে উত্তপ্ত বা অল্পতপ্ত বা অতি শান্ত আলোচনা। সন্ধ্যা ও প্রথম রাত্রিটা এইভাবে না কাটালে তাঁর উপরে দয়া করতেন না নিদ্রাদেবী।

অবিনাশবাবুর আর একটি শখ হচ্ছে প্রেততত্ত্ব নিয়ে গবেষণা। এ-বিষয় নিয়ে হাতে-নাতে পরীক্ষা করে নানা পত্র-পত্রিকায় তিনি প্রকাশ করেছেন অসংখ্য প্রবন্ধ। বাংলায় ও বাংলার বাইরেও প্রথম শ্রেণীর প্রেততত্ত্ববিদ বলে অবিনাশবাবুর খ্যাতি বিশেষভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। এ সম্বন্ধে কারুর কোন জিজ্ঞাসা থাকলেই জবাব খোঁজবার জন্যে তিনি হতেন অবিনাশবাবুর দ্বারস্থ। এই জিজ্ঞাসুদের জন্যে অবিনাশবাবু প্রতিদিনই অনেকটা সময় ব্যয় করতে বাধ্য হন।

সেদিন সকালবেলা বৈঠকখানায় প্রবেশ করে অবিনাশবাবু দেখলেন তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছেন একটি যুবক। মানুষটির মনের ভিতরে যে বিশেষ এক উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছে, মুখ দেখলে সে কথা বুঝতে বিলম্ব হয় না।

অবিনাশবাবু নিজের নির্দিষ্ট আসনখানি গ্রহণ করে জিজ্ঞাসু চোখে যুবকের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

যুবক শুধোলে, 'মহাশয়ের নাম কি অবিনাশবাবু?'

অবিনাশবাবু নীরবে ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন।

—'একটি গুরুতর কারণে আমি আপনার কাছে এসেছি।'

—'কারণটি কী?'

—'কারণ বলার আগে এই খবরের কাগজের একটা জায়গা আপনাকে পড়ে শোনাতে পারি?'

—'অনায়াসেই।'

যুবক একখানি খবরের কাগজ বার করে পাঠ করতে লাগল:

'কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে কয়েকটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছে। প্রত্যেকটি ঘটনা কেবল রহস্যময়ই নহে, উপরন্তু রীতিমত বিপদজনক।

এমনকি, সাঙ্ঘাতিক!

'গত একমাসের মধ্যে ওখানে একই কারণে সাতজন লোক মারা পড়িয়াছে। ভারতের প্রধান নগর কলিকাতায় মাত্র সাতজনের মৃত্যুকে উল্লেখযোগ্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না, প্রতি মিনিটেই সেখানে হয়ত একাধিক ব্যক্তি করিতেছে মৃত্যুর কবলে আত্মসমর্পণ। তথাপি এই সাতজন লোকের মৃত্যু লইয়া কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে যে অত্যন্ত বিভীষিকার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার বিশেষ কারণের অভাব নাই।

'কারণগুলি এই ঃ

'পরে-পরে এই সাতজন লোকেরই মৃত্যু হইয়াছে শয্যায় শায়িত অবস্থায়, নিদ্রার সময়ে।

'প্রত্যেক লোকটিরই স্বাস্থ্য ছিল ভাল এবং কোন পীড়ায় তাহাদের মৃত্যু ঘটে নাই। যদিও হত ব্যক্তিদের প্রত্যেকের কণ্ঠদেশে পাওয়া গিয়াছে অতি ক্ষুদ্র চিহ্ন, তবু কোন হত্যাকারীর কবলে পড়িয়া যে তাহাদের মৃত্যু হইয়াছে, এমন সন্দেহ প্রকাশ করিবার উপায় নাই। কারণ, প্রতি ক্ষেত্রেই মৃত ব্যক্তিরা ছিল রুদ্ধদ্বার গৃহের মধ্যে। প্রতি ঘটনাস্থলেই বাহিরের কোন লোকের প্রবেশ ও প্রস্থানের কিছুমাত্র চিহ্ন পাওয়া যায় নাই। কোন মৃত ব্যক্তিরই এমন শত্রু ছিল না, যে তাহাকে হত্যা করিতে পারে। কাহারও ঘর হইতে কোন মূল্যবান দ্রব্যও অদৃশ্য হয় নাই।

'অথচ প্রত্যেকেই মারা পড়িয়াছে একই অস্বাভাবিক কারণে। ডাক্তারি পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে, প্রত্যেকেরই মৃত্যুর কারণ রক্তহীনতা। মৃত ব্যক্তিদের কাহারও রক্তহীনতা ব্যাধি ছিল না, অথচ কোন মৃত ব্যক্তিরই দেহের মধ্যে পাওয়া যায় নাই একবিন্দু রক্তের অস্তিত্ব। রক্তহীনতা ব্যাধিতে মৃত্যু ঘটিলেও মানুষের দেহের এমন অবস্থা ঘটে না। দেখিলে মনে হয়, তাহাদের দেহের ভিতর হইতে সমস্ত রক্ত যেন নিঃশেষে শোষণ করিয়া লওয়া হইয়াছে। এক মাসের মধ্যে উপর-উপরি সাত-সাতজন লোকের একই কারণে এমনভাবে মৃত্যু হওয়াতে শহরের উত্তরাঞ্চলে এক ভয়াবহ উত্তেজনার

সৃষ্টি হইয়াছে।

'কাহারও কাহারও ধারণা, এ একরকম নূতন রহস্যময় ব্যাধি, হয়ত অবিলম্বে সাবধান না হইলে এই বিশেষ ব্যাধি মড়কের আকারে আত্মপ্রকাশ করিবে।

'কেহ-কেহ এই ঘটনাগুলিকে ভৌতিক ব্যাপার বলিয়া সন্দেহ করিতেছে। কিন্তু পুলিশ বিপদে পড়িয়াছে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিরই কণ্ঠের উপরকার সেই ক্ষুদ্র ক্ষতচিহ্ন লইয়া। মৃত্যুর আগে তাহাদের কাহারও কণ্ঠে যে ও-রকম ক্ষতচিহ্ন ছিল না, তাহারও নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ঐ সব ক্ষতচিহ্নের জন্য দায়ী কে? এটুকুও বুঝা গিয়েছে, অত ছোট ক্ষতের জন্য কোন মানুষের মৃত্যু হইতে পারে না। কিন্তু ঐ লোকগুলির মৃত্যুর সঙ্গে যে ঐ-সব ক্ষতের বিশেষ একটি সম্পর্ক আছে, সে বিষয়েও কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

'কোন-কোন লোক আর-এক মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, এইসব মৃত্যুর জন্য দায়ী হইতেছে 'Vampire Bat' বা পিশাচ-বাদুড়। এই জাতীয় বাদুড়দের স্বভাব, নিদ্রিত জীবজন্তুদের রক্ত শোষণ করা।

'তাঁহাদের মতের বিরুদ্ধে কেহ-কেহ যুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, পিশাচ-বাদুড়ের স্বদেশ হইতেছে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা। ও-শ্রেণীর বাদুড় পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। উত্তরে প্রথম দল বলিতেছেন, পিশাচ-বাদুড়রা যে কেবলমাত্র আমেরিকাতেই বাস করে, একথা তাঁহাদেরও কাছে অবিদিত নাই। কিন্তু দৈবগতিকে ঐ জাতীয় দু-একটা বাদুড় যে ভারতবর্ষে আসিয়া পড়িতে পারে না, এমন কথাও জোর করিয়া বলা যায় না। হয়ত আমেরিকা হইতে আগত কোন জাহাজের সঙ্গে সকলের অজ্ঞাতসারেই তাহারা কলিকাতায় আসিয়া পড়িয়াছে।

'এ সম্বন্ধে কাহার কথা সত্য ও কাহার কথা মিথ্যা, তাহা নিরূপণ করিবার উপায় নাই। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারই যে অত্যন্ত রহস্যময় ও বিপদজনক, সকলকেই সে কথা স্বীকার করিতে হইবে।'

পড়া সাঙ্গ করে যুবকটি বললে, 'এ-সম্বন্ধে আপনার মত কী?'

অবিনাশবাবু বললেন, 'আমার কোন মতামত নেই। আপনি পড়লেন, আমি শুনলুম—এইমাত্র।'

—'লোকগুলি এমনভাবে যে মারা পড়ল, তার কি কোন বিশেষ কারণ থাকতে পারে না?'

'—কারণ তো অনেকেই দেখিয়েছে, আমি আর নতুন কী কারণ দেখাতে পারি?'

—'আজ্ঞে, আপনি তাই পারেন বলেই আমি আপনার কাছে এসেছি।'

—'কী রকম? আমি গোয়েন্দাও নই, ডাক্তারও নই; মৃত্যুর বা হত্যার রহস্য নিয়ে কোনদিনই কারবার করিনি।'

—'কিন্তু আপনি হচ্ছেন বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেততত্ত্ববিদ।'

অবিনাশবাবুর দৃষ্টি সচকিত হয়ে উঠল। চেয়ারের উপরে সোজা হয়ে বসে যুবকের মুখের উপরে ভাল করে তিনি একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'আপনার নাম কী?'

—'শ্রীবিনয়ভূষণ ভৌমিক।'

—'কী করেন?'

—'আমাকে আইন-ব্যবসায়ী বলে মনে করতে পারেন।'

—'আমি প্রেততত্ত্ববিদ বলেই কি আপনি আমার কাছে এসেছেন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'আপনি কি মনে করেন, খবরের কাগজের ঐ রহস্যময় ঘটনাগুলোর সঙ্গে প্রেততত্ত্বের কোন সম্বন্ধ আছে?'

—আজ্ঞে, তা না মনে করলে আপনার কাছে আসব কেন?'

—'আপনার এ-রকম সন্দেহের কোন কারণ বুঝলুম না।'

বিনয় সে-প্রশ্নের জবাব না দিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, '"Vampire" কাকে বলে?'

—'সার্বিয়ান ভাষার "Vampir" শব্দ থেকে ইংরেজি এই Vampire" কথাটির জন্ম। সার্বিয়ানদের বিশ্বাস, কোন দানব বা

সন্তোমৃত লোকের প্রেতাত্মা অন্য কোন মানুষের মৃতদেহের মধ্যে প্রবেশ করে জীবন্ত জীবদের রক্ত শোষণ করে বেড়ায়। বাংলায় "Vampire" কে আমরা "পিশাচ" বলে ডাকতে পারি।'

'—আচ্ছা অবিনাশবাবু, পৃথিবীতে পিশাচ আছে, এটা কি আপনি বিশ্বাস করেন?'

—'করি।'

—'আপনি কখনো পিশাচ দেখেছেন?'

—'স্বচক্ষে দেখিনি, কিন্তু তার অস্তিত্বের অনেক প্রমাণ পেয়েছি।'

—'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কলকাতাতেও এক দুর্দান্ত পিশাচের আবির্ভাব হয়েছে। ঐ সাতজন লোকের মৃত্যু তারই কীর্তি।'

অবিনাশবাবু বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, 'কোনরকম প্রমাণ না পেয়েই আপনি এই আশ্চর্য সিদ্ধান্তে এসে উপস্থিত হয়েছেন?'

—'না অবিনাশবাবু, তা নয়। আমার কাছে যথেষ্ট প্রমাণ আছে।'

—'যথা?'

—'ঠিক ওভাবে আমি কোন প্রমাণ দেখাতে চাই না। আপনার কাছে একটি কাহিনী বলতে চাই, আর সে-কাহিনীর নায়ক হচ্ছি আমিই। আপনি কি দয়া করে সে কাহিনীটি শুনবেন?'

বিনয়ের মুখের উপরে আর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে অবিনাশবাবু বললেন, 'বেশ, আমার কোন আপত্তি নেই।'

তারপর বিনয় একে-একে যে ঘটনাগুলোর উল্লেখ করলে সে সব কথা তার ডায়রি পাঠ করে আগেই আমরা জানতে পেরেছি।

গম্ভীর মুখে খুব মন দিয়ে অবিনাশবাবু কাহিনীর সমস্তটা শ্রবণ করলেন। খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন, তারপর ধীরে ধীরে, যেন নিজের মনে মৃদু স্বরে বললেন, 'এ-রকম আশ্চর্য কাহিনী আর কখনো আমি শুনিনি। বিনয়বাবু, আপনি যা বললেন তা শ্রবণ করে আমার মনে কয়েকটা প্রশ্ন জাগছে।'

—কি-কি প্রশ্ন?'

—'আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের সেই ভাঙা

বাগানবাড়িটা রাজা রুদ্রপ্রতাপ সিংহ কি এরই মধ্যে কিনে নিয়েছেন ?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'রাজা কি বাড়িখানা কেনবার জন্যে নিজেই কলকাতায় এসেছিলেন ?'

—'না। তিনি একজন প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন।'

—'রাজা কলকাতায় এসেছেন বলে আপনারা কি কোন খবর পেয়েছেন ?'

—'না।'

—'ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের বাগানবাড়িতে এখন কোন লোক বাস করে কি ?'

—'একদিন আমি বাড়িখানা দেখতে গিয়েছিলুম। বাড়ির দরজায় তালাবন্ধ ছিল। কিন্তু বাগানের কোণে যেখানে মালীদের ঘর আছে সেখানে এসে আড্ডা গেড়েছে একদল বেদে জাতের লোক। তাদের জিজ্ঞাসা করে জানলুম, রাজা এখনো কলকাতায় আসেননি। কিন্তু রাজা না এলেও ঐ বেদেগুলো যে রাজারই আশ্রিত লোক, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। রাজার বিশালগড়েও আমি অনেক বেদে দেখেছি।'

—'কলকাতায় এই যে রক্তহীনতার জন্যে সাতজন লোকের মৃত্যু হয়েছে, আপনি কি সন্দেহ করেন যে এর মধ্যে রাজার কোন হাত আছে ?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। সন্দেহ করি না বললে সত্য বলা হয় না।'

—'রাজা যদি কলকাতায় না থাকেন, তাহলে ঐ মৃত্যুগুলোর জন্যে তিনি দায়ী হবেন কেন ?'

—'আমার বিশ্বাস, রাজা কলকাতাতেই আছেন। বেদেরা আমার কাছে মিথ্যে কথা বলেছে।'

—'আপনার এ-রকম বিশ্বাসের কারণ বুঝলুম না।'

—'একটা কারণের কথা আমি বলতে পারি, কিন্তু বলতে আমার সঙ্কোচ হচ্ছে।'

—'কেন ?'

—'কথাটা এতই আজগুবি, শুনলে হয়ত আমাকে আপনি পাগল বলে মনে করবেন।'

অবিনাশবাবু একটুখানি হেসে বললেন, 'আজ যে কাহিনী আমাকে বললেন, তা শুনেও যখন আপনাকে পাগল বলে মনে করিনি, তখন আরও কিছু অদ্ভুত কথা শুনলে আপনার সম্বন্ধে আমার আগেকার ধারণা একটুও বদলাবে না। বিনয়বাবু, আমি প্রেততত্ত্ববিদ। অনেকের মতে প্রেততত্ত্বটাই হচ্ছে একটা আজগুবি ব্যাপার। কিন্তু আমি ভূত যখন মানি, আমার কাছে অলৌকিক বা আজগুবি বলে কোন কিছু নেই। আপনি যা বলতে চান, অসঙ্কোচে বলুন।'

বিনয় বললে, 'আমার বাড়ির বিশ-পঁচিশ হাত দূরে একটা বড় কাঁঠাল গাছ আছে। আমার দোতালার শোবার ঘর থেকে কাঁঠাল গাছটা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। সেই গাছটার একটা ডালে আজকাল মাঝে মাঝে একটা অদ্ভুত বাদুড় এসে বসতে শুরু করেছে।'

—'অদ্ভুত বাদুড় ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। সাধারণত বাদুড়দের স্বভাব, দুখানা পা দিয়ে গাছের ডাল ধরে নিচের দিকে মাথা করে ঝুলে থাকা। কিন্তু এ-বাদুড়টা ঠিক পাখির মতই ডালের উপরে বসে থাকে। কাজেই তাকে অদ্ভুত ছাড়া আর কী বলব বলুন ?'

—'আজ কদিন থেকে বাদুড়টাকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন ?'

—'প্রায় মাসখানেক ধরে। কিন্তু সে রোজ আসে না। এক-মাসের মধ্যে তিনদিন সে দেখা দিয়েছে, আর সেই তিন দিনই ছিল শনিবার। সন্ধ্যা যখন হয়-হয়, সে দেখা দেয় ঠিক তখনই। আকারেও সে সাধারণ বাদুড়ের চেয়ে অনেক বড়—এত বড় বাদুড় আমি জীবনে কখনো দেখিনি।'

—'এই বাদুড়ের সঙ্গে রাজার কলকাতায় আগমনের সম্পর্ক কী ?'

—'সম্পর্ক হয়ত কিছুই নেই। কিন্তু তবু আগে আমার সব কথা শুনুন। কাঁঠাল গাছের ডালে বসে বাদুড়টা এক দৃষ্টিতে কেবল আমার

মুখের পানে তাকিয়ে থাকে। বললে হয়ত আপনি বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু তার চোখদুটোও ঠিক বাদুড়ের মত নয়। দেখে আমার মনে হয়েছে, যেন ঠিক দুটো মানুষের চোখ উগ্র দৃষ্টিতে আমাকে নিরীক্ষণ করছে। আর সেই চোখদুটোও দেখতে যেন অবিকল রাজার চোখের মত। রাজার চোখের মত দেখতে বাদুড়ের চোখ—এ কথাটা হাস্যকর নয়?'

অবিনাশবাবু কিঞ্চিৎ উত্তেজিতভাবে বললেন, 'না বিনয়বাবু, মোটেই হাস্যকর নয়! কী বললেন? মানুষের চোখের মত দেখতে বাদুড়ের চোখ? আর সেই চোখদুটো কেবল তাকিয়ে থাকে আপনার দিকেই?'

—'হ্যাঁ অবিনাশবাবু। একেবারে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। সেই সময় আমার কী মনে হয় জানেন? মনে হয়, কে যেন আমাকে বাড়ির বাইরে যাবার জন্যে প্রাণপণে আকর্ষণ করছে! কে যে আকর্ষণ করছে তা বুঝতে পারি না, কিন্তু মনের মধ্যে তার আকর্ষণকে রীতিমত অনুভব করি। তখন ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি জানলার ধার থেকে সরে যাই। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে ওঠে, তখনো বাদুড়টা সেখানে থাকে কি না আর বোঝা যায় না।'

অবিনাশবাবু অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে বললেন, 'সাবধান বিনয়বাবু! হয়ত আপনাকে কেউ সম্মোহিত করবার চেষ্টা করছে। আপনার পক্ষে রাত্রে একলা রাস্তায় বেরুনো নিরাপদ নয়।'

বিনয় বললে, 'আর একটা আশ্চর্য কথা শুনুন। গেল শনিবারে, রাত যখন তিনটে বেজে গেছে, হঠাৎ কার ডাকাডাকিতে আমার ঘুম ভেঙে যায়। বিছানার উপরে উঠে বসে শুনলুম বাড়ির বাহির থেকে কে যেন আমার নাম ধরে ডাকছে। আশু বলে আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে, মনে হল তারই কণ্ঠস্বর। কিন্তু অবিনাশবাবু, বিশালগড় থেকে ফিরে আসবার পর থেকেই রাত্রে যা-কিছু দেখি আর শুনি তাইতেই আমার মন সন্দিহান হয়ে ওঠে। ডাকের কথা ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি। গুরুজনরাও ছেলেবেলায় সাবধান করে দিতেন,

রাত্রের কারুর ডাকে সাড়া দিতে নেই—অন্তত তিনবার ডাকবার আগে। হঠাৎ সেই কথাটাই আমার মনে হল। আমি সাড়া দিলুম না। কিন্তু কে ডাকছে, তা দেখবার জন্যে টর্চটা হাতে করে জানলার কাছে গেলুম। নিচে টর্চের আলো ফেলে কারুকেই দেখতে পেলুম না। কেবল শুনতে পেলুম, কাঁঠাল গাছের একটা ডাল সশব্দে নড়ে উঠল। তারপরেই দুখানা বড় বড় পাখনার ঝট্‌পট্‌ শব্দ। শূন্যে আলো ফেলে দেখি, মস্ত-বড় একটা বাদুড় উড়তে উড়তে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। পরদিন ভোরবেলাতেই আশুর বাড়িতে ছুটলুম। সেখানে শুনলুম যে কাল রাত্রে আমাকে ডাকতে আসবে কি, জ্বরের আক্রমণে আজ তিন দিন-ধরে সে শয্যাগত হয়ে আছে। এ-সব কী ব্যাপার অবিনাশবাবু?'

অবিনাশবাবু আবার কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'বিশালগড়ে যাবার সময় সরাইখানার সেই বুড়ি আপনাকে যে কবচখানা দিয়েছিলেন, সেখানা এখনো আপনার গলায় ঝোলানো আছে তো?'

—'আজ্ঞে না, কলকাতায় এসে সেখানা গলা থেকে খুলে রেখেছি।'

অবিনাশবাবু তৎক্ষণাৎ ব্যস্তভাবে বললেন, 'সর্বনাশ, করেছেন কী! জানেন, সেই কবচের গুণেই বিশালগড় থেকে আপনি প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছেন? বিশালগড়ের রাজা সত্য সত্যই যদি পিশাচ হয় তাহলে তার ভৌতিক দৃষ্টি এখনো আপনার উপরে নিবদ্ধ আছে। যে যখন স্বহস্তে আপনাকে স্পর্শ করেছে, তখন কলকাতায় এলেও আপনি খুব সহজেই আবার তার প্রভাবে গিয়ে পড়তে পারেন। কিন্তু ঐ রক্ষাকবচখানি আপনার গলায় থাকলে সে আর কিছুতেই আপনাকে আকর্ষণ করতে পারবে না। এখন আপনার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, বাড়ি ফিরে গিয়ে আবার সেই কবচ ধারণ করা। তারপর আর এক কথা। আজও তো শনিবার। আপনার যদি ভুল না হয়ে থাকে, তাহলে সেই কাঁঠাল গাছে আজও আবার বাদুড়ের আবির্ভাবের সম্ভাবনা। আমি আজ সন্ধ্যার আগে আপনার বাড়িতে

যেতে চাই! আপনার আপত্তি নেই তো?'

বিনয় খুশি হয়ে বললে, 'বিলক্ষণ! আপত্তি কী মশাই, এটা তো আমার পক্ষে সৌভাগ্যেরই বিষয়!'

২ বাগানবাড়ির ঝোপ

সেইদিন সন্ধ্যার আগে।

বিনয়ের শয়নগৃহ। অবিনাশবাবু ও বিনয়।

সূর্য অস্তগত। ধীরে ধীরে ময়লা হয়ে আসছে দিনের আলো। আর মিনিট-কয়েক পরেই চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে যাবে সন্ধ্যার অন্ধকারে। এখনই দৃষ্টির সামনে ভাসছে কেমন একটা ছায়া-ছায়া ভাব।

জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বিনয় একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'ঐ দেখুন অবিনাশবাবু, ঐ দেখুন!'

সাগ্রহে দৃষ্টিচালনা করে অবিনাশবাবু দেখলেন, খানিক দূর থেকে উড়ে আসছে মস্ত বড় একটা কালো বাদুড়।

বাদুড়টা সোজা এসে কাঁঠাল গাছের একটা বড় ডালের উপরে চুপ করে বসে পড়ল।

বিনয় বললে, 'দেখুন আমার কথা সত্য কি না। আর এও দেখছেন তো, বাদুড়টা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার ঘরের দিকেই? ওর চোখদুটোও লক্ষ করুন!'

অবিনাশবাবু আস্তে আস্তে বললেন, 'সবই দেখছি, সবই লক্ষ করছি। আপনি ঠিকই বলেছেন, ওর চোখদুটো মোটেই বাদুড়ের মত নয়। বাদুড়ের চক্ষু-কোটরের ভিতর দিয়ে মানুষেরও দৃষ্টি ফুটে ওঠেনি—এ হচ্ছে কোন অভিশপ্ত অমানুষের দৃষ্টি! ও-দৃষ্টি যার উপরে পড়বে তার সর্বনাশ না হয়ে যায় না!'

বিনয় কাতর কণ্ঠে বললে, 'তাহলে এখন আমি কী করব?'

—'আজকেও কি কোন আকর্ষণ আপনাকে বাইরে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে ?'

—'না অবিনাশবাবু। আজ আমি সে-সব কিছুই অনুভব করছি না।'

—'সেই কবচখানা ধারণ করেছেন তো ?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'জানবেন, ঐ কবচ আপনার গলায় থাকলে কোন দুষ্ট আত্মাই আর আপনাকে আকর্ষণ করতে পারবে না। আর একটা বিষয়েও আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই।'

—'কী বিষয়ে ?'

—'আমি দেখতে চাই, ঐ বাদুড়টার ভিতরে সত্য-সত্যই কোন অপার্থিবতা আছে কি না।'

—'কেমন করে দেখবেন ?'

—'আপনার ওই কবচখানা বাহিরে বার করুন। তারপর ও-খানা হাতে করে তুলে ধরে একেবারে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ান। সত্যই যদি ঐ কবচের কোন গুণ থাকে, তাহলে এখনি তার স্পষ্ট প্রমাণ আপনি নিজেই দেখতে পাবেন।'

অবিনাশবাবুর কথামত বিনয় কবচখানা বার করে জানলার ধারে গিয়ে সামনের দিকে তুলে ধরলে। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, যেন কোন অদৃশ্য হাতের প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে বাদুড়টা কাঁঠাল গাছের ডালের উপর থেকে নিচের দিকে ঠিকরে পড়ল। কিন্তু মাটিতে গিয়ে পড়বার আগেই সে আবার নিজেকে সামলে নিয়ে তীরবেগে আকাশের দিকে উঠে চলে গেল একেবারে চোখের আড়ালে।

অবিনাশবাবু মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'আর আমার কোনই সন্দেহ নেই। ওটা নিশ্চয়ই পৃথিবীর সাধারণ বাদুড় নয়। আপনার কবচের শক্তি দেখলেন তো ?'

বিনয় অনুতপ্ত কণ্ঠে বললে, 'আপনার কথাই সত্য অবিনাশবাবু, কবচ খুলে ফেলে বিপদকে আমি যেচেই ডেকে আনতে চেয়েছিলুম। ভবিষ্যতে আর কখনো এমন কাজ করব না।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'ভবিষ্যতের কথা এখন থাক, আপাতত আমরা কী করব, তাই নিয়েই আলোচনা করা যাক। আপনার ধারণা, পিশাচ রাজা আবার কলকাতায় এসেছে?'

—'আমার তো তাই ধারণা। ঐ বাদুড়টা দেখে আপনারও মনে কি ঐ-রকম সন্দেহ জাগছে না?'

—'খালি সন্দেহ নিয়ে কোন কাজই হবে না, আমি চাই স্পষ্ট প্রমাণ।'

—'কী রকম প্রমাণ?'

—'শুনুন। পিশাচ বা ভ্যাম্পায়ারের একটা বিশেষ স্বভাব আছে। দিনে তারা কোন গোরস্থানের কবরে বা অন্য কোথাও লুকিয়ে ঠিক মৃতদেহের মতই পড়ে থাকে। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে আবার হয় তাদের জাগরণ। তখন তারা জ্যান্ত মানুষের মতন লোকালয়ে গিয়ে শিকার খুঁজে বেড়ায়। সারা রাতটাই তাদের কেটে যায় এইভাবে। তারপর পূর্ব-আকাশে দিনের আলো ফোটবার ঠিক পূর্ব-মুহূর্তেই তারা আবার স্বস্থানে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। রাজা কলকাতায় এসেছে কি না, আর সে সত্য-সত্যই পিশাচ কি না, এটা আমরা অনায়াসেই আবিষ্কার করতে পারি।'

—'কেমন করে?'

—'আপনি তো ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের বাগানবাড়িটা চেনেন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'আজ রাত্রে আমার সঙ্গে আপনি সেখানে যেতে পারবেন?'

বিনয় শিউরে উঠে বললে, 'রাত্রে! সেই পোড়ো বাড়িতে!'

—'ভয় পাবেন না বিনয়বাবু, ভয় পাবার কিছুই নেই। স্মরণ রাখবেন, আপনার সঙ্গে আছে অব্যর্থ রক্ষাকবচ। ঐ পোড়ো বাড়িটা হানাবাড়ি হলেও কবচের গুণে আপনার কোন ভয় নেই। আর আমারও কোন ভয় নেই,—কারণ, আমার সহায় মন্ত্রশক্তি। আমাদের মতন যারা প্রেততত্ত্ব নিয়ে কারবার করে, দুষ্ট আত্মাদের কবল থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে সর্বদাই তাদের মন্ত্রশক্তির সাহায্য নিয়ে প্রস্তুত

থাকতে হয়। তাহলে কী বলেন, আজ এই বাগানবাড়িতে গিয়ে রাত জাগতে রাজি আছেন?'

বিনয়ের মুখ দেখে মনে হল না যে সে বিশেষ আশ্বস্ত হয়েছে। নাচারের মতন বললে, 'আপনি যখন বলছেন, তখন আমাকে যেতেই হবে।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'আপনার কোন ভাবনা নেই। আমরা সেই বাগানবাড়ির ভিতরে প্রবেশ করব। আপনার মুখে শুনেছি, বাড়ির চারিদিকেই অনেকখানি জমি আছে। সুতরাং এটুকু অনুমান করতে পারি যে, সেই পোড়ো বাগানে ফুল আর ফলগাছ না থাক, ঝোপ-ঝাপ আগাছা আছে যথেষ্টই। তাই নয় কি?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। সেই জমির উপরে আছে দস্তুরমত একটি জঙ্গল। ঝোপঝাপ খুঁজে নিতে একটুও দেরি লাগবে না।'

—'ব্যস্, তাহলেই চলবে। পোড়ো জঙ্গলেই আজ আমরা রাত্রিবাস করব। মন্দ কী? এও একটা নূতনত্ব!'

রাত্রি এখন যাত্রী হয়েছে প্রভাত-তীর্থে আত্মসমর্পণ করবার জন্যে। কিছু প্রভাত আসন্ন হলেও এখনো ভোরের পাখিদের ঘুম ভাঙেনি এবং উষার শুভ্র ছোঁয়ায় এখনো হয়নি বিষণ্ণ অন্ধকারের মৃত্যু।

ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের ভাঙা বাড়ির পোড়ো বাগানের যেখানে আগে ছিল মস্ত-বড় ফটকটা, এখন তার কোন চিহ্নই বিদ্যমান নেই। কিন্তু সেখান দিয়ে একটা পথ ভিতর দিকে অগ্রসর হয়ে বাড়ির দরজা পর্যন্ত চলে গিয়েছে।

সেই পথের ধারেই ছিল এমন একটা প্রকাণ্ড ঝোপ যে, তার ভিতরে একটা হস্তীরও স্থানসঙ্কুলান হতে পারে। অবিনাশবাবুর সঙ্গে বিনয় আশ্রয় নিয়েছে সেই ঝোপটার মধ্যেই। বাহির থেকে কোন দৃষ্টিই তাদের আবিষ্কার করতে পারবে না, কিন্তু ভিতর থেকে ঝোপের ফাঁক দিয়ে পথের উপরটা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে তারা।

সারারাত শুকনো পাতা নড়লেই সাপের ভয়ে চমকে চমকে উঠে, এবং ঝাঁকে ঝাঁকে হৃষ্টপুষ্ট মশকদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বিনয়ের দেহ-

মন কাবু হয়ে পড়েছে একেবারে। অবিনাশবাবু কিন্তু এমন স্থিরভাবে বসে আছেন যে দেখলে মনে হয় না তিনি একটামাত্র মশারও কামড় খেয়েছেন।

খুব দূরে কোথা থেকে একটা বড় ঘড়ি ঢং-ঢং করে পাঁচ বার বেজে

অবিনাশবাবু আস্তে আস্তে বিনয়ের গায়ে ঠেলা মেরে বললেন, 'হুঁসিয়ার!'

বিনয় আঁৎকে উঠে বললে, 'কী হয়েছে অবিনাশবাবু?'

—'হবে আর কী? এখানে সত্যিই যদি কোন পিশাচ থাকে, তাহলে তার আসবার সময় হয়েছে। ঐ দেখুন, রাত্রির অন্ধকার ক্রমেই পাতলা হয়ে আসছে, পূর্বদিকের আকাশও এখন অনেকটা ফর্সা। পিশাচের চোখ কোনদিন উষার আলো পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না।'

—'আমাকে এখন কী করতে হবে?'

—'কিছু করতে হবে না, চোখদুটোকে সজাগ রেখে খালি চুপ করে বসে থাকতে হবে।'

ভোরের বাতাসের প্রথম ঝাপ্‌টা তাদের কপালের উপর বুলিয়ে দিয়ে গেল ভারি মিষ্টি একটি ঠাণ্ডা ছোঁয়া। কোন গাছ থেকে ডেকে উঠল দুটো-একটা কাক।

—'অবিনাশবাবু!'

—'চুপ, ঐদিকে দেখুন!'

হাল্কা অন্ধকারের ভিতর দিয়ে একটা সুদীর্ঘ মূর্তি বাগানের ভিতরে প্রবেশ করলে। মূর্তির দেহের কালো পোশাকটা অন্ধকারের সঙ্গে প্রায় এক হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তার মুখের শুভ্রতা। মস্ত একজোড়া পাকা গোঁফের দুই প্রান্ত হাওয়ায় দুলে দুলে উঠছে, বিনয় তাও দেখতে পেলে। মুখখানাকে ভাল করে চিনতে পারলে না বটে, কিন্তু জাঁদরেলি গোঁফজোড়া চিনে ফেলতে তার একটুও কষ্ট হল না। এই গোঁফের একমাত্র মালিক রাজা রুদ্রপ্রতাপ।

বাগানের ভিতরে ঢুকে মূর্তিটা ঝোপের ঠিক পাশের পথে এসে

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। তার কি সন্দেহ হল জানি না, কিন্তু সে যখন ফিরে ফিরে এদিকে-ওদিকে দৃষ্টিচালনা করছিল, তখন তার দুই চক্ষে জ্বলে জ্বলে উঠছিল যেন তীব্র বিদ্যুতের শিখা।

আচম্বিতে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে অমানুষিক কণ্ঠে মূর্তিটা করে উঠল ভয়াবহ অট্টহাস্য। বিনয় সভয়ে অবিনাশবাবুর একখানা হাত দুই হাতে চেপে ধরলে এবং অবিনাশবাবুও খানিকটা স্তম্ভিতের মতন হয়ে গেলেন। এমন অট্টহাসি মানুষের কর্ণ বোধহয় কোনদিনই শ্রবণ করেনি।

তেমনি হা হা হা হা হা হা হাসতে হাসতে মূর্তিটা দ্রুতপদে বাড়ির দিকে প্রায় ছুটে চলে গেল। তারপর শোনা গেল দরজা খোলার ও দুম্ করে বন্ধ হবার শব্দ।

বিনয় হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'অবিনাশবাবু! ও অমন করে হাসলে কেন?'

—'হয়ত আমাদের অস্তিত্ব জানতে পেরেছে।'

—'কিন্তু তবু ও তো আমাদের আক্রমণ করলে না?'

—'ভোরের পাখি ডেকে উঠেছে। ওর আর কোন শক্তিই নেই।'

৩ আবার নতুন খবর

পরদিনের বেলা সাড়ে দশটা।

বিনয় হন্তদন্তের মত অবিনাশবাবুর বৈঠকখানায় এসে হাজির, তার হাতে একখানা খবরের কাগজ।

গতকল্যকার নিশা-জাগরণের পর আজ অবিনাশবাবুর ঘুম ভেঙেছিল বেশ একটু বেলায়। প্রথম চায়ের পেয়ালায় প্রথম চুমুক দিতে যাচ্ছেন, এমন সময় বিনয়কে দেখে বিস্মিত স্বরে তিনি বললেন, 'ব্যাপার কী! আপনার মুখের ভাব তো সন্তোষজনক বলে মনে হচ্ছে না?'

বিনয় একখানা চেয়ারের উপরে বসে পড়ে বললে, 'আপনার কথার উত্তর না দিয়ে আমি এই খবরের কাগজখানা পাঠ করতে চাই।'

—'আবার খবরের কাগজ! কাল কি আবার নতুন কোন মানুষ রক্তশূন্যতা রোগে মারা পড়েছে?'

—'শুনুন।' এই বলে বিনয় খবরের কাগজখানা পাঠ করতে লাগল :

'কলিকাতায় ভ্যাম্পায়ার বাদুড়!

অনেকেই এতদিন যে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছিলেন, কাল রাত্রে তাহা সত্যে পরিণত হইয়াছে। ইয়াঙ্কি মুল্লুকের ভ্যাম্পায়ার বাদুড় দেখা দিয়াছে ভারতের প্রধান নগর কলিকাতায়।

পুলিনবিহারী বসু শ্যামবাজার অঞ্চলে বাস করেন। তিনি একজন কারবারী লোক। গতকল্য সন্ধ্যার পর আহারাদি সম্পন্ন করিয়া তিনি নিজের শয়নগৃহে গমন করেন। তাহার পর যথাসময়ে নিদ্রিত হইয়া পড়েন। তাঁহার স্ত্রী বাড়িতে ছিলেন না, নিজের কোন আত্মীয়ের বিবাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে প্রায় মধ্যরাত্রে তিনি আবার বাড়িতে ফিরিয়া আসেন। পুলিনবাবু সেদিন শয়নগৃহের দরজা কেবল ভেজাইয়া রাখিয়াছিলেন, স্ত্রী আসিলে দরজার অর্গল খুলিবার জন্য পাছে তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, সেই ভয়েই ভিতর হইতে তিনি দরজা বন্ধ করেন নাই।

তাঁহার স্ত্রী দরজা ঠেলিয়া ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ঘরের আলো জ্বালাই ছিল, এবং সেই আলোতে তাঁহার স্ত্রী দেখিলেন ভয়াল এক দৃশ্য।

প্রকাণ্ড একটা কৃষ্ণবর্ণের কি জীব তাঁহার নিদ্রিত স্বামীর দেহের উপরার্ধ প্রায় আচ্ছন্ন করিয়া শয্যার উপরে স্থির হইয়া আছে। সেই দৃশ্য দেখিয়াই তিনি প্রাণপণে চিৎকার করিয়া উঠেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবটা তাঁহার স্বামীর দেহের উপর হইতে উঠিয়া জানালার ভিতর দিয়া ঘরের বাহিরে গিয়া ডানার ঝটপট্ শব্দ করিয়া উড়িয়া যায়। তখন বুঝিতে পারা যায় যে জীবটা বাদুড় ছাড়া আর কিছুই নয়।

পুলিনবাবুর স্ত্রী বিছানার পার্শ্বে আসিয়া দেখিলেন, তখনও তাঁহার

স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই এবং তাঁহার কণ্ঠদেশের উপর হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে রক্তের ধারা। তাহার পর অনেক চেষ্টা করিয়াও স্বামীর নিদ্রা ভাঙিতে না পারিয়া পুলিনবাবুর স্ত্রী ডাক্তারের বাড়িতে খবর পাঠান।

ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষার পরে বলেন, পুলিনবাবু জীবিত আছেন বটে এবং তাঁহার প্রাণেরও কোন আশঙ্কা নাই, তবে রক্তশূন্যতার জন্য অত্যন্ত নির্জীব হইয়া পড়িয়াছেন।

যদিও এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ এখনও আমরা পাই নাই, তবু যতটুকু প্রকাশ পাইয়াছে তারই উপর নির্ভর করিয়া আমরা বলিতে পারি, ইহার আগে কলিকাতায় গত এক মাসের মধ্যে উপর-উপরি সাত-সাতজন লোকের যে রহস্যময় মৃত্যু হইয়াছে, তাহার সহিত এই ঘটনার নিশ্চয়ই একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ঐ সাতজন লোকও মারা পড়িয়াছে রক্তশূন্যতার জন্য। পুলিনবাবুও যে ঠিক এই কারণেই মৃত্যুমুখে পড়িতেন সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। তাঁহার স্ত্রীর আকস্মিক আগমনের জন্যই এ-যাত্রা তিনি রক্ষা পাইয়াছেন।

পূর্বেই আমরা প্রকাশ করিয়াছি, রক্তশূন্যতার জন্য এতগুলি লোকের মৃত্যু দেখিয়া অনেকেই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, এইসকল দুর্ঘটনার জন্য দায়ী আমেরিকার ভ্যাম্পায়ার বাদুড়। যে-কোন উপায়েই হউক, এক বা একাধিক ঐ জাতীয় জীব কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত তাঁহাদেরই মত সঠিক বলিয়া প্রমাণিত হইল। কারণ, পুলিনবাবুর স্ত্রী স্বচক্ষে দেখিয়াছেন যে তাঁহার স্বামীর দেহের উপরে একটা প্রকাণ্ড কালো বাদুড় স্থির হইয়া পড়িয়া আছে। এবং এই বাদুড়টাই যে পুলিনবাবুর রক্ত শোষণ করিতেছিল, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এতদিন পরে উত্তর-কলিকাতার এই বিচিত্র রহস্যের একটা সমাধান হইল। কিন্তু এখন একটা বড় প্রশ্ন হইতেছে এই যে, কোন্ উপায়ে ঐ ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের কবল হইতে শহরবাসীরা উদ্ধার

লাভ করিবে? কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে আমরা এই প্রশ্নের উত্তর দাবি করিতেছি।'

সমস্ত শুনে অবিনাশবাবু আগে নীরবে খালি করলেন চায়ের পেয়ালাটা। তারপরে বললেন, 'কাগজওয়ালাদের বিশ্বাস, এতদিন পরে সব রহস্যের সমাধান হয়েছে। ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ও দেখা গিয়েছে, আর সাতজন লোকের মৃত্যুর কারণও জানতে নাকি কারুর বাকি নেই। কিন্তু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব আমরা মানুষ, আসল রহস্যের কতটুকু খবরই বা আমরা রাখতে পারি? ভ্যাম্পায়ার বাদুড়! রাবিশ! আসল কথা জানতে পারলে শহরবাসীদের নাড়ী একেবারে ছেড়ে যাবে!'

বিনয় কাতর মুখে বললে, 'অবিনাশবাবু, কলকাতাবাসীদের মাথার উপরে কী ভীষণ বিপদের খাঁড়া ঝুলছে, এটা তো এখন আপনি বুঝতে পেরেছেন? আপনি কি চেষ্টা করলে এই বিপদ দূর করতে পারেন না?'

অবিনাশবাবু বললেন, 'পারি বিনয়বাবু, পারি। চেষ্টা করলে হয়ত চব্বিশ ঘণ্টার ভিতরেই আমি ঐ পিশাচ রাজার সব লীলাখেলা সাঙ্গ করে দিতে পারি।'

—'তবে সেই চেষ্টাই করুন অবিনাশবাবু, সেই চেষ্টাই করুন!'

অবিনাশবাবু ভাবতে ভাবতে ধীরে ধীরে বললেন, 'ব্যাপারটা একটু ভাল করে বোঝবার চেষ্টা করুন। পুলিশের কাছ থেকে আমরা কোনই সাহায্য পাব না, কারণ পুলিশ কোনদিনই ভূত-প্রেত, পিশাচ, দৈত্য বা দানব নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি হবে না। আমাদের মুখে সব কথা শুনলে তারা আমাদের তাড়াতাড়ি পাঠাতে চাইবে পাগলা গারদে। সুতরাং পুলিশের কথা একেবারেই ভুলে গিয়ে আমাদের দুজনকে কাজ করতে হবে খুব গোপনে আর স্বাধীনভাবে।'

—'হ্যাঁ অবিনাশবাবু, আপনার এ অনুমান মিথ্যা নয়।'

—'বিনয়বাবু, কাল রাতে আপনি ছিলেন বিনিদ্র। আজকেও কি সারারাত না ঘুমিয়ে জেগে থাকতে পারবেন?'

—'কেন বলুন দেখি?'

—'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সূর্যোদয়ের পরেই পিশাচ রাজা ঐ বাড়ির

ভিতরে কোন এক জায়গায় নির্জীব হয়ে পড়ে থাকে, সন্ধ্যার আগে তার দেহে আর জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পায় না। দিনের বেলায় তার অবস্থা হয় একান্ত অসহায়ের মতন; আক্রান্ত হলেও সে কিছুতেই আত্মরক্ষা করতে পারে না। পিশাচকে বধ করবার উপায় আমার অজানা নেই। দিনের বেলায় একবার তাকে হাতে পেলেই তার কবল থেকে তখনি পৃথিবীকে মুক্তি দিতে পারি।'

—'এ জন্যে রাত জাগবার দরকার কী, অবিনাশবাবু? কাল সকালেই তো সূর্যোদয়ের পরে আমরা ঐ বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকতে পারি?'

—'বিনয়বাবু, আপনি ছেলেমানুষের মতন কথা বলছেন। বাগান-বাড়ির মালীদের ঘরে একদল বেদেকে কি আপনি স্বচক্ষে দেখেন নি? ওরা কেন যে ওখানে আছে, তাও কি বুঝতে পারছেন না? ওরা হচ্ছে রাজার মাহিনা-করা অনুচর; বাড়ির উপরে পাহারা দেবার জন্যেই রাজা ওদের নিযুক্ত করেছে। রাজা নিজেও জানে, দিনের বেলায় সে হয় অত্যন্ত অসহায়। তাই সেই সময় বাড়ির চারিদিকেই থাকে বেদেদের কড়া পাহারা। আমরা কেমন করে তাদের চোখে ধুলো দেব? অতএব দিনের কথা ভুলে গিয়ে ঐ বাগানবাড়িতে যেতে হবে রাত্রির অন্ধকারে গা ঢেকে। বাড়িখানা আমিও দেখেছি। প্রকাণ্ড বাড়ি। চোরের মতন বাড়ির ভিতর ঢুকে, আনাচে-কানাচে বা কোন একখানা ঘরের ভিতরে লুকিয়ে বসে আমরা দুজনে সূর্যোদয়ের অপেক্ষা করব। তারপর পিশাচ যখন হবে জড় পদার্থের মত, তখন আমরা তার দেহটিকে ধ্বংস করবার চেষ্টা করব।'

—'কিন্তু যে সময় আমরা ঐ বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকব, রাজা যদি তখন সেইখানে উপস্থিত থাকে?'

—'রাত্রে সেখানে রাজার উপস্থিতির সম্ভাবনা খুবই অল্প। সাধারণত পিশাচরা সূর্যাস্ত হলেই শিকারের সন্ধানে যাত্রা করে। আমাদের বিশ্বাস, অলৌকিক শক্তির গুণে রাজা বাদুড়ের আকার ধারণ করতে পারে। যে কালো বাদুড়টা আপনাকে জ্বালাতন করতে যেত,

সেটা যে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হবার আগেই সেই কাঁঠাল ডালে গিয়ে বসত, এরই মধ্যে এ কথা কি আপনি ভুলে গিয়েছেন ?'

বিনয় একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, 'না, ভুলিনি অবিনাশবাবু। আপনার মতই অভ্রান্ত বলে বোধ হচ্ছে। যদিও সেই প্রেতপুরীর মধ্যে রাত্রি যাপন করবার কথা মনে করেই আমার বুকটা ধড়াস করে উঠেছে, তবুও মানুষের এই মহাশত্রুকে বধ করবার জন্যে সমস্ত বিপদকেই আমি তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিতে পারি।—তাহলে এই কথাই রইল অবিনাশবাবু। কখন আমরা ঐ বাগানবাড়ির দিকে যাত্রা করব ?'

—'রাত বারোটার পর।'

৪ যম থাকে যমালয়ে

রাত যখন একটা, প্রগাঢ় অন্ধকারের ভিতর দিয়ে তারা উপস্থিত হল সেই বাগানবাড়িখানার কাছে। অন্ধকারের মধ্যে দীপ্ত জোনাকিদের দেখাচ্ছে অশরীরীদের ভুতুড়ে আলোফুলের মালার মত। ঝিল্লীদের ঝঙ্কারও শোনাচ্ছে কেমন যেন অস্বাভাবিক, ইহলোকের কানে কানে যেন শোনাতে চায় পরলোকের কর্কশ সঙ্গীত। বাতাসে বাতাসে গাছে গাছে জাগছে যে পত্রমর্মর, তাও যেন অভিশপ্ত আত্মাদের করুণ দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কিছুই নয়। রাত্রে পৃথিবীর উপর অন্ধকারের যবনিকা নেমে এলে সৃষ্টির প্রভাত থেকে মানুষের মনের ভিতরে সঞ্চারিত হয়ে আসছে এক অবর্ণনীয় অপার্থিব ভাব। তখন সহজ বস্তুকেও আর সহজ বলে মনে হয় না, অন্ধ দৃষ্টি আর কিছুই দেখতে না পেলেও কল্পনায় চারিদিকেই দেখে বা দেখছে বলে সন্দেহ করে রহস্যময় আতঙ্ক আর আতঙ্ক।

অবিনাশবাবু বললেন, 'বিনয়বাবু, আপনি এমন বোবার মতন চুপ করে আছেন কেন ? আপনার ভয় হচ্ছে নাকি ?'

বিনয় বললে, 'ভয় যে হচ্ছে না, কেমন করে বলি ? এখন আমি চারিদিকেই দেখছি সেই ভয়ানক রাজার মূর্তি ! প্রত্যেক ঝোপঝাপ নড়ে নড়ে উঠছে আর আমার মনে হচ্ছে, রাজা বুঝি টের পেয়েছে

আমাদের

অন্ধকারের জীব। এই নিশাচর যে আমাদের অনুসরণ করছে না, কিছুতেই আমি মনে করতে পারছি না এই কথাটা।'

—'কিন্তু আপনাকে তো আমি বারবার বলছি যে ঐ কবচ সঙ্গে থাকতে আপনার কোনই আশঙ্কা নেই?'

—জানি অবিনাশবাবু, জানি। দুর্বল মন তবু সহজে প্রবোধ মানতে চায় না।'

বিনয়কে সান্ত্বনা দেবার জন্যে তার হাত ধরে আরও কয়েক পদ অগ্রসর হয়ে অবিনাশবাবু বললেন, 'আচ্ছা, আগেও তো আপনি এই বাড়িখানা দেখেছেন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। এ বাড়ির ভিতর-বাহির, সবই আমার দেখা।'

—'খুব সম্ভব বাড়ির সদর দরজাটা বাহির থেকে তালাবন্ধ করে রেখেছে। এই বাড়িতে ঢোকবার আর কোন উপায় আপনি জানেন?'

—'বাড়ির পিছনে দেখেছিলুম পাল্লাহীন একটা খিড়কির দরজা। সেখান দিয়ে অনায়াসেই ভিতরে প্রবেশ করা যায়।'

—'বেশ, তাহলে ঐ পথই আমরা অবলম্বন করব। বেদেদের কোনই সাড়া নেই। আর এত রাত্রে তাদের সাড়া থাকবার কথাও নয়। তারা জানে, তাদের রাজা বেরিয়েছে এখন নৈশ বিহারে, অতএব বাড়ির উপরে আর পাহারা দেবার দরকার নেই। নিশ্চয়ই তারা এখন নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করছে। আসুন বিনয়বাবু।'

অন্ধকার হাতড়াতে হাতড়াতে বার-কয়েক হোঁচট খেয়ে তারা উপস্থিত হল বাড়িখানার পিছন দিকে।

অন্ধকারে যেখানে ঘন নয় এমন একটা জায়গা দেখিয়ে দিয়ে বিনয় বললে, 'ঐখানে আছে একটা পানায় সবুজ মস্ত বড় পুরোনো পুকুর। আর এইদিকে আছে খিড়কির সেই ভাঙা দরজাটা।'

দ্বারপথ আবিষ্কার করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। ভিতরে ঢুকে অবিনাশবাবু বললেন, 'আর কোন অযাচিত লোককে ভয়

করবার কারণ নেই। এইবারে আমরা টর্চ জ্বেলে একটা গা-ঢাকা দেবার মত জায়গা খুঁজে বার করতে পারি।'

টর্চের চাবি টিপে আলো জ্বেলে দুজনে অগ্রসর হতে লাগল। তাদের চারিদিকেই দেখা যাচ্ছে প্রায় ধ্বংসস্তূপের মত জীর্ণ বাড়ির আগাছাভরা উঠোন, দালানের ভেঙে-পড়া খিলানের পর খিলান, ধ্বসে-পড়া সোপান ও হেলে-পড়া দেওয়ালের উপর ঝুলে-পড়া কড়ি ও বরগা। এক জায়গা থেকে তাদের পদশব্দ শুনে দুটো শেয়াল বেগে ছুটে পালিয়ে গেল। একাধিক সর্পেরও সন্ধান পাওয়া গেল। একটি ঘরের ভিতর কি রকম ঝট্‌পট্‌ ঝট্‌পট্‌ শব্দ। উপর দিকে আলো ফেলে শুকনো গলায় বিনয় বলে উঠল, 'বাদুড়!'

সে ভয়ে ভয়ে পিছিয়ে আসছিল, কিন্তু অবিনাশবাবু তার কাঁধের উপর হাত দিয়ে শান্ত স্বরে বললেন, 'ও-রকম ছোট বাদুড় দেখে আপনি আঁৎকে উঠলেন কেন? ওটা তো সাধারণ বাদুড় ছাড়া আর কিছুই নয়।'

আর একটা ঘরে ঢুকেই তারা শুনতে পেলে বিকট কণ্ঠের কয়েকটা অদ্ভুত চিৎকার। বিনয়ের সর্বাঙ্গ কণ্টকিত হয়ে উঠল এবং যেন খাড়া হয়ে উঠল তার মাথার চুলগুলো পর্যন্ত।

অবিনাশবাবু হেসে বললেন, 'ও তক্ষক, কোন ভয় নেই।'

তারপর তারা প্রবেশ করলে খুব বড় একটা ঘরের ভিতরে। সে ঘরখানার অবস্থা অন্যান্য ঘরের মতন শোচনীয় ছিল না, যদিও তার মেঝের উপরে জমে আছে বহুকালের সঞ্চিত ধুলো এবং তার দেওয়ালের গা থেকেও খসে পড়েছে চুন-বালির প্রলেপ, তবু চেষ্টা করলে সে ঘরখানাকে এখনও মানুষের ব্যবহারযোগ্য করে নেওয়া যায়।

সেই ঘরেরই এক কোণে দেখা গেল প্রকাণ্ড একটা সিন্দুক।

সেটা দেখেই চমকিত চক্ষে বিনয় বলে উঠল, 'ওই সিন্দুকটাকেই আমি দেখেছি বিশালগড়ে! দিনের বেলায় রাজা মড়ার মতন শুয়ে থাকে ওরই ভিতরে!'

অবিনাশবাবু এগিয়ে গিয়ে সিন্দুকের ভারি ডালাটা খুলে ফেলে

খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'সিন্দুকের ভিতরে দেখছি বিছানার বদলে রয়েছে রাশীকৃত স্যাঁতসেঁতে মাটি। হ্যাঁ, পিশাচেরই উপযুক্ত শয্যা বটে! দিনের বেলায় পিশাচ শুয়ে থাকতে চায় কবরের ভিজে মাটির বিছানায়। এখানে পিশাচ কবরের বদলে ব্যবহার করেছে একটা সিন্দুককেই, কিন্তু নিজের স্বভাব ভুলতে না পেরে নগ্ন মাটির উপরেই শয্যা রচনা না করে পারেনি।'

বিনয় নিজের হাতের ঘড়ি দেখে বললে, 'রাত তিনটে বেজেছে। রাজার আসতে এখনো অনেক দেরি।'

কিন্তু তার কথা ফুরোতে না ফুরোতেই সেই প্রকাণ্ড ঘরটা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল পৈশাচিক অট্টহাসির তরঙ্গে।

দুজনেই বিদ্যুতের মত ফিরে দেখে, কখন নিঃশব্দপদে রাজা এসে প্রবেশ করে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক সেই ঘরের মাঝখানে।

রাজা হাসতে হাসতে হঠাৎ হাসি থামিয়ে ফেলে বজ্রের মতন কঠিন স্বরে চিৎকার করে বললে, 'ক্ষুদ্র মানুষ! তোরা যে আজ এইখানে আসবি, কালকেই আমি তা অনুমান করেছিলুম। তোরা হচ্ছিস নশ্বর, দুনিয়ায় এসেছিস দুদিনের পরমায়ু নিয়ে! কতটুকু তোদের বুদ্ধি? আমি হচ্ছি অমর, আজ তিন শতাব্দী ধরে এই পৃথিবীর বুক মাড়িয়ে আমি বিচরণ করছি দিগ্বিদিকে—আমার মনের মধ্যে আছে তিন শতাব্দীকালের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা! এত বড় দুঃসাহস তোদের, আমার সঙ্গে করতে চাস প্রতিদ্বন্দ্বিতা? তোদের সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা আজ লুপ্ত করে দেব আমি এই মুহূর্তেই!' দুই ক্রুদ্ধ চক্ষে দুটো দপ্‌দপে শিখা জ্বালিয়ে রাজা পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল তাদের দিকে—সামনে সুদীর্ঘ বাহু বাড়িয়ে।

ভয়ে, দুশ্চিন্তায় বিনয়ের মুখ হয়ে গেল মড়ার মত পাণ্ডুর। পায়ে পায়ে সেও পিছোতে লাগল, চমকে উঠতে উঠতে।

অবিনাশবাবু কিন্তু নিশ্চল। তাঁর নেই এতটুকু ভয়ের লক্ষণ। স্থির গম্ভীর স্বরে তিনি বললেন, 'নির্ভয় হোন বিনয়বাবু! আপনার অস্ত্রের কথা আবার ভুলে গেলেন? শিগ্‌গির বার করুন সেটা!'

বিনয় কাঁপতে কাঁপতে নিজের জামার তলা থেকে টেনে বার করে ফেললে গলায় ঝোলানো সেই কবচখানা।

বিকট আর্তনাদ করে রাজা তখনি ঘুরে মাটির উপরে পড়ে গেল বিদ্যুতাহতের মত। তারপর চোখের পলক পড়তে-না-পড়তেই আবার উঠে ঝড়ের মত বেগে ঘরের ভিতর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিনয়ের হাত ধরে টানতে টানতে অবিনাশবাবুও ছুটলেন ঘরের বাইরে।

উঠোনের উপর আবার দেখা গেল পলাতক রাজার ছুটন্ত মূর্তি।

অবিনাশবাবু দৌড়তে দৌড়তে চেঁচিয়ে বললেন, 'ভয় পাবেন না বিনয়বাবু, ছুটে চলুন আমার সঙ্গে! পিশাচ এখন শক্তিহীন। আমাদেরই ভয়ে সে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে চায়। ঐ কবচ একবার যদি ওর গায়ে স্পর্শ করাতে পারি, তাহলে এখনি ও মূর্ছিত হয়ে আমাদের হস্তগত হবে। তারপর? তারপর যা করবার, আমিই করব।'

রাজার মূর্তি বৃদ্ধের মত বটে, কিন্তু তার দেহে আছে যেন একাধিক যুবকের প্রবল শক্তি। অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে কখনো রাশীকৃত ইষ্টকস্তূপের উপর লাফ মেরে এবং কখনো বা মাটির উপর দিয়ে দ্রুতগামী হরিণের মত ছুটতে ছুটতে ক্রমেই সে দূরে চলে যেতে লাগল। খিড়কির ভাঙা দরজা দিয়ে অবিনাশবাবুর সঙ্গে বিনয়ও বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে পেলে, সেই পানায়-ভরা পুকুরের জলের ভিতরে কে যেন ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। তারপর শোনা গেল সাঁতার কাটতে কাটতে জলে ছপ্ ছপ্ শব্দ তুলে কে ওপারের দিয়ে চলে যাচ্ছে।

অবিনাশবাবুও পুকুরের ডান পাড়ের উপর দিয়ে দৌড়ে ওদিকে যাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু হঠাৎ পায়ে গাছের শুকনো শিকড়ের মত কি-একটা জিনিসের বাধা পেয়ে মাটির উপরে সটান পড়ে গেলেন। বিনয় তাড়াতাড়ি তাঁকে তুলে আবার বসিয়ে দিলে।

তখন জলের উপরে সাঁতারের শব্দ থেমে গিয়েছে, এবং পরমুহূর্তেই জেগে উঠল আর একটা নূতন শব্দ।

শূন্যে বাদুড়ের ডানার ঝট্‌পটানির শব্দ।

ক্রুদ্ধ মুখে আকাশের দিকে তাকিয়ে অবিনাশবাবু বললেন, 'রাজা আবার আমাদের নাগালের বাইরে। ঐ দেখুন।'

একটা অসম্ভব প্রকাণ্ড কালো বাদুড় দুইদিকে দুখানা ডানা বিস্তৃত করে আকাশের গায়ে উড়ে যাচ্ছে উপরে—আরও উপরে।

পরদিনের গভীর রাত্রি।

অবিনাশবাবু ও বিনয় আবার সেই বাগানবাড়িতে।

কিন্তু সেই বড় ঘরে প্রবেশ করে দেখা গেল, মস্ত সিন্ধুকটা সেখান থেকে অদৃশ্য হয়েছে।

বিনয় মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, 'অবিনাশবাবু, পাখি কি উড়েছে?'

—'পাখি যে উড়েছে, সেটা তো কাল স্বচক্ষেই আমরা দেখেছি। আপনার কবচ তার সহ্য হবে না।'

—'বেদেরা?'

—'পাখির বাসা আছে সেই সিন্ধুকে। বেদেরা নিশ্চয়ই বাসা নিয়ে ফিরে গেছে বিশালগড়েই।'

—'এখন উপায়?'

—'আমাদেরও যেতে হবে বিশালগড়ে!'

—'বলেন কী, আবার সেই মারাত্মক জায়গায়?'

—'যমকে খুঁজতে গেলে যমালয়েই যেতে হয়।'

৫ আবার বিনয়ের ডায়েরি

বিশালগড়ের বিপুল অরণ্যের প্রান্তে আবার সেই সরাইখানায়। এবং আমাকে দেখে সচকিত বিস্ময়ে সর্বপ্রথমে অভ্যর্থনা করতে এলেন আবার সেই প্রাচীনা নারী।

বললেন, 'বাছা, সেবার মরতে মরতে বেঁচে গিয়েও আবার আপনি এখানে এসেছেন ?'

আমি সহাস্যে বললুম, 'মায়ীজি, আপনার দেওয়া রক্ষাকবচ যখন আমার গলায় ঝুলছে, তখন যমকেও আমি ভয় করি না। কিন্তু এবারে আমি একলা আসিনি, আমার সঙ্গে এসেছেন বন্ধুটিও।'

প্রাচীনা অবিনাশবাবুর মুখের দিকে এবার কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, 'এঁরও গলায় কোন রক্ষাকবচ আছে কি ?'

—'না মা, এঁর কোন কবচের দরকার নেই। এঁর কারবারই হচ্ছে-ভূত -প্রেত নিয়ে খেলা করা।'

—'ও, উনি বুঝি রোজা ?'

অবিনাশবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'আপনার কথাই সত্য। এক হিসাবে আমি রোজাই বটে, তবে, আমি হচ্ছি অতি-আধুনিক রোজা।'

প্রাচীনা আশ্বস্ত হয়ে বললেন, 'তাহলে বাবুজি, আপনাদের জন্যে আমার আর কোন চিন্তা নেই। কিন্তু আপনাদের আবার এখানে আসবার কারণ কী ?'

আমি বললুম, 'আমরা এসেছি রাজা রুদ্রপ্রতাপের অস্তিত্ব লুপ্ত করতে।'

প্রাচীনা বিস্মিত মুখে কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বললেন, 'কিন্তু বাবুজি, রাজা তো বিশালগড়ে নেই!'

আমি বললুম, 'রাজা কলকাতায় গিয়েছিলেন। কিন্তু কাল রাত্রেই তিনি আবার কলকাতা ত্যাগ করেছেন। বিশালগড় ছাড়া তাঁর যাবার আর কোনই জায়গা নেই। আমাদের মতন তাঁরও আজকে এখানে আসার কথা।'

প্রাচীনা বললেন, 'কিন্তু এখনো তিনি এখানে আসেন নি।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'এ কথা আপনি কেমন করে জানলেন ?'

প্রাচীনা বললেন, 'বাবুজি, বিশালগড়ে যেতে আর সেখান থেকে বাইরে আসতে হলে পথ আছে একটি মাত্র। সে পথ এসে পড়েছে

এই সরাইখানার সামনেই। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, রাজা বিশালগড়ে ফিরে গেলে আমরা নিশ্চয়ই তাঁকে দেখতে পেতুম।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'আপনি যখন রাজার সব খবর রাখেন, তখন এটুকুও নিশ্চয় জানেন যে ইচ্ছা করলে তিনি রূপান্তর গ্রহণ করতে পারেন?'

ভয়ে ভয়ে একবার চারিদিকে তাকিয়ে প্রাচীনা চুপি-চুপি বললেন, 'এত জোর গলায় রাজার কথা নিয়ে আলোচনা করবেন না! এখানে বনের গাছ পাতা আর বাতাসেরও বোধহয় কান আছে, রাজার কথা তারা সব শুনতে পায়। রাজা যদি একবার জানতে পারেন যে তাঁর কথা নিয়ে আমি আপনাদের সঙ্গে এইভাবে আলাপ করছি, তাহলে আমার জীবনের মূল্য হবে না একটিও কানাকড়ি। হ্যাঁ বাবুজি, আমি শুনেছি যে মাঝে-মাঝে বন থেকে এমন সব নেকড়ে বেরোয়, আর আকাশ দিয়ে উড়ে যায় এমন এক মস্ত বাদুড়, যাদের আত্মার সঙ্গে নাকি রাজার আত্মার কোনই তফাত নেই। অবশ্য, এটা সত্যি কি মিথ্যা কথা আমি তা জানি না।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'কাল কলকাতায় প্রায় শেষ রাতে আমরা রাজাকেই দেখেছি বোধহয় বাদুড়রূপে। রাজা যদি শূন্য পথে বিশালগড়ে গিয়ে হাজির হন?'

প্রাচীনা একটু ভেবে বললেন, 'কাল প্রায় শেষ রাতে রাজা যদি সত্য-সত্যই বাদুড়-মূর্তি ধারণ করে থাকেন, তাহলে শূন্যে উড়েও তিনি ভোরের আগে এতটা পথ পার হতে পারবেন না।'

—'আপনি কী বলতে চান?'

—'লোকে বলে, সূর্যোদয় হলেই রাজা হন মড়ার মত। সে ক্ষেত্রে তাঁকে বিশালগড়ে আসতে হবে অন্য লোকের সাহায্যে পৃথিবীর মাটির উপর দিয়ে।'

—'রাজাকে সাহায্য করতে পারে, এমন সব লোকও আছে নাকি?'

—'আছে বৈকি বাবুজি! কিন্তু তারা এ অঞ্চলের কোন ভাল লোক নয়। তারা হচ্ছে বিদেশী বেদে। রাজার কথায় তারা ওঠে-বসে। কিন্তু রাজার সঙ্গে সঙ্গে তারাও বিশালগড় থেকে অদৃশ্য হয়েছে। কিছুদিন আগে আমি দেখেছি, তারা একটা ভারি সিন্ধুক মাথায় করে বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে ইস্টিশানের দিকে চলে গেল। তার পর থেকে এখন পর্যন্ত আর তাদের দেখা পাইনি।'

বিনয় বললে, 'সেই সিন্ধুকের রহস্য আপনি জানেন?'

প্রাচীনা কেমন শিউরে উঠে বললেন, 'লোকে নানান আজগুবি কথা বলে, আমি ঠিক জানি না।'

—'বেদেরা সেই সিন্ধুকটা নিয়ে কলকাতায় গিয়েছিল। কিন্তু কাল রাজার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সিন্ধুক-সুদ্ধ সেই বেদেদেরও আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বেদেরা সেই সিন্ধুকটা নিয়ে কোথায় যেতে পারে, আপনি বলতে পারবেন কি?'

—'রাজার মত ওই বেদেরাও হচ্ছে বিশালগড়ের জীব। সিন্ধুক নিয়ে তারা সেখানে ছাড়া আর কোথাও যাবে বলে মনে হয় না।'

অবিনাশবাবু হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'তাহলে আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, সিন্ধুক নিয়ে বেদেরা এখনো বিশালগড়ে ফিরে যায়নি?'

—'হ্যাঁ বাবুজি, এ বিষয়ে সন্দেহ করবার কিছুই নেই।'

—'জয় গুরু! বেদেরা তাহলে এখনি বা একটু পরেই সিন্ধুক নিয়ে এই পথে ফিরে আসবে।'

আমি বললুম, 'আপনি এতটা নিশ্চিত হচ্ছেন কেন?'

—'কেন? আরে, আপনি কি এও বুঝতে পারছেন না যে, বেদেরা এই সিন্ধুক নিয়ে আমাদেরই মত রেলপথে এইখানে আসবে? কলকাতা থেকে বিশালগড়ে আসবার ট্রেন আছে মাত্র একখানা। যদিও আমরা তাদের দেখতে পাইনি, কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই তাদের সঙ্গে এখানে এসে পৌঁছেছি। তারা বহন করে আনছে একটা মস্ত ভারি সিন্ধুক, তাই আমাদের আগে এখানে এসে

হাজির হতে পারেনি। কিন্তু তারা এল বলে। চলুন বিনয়বাবু, তাদের আগেই আমরা বিশালগড়ে গিয়ে উপস্থিত হতে চাই।'

প্রাচীনা বললেন, 'বাবুজি, এতদূর থেকে আসছেন, আপনারা কি দয়া করে এখানে একটু বিশ্রামও করবেন না?'

আমি বললুম, 'প্রণাম মায়ীজি, আজ আর বিশ্রামের সময় নেই। যদি ভালোয় ভালোয় ফিরে আসি, আবার এখানে এসে বিশ্রাম করব। চলুন অবিনাশবাবু।'

৬ গোলাপি, বেগুনি, নীল আলো

সন্ধ্যা। কিন্তু আজকের সন্ধ্যা নয় চন্দ্রহীন। চারিদিক ছন্দোময় হয়ে আছে জ্যোৎস্নার মৌন আলোক-সঙ্গীতে।

আবার সেই বিশালগড়ের অসমোচ্চ পথের উপরে। দুইদিকে তার গহন অরণ্য, নৃত্যশীলা তটিনী, ছবির মত সুন্দর পাহাড়ের পর পাহাড়। সেদিন ছিল অন্ধকারের বিভীষিকা, কিন্তু আজ চারিদিকে ছড়িয়ে আছে গীতিকবিতার ঐশ্বর্য।

এইসব দেখতে দেখতে অবিনাশবাবুকে নিয়ে আমি এগিয়ে চললুম আগে আগে। আজ আমি নির্ভয়, কারণ কবচের মহিমা আমাকে করে তুলেছে পরম সাহসী। রুদ্রপ্রতাপ আজ যদি একেবারে আমার সামনে এসেও দাঁড়ায় তাহলেও আমি পশ্চাৎপদ হব না এক ইঞ্চিও।

প্রকৃতির সৌন্দর্য আমাদের এমনভাবে অভিভূত করে রাখলে যে অনেকখানি পথ পার হয়েও আমরা কেউ কারুর সঙ্গে বাক্যবিনিময় করবার অবসর পেলুম না। আমাদের হয়ে তখন কথাবার্তা কইতে লাগল উচ্ছ্বসিত সুগন্ধ বাতাস, মর্মরিত তরুলতা, কলরবমুখরা নদী ও নাম-না-জানা সব গানের পাখি। এই শব্দ-গন্ধ-স্পর্শময়ী মোহিনী রাত্রি খানিকক্ষণের জন্যে ভুলিয়ে দিলে সেই বিভীষণ রাজা রুদ্রপ্রতাপের স্মৃতিও।

সর্বপ্রথমে কথা কইলেন অবিনাশবাবু। বললেন, 'বিনয়বাবু, একটা বিষয় আমি অনুমান করতে পারছি।'

—'কী ?'

—'রুদ্রপ্রতাপ বিশালগড়ে ফিরবে কেমন করে। আপনি কিছু আন্দাজ করতে পারছেন ?'

খানিক দূরে একটা পাহাড়ের বুকে নির্ঝর ঝরে পড়ছিল তরল রৌপ্যধারার মত। সেইদিকে তাকিয়ে আমি বললুম, 'আমি এখন কোন কথাই অনুমান করবার চেষ্টা করছি না অবিনাশবাবু। আমি বাস করছি এখন অন্য জগতে।'

—'মানে ?'

—'রাজা রুদ্রপ্রতাপ নয়, আমার ঘাড়ে চেপেছে এখন কোন কবির প্রেতাত্মা।'

—'কী রকম ?'

—'কবিরা যা নিয়ে কারবার করেন, আমি হয়েছি তারই কারবারী।'

—'অর্থাৎ ?'

—'আমার উপরে দেখছি চাঁদকে, নীলিমার গায়ে দেখছি জ্যোৎস্নাকে, পাহাড়ের উপরে দেখছি নির্ঝরিণী আর বনে বনে দেখছি কত রূপ, কত রস, কত ছন্দ! ভুলে গিয়েছি অবিনাশবাবু, আপনার ওই রুদ্রপ্রতাপকে একেবারে ভুলে গিয়েছি।'

অবিনাশবাবু গম্ভীর স্বরে বললেন, 'কিন্তু রুদ্রপ্রতাপ যে আমাদের ভোলেনি, সেটাও আপনি ভুলে গিয়েছেন নাকি ?'

তৎক্ষণাৎ সজাগ হয়ে বললুম, 'এবারে আমার স্বর্গ থেকে হল পতন। এমন সুন্দর জগতে সেই মূর্তিমান অন্ধকারের কথা কেন আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন ?'

অবিনাশবাবু হেসে বললেন, 'স্মরণ না করিয়ে দিয়ে উপায় নেই। আমাদের হাতে সময় খুব অল্পই, যে-কোন মুহূর্তে রুদ্রপ্রতাপকে আবার আমরা চোখের সামনে দেখতে পারি।'

—'বুঝতে পারছি। কিন্তু আপনি আমাকে কী অনুমান করতে বলছিলেন ?'

—'রুদ্রপ্রতাপ কেমন করে বিশালগড়ে ফিরে আসছে, সেকথা বলতে পারেন ?'

'আপনি আমার সঙ্গে আছেন বলে ও-সব বিষয় নিয়ে আমি মস্তক ঘর্মাক্ত করবার চেষ্টা করিনি। আপনি কিছু অনুমান করেছেন ?'

অবিনাশবাবু বললেন, 'রুদ্রপ্রতাপ বিশালগড়ে আসবে সেই সিন্ধুকেরই ভিতরে, যা বহন করে আনছে একদল বেদে।'

—'তাই নাকি ?'

—'সেইরকম তো সন্দেহ হয়। সূর্যোদয়ের পূর্ব-মুহূর্তে কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে রুদ্রপ্রতাপ আশ্রয় নিয়েছে সেই সিন্ধুকের ভিতরে। দিনের বেলায় যে হয় মৃতবৎ, নিশ্চয়ই সে বাইরের পৃথিবীর চোখের সামনে থাকবে না।'

আমি বললুম, 'কিন্তু এখন আবার রাত্রি হয়েছে। রাজা যে এখনো সজীব হয়ে ওঠে নি, একথা কি জোর করে-বলা যায় ?'

—'তা যায় না। কিন্তু সে-ক্ষেত্রে এর মধ্যেই নিশ্চয় আবার আমরা রাজার দেখা পেতুম। আমার মনে হয়, যে-কারণেই হোক রাজা এখনো তার নিরাপদ বাসা ছেড়ে বাইরে বেরুতে সাহস করেনি।'

আচম্বিতে খুব কাছে বনের ভিতর থেকে হা হা হা হা করে জেগে উঠল আবার সেই অতিপরিচিত ও ভয়াবহ অট্টহাসির পর অট্টহাসির উচ্ছ্বাস।

আমার চোখের সুমুখে এক মুহূর্তে যেন দপ্ করে নিবে গেল আকাশ ও পৃথিবী-ভরা পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার ঔজ্জ্বল্য।

এক লাফে পিছিয়ে এসে ও প্রায়-আবদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলুম, 'অবিনাশবাবু, অবিনাশবাবু!'

ব্যাপারটার আকস্মিকতা এতই অভাবিত যে অবিনাশবাবু পর্যন্ত খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। ও স্বর যে কার তা বুঝতে কিছুই বিলম্ব হয় না। পৃথিবীতে একমাত্র লোকেরই কণ্ঠ থেকে ওরকম পৈশাচিক হাস্যধ্বনি জাগ্রত হতে পারে।

আমরা পরস্পরের হাত ধরে খানিকক্ষণ নীরব হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলুম।

কিন্তু অট্টহাসি আর শোনা গেল না। অট্টহাসি থেমে গেলেও তার প্রতিধ্বনি তখনো শোনা যেতে লাগল দূরে দূরে পাহাড়ের শিখরে শিখরে এবং উপত্যকায় উপত্যকায়। আলোর উপরে নেমে এল যে অদৃশ্য অন্ধকারের ঘেরাটোপ, তা চোখে দেখা না গেলেও যেন হৃদয় দিয়ে অনুভব করা যায়। কম্পিত স্বরে বললুম, 'অবিনাশবাবু, আপনার ধারণা সত্য নয়। রাজার দেহ আবার জ্যান্ত হয়ে উঠেছে।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'হ্যাঁ। কেবল জ্যান্ত হয়নি, বোধহয় সে আমাদের অনুসরণও করছে।'

ত্রস্ত চোখে পিছন দিকে তাকিয়ে বললুম, 'কিন্তু তাকে তো দেখতে পাচ্ছি না?'

অবিনাশবাবু বললেন, 'তাকে দেখতে পাচ্ছেন না কারণ সে দেখা দিতে সাহস করছে না।'

—'সাহস করছে না?'

—'না। আপনার কবচের কথা আবার ভুলে যাচ্ছেন নাকি?'

—'এমন অবস্থায় ভুলে যাওয়া অসম্ভব নয়! কিন্তু রাজা যদি সত্য-সত্যই ভয় করে, তবে অকারণে এমনভাবে নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ দিলে কেন?'

—'সেইটেই আমি বুঝতে পারছি না। তার পক্ষে আত্মগোপন করে থাকাই উচিত ছিল। কিন্তু তা যখন সে করেনি তখন তার মনের ভিতরে নিশ্চয়ই কোন গোপন অভিসন্ধি আছে। তার শয়তানি বুদ্ধি এখন কোন্ পথ ধরবে তাও বোঝা যাচ্ছে না। আত্মরক্ষার জন্যে এখন আমাদের আরো সাবধান হতে হবে।'

—'এই বনে কী করে আমরা আরো সাবধান হব?'

—'অপেক্ষা করুন, এখনি দেখতে পাবেন।'

আমরা তখন যেখানে এসে দাঁড়িয়েছিলুম তার একদিকে পাহাড় আর বন এবং আর একদিকে জঙ্গল শেষ হয়ে গিয়ে আরম্ভ হয়েছে

সুদূর-বিস্তৃত একটা প্রান্তর। অনেক দূরে প্রান্তরের মাঝখানে একটা সুদীর্ঘ রৌপ্যরেখা থেকে-থেকে চক্‌চক্ করে উঠছিল—বোধহয় কোন নদী।

আমাকে নিয়ে অবিনাশবাবু পথ ছেড়ে নেমে প্রান্তরের উপরে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর বিড়বিড় করে কি এক দুর্বোধ মন্ত্র বলতে বলতে মাটির উপরে মণ্ডলাকারে টেনে দিতে লাগলেন একটা রেখা।

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'ও কী করছেন অবিনাশবাবু?'

অবিনাশবাবু নিজের কার্য শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'মন্ত্রপূত গণ্ডী টেনে দিলুম।'

—'কেন?'

—'রুদ্রপ্রতাপ যখন আবার জেগেছে, তখন এই গণ্ডীর ভিতরে বসেই আজকের রাতটা আমাদের পুইয়ে দিতে হবে। সাবধান, এই গণ্ডীর ভিতর থেকে কিছুতেই বাইরে যাবার চেষ্টা করবেন না। এর বাইরে গেলেই বিপদ। কিন্তু ভিতরে থাকলে ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানব—কেহই আমাদের কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। রুদ্রপ্রতাপের সমস্ত শয়তানি বুদ্ধিই এই গণ্ডীর বাইরে একেবারে মাঠে মারা যাবে। আসুন বিনয়বাবু, মাঝখানে এসে বসুন। মন থেকে সমস্ত দুশ্চিন্তা দূর করুন। ইচ্ছা করেন তো রীতিমত নাক ডাকিয়ে রাত কাবার করলেও কোন ক্ষতি হবে না।'

আমি বললুম, 'আমার নাক আজ রাতে ডাকবার চেষ্টা করবে? আপনি কি পাগল হয়েছেন?'

—'তবে আপনার নীরব নাসিকা দিয়ে লক্ষ্মীছেলেটির মত এইখানে বসে আবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করুন।'

—'তাও অসম্ভব। আমার ঘাড় থেকে কবির প্রেতাত্মা এখন নেমে গিয়েছে। রুদ্রপ্রতাপের সাজ্ঘাতিক মূর্তি ছাড়া আমি আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

—'উত্তম। গণ্ডীর ভিতরে বসে তাও দেখলে ক্ষতি নেই; কিন্তু খুব হুঁসিয়ার, গণ্ডীর বাইরে একবারও পা বাড়াবেন না।'

আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিলুম, মুখে কিছু বললুম না।

অবিনাশবাবু একটা মস্ত হাই তুলে বললেন, 'ঘুম আমাকে হাতছানি দিচ্ছে, আমি জেগে থাকতে পারব না। গণ্ডীর ভিতরে আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ। প্রেতলোকের পল্টন এলেও এ ব্যূহ ভেদ করতে পারবে না। তাই আবার বলি বিনয়বাবু, আমার সঙ্গে আপনিও করুন নিদ্রাদেবীকে সাধনা।'

—'ক্ষমা করবেন অবিনাশবাবু, আমার চোখ থেকে সব ঘুম ছুটে গিয়েছে।'

অবিনাশবাবু নাচারভাবে দূর্বাকোমল মাটির উপরে দেহকে লম্বমান করে কিঞ্চিৎ কঠিন স্বরে বললেন, 'কিন্তু ঘুমোবার আগে একটা কথা বলে রাখি বিনয়বাবু। সর্বদাই মনে রাখবেন, দুষ্ট আত্মা—অর্থাৎ পিশাচ করেছে আপনার দেহকে স্পর্শ। রাজা কে, আপনি তা জানেন। যতই রক্ষাকবচ ধারণ করুন, আপনাকে সে সহজেই ভোলাতে পারবে। পিশাচের ছলনা কোন্ দিক থেকে যে আপনাকে আকর্ষণ করবে, আপনি জেনেও তা বুঝতে পারবেন না বলেই মনে করি। কিন্তু সর্বক্ষণই স্মরণ রাখবেন, আপনার পক্ষে গণ্ডীর ভিতরটা সম্পূর্ণ নিরাপদ, আর গণ্ডীর বাহিরটা হচ্ছে একান্ত বিপদজনক।' তিনি পাশ ফিরে শুলেন। মিনিটকয়েক যেতে না-যেতেই তাঁর নাসিকার মধ্যে জাগ্রত হল দস্তুরমত হুঙ্কারধ্বনি। সেই কোলাহল শ্রবণ করে দুটো শৃগাল চরম বিস্ময়ে উৎকর্ণ হয়ে একটা ঝোপের ভিতর হতে একবারমাত্র মুখ বাড়িয়ে মুহূর্তেই সে স্থান ত্যাগ করতে বিলম্ব করলে না।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম মাঠের উপরে দূরের চাকচিক্যময় রূপোলী নদী-রেখার দিকে। ধীরে ধীরে আবার মনের ভিতরে হতে জাগল অসাময়িক কবিত্বের সঞ্চার। সে কবিত্বকে অসাময়িক ছাড়া আর কী বলব? যেখানে একটু আগেই শোনা গেছে অলৌকিক এবং পৈশাচিক অট্টহাস্য, সেখানে কোন সত্যিকার মহাকবির মনও ধারণায় আনতে পারত না পেলব কবিত্বকে।

কতক্ষণ এইভাবে কেটে গেল আমি তা জানিনা, কিন্তু হঠাৎ আমার সন্দেহ হতে লাগল, সমুজ্জ্বল নদী-রেখার ঠিক উপরেই ক্রমে-ক্রমে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে দুগ্ধধবল চন্দ্রকরধারার কতক কতক অংশ।

ভুল দেখছি ভেবে আমি একবার দুই হাতে দুই চোখ কচলে আরো ভাল করে দেখলুম, সেই পুঞ্জীভূত জ্যোৎস্না যেন খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়ে এগিয়ে আর এগিয়ে আর এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে ধীরে আমারই দিকে। জ্যোৎস্নার এমন কল্পনাতীত ব্যবহার এর আগে আর কখনো আমি লক্ষ করিনি। এও কি সম্ভব?

আসছে, আসছে, আসছে—কাছে, আরো কাছে এগিয়ে আসছে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত পুঞ্জীকৃত জ্যোৎস্না।

ব্যাপারটাকে একটু তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু বিশেষ কিছুই বুঝতে পারলুম না। আমার বোধশক্তি যেন ক্রমেই কেমন আচ্ছন্ন হয়ে আসতে লাগল। কেবল এইটুকুই অনুভব করলুম, আমার মনের মধ্যে যেন নূপুর বাজাচ্ছে কী এক অজানিত আনন্দের ছন্দ। যেন এই আনন্দকে লাভ করতে পারলে আমি অনায়াসেই পরিত্যাগ করতে পারি যে-কোন সাম্রাজ্যের সিংহাসন!

আরো কাছে—আরো, আরো, আরো কাছে একে একে একে এগিয়ে এল সেই আশ্চর্য চন্দ্রকিরণপুঞ্জ। যা ছিল প্রথমে ছায়া-ছায়া স্বচ্ছ, দেখতে দেখতে তা গ্রহণ করতে লাগল এক-একটা নির্দিষ্ট আকার।

ঘনীভূত হয়ে উঠছে, আকারগুলো ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে উঠছে। পরে পরে, অবশেষে পাশে পাশে আত্মপ্রকাশ করলে তিন-তিনটে মূর্তি। মূর্তিগুলো যেন পরিচিত, এর আগে যেন দেখেছি তাদের কোন্ স্বপ্নজড়িমায়। কিন্তু সে কোথায়, সে কোথায়?······

কোথায়? তা ধারণাতেও আনতে পারলুম না। আমি তখন একেবারেই আত্মবিস্মৃত। আমার কাছ থেকে তখন বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে যেন পৃথিবীর অস্তিত্ব।

পাশাপাশি তিনটি তরুণীর সঞ্চারিণী লতার মতন তনু। এমন সব পরমা সুন্দরী আমার চক্ষু জীবনে আর কখনো দেখেনি। রূপকথার রাজকন্যারাও তুচ্ছ তাদের কাছে। বকপক্ষশুভ্র তাদের দেহ এবং তাদের একজনের চক্ষে জ্বলছে গোলাপি আলো, আর-একজনের চক্ষে বেগুনি আলো এবং আর-একজনের চক্ষে নীল আলো। চোখে যে এতরকম রঙের আলো জ্বলতে পারে, একথা জানতুম না কোনদিনই।

তিনটি তরুণী এগিয়ে এসে দাঁড়াল পাশে পাশে পাশে।

যার চোখে জ্বলছিল গোলাপি আলো, সে বীণানিন্দিত স্বরে বললে, 'বন্ধু, আমায় কি চিনতে পারছ না?'

আমি তাকে চিনলুম, কিন্তু মুখ আমার হয়ে গেছে বোবা!

যার চোখে জ্বলছিল বেগুনি আলো, সে এগিয়ে এসে নির্ঝরিণীর ছন্দভরা কণ্ঠে বললে, 'এস বন্ধু, এখানে এস—আকাশের চাঁদ চায় পৃথিবীর ছেলেমেয়েদের খেলা দেখতে!'

যার চোখে জ্বলছিল নীল আলো, সানুনয়ে দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে কলভাষিণী নদীর মতন স্বরে সে বললে, 'বন্ধু, ও বন্ধু! আজ তুমি আমায় চিনতে পারছ না? সেদিন তোমায় দেখেছিলুম কী চমৎকার! কিন্তু আজ দেখছি তোমার গলায় ঝুলছে তামার তৈরি কি একটা বিশ্রী জিনিস! ওটা দিয়ে যাও আমার হাতে—আমি ছুঁড়ে ফেলে দি ওটাকে নদীর জলে! অমন সুন্দর দেহে অমন কুৎসিত জিনিস কি মানায়? দাও দাও, ওটা আমায় দাও, আর ওর ভার বহন কোরো না!' বলতে বলতে সে সামনে বাড়িয়ে দিলে দুইখানি ফুলের পাপড়ির মতন নরম হাত।

আমি দাঁড়িয়ে উঠলুম মাতালের মতন টলতে টলতে—সমস্ত পৃথিবী যেন আমার ধারণার বাইরে। নিজের অজ্ঞাতসারেই আমি গলা থেকে কবচখানা টেনে বার করলুম, তারপর অবিনাশবাবুর টানা রেখা-মণ্ডলের বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়ালুম—

কিন্তু পর-মুহূর্তেই প্রচণ্ড এক হাতের টানে আছাড় খেয়ে মাটির উপরে ঘুরে পড়লুম পিছন দিকে।

ক্রোধে বিচলিত কণ্ঠে অবিনাশবাবু চিৎকার করে বললেন, 'ভ্যাগিস্য আমি হঠাৎ জেগে উঠেছি, নইলে আপনার কী হত বলুন দেখি? আপনি গণ্ডীর বাইরে গিয়ে কবচ দিতে যাচ্ছিলেন কার হাতে? আপনি মূর্খ. আপনাকে গালাগালি দেবার ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না! চুপ করে বসে থাকুন এইখানে!'

এবারে আর অট্টহাসি নয়—আচম্বিতে কোথা থেকে কার কণ্ঠে জেগে উঠল এমন আর্ত স্বর, নরকেও যা কেউ কোনদিন শ্রবণ করেনি।

সঙ্গে সঙ্গে সেই তিনটে অপূর্ব-সুন্দর—কিন্তু অপার্থিব নারীমূর্তি সরে সরে—ক্রমে দূরে, আরো দূরে সরে গেল। দেখতে দেখতে তাদের দেহ মিলিয়ে যেতে লাগল যেন কোন বায়বীয় পদার্থের মত বাতাসের সঙ্গে। কোথায় গোলাপি আলো, কোথায় বেগুনি আলো, কোথায় নীল আলো! কেমন একটা অদ্ভুত ক্রন্দন প্রথমে অস্পষ্ট আর অস্পষ্ট হয়ে শোনাতে লাগল বহু—বহু দূরের প্রতিধ্বনির মত। তারপর তাও মিলিয়ে গেল—জাগ্রত হয়ে রইল কেবল স্বাভাবিক এবং পরিপূর্ণ চাঁদের আলো।

অবিনাশবাবু বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, 'বিনয়বাবু! যা বারণ করেছিলুম, আপনি তাই করতে যাচ্ছিলেন!'

আমি হাতজোড় করে বললুম, 'সব এখন বুঝতে পেরেছি! আমি যাচ্ছিলুম নরকে! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন!'

অবিনাশবাবু বললেন, 'এখানে ক্ষমার কথা হচ্ছে না বিনয়বাবু। এখানে আছে কেবল যুক্তির কথা—···যাক, যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে। বিগতকে নিয়ে আমি আর নাড়াচাড়া করতে চাই না। চেয়ে দেখুন, পূর্ব-চক্রবালে দেখা যাচ্ছে গোলাপি উষার মোহনীয় দৃষ্টি। এইবারে শেষ হবে যত ভৌতিক চক্রান্ত।'

একটু একটু করে ধবধবে নরম আলোর আভায় ভরে গেল সমস্ত আকাশ। দূরে, কাছে—গাছে গাছে গেয়ে উঠল জাগ্রত প্রভাতে গীতকারী বিহঙ্গের দল।

উঠে দাঁড়িয়ে পূর্ণকণ্ঠে বললুম, 'জয়, প্রভাত-সূর্যের জয়! চলুন অবিনাশবাবু, আর কোনদিন আমি পদচ্যুত হব না!'

৭ আমরা হত্যাকারী

আবার ধরেছি বিশালগড়ের পথ।

চিকণ রোদে চারিদিক করছে ঝলমল, কোথাও নেই এতটুকু কালিমার আভাস। গাছপালার ছায়া পর্যন্ত যেন মাজাঘসা, সমুজ্জ্বল। সারা পথ ধরেই কানে জাগছে পাখিদের আনন্দগীতি, ঝরনার সুরও শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। বিশালগড়ের অরণ্য থেকে এখন বিলুপ্ত হয়েছে সমস্ত বিভীষিকার ভাব।

আমার মনও নির্ভয়। এখন দিনের বেলা, শয়তানের রাজা অসহায় মড়ার মতন পড়ে আছে কোথায়, সে আর আমাদের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।

অবিনাশবাবু বললেন, 'বিনয়বাবু, আমাদের আরো তাড়াতাড়ি পা চালাতে হবে।'

—'কেন অবিনাশবাবু, তাড়াতাড়ির দরকার কী?'

—'দিনের আলো থাকতে থাকতে আমরা যদি বিশালগড়ে পৌঁছতে না পারি, তাহলে আমাদের চরম বিপদের সম্ভাবনা। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে পিশাচ হবে জীবন্ত; সঙ্গে সঙ্গে আবার জাগবে রক্তভক্ত নেকড়ের দল, আর সেই ভীষণ-সুন্দর নারীমূর্তিগুলো। তখন কোন্ দিক দিয়ে কেমন করে যে আসবে বিপদ-আপদ, আমরা তা ধারণাতেও আনতে পারব না।'

অবিনাশবাবুর সাবধান-বাণী শুনে পায়ের গতি করলুম দ্রুততর। বিশালগড়ে যখন পৌঁছলুম, বেলা তখন পাঁচটা।

দিনের বেলায় সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকাখানাকেও যেন দেখাচ্ছে মৃতবৎ। বিস্তৃত অঙ্গনের উপরে জাগতে লাগল কেবল আমাদের পায়ের জুতোর শব্দ, তাছাড়া কোনদিক থেকে কোন শব্দই

শুনতে পেলুম না। এখানে হয়েছে যেন নিখিল জীবনের সমাধি। এখানে যেন কণ্ঠস্বরকে মুক্ত করতেও হয় আতঙ্ক।

সেই প্রকাণ্ড দরজা। পাল্লা দুখানা ছিল বন্ধ, হাত দিয়ে ঠেলতেই যেন কর্কশ স্বরে প্রতিবাদ করতে করতে খুলে গেল।

ভিতরে ঢুকে সোজা গিয়ে হাজির হলুম সেই ঘরে, যেখানে কিছুদিন আগে বাস করেছিলুম বন্দীর মত।

ঘরের সাজ-সজ্জার কিছুই পরিবর্তন হয়নি, নূতনত্বের মধ্যে দেখলুম খালি, সর্বত্রই পড়েছে ধুলোর একটা আবরণ।

জিজ্ঞাসা করলুম, 'এখন আমরা কী করব অবিনাশবাবু?'

অবিনাশবাবু বললেন, 'প্রথমেই আমাদের যেতে হবে রাজার শয়নগৃহে।'

—'কিন্তু আগেই তো আপনাকে বলেছি, দিনের বেলায় রাজা তার ঘরের ভিতর থাকে না?'

অবিনাশবাবু যেন অধীরভাবেই বললেন, 'জানি বিনয়বাবু, ও-কথা আর আমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে না। আমি যেতে চাই একতালার সেই অন্ধকার স্যাঁতসেতে ঘরে, যেখানে আপনি সিন্ধুকের ভিতরে রাজাকে শুয়ে থাকতে দেখেছেন।'

—'তাহলে আমার সঙ্গে এদিকে আসুন।'

তারপর ঠিক যেভাবে প্রথমে রাজার ঘরে গিয়ে ঢুকেছিলুম, কার্নিশের উপর দিয়ে ঠিক সেইরকম করেই আবার ঢুকলুম সেই ঘরের ভিতরে। সে-ঘরেরও কোন পরিবর্তন হয়নি। সেকেলে টেবিলের উপরে ধুলো-মাখানো স্বর্ণমুদ্রাগুলো পর্যন্ত ঠিক সেইভাবেই পড়ে রয়েছে।

দেওয়ালের দরজাটা ঠেলে পেলুম আবার সেই সরু পথ ও সঙ্কীর্ণ সিঁড়ির সার।

এবারে আমাদের সঙ্গে ছিল দুটো টর্চ, তার দুটো তীক্ষ্ণ আলোকে অন্ধকারের বক্ষ ভেদ করে আবার নামতে লাগলুম নিচের দিকে। সেবারের মত এবারও মনের মধ্যে জেগে উঠল একটা

রোমাঞ্চকর অপার্থিব ভাব। ইহলোক থেকে যেন এগিয়ে যাচ্ছি পরলোকের দিকে। জানি পিশাচ রাজা এখন উপদ্রব করবার শক্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে, তবু এই অপার্থিব ভাবটা মনের ভিতর থেকে তাড়াতে পারলুম না। অবিনাশবাবু কি ভাবছিলেন জানি না, কিন্তু তিনি একেবারেই চুপচাপ।

তারপর সেই ঘর। কিন্তু আজ আর সেখানে গলিত শবদেহের দুর্গন্ধও নেই, আর সেই প্রকাণ্ড সিন্দুকটাও সেখান থেকে অদৃশ্য।

খানিকক্ষণ নীরব থেকে অবিনাশবাবু ধীরে ধীরে বললেন, 'আমাদের ভয়ে রুদ্রপ্রতাপ কি তার শোবার ঘর বদলেছে?'

—'হতেও পারে, অসম্ভব নয়।'

—'তাহলে আজ দেখছি বাড়ির সর্বত্রই তন্ন-তন্ন করে খুঁজতে হবে। কিন্তু সূর্যাস্তের আগে সেটা সম্ভব হবে কি? যাক, পরের কথা পরেই ভাবা যাবে, এখন আসুন, আমাদের অন্বেষণ আরম্ভ হবে একেবারে বাড়ির উপরতালা থেকে।'

উঠে গেলুম তিনতালার সেই সুদীর্ঘ দালানে। সেখানে সেই ঘরের পরে ঘর, আর প্রত্যেক ঘরের দরজাতেই একটা করে তালা লাগানো। কিন্তু সেদিনকার মত আজকেও দেখলুম সেই বড় হলঘরটির দরজায় কুলুপ লাগানো নেই, হাত দিয়ে ঠেলতেই ধীরে ধীরে পাল্লা দু-খানা খুলে গেল। কিন্তু ঘরের ভিতরে ঢুকতে গিয়েই বুকের ভিতরে লাগল একটা মহা আতঙ্কের ধাক্কা। তাড়াতাড়ি আবার পিছিয়ে এলুম।

অবিনাশবাবুও এগিয়ে দেখলেন, তারপরে চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন স্থির মূর্তির মত।

ঘরের মাঝখানে রয়েছে একখানা মস্ত বড় খাট এবং তার উপরে পাশাপাশি শুয়ে রয়েছে সেই ভীষণ-সুন্দর ও অপার্থিব তিন নারীমূর্তি।

খানিকক্ষণ পরে অবিনাশবাবু মুখ ফিরিয়ে আমাকে বললেন, 'আসুন!'

অবিনাশবাবুর সঙ্গে সঙ্গে আড়ষ্টভাবে এবং রীতিমত ভয়ে-ভয়েই আমিও ঘরের ভিতর ঢুকে সেই ভয়াবহ খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম।

সত্য, এদের দেখবার আগে এমন সৌন্দর্যের কল্পনাও করা যায় না। তাদের তিনজনের পরনে তিনখানি গোলাপি, বেগুনি, আর নীল রঙের পাতলা ফিনফিনে শাড়ি। তাছাড়া দেহের অন্য কোথাও কোনরকম অলঙ্কারই নেই। এই নিরলঙ্কার দেহের জন্যেই যেন আরো সুন্দর হয়ে উঠেছে তাদের আকৃতি। মাথার চিকণ কালো চুলের রাশি এলিয়ে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে। মোমের মত নরম দেহের উপর দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে যেন ভিতরকার রক্তের আভা। কী নিটোল বাহু, কী টানা টানা ভুরু, কী চমৎকার ডাগর ডাগর চোখ! ঠোঁটগুলি যেন ঠিক মিহিন্ ফুলের পাপড়ি এবং আধ-খোলা ঠোঁটের ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে ধবধবে দাঁতগুলি মুক্তাসারির মত। পাশাপাশি শুয়ে আছে যেন বড় শিল্পীর হাতে গড়া তিনটি চমৎকার পুতুল।

কিন্তু এই সুন্দর আকৃতির পিছনে আছে যে ভয়ঙ্কর প্রকৃতি, এখন তাদের দেখে কিছুতেই তা আন্দাজ করা সম্ভবপর নয়। তাদের চোখের পাতা খোলা থাকলেও তাদের ভিতর থেকে বেরুচ্ছে না কোন জাগ্রত দৃষ্টির আভাস। শ্বাস-প্রশ্বাসে বুকের উত্থান-পতন নেই বটে, কিন্তু তাদের দেখলে মৃত বলেও সন্দেহ হয় না। এরা আশ্চর্য জ্যান্ত মড়া!

—'এদিকে সরে আসুন!' এমন গম্ভীর ও কঠোর স্বরে অবিনাশবাবু এই কথাগুলো বললেন, যে আমি সচকিত দৃষ্টি তুলে তাঁর দিকে ফিরে তাকালুম। তাঁর মুখের উপরে একটা নৃশংস দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ভাব।

. সরে এসে জিজ্ঞাসা করলুম, 'অবিনাশবাবু, এখন আপনি কী করবেন?'

অবিনাশবাবু উত্তর দিলেন না, হাতব্যাগ খুলে ভিতর থেকে টেনে

বার করলেন একখানা ধারালো চকচকে ভোজালি।

আমি বিপুল বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'একি অবিনাশবাবু? আপনি ভোজালি বার করলেন কেন?'

দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুট স্বরে তিনি বললেন, 'মড়া যাতে আর না বাঁচতে পারে, সেই ব্যবস্থাই আমি করব!'

আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল। শিউরে উঠে বললুম, 'তার মানে? আপনি কি এদের হত্যা করতে চান?'

অবিনাশবাবু পাগলের মত হা হা করে হেসে উঠে বললেন, 'মড়াকে আবার কেউ হত্যা করতে পারে নাকি?'

—'কিন্তু আপনি তো জানেন, এরা কেউ মড়া নয়? এরা ঘুমিয়ে পড়ে আবার জেগে ওঠে?'

—হ্যাঁ, আবার জেগে ওঠে, জীবন্ত মানুষের রক্ত পান করবার জন্যে। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না, ওদের ঠোঁট অত বেশি রাঙা কেন? ওদের ঠোঁটে এখনো মাখানো রয়েছে মানুষের শুকনো রক্তের দাগ। আর খানিক পরেই ওরা আবার জেগে উঠবে, আর রাক্ষসীর মত আক্রমণ করবে আমাদেরই। কিন্তু ওদের জাগার দিন শেষ হয়ে গিয়েছে, আমি আর ওদের জাগতে দেব না—না, না, কখনোই না!'—বলতে বলতেই তিনি ভোজালিখানা তুলে ধরলেন মাথার উপরে।

আমি বলে উঠলুম, 'করেন কী, করেন কী অবিনাশবাবু!'

বিষম রাগে চেঁচিয়ে উঠে অবিনাশবাবু বললেন, 'আপনি নির্বোধ! প্রেতিনীর উপরে দয়া?'

ভোজালিখানা তুলে অবিনাশবাবু আবার ঝুঁকে পড়লেন সামনের দিকে।

সে দৃশ্য সহ্য করতে পারব না বলে আমি বেগে ঘরের ভিতর থেকে পালিয়ে এলুম। তারপরেই দালানে দাঁড়িয়ে আচ্ছন্নের মত শুনলুম আঘাতের পর আঘাতের শব্দ, এবং তিনটে বিভিন্ন কণ্ঠে তিন-তিনবার কান-ফাটানো তীব্র চিৎকার।

অবিনাশবাবু দ্রুতপদে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন, তাঁর মুখচোখ ভদ্‌ভ্রান্তের মত এবং তাঁর জামাকাপড়ে টকটকে লাল টাটকা রক্তের দাগ। তাঁর হাতের ভোজালি থেকেও ঝরঝর করে রক্ত ঝরে পড়ছে। প্রায়-অস্ফুট স্বরে তিনি বললেন, 'চলে আসুন বিনয়বাবু, শিগগির এখান থেকে চলে আসুন। পৃথিবী থেকে তিনটে মহা পাপ চিরদিনের জন্যে বিদায় হয়েছে—ওদের মুণ্ড আর জোড়া লাগবে না।'

৮ নেকড়ে এবং রুদ্রপ্রতাপ

অবিনাশবাবুর সঙ্গে আমি আবার বিশালগড়ের বাইরে এসে দাঁড়ালুম।

বিশালগড়ের ভিত্তির তলায় আছে বোধহয় কোন ছোট পাহাড়। কারণ, এখানটা চারিদিকের অন্য সব জায়গার চেয়ে অনেক উঁচু। এখানে দাঁড়িয়ে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় অনেক দূর পর্যন্ত।

পশ্চিম আকাশের দিকে তাকিয়ে বুঝলুম, আর খানিকক্ষণ পরেই হবে সূর্যাস্ত। মনে হতেই বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। সূর্যাস্তকাল পর্যন্ত আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ। ততক্ষণ পর্যন্ত পিশাচের নিদ্রাভঙ্গ হবে না। কিন্তু তারপর?

বোধহয় সেই কথাই ভাবছিলেন অবিনাশবাবুও। কারণ তিনি বললেন, 'বিনয়বাবু, বিশালগড়ের ভিতরে তো রুদ্রপ্রতাপের কোনই পাত্তা পেলুম না। খুব সম্ভব এই অরণ্যেরই কোন গুপ্ত স্থানে সে দিবানিদ্রায় অসাড় হয়ে পড়ে আছে। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই হবে আবার তার জাগরণ, আর আমাদের পক্ষে সেটা হবে অত্যন্ত বিপদের কথা।'

আমি বললুম, 'রাতের বেলায় এই বিশাল অরণ্যের কোথাও আমরা নিরাপদ নই। পিশাচ তার অপার্থিব শক্তি নিয়ে নিশ্চয়ই আমাদের খুঁজে বার করবে। সূর্যাস্তের আগে আমরা কিছুতেই এই

বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে যেতে পারব না। তখন আমাদের কী উপায় হবে অবিনাশবাবু?'

—'আত্মরক্ষা করার জন্যে আমাদের একমাত্র উপায় হচ্ছে কালকের মত আবার মন্ত্রপূত গণ্ডীর মধ্যে রাত্রিযাপন করা।'

—'মানলুম, আপনার মন্ত্রপূত গণ্ডীর ভিতরে কোন প্রেত কি পিশাচ আসতে পারবে না। কিন্তু আর একটা পার্থিব বিপদের কথা আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন?'

—'আপনি কী বিপদের কথা বলছেন?'

—'আপনাকে কি সেই নেকড়ের দলের কথা আমি বলিনি? সেই দারুণ নেকড়ের দল রুদ্রপ্রতাপের বশীভূত। সে যদি নেকড়ের দলকে আমাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়, তাহলে ওই মন্ত্রপূত গণ্ডী কি আমাদের রক্ষা করতে পারবে?'

অবিনাশবাবু খানিকক্ষণ গম্ভীর মুখে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে শুষ্ক কণ্ঠে বললেন, 'নেকড়ের দলের কথা সত্যিই আমার মনে ছিল না। গণ্ডী তো তাদের বাধা দিতে পারবে না! তবে, আমাদের পক্ষে একমাত্র সান্ত্বনা যে, আমরা নিরস্ত্র নই। আমাদের দুইজনেরই সঙ্গে আছে রিভলভার; অন্তত যতক্ষণ বাঁচব, ততক্ষণ তাদের বাধা দিতে পারব!'

'হ্যাঁ, যতক্ষণ বাঁচব, ততক্ষণ। কিন্তু তারপর?'

'তার পরের কথা এখন আর ভেবে কোনই লাভ নেই। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছিলুম, তা সম্পূর্ণরূপে সফল হল না। পিশাচীদের বধ করেছি বটে, কিন্তু পালের গোদা সেই পিশাচ এখনো বর্তমান। সে যে কী করবে আর না করবে, তাও আমরা অনুমান করতে পারছি না। আমাদের সম্বল কেবল ভগবানের দয়া। তাঁরই উপরে নির্ভর করা ছাড়া অন্য কোনই উপায় নেই।'

আবার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলুম।

অস্ত যাবার আগে সূর্যের মুখ যতই রাঙা হয়ে উঠছে, তার কিরণ হয়ে আসছে ততই পরিম্লান। দিনের আলো থাকতে থাকতে

বাসায় ফেরবার জন্যে এখনই পাখিদের মধ্যে জেগেছে ব্যস্ততা। শূন্য পথ দিয়ে দলে দলে উড়ে যাচ্ছে বুনো হাঁস, বক, কাক, শালিক ও চিল প্রভৃতি বিহঙ্গের দল। কখনো হাঁস ও বকের ঝটপট শব্দ এবং কখনো বা টিয়া ও শালিকের কলরবে থেকে-থেকে ভেঙে যাচ্ছে অরণ্যের নিস্তব্ধতা। হঠাৎ বাতাসও কেমন চঞ্চল হয়ে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে জাগল যেন আসন্ন রাত্রির ভয়ে অরণ্যের মর্মর-কাতরতা। তার পরেই অনেক, অনেক দূর থেকে শুনতে পেলুম একটা ভয়াবহ অস্পষ্ট ধ্বনি।

সচকিত কণ্ঠে বললুম, 'অবিনাশবাবু, শুনছেন?'

—'কী?'

—'আপনি একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছেন না?'

—'হ্যাঁ, পাচ্ছি। ও কিসের শব্দ?

—'নেকড়েরা আসছে!'

—'নেকড়েরা?

—'হ্যাঁ। নেকড়েরা আসছে, আর ছুটতে ছুটতে চিৎকার করছে। যে শব্দ শুনছেন, ও হচ্ছে নেকড়েদের গর্জন। ঐ ভয়ানক শব্দ আমার কাছে অত্যন্ত পরিচিত। পিশাচ রুদ্রপ্রতাপের সঙ্গে নেকড়েদের কী অলৌকিক যোগাযোগ আছে আমি তা জানিনা, কিন্তু এরই মধ্যে কোন অদ্ভুত উপায়ে তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছেছে রুদ্রপ্রতাপের আদেশ। হয়ত সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই নেকড়েরা আমাদের কাছে এসে পড়বে। অবিনাশবাবু, মাত্র দুটো রিভলভারের গুলিতে আমরা কি শতাধিক নেকড়েকে ঠেকিয়ে রাখতে পারব?'

অবিনাশবাবু কোন উত্তর দিলেন না, চুপ করে কী যেন ভাবতে লাগলেন। আমি উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলুম, নেকড়েদের চিৎকার ক্রমেই স্পষ্ট, আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সূর্যাস্তের আর কত দেরি? বোধহয় মিনিট পনেরোর বেশি নয়। নেকড়েদের এখানে আসতে আর কত দেরি? হয়ত মিনিট পনেরোরও কম।

হঠাৎ অবিনাশবাবু বলে উঠলেন, 'ভয় নেই বিনয়বাবু, ভয় নেই। আত্মরক্ষার একটা উপায় আমি আবিষ্কার করেছি!'

সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কী উপায় অবিনাশবাবু?'

—'ঐ যে খুব উঁচু বড় গাছটা দেখেছেন, ওরই উপরে উঠে আজ আমরা রাত্রি যাপন করব।'

—'ঐ গাছের উপরে উঠলে আমরা নেকড়েদের ফাঁকি দিতে পারব বটে, কিন্তু আপনি রুদ্রপ্রতাপের কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন? গাছে উঠলে তাকেও কি ফাঁকি দিতে পারব?'

—'রুদ্রপ্রতাপের কথা আমি ভুলিনি বিনয়বাবু। ঐ গাছের চারিদিক ঘিরে আমি কেটে দেব মন্ত্রপড়া গণ্ডী। রুদ্রপ্রতাপ যদি গণ্ডীর ভিতরে ঢুকতে না পায়, তাহলে সে গাছের উপরে গিয়ে উঠবে কেমন করে?'

আমি শুকনো হাসি হেসে বললুম, 'রুদ্রপ্রতাপ যদি একটা বাদুড় হয়ে শূন্যপথে ওই গাছের উপরে গিয়ে আবির্ভূত হয়?'

—'না, তা সে পারবে না। ঐ গণ্ডীর উপরকার শূন্যপথও তার কাছে বন্ধ।'

নেকড়ের চিৎকার এখন বেশ ভাল করেই শোনা যাচ্ছে। সে কী ক্ষুধিত চিৎকার! তার প্রভাবে দিকে দিকে প্রতিধ্বনিও যেন হয়ে উঠল বিষাক্ত!

আমার সামনে পড়ে ছিল বিশালগড়ে আসবার সেই সুদীর্ঘ সোজা রাস্তাটি। হঠাৎ দেখলুম, সেই রাস্তার উপর দিয়ে কারা এগিয়ে আসছে এইদিকেই। সচমকে ভাল করে তাকিয়ে বুঝলুম, কয়েকটা লোক মাথার উপর কি যেন একটা বহন করে আনছে।

অনিবাশবাবু সেই বড় গাছটার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, আমি তাড়াতাড়ি ত্রস্ত কণ্ঠে ডাকলুম, 'অবিনাশবাবু, অবিনাশবাবু!'

অবিনাশবাবু দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, 'কী?'

—'পথ দিয়ে কারা আসছে।'

অবিনাশবাবু ফিরে দাঁড়িয়ে পথের দিকে করলেন দৃষ্টিপাত।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে বললেন, 'পথ দিয়ে কারা আসছে, বুঝতে পারছেন না ?'

—'কারা আসছে ?'

—'সেই বেদের দল। আর ওদের সঙ্গে রয়েছে সেই বড় সিন্ধুকটা, যার ভিতরে দিনের বেলায় ঘুমিয়ে থাকে রুদ্রপ্রতাপ।'

আমি সভয়ে বললুম, 'রুদ্রপ্রতাপকে নিয়ে ওরা আমাদের সামনে আসতে সাহস করবে ? সে তো এখনো মৃতবৎ !'

গম্ভীর স্বরে অবিনাশবাবু বললেন, 'সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখুন।'

সূর্য তখন একটা ঝিমন্ত লাল আলোর গোল ফানুসের মত। আর মিনিট পাঁচ-ছয়ের মধ্যেই সে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাবে দিক-চক্রবালরেখার ওপারে।

অবিনাশবাবু বললেন, 'আপনি কি জানেন না বিনয়বাবু, ভোরের আলো ফোটবার আগেই রাতকানা পাখিদের ঘুম যায় ভেঙে ? তেমনি বোধহয় সূর্য ডোববার সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যা আসবার আগেই দিনকানা রুদ্রপ্রতাপের দেহে জাগে জীবনের চিহ্ন। বেদেরা আমাদের কাছে আসবার আগে সূর্যের মুখ আর আমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাব না। অতএব আমাদের এখন বেগে দৌড়ে এগিয়ে যেতে হবে ঐ বেদেগুলোর দিকে।'

আমি সবিস্ময়ে বললুম, 'কেন অবিনাশবাবু ?'

—'সূর্যাস্তের পরমুহূর্তেই রুদ্রপ্রতাপ হবে সিন্ধুকের ভিতর থেকে অদৃশ্য।'

—'বেদেরা দেখছি দলে ভারি। ওরা আমাদের বন্ধু নয়।'

অবিনাশবাবু আমার হাত ধরে টানতে টানতে অগ্রসর হয়ে বললেন, 'জানি বিনয়বাবু, জানি। ওরা আমাদের শত্রু। আমরাও ওদের বন্ধু নই। আমরাই ওদের আক্রমণ করব। বার করুন রিভলভার, দৌড়ে চলুন—আর কথা কইবার সময় নেই !'

অবিনাশবাবুর সঙ্গে সঙ্গে আমিও হলুম সবেগে ধাবমান। তিনিও রিভলভার বার করলেন, আমিও।

উত্তেজনায় আর একটা মস্ত বিপদের কথা ভুলে গিয়েছিলুম। তখন আমাদের খুব কাছ থেকেই শোনা যাচ্ছে নেকড়েদের ভীষণ চিৎকার। তাদের ঘন ঘন চিৎকারে থর্-থর্ করে কাঁপছে যেন সারা বন। তারা এসে পড়ল বলে।

খানিকটা ছুটেই আকাশে শঙ্কিত চক্ষু তুলে দেখলুম, চোখের আড়ালে নেমে গিয়েছে তখন সূর্যের আধখানা।

আমাদের ঐভাবে দৌড়ে যেতে দেখে বেদের দল দাঁড়িয়ে পড়ল। বাহকরাও সিন্দুকটা নামিয়ে রাখলে মাটির উপরে। তারপর লক্ষ করলুম, তাদের প্রত্যেকেরই হাতে কি যেন চক্‌চক্ করে উঠছে। অস্ত্র?

তাদের দলে লোক ছিল প্রায় পনেরো-ষোলো। আমরা মোটে দু-জন দেখে তাদের সাহস বেড়ে উঠল। তারাও বেগে এগিয়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে।

যখন আমরা তাদের কাছ থেকে বিশ-পঁচিশ হাত দূরে এসে পড়েছি, অবিনাশবাবু চিৎকার করে বললেন, 'রিভলভার ছুঁড়ুন বিনয়বাবু, রিভলভার ছুঁড়ুন!' দৌড়তে দৌড়তেই রিভলভার তুলে তিনি ঘোড়া টিপতে লাগলেন। আমিও ছুড়তে লাগলুম রিভলভার।

তারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল হতভম্বের মত। একটা বেদে গুলি খেয়ে মাটির উপরে দড়াম করে পড়ে গেল এবং তারপরে আবার দাঁড়িয়ে উঠে আর্তনাদ করতে করতে পালিয়ে গেল ওপাশের গভীর বনের দিকে। আর একটা বেদেও গুলি খেয়ে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল। তারপর অন্য বেদেগুলোরও সাহস গেল একেবারে উবে। তারা সকলেই উদ্‌ভ্রান্তের মত যে যেদিকে পারলে দৌড় মেরে সরে পড়ল। পরমুহূর্তে আমরা গিয়ে দাঁড়ালুম সেই সিন্দুকটার পাশে।

রিভলভারটা বাম হাতে নিয়ে অবিনাশবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'আগ্নেয়াস্ত্রে পিশাচ মরে না। পিশাচ বধ করতে গেলে

তার মুণ্ডটাকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করতে হবে দেহ থেকে।' ডান হাত দিয়ে কোমরে ঝোলানো ভোজালিখানা তিনি টেনে বার করে ফেললেন।

সেই সঙিন মুহূর্তেও আমার দৃষ্টি তখন আকৃষ্ট হল অন্য একদিকে। পথের ওপারে ছিল একটা মাঝারি আকারের এবড়ো-খেবড়ো মাঠ এবং তারই প্রান্তে ছিল গভীর জঙ্গল। আড়ষ্ট নেত্রে দেখলুম, সেই জঙ্গলের ঝোপঝাপের ভিতর থেকে লাফ মেরে মাঠের উপরে এসে আবির্ভূত হচ্ছে নেকড়ের পর নেকড়ে। তারা প্রত্যেকেই ছুটে আসতে লাগল আমাদের দিকেই।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললুম, 'অবিনাশবাবু! নেকড়েরা এসে পড়েছে!'

অবিনাশবাবু দৃঢ়স্বরে বললেন, 'আসুক নেকড়ের দল! পিশাচকে মেরে তবে আমরা মরব! ঐ দেখুন, সূর্য ডুবে গিয়েছে, আর সময় নেই।'

তাঁর মুখের কথা ফুরুতে-না ফুরুতেই সিন্দুকের ডালাটা খুলে গেল সশব্দে। তারপর স্তম্ভিত চক্ষে দেখলুম, সিন্দুকের ভিতরে সিধে হয়ে বসে আছে জাগ্রত রুদ্রপ্রতাপের ভয়াল মূর্তি। তার দুই চক্ষে জ্বলছে হিংস্র দৃষ্টি এবং ওষ্ঠাধরে মাখানো রয়েছে তীব্র বিদ্রূপের হাস্য।

হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে উঠে লাফ মেরে সিন্দুকের বাইরে এসে পড়ল, তারপর বিকট অট্টহাস্য করে সচিৎকারে বললে, 'ওরে আয় রে, আয় রে আয়, আমার বনের সন্তানেরা! তোদের সামনে এসেছে বলির পশু, দৌড়ে আয় রে, দৌড়ে আয়! তোদের উপবাস ভঙ্গ কর্, নিবারণ কর্ তোদের উদরের ক্ষুধা!'

প্রায় সারা মাঠটাই তখন যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। যেদিকে তাকাই সেইদিকেই দেখি নেকড়ের পর নেকড়ে—চক্ষু তাদের রক্তবর্ণ, হাঁ-করা মুখ তাদের দন্ত-কণ্টকিত, কণ্ঠ তাদের ভৈরব গর্জনে পরিপূর্ণ।

অবিনাশবাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন রুদ্রপ্রতাপের পিছন দিকে। প্রথমটা তিনিও থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তারপরেই নিজেকে সামলে

নিয়ে বিদ্যুৎ-গতিতে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন রুদ্রপ্রতাপের উপরে এবং চোখের পলক পড়বার আগেই দুই-দুই বার চালনা করলেন তাঁর হাতের ভোজালিখানা।

একটা প্রচণ্ড আকাশ-ফাটানো বিকট চিৎকার, এবং তারপরেই একদিকে ছিটকে পড়ল রুদ্রপ্রতাপের মুণ্ডটা এবং আর একদিকে ধরাশায়ী হল তার মুণ্ডহীন দেহটা।

চারিদিক একেবারে স্তব্ধ। নেকড়েদেরও চিৎকার শোনা যাচ্ছে না। বিপুল বিস্ময়ে ফিরে দেখি, নেকড়ের দল আবার ছুটে ফিরে যাচ্ছে মাঠের উপরকার নিবিড় অরণ্যের দিকে। রুদ্রপ্রতাপের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কি ফুরিয়ে গেল তার অপার্থিব মন্ত্রশক্তি? এতক্ষণ তারই ইচ্ছাশক্তি কি চালনা করছিল ওই নেকড়েগুলোকে?

হঠাৎ অবিনাশবাবু চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'দেখুন বিনয়বাবু, এদিকে ফিরে দেখুন!'

ফিরে দেখলুম এক অভাবিত ব্যাপার। রুদ্রপ্রতাপের মুণ্ডহীন দেহ এবং দেহহীন মুণ্ড আশ্চর্য রূপান্তর গ্রহণ করছে। কয়েক মুহূর্ত পরে সেখানে পড়ে রইল কেবল একটা বড় ও একটা ছোট জীর্ণ ধূলির পুঞ্জ। যে অভিশপ্ত দুর্দান্ত আত্মা এই রক্ত-মাংসে গড়া দেহটাকে অস্বাভাবিক রূপে জীবন্ত করে রেখেছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, আজ সেই আত্মার সংস্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই নশ্বর দেহটা আবার ফিরে পেয়েছে তার স্বাভাবিক অবস্থা। ধূলায় গড়া নশ্বর দেহ আবার পরিণত হয়েছে ধূলিপুঞ্জে।

অবিনাশবাবু অভিভূত স্বরে বললেন, 'ভগবানকে ধন্যবাদ দিন বিনয়বাবু! এতকাল পরে রুদ্রপ্রতাপের শাপমুক্ত দেহের আবার সদগতি হল। আর সে জাগবে না।'

খানিকক্ষণ আমরা দুইজনেই ভারাক্রান্ত মনে সেইখানে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলুম নীরবে। অরণ্যের উপরে ধীরে ধীরে নেমে আসছে অন্ধকারের যবনিকা, কিন্তু সে অন্ধকারকে আজ যেন মনে হল স্নিগ্ধ, শান্ত, সুন্দর।

কায়াহীনের কাহিনী

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

কাঠাহীনের কাহিনী

সূচীপত্র

হরতনের গোলাম	১
বাঁশির ডাক	১৮
লাট্টুর ঘূর্ণি	৪১
কঙ্কালের টঙ্কার	৫০
অতিথির আবদার	৬৯
খোট্টাই সরবৎ	৮২

হরতনের গোলাম

তোমরা অনেক আশ্চর্য ঘটনা কানে শুনেছ, কিন্তু আমি চোখে দেখেছি এক অত্যাশ্চর্য অদ্ভুত ঘটনা।. তখন আমার বয়স অল্প, বোধ হয় তের-চোদ্দ।

বৃন্দাবন,. ডাকনাম বিনু, ছিল আমার সবচেয়ে ভালবাসার বন্ধু। এক ক্লাসে পড়তুম, দিনরাত একসঙ্গে থাকতুম, সে ছাড়া আর কারো সঙ্গে খেলতে, কথা কইতে আমার ভাল লাগত না। আমাদের বাড়ির কাছেই ছিল তাদের বাড়ি।

তখন আমরা নতুন তাস খেলতে শিখেছি। বিনু সেবার এক দিনের জন্য মামার বাড়ি গিয়ে বিস্তি খেলা শিখে এসেছিল। এসেই সে আমায় ঐ খেলা শিখিয়ে দিলে। দু-জনেই নতুন খেলিয়ে, কিন্তু বিনু দু-চার বাজি খেলেই পাকা ওস্তাদ হয়ে উঠল। আমি প্রায় প্রতি হাতেই তার কাছে হারতুম। কোথায়ই বা তাকে জিতেছি? স্কুলের লেখাপড়ার প্রাইজে, খেলাধূলোর প্রাইজে, সে বরাবরই আমাকে হারিয়ে এসেছে। এমনকি নিমন্ত্রণ খেতে বসেও কোনদিন তাকে জিততে পারিনি; সে বরাবর আমার চেয়ে বেশি খেয়েছে। এক-এক সময় সন্দেহ হত আমার মায়ের স্নেহটিও বুঝি সে আমার চেয়ে বেশি করে জিতে নিলে। কিন্তু এতে আমার দুঃখ ছিল না। কারণ তাকে যে আমি সত্যি ভালবাসতুম।

রোজ সন্ধ্যার পর স্কুলের পড়া শেষ করে, খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে আমরা দুই বন্ধুতে আমাদের সদর বাড়ির পশ্চিম কোণে ভাঙা নহবতখানার নিচের অন্ধকার ঘরটায় লুকিয়ে বসে তাস খেলতুম। এই ঘরটায় পুরাকালে কে থাকত জানি না; এ বাড়ি যখন জমজমাট ছিল, তখন হয়ত কর্তাদের সানাইওয়ালারা এইখানে বসবাস করত। এখন এখানে দিনে রাতে কারো পায়ের ধুলো পড়ে না—এক চুপি

চুপি আমাদের ছাড়া। এই ঘরটা আমাদের দুই বন্ধুর ভারি মনের মত ঘর ছিল—এর মধ্যে বাড়ির ভিতরকার তাড়াহুড়ো এসে পৌঁছতে পারত না ; আমরা দু-জনে পায়রার খোপের মত একটুখানি জায়গায় বেশ নির্জনে নিশ্চিন্তে মুখোমুখি বসে মনের সুখে অবিরাম গলগল করতে পারতুম। আমাদের ছুটির দিনগুলো নির্বিঘ্নে, নিবিড় আনন্দে কাটত—এই ঘরখানির কোলে মাথা রেখে শুয়ে। বিনু নিজের হাতে ঐ ঘরের একটি কোণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখত। এর কোন আভরণ ছিল না—এর সমস্ত অভাব ও দৈন্যকে আমরা আমাদের অন্তরের আনন্দ দিয়ে ঢেকে রেখেছিলুম। নাহলে সেই কঙ্কালসার জীর্ণ অন্ধকার কোটরের মধ্যে আমাদের কচি দুটো প্রাণ কিছুতেই তিষ্ঠতে পারত না।

বিনু মামার বাড়ি থেকে একজোড়া তাস সংগ্রহ করে এনেছিল। বোধহয় তার মামাদের আড্ডার পরিত্যক্ত তাস। তাসজোড়াটা ছিল খুবই পুরোনো, ভদ্রসমাজে নিতান্তই অচল। সম্ভবত তাই এত সহজে সে বেচারা ওস্তাদ খেলোয়াড়াদের কড়া হাতের কঠিন চাপড় থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বিনুর ছোট্ট নরম হাত-খানিতে পড়বার সৌভাগ্য পেয়েছিল। বেচারাকে যে অনেক দিন ধরে অনেক চড় চাপড় সইতে হয়েছে সে তার চেহারা দেখলেই বোঝা যেত। কিন্তু কোন্ গুরুতর অপরাধে তার কানগুলো যে এমন নির্দয়ভাবে কাটা গিয়েছিল এবং কেনই বা তার বুকের উপর আঁচড় টেনে টেনে এমন ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছে তা আমরা বুঝতে পারতুম না। এ তার কোন্ পাপের শাস্তি ?—কে জানে।

তার এই জীর্ণ শীর্ণ চেহারা দেখে আমাদের কেমন মায়া করত, সেইজন্যে তার উপর জোর জবরদস্তি করতে পারতুম না। তাকে নিয়ে অতি সন্তর্পণে খেলতুম। আস্তে আস্তে তুলতুম, আস্তে আস্তে ফেলতুম, ভাঁজতুম খুব আলগা হাতে। খেলা শেষ হয়ে গেলে ধীরে ধীরে গুছিয়ে একখানি রুমাল মুড়ে তুলে রাখতুম—অতি যত্নে। সত্যিই বলছি, এই তাসকে এত ভালবাসতুম আমরা যে এর বদলে নতুন ঝকঝকে তাস কিনে আনতে আমাদের লোভটুকু পর্যন্ত হয়নি কোনদিন।

এই তাসের ছবি দেখে আমার মনে হত, এরা যেন এককালে এই বাড়িরই মানুষ ছিল, এখন তাস হয়ে গেছে। তোমরা হেসো না, এর হরতনের গোলামটিকে আমার মনে হত ঠিক যেন বুড়ো ঠাকুর্দার দারোয়ান এ। এর কৌটাওয়ালা তাসগুলোও যেন কেমন এক রকমের। এক-এক দিন বিনুর সঙ্গে খেলতে খেলতে প্রদীপের ঝাপসা আলোয় এর আটা-নওলা-দওলার রঙিন ফুটকিগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ আমার চোখ কেমন ধাঁধিয়ে যেত, মনে হত আমি যেন তাদের ঐ ফুটকিগুলোর ফাটলের মধ্যে দিয়ে কতদূর চলে গেছি—সে যেন কতকালের আগেকার কোনখানে। যারা অনেক কাল আগে এখানে ছিল যেন তাদের কাছে! সেখানে কী দেখতুম, কী শুনতুম মনে নেই, কিন্তু সে-সব দেখে শুনে কেমন তন্ময় হয়ে যেতুম। হঠাৎ বিনুর ডাকে আবার ফিরে আসতুম। সে ধমক দিয়ে বলত, 'কী বসে-বসে ভাবছিস? খেল না!' আমি অমনি তাড়াতাড়ি যা-হোক একখানা তাস ফেলে দিয়ে খেলায় আবার মন দিতুম। কিন্তু বুকটা কেমন ছম-ছম করতে থাকত। মনে হত এ নিশ্চয় জাদু-করা তাস!

বিনুকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলুম, 'এই তাস নিয়ে তোর মামার বাড়িতে কারা খেলত রে বিনু?' বিনু বলেছিল, 'শুনেছি দাদামশায় খুব পাকা খেলিয়ে ছিলেন; কেউ তাঁকে তাস খেলায় হারাতে পারত না। লোকে হিংসে করে বলত সে তাঁর খেলার গুণ নয়, তাসের গুণ! তিনি তাস গুণ করতে জানতেন। বোধহয় এ তাঁরই আমলের তাস।' বিনুর দাদামশায়কে আমরা চোখে দেখিনি। তার মামাদের দেখতুম খুব বুড়ো। উঃ, তাহলে না জানি তিনি কত বুড়ো! এ সেই আদ্যি-কালের বদ্যিবুড়োর হাতের গুণ-করা তাস! এ তাস ছুঁতে বুক ছম-ছম করত, কিন্তু তবু ভালবাসতুম বিনুর দেওয়া এই তাসজোড়াটাকে।

এই তাস নিয়ে বিনু গম্ভীর মুখে রোজ আমার সঙ্গে খেলত। তাকে খেলায় জিততে পারতুম না বলে সে প্রায়ই হাসতে হাসতে বলত, 'জানিস মল্লি, এ আমার দাদামশায়ের গুণ করা তাস। এ তাস হাতে থাকলে কেউ আমায় জিততে পারবে না, তুইও না।'

আমাদের আড্ডাঘরের দেয়ালে গোরুর চোখের মত একটা সরু কুলুঙ্গিতে ছোট্ট একটি তেলের প্রদীপ জ্বলত, আমাদের বসবার কোণটুকু আলো করে ; বাকি ঘরটা অন্ধকারের আবছায়ায় শুয়ে থাকত, কালো চাদর মুড়ি দিয়ে। খেলা জমে উঠত, সঙ্গে সঙ্গে রাতের অন্ধকারও জমে উঠত। একে একে বাড়ির প্রদীপ সব নিভে যেত, ঘরের পাশে সরু গলির পথটা ক্রমে নির্জন হয়ে আসত। চৌধুরী-বাড়ির দোতলার জানলা থেকে যে একফালি সরু আলো এসে অন্ধকার গলির উপর পড়ত, ক্রমে সেটুকুও অস্ত যেত ; গলির ফাঁকটা ভরাট হয়ে উঠত জমাট অন্ধকারে। আর সেই কালো পাথরের মত অন্ধকারের উপর দিয়ে মাঝে মাঝে শুনতুম কে যেন পায়চারি করছে লাঠি হাতে খড়ম পায়ে, খট-খটাস ! খট খটাস ! তার পরেই খুব দূর থেকে একটা খেঁকি কুকুর বুক ফেটে কাতরে উঠত, কেঁই কেঁই ! আর অমনি ঝুলের ঝালর ও মাকড়সার জাল দিয়ে ঘেরা আমাদের ঠাকুর্দার আমলের পুরানো ঠাকুরদালানের কালপেঁচা ও চামচিকে বাদুড়গুলো অন্ধকারের মধ্যে কখনো হুস্-হুস্ কখনো হিস্-হিস্ শব্দে তাদের বাচ্চাগুলোকে সাবধান করে দিত এবং মাঝে মাঝে ফট্‌ফট্ করে হাততালির আওয়াজে কাকে যেন আমাদের ঘরের দিকে তাড়িয়ে দিত। ঐ বুঝি সে এল ! এই ভাবতে ভাবতে আমার সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে আসত। হাতের তাস মাটিতে নামত না। বিমু ধমক দিয়ে বলত, 'কী করছিস ? খেল্ না !' তার ধমকানিতে আমার চটকা ভাঙত। আর সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকের ঐ বিশ্রী শব্দগুলোও যেন ভয়ে ভয়ে চুপ করে যেত। তা যদি না হত তাহলে বোধহয় ঘর থেকে ছুটে আমি বাবার কাছে পালিয়ে যেতুম, কিছুতেই বিমুর সঙ্গে খেলতুম না।

সেদিন খেলা আরম্ভ করতেই হঠাৎ খুব জোরে ঝড়-বৃষ্টি এল। একটা ঝড়ের দমকা আমাদের কোলের তাসগুলোকে উল্টে পাল্টে ভেস্তে দিয়ে ঘর থেকে খানিকটা ঝুল ও ধুলো উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। বিমু বললে, 'মল্লি, দরজা জানলাগুলো বন্ধ করে দে।' আমি উঠে জানলাগুলো বন্ধ করতে লাগলুম। পশ্চিমের জানলাটায় হাত দিতেই

কে যেন সজোরে আমার হাতে একটা ঝাঁকানি দিয়ে শেকহ্যাণ্ড করে চলে গেল। আমি তাড়াতাড়ি হাতটা ঘরের ভিতর ঢুকিয়ে নিলুম,—কিছু বুঝতে পারলুম না। বুকটা ধুক-ধুক করতে লাগল।

খেলতে বসেই সে-বাজি জিতলুম। আশ্চর্য কাণ্ড! যা কখনো হয়নি তাই হল। বিনুও অবাক। সে বেশি করে মন দিয়ে খেলতে বসল। কিন্তু পরের বাজিও জিততে পারলে না। আমার কেমন সন্দেহ হল—এলোমেলো ঝড় এসে তাসের জাদুটা উড়িয়ে নিয়ে গেল নাকি?

আমি ক্রমাগতই জিততে লাগলুম। কিন্তু আমার কেমন মনে হচ্ছিল এ জেতায় আমার কোন বাহাদুরি নেই; প্রতিবারেই এমন তাস আসছিল যে খেললেই পিঠ পাওয়া যায়; কে যেন ম্যাজিক করে ভাল-ভাল তাসগুলো বেছে বেছে আমার হাতে তুলে দিচ্ছে। বিনু বার-বার হেরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠল, 'আজ আমার পড়তা খারাপ পড়ল দেখছি!' তার দীর্ঘশ্বাসটা আমার বুকে গিয়ে বাজল। আমি চঞ্চল হয়ে উঠলুম। আমার মন কেঁদে বলতে লাগল, 'আমি জিত চাই না, বিনু জিতুক।' আমি ফন্দি করে বিনুকে জিতিয়ে দেবার জন্যে হাঁকু-পাঁকু করতে লাগলুম; কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। আজকের ঐ ঝড়ে কেমন যেন সব এলোমেলো হয়ে গেছে।

বিনু ফেলল হরতনের বিবি, তাকে সেই পিঠটা দেবার জন্যে আমি তাড়াতাড়ি ফেললুম গোলাম, কিন্তু পিঠ তোলবার সময় দেখা গেল গোলামটা চেহারা বদলে সাহেব হয়ে গেছে। কাজেই পিঠটা আমাকেই নিতে হল। পরের হাতে আমি ফেললুম চিড়ের দশ, আমি জানতুম বিনু এ দশ ফোঁটার লোভ কিছুতেই ছাড়তে পারবে না, সে নিশ্চয় গোলাম দিয়ে পিঠটা নেবে; বিনু ফেললও গোলাম, কিন্তু আমার দশখানা হঠাৎ দু-ফোঁটা চুরি করে কেমন করে যে আটা হয়ে গেল আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না। আমি অবাক; বিনু বাজি হেরে গোঁ হয়ে বসে রইল। রাগ হলে বিনুর বড়-বড় চোখদুটো আরও বড় হয়ে উঠতে দেখেছি, কিন্তু আজ যেন অস্বাভাবিক রকম বড়

হয়েছে বলে মনে হতে লাগল। সেবারের খেলাতে তার হাতে ক্লাই ইস্কাবনের দশখানার উপর চিড়ের সাতা পাশিয়ে দিতে গিয়ে যখন সেটা রঙের সাতার তুরুপ হয়ে গেল তখন তার সেই হঠাৎ-বড়-হয়ে যাওয়া চোখদুটো এমন একরকমভাবে বিস্ফারিত করে সে আমার দিকে চাইলে যে, সে-চাহনিতে আমার সর্বশরীর ঝিম-ঝিম করে এল।

বিনুকে ভয়ে-ভয়ে বললুম, 'ভাই, আর খেলে কাজ নেই। চল যাই।' বিনু সে-কথা কানেই তুললে না।

ক্রমে রাত গভীর হয়ে এল। মনে হল বাড়ির সবাই ঘুমিয়েছে ; আমাদের এ ঘরখানারও যেন ঘুম ধরেছে। এর দরজা জানলা ইট কাঠ ঘুমে ঢুলছে। প্রদীপের আলোটা থেকে-থেকে কেবল হাই তুলছে। কড়িকাঠের খোপে খোপে চড়াই পাখিগুলো গল্প শেষ করে শুয়ে পড়েছে। চারিদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। হাতের তাসগুলোর দিকে চেয়ে দেখি সাহেব বিবিদের চেহারা ঘুমে জড়িয়ে আসছে। ক্রমে মনে হল সমস্ত পৃথিবীটাই যেন ঘুমের ঝোঁকে ঢুলছে—ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্।

হঠাৎ চমক ভাঙল চৌধুরী-বাড়ির ঘড়ির শব্দে—ঢং! সেই শব্দ অন্ধকারের ঘুম ভাঙাতে ভাঙাতে অনেক দূর চলে গেল।

ওকি ? ও কিসের শব্দ ? কড়িকাঠের কাছে ঐ কোণের গর্ত থেকে কে অমন বিশ্রী সুরে নিশ্বাস টানছে—হুউউস্স্স্—হুউউস্স্! আমি চমকে উঠে বিনুকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'ও কিসের শব্দ ভাই ?'

বিনু কথা কইলে না। শুধু তাস থেকে চোখ তুলে কড়িকাঠের দিকে চাইলে, আর আমার মনে হল তার সেই ড্যাবডেবে চাহনিটা চোখ থেকে ঠিকরে বেরিয়ে কড়িকাঠের অন্ধকার কোণে গিয়ে এঁটে রইল—জ্বল-জ্বল করে চেয়ে আমার দিকে। বিনুকে কান্নার সুরে বললুম, 'ভাই, আমার বড় ঘুম পেয়েছে!'

বিনু বললে, 'আচ্ছা, আর দু-হাত।' আমি চমকে উঠলুম তার গলা শুনে। কী গম্ভীর আওয়াজ, এ তো বিনুর গলা নয়! কে তার গলার ভিতর দিয়ে কথা কইলে ?

কোন রকমে এই দু-হাত খেলা এখন শেষ করতে পারলে বাঁচি।

কোনদিকে কান দেবার, কোনদিকে চোখ দেবার আমার সাহস হচ্ছিল না। ইচ্ছা হচ্ছিল এই তাস দিয়ে চোখ কান ঢেকে ফেলি।

আমি খুব চোখের কাছে তাস এনে একমনে খেলতে লাগলুম।

সে-হাত বিনু খেলেছিল রঙের নওলা। আমার হাতে গোলাম ছিল, কিন্তু পিঠ নেবার ইচ্ছা ছিল না। কী করে লুকোলে বিনু সেটা ধরতে পারবে না ভাবছি, বিনু বলে উঠল সেইরকম বিষম ভারি গলায় স্বর কাঁপিয়ে, 'গোলামটা আছে তো?'

ভয় হল, ধরা পড়ে গেছি। বাঁ হাতের সারি থেকে চট্ করে হরতনের গোলামটা তুলে নিয়ে নওলার উপর ফেলতে গিয়ে দেখি— সামনে নওলা নেই, বিনুও নেই। অ্যাঁ!

বুকটা ধ্বক করে উঠল।

এপাশ ওপাশ চেয়ে দেখি, শুধু বিনু নয়, একখানি তাসও নেই। বোঁ করে মাথাটা ঘুরে গেল। চোখে অন্ধকার দেখলুম। গা হাত পা ঝিম-ঝিম করতে লাগল। ঘরের চার কোণ থেকে চারটে বিকট হাসি খিল-খিল শব্দে ছুটে বেরিয়ে এল। আর উপরের নহবতখানা থেকে ঢাক ঢোল কাঁশি বাঁশি সব একসঙ্গে বেজে উঠল। আমি কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে শুয়ে পড়লুম। মনে হল আমার হাত পায়ের সমস্ত খিল যেন আলগা হয়ে গেছে—উঠে হেঁটে পালাবার আর উপায় নেই।

আমার কান্না আসতে লাগল—বিনু—আমার বিনু কোথায় গেল? উপর থেকে ভাঙা কাঁশিখানা ফাটা আওয়াজে বলতে লাগল—কৈ না না, কৈ না না! আমি খুব চেঁচিয়ে ডাকলুম—'বিনু, বিনু!' কিন্তু আমার গলার স্বর মুখ দিয়ে না বেরিয়ে পেটের ভিতর চলে গেল—ঘুরতে ঘুরতে, গোঁ-গোঁ শব্দে।

একবার আশা হল বিনু হয়ত বাইরে গেছে—এখনি আসবে। কিন্তু বাঁ হাত থেকে ডান হাতে তাসটা নিয়েছি মাত্র—এইটুকু সময়ের মধ্যে সে এত বড় ঘর পেরিয়ে বাইরে গেল কেমন করে? হয়ত আমি অন্ধকারে দেখতে পাইনি। তাই হবে। এই মনে করে দরজার দিকে

এগিয়ে গেলুম। কিন্তু গিয়ে দেখি—একি, যেমন খিল বন্ধ করেছিলুম, ঠিক তেমনিই আছে। তবে সে কেমন করে বাইরে গেল ?

হঠাৎ মনে হল, বিনু আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে এই ঘরের মধ্যে লুকিয়ে নেই তো ?

কিন্তু কোথায় লুকোবে ? ঘর যে ফাঁকা। আসবাবের মধ্যে মাত্র একটা ভাঙা আলমারি। তার পেছনে বড়জোর আঙুল পাঁচেক জায়গা। তার মধ্যে একটা মানুষ থাকতে পারে না। তবু সেখানটা একবার দেখলুম। ঘরের এ কোণ ও কোণ এধার ওধার প্রদীপ ধরে দেখলুম তন্ন-তন্ন করে। কিন্তু সে কোথাও নেই—কোথাও নেই !

৩

কতক্ষণ পড়ে পড়ে কেঁদেছিলুম জানি না। যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম, তখনও কান্নার জলে চোখ আমার ঝাপসা। রাত তখন নিশুতি। চারিদিক নিঝুম। কেউ কোথাও নেই ; কেবল আমাদের তিনমহল প্রকাণ্ড বাড়িখানা দেখলুম ভয়ঙ্কর আতঙ্কে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেন ভয়ে তার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। চৌধুরীদের চৌতলার চিলের ছাদটা আমাদের দিকে এতখানি গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'কী হল রে, কী হল ? কোথায় গেল ?' পশ্চিম কোণের ঢ্যাঙা সুপারিগাছটা কিছু না বলে শুধু ডিঙি মেরে আকাশের দিকে মুখ তুলে ইসারায় দেখিয়ে দিলে—আমাদের বাড়ির ঠিক মাথায় একটা মস্ত বড় কালো পাখি তাসের মত নানা রঙে চিত্রবিচিত্র করা ডানা মেলে মেঘের অন্ধকারে ভেসে চলেছে—কাকে ঠোঁটে নিয়ে। তাই দেখে চারিদিক থেকে চাপা গলায় সবাই বলে উঠল,—'আ হা হা।' অমনি আমার বুকের ভিতরটা করে উঠল 'আ হা হা ! বিনুকে ওরা ভেল্‌কি-বাজিতে উড়িয়ে নিয়ে গেল !'

ভাবতে ভাবতে আমার চোখের সামনে থেকে যেন সব একে একে মুছে আসতে লাগল, পায়ের তলা থেকে পৃথিবীটা ধীরে ধীরে সরে যেতে

লাগল। আমি যেন একটা অতল অন্ধকারের মধ্যে ডুবতে লাগলুম পলে পলে, তালে তালে।

তারপর মনে পড়ে অন্ধকারে চেনা পথ ধরে বাড়ির ভিতরের দিকে যাচ্ছিলুম; হঠাৎ কানে এল তাস পেটার শব্দ—চটাস্ চটাস্! এত রাত্রে এখানে তাস খেলে কে? মুহূর্তের মধ্যে আমার চলা বন্ধ হয়ে গেল; আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলুম।

বারান্দার পশ্চিম কোণে ঘুরঘুট্টে অন্ধকারের মধ্যে আমাদের খাজনা-ঘর। দিনের বেলা এর সামনে দিয়ে যেতে আমাদের গা-ছমছম করে, সেজন্যে এ দিকটা আমরা কেউ মাড়াতুম না। আমাদের বিশ্বাস যত রাজ্যের ভূত প্রেত ঐখানে বাসা বেঁধে মনের সুখে ঘরকন্না করছে। আমরা ঐ মহলটা তাদের ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিলুম। সেখানে কস্মিনকালে সকাল-সন্ধ্যায় আলোগঙ্গাজল পড়ত না;—ঝাঁটও কেউ দিত না। এই খাজনা-ঘর যে কতকালের তা কেউ জানে না;—বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে পুরানো এই জায়গাটা। শোনা যায়, ঠাকুরদাদার যিনি ঠাকুরদাদা ছিলেন তাঁর আমলে জমিদারির খাজনা এলে এই ঘরে গচ্ছিত রাখা হত—মাটির তলায় একটা চৌখুপির মধ্যে। সরু সুড়ঙ্গের মত এই ঘর, সামনে মোটা মোটা লোহার গরাদে-দেওয়া খাঁচার মত দরজা—পিতলের শিকল দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো। সামনে দাঁড়ালে একটা স্যাঁতসেঁতে পচা গন্ধ নাকে আসে, আর চোখে পড়ে কালিঝুলি মাখা একটা অন্ধকারের কুণ্ডলী—দিন রাত ধুনির মত ঘুরছে।

এই ঘর কতকাল যে খোলা হয়নি তার ঠিক নেই। খোলার দরকারই হয়নি। কারণ বহুদিন হল আমাদের সে জমিদারি নেই, তার খাজনাও আর আসে না। ঠাকুরমার মুখে গল্প শুনেছি, আমার ঠাকুরদাদার যিনি ঠাকুরদাদা ছিলেন তাঁর অগুন্তি টাকা ছিল—একটা রাজা-রাজড়ার তেমন থাকে না। কিন্তু তিনি ভারি কৃপণ ছিলেন। একটি পয়সাও কাউকে প্রাণ থাকতে দিতে পারতেন না—এমন কি নিজের ছেলেমেয়েকেও নয়। তিনি কেবল টাকার পর টাকার রাশ জমা করে চলতেন। লোকে টাকা খরচ করে নাম কেনে, তিনি টাকা

না খরচ করার বাহাদুরিতে লোকের কাছে খেতাব পেয়েছিলেন। টাকার উপর তাঁর এমন মায়া ছিল যে, পাছে মারা যাবার পর তাঁর টাকা খরচ হয়ে যায় এই ভয়ে তিনি তাঁর যথাসর্বস্ব যখের হাতে সমর্পণ করে যান— যার কাছ থেকে একটি কানাকড়িও বার হবার জো নেই।

এই যখের কাহিনী একটা মস্ত বড় গল্প। কেমন করে একটি সুন্দর নয় বছরের ছেলেকে মেঠাই ও খেলনার লোভ দেখিয়ে তার বাপ মায়ের কাছ থেকে চুরি করে আনা হয়, কেমন করে তাকে লাল চেলি পরিয়ে, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে, ঐ অন্ধকার বাজনা-ঘরের তলায় বন্ধ চৌখুপির মধ্যে—যেখানে কেবল ঘড়া-ঘড়া টাকা সাজানো আছে, আর কিছু নেই, আর কেউ নেই—না বাপ, না মা, না আলো, না বাতাস—সেইখানে একলাটি বসিয়ে রেখে, তারপর ঐ চৌখুপিতে ঢোকবার পথটা দশ মণ পাথর দিয়ে চিরদিনের মত বুজিয়ে দেওয়া হয়, সে কথা শুনতে শুনতে আমার চোখে জল আসত—বুক দুর-দুর করত; আর ঠাকুরদাদার সেই পাষণ্ড ঠাকুরদাদার উপর রাগ হত। ঠাকুরমা বলতেন, 'আহা, ঐ সুন্দর নয় বছরের ছেলেটি কত কেঁদেছে, বাবা—বাবা করে বুক ফেটে কত চেঁচিয়েছে, তেষ্টায় একফোঁটা জলের জন্য ছটফট করেছে, তবু কেউ তাকে ঐ চৌখুপির দরজা খুলে দেয় নি।' শুনে আমার গলা কাঠ হয়ে আসত। তারপর খিধে তৃষ্ণায় ভয়ে কাতরাতে কাতরাতে বেচারা কখন যে হাঁপিয়ে মরে গেছে, সে হয়ত নিজেই বুঝতে পারে নি। এখন সে যখ হয়ে আছে—ঐখানে বসে বসে কেবল টাকার ঘড়া আগলাচ্ছে। কারো সাধ্য নেই যে ঐ টাকা সেখান থেকে নিয়ে আসে। আমার ঠাকুরদাদার বাবা নাকি একবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বেশি দূর যেতে হয় নি; মেঝের পাথরে একটিমাত্র শাবলের ঘা দিতেই তিনি গোঁ গোঁ করতে করতে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তিন দিন তাঁর কাঁপুনি ছিল, সাত দিন তাঁর মুখে রা ছিল না। কেন যে এমন হল কেউ জানে না। তিনি নিজেও কিছু বলেন নি। কারো সাহসও হয়নি জিজ্ঞাসা করতে। সেই থেকে ঐ ঘরের দিকে আর কেউ যায় না।

মনে হল ঐ খাজনা-ঘর থেকেই যেন তাস খেলার শব্দ পেলুম। যদিও ওদিকে যেতে বুক দুরদুর করতে লাগল, কিন্তু বিনুর জন্যে না গিয়ে পারলুম না; যদি সে ওখানে থাকে—যদি আমায় দেখতে পেয়ে ছুটে আসে!

বুকটা দু-হাতে চেপে খাজনা-ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। লোহার গরাদে-দেওয়া দরজা দিনের বেলা শিকল দিয়ে বাঁধা থাকে, কিন্তু এখন দেখলুম খোলা। অন্ধকারে চোখে কিছু দেখা গেল না, কিন্তু কানে শোনা গেল—কারা দু-জন যেন দরজার দুই ধার থেকে সজোরে ছুটে এসে মাথায় মাথায় অনবরত ঠোকাঠুকি করছে—দুম্ দুম্ দুম্! আমার কেমন মনে হল, যেন এইখানকার এই অগাধ সম্পত্তি, এই যখের ধন—কে নেবে তাই নিয়ে দুই ভূতের লড়াই চলেছে।

আমি একমনে এদের লড়াইয়ের তাল শুনছি, হঠাৎ বিনুর মত কার গলা পেলুম। সে বলছে, 'বিবির চেয়ে রঙের গোলাম বড়।' আর একজন কে সরু গলায় বলে উঠল, 'দূর বোকা, তা কখনো হয়? গোলাম হল সাহেব বিবির চিরকেলে কেনা গোলাম; হলই না-হয় সে রঙ মেখেছে!'

গোড়ায় গোড়ায় আমিও একদিন বিনুকে বলেছিলুম, 'গোলাম কেন বিবির চেয়ে বড় হবে বিনু?' বিনু বলেছিল—'এইরকম যে নিয়ম!' আজও আবার সেই কথা উঠেছে। এও তাহলে আমাদের মতন নতুন খেলিয়ে দেখছি।

আবার শুনলুম, 'তুই কিছুই খেলতে পারিস না! মল্লি তোর চেয়ে ঢের ভাল খেলে!' বিনু আমায় ডাকত মল্লি বলে।

মনে হল, আমার নাম যখন করছে, এ তখন নিশ্চয় বিনু। বিনুর গলায় আমার নাম শুনে ঐ ঘরের মধ্যে যাবার জন্যে আমার প্রাণটা আকুলি বিকুলি করতে লাগল, কিন্তু পারলুম না; ভয় হল পাছে ঐ ছুটো পাগলা ভূতের মাথা-ঠোকাঠুকির মধ্যে পড়ে থেঁতলে যাই। আমি চুপ করে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলুম।

হঠাৎ অন্য লোকটা চেঁচিয়ে উঠল—'অ্যাঁ, হরতনের গোলাম কোথায়

গেল? হরতনের গোলাম! ভারি আশ্চর্য!—এই ছিল, এই নেই! চোখের পাতা ফেলতে না ফেলতেই উড়ে গেল!'

আমার ভারি হাসি পেল—ঐ জাদু-করা তাস এদের সঙ্গেও জাদু খেলছে দেখছি!

বিনু বলে উঠল, 'হরতনের গোলাম?—সে তো মল্লির হাতে।'

আমি নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে দেখি—সত্যিই তো, সেই হরতনের গোলাম, যা দিয়ে বিনুর নওলার পিঠ নিতে গিয়েছিলুম, সেখানা আমার হাতেই রয়েছে তো!

অন্য লোকটা বলে উঠল—'কৈ হ্যায়—মল্লিবাবুকো পাকাড় লে-আও।'

সেই শুনে আমি তাড়াতাড়ি হরতনের গোলামখানা খানা ঘরের ভিতর ছুঁড়ে দিয়ে এক-ছুটে নিজের শোবার ঘরে পালিয়ে এলুম।

৪

ঘরে এসেও ভয়ে বুকটা ধ্বকধ্বক করতে লাগল—এই বুঝি সে এসে আমায় জাপটে ধরে নিয়ে যায়! আমি পা থেকে মাথা পর্যন্ত চাদর মুড়ি দিয়ে মড়ার মত পড়ে রইলুম। খানিকক্ষণ কেউ এল না, তারপর কে একজন খস-খস শব্দে বারান্দা দিয়ে চলে গেল—বোধহয় আমার ঘর চিনতে পারলে না।

আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। নিশ্চিন্ত হয়ে পাশ ফিরতে যাচ্ছি, এমন সময় কে আবার তড়াক করে লাফিয়ে আমার বিছানায় উঠল। আমি ভয়ে কাঠ! যে এল, সে খানিক বিছানার এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে আমার গা শুঁকে শুঁকে বেড়াতে লাগল। তারপর আমার মাথার কাছে এসে মুখে-ঢাকা চাদরখানা ধরে সজোরে টানতে লাগল—মুখ খুলে দেখবে। ওরে বাবা রে! আমি প্রাণপণে চাদরখানা আঁকড়ে রইলুম, কিছুতেই মুখ খুলতে দিলুম না। তারপর সে পায়ের দিকে এল। তার নিশ্বাসের হাওয়ায় আমার পা দুখানা ঠাণ্ডা হিম হয়ে এল। আমার পা ধরে হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে যাবে না তো? ভয়ে পা গুটিয়ে নেবার

চেষ্টা করলুম, পারলুম না। খানিকক্ষণ সে চুপ করে রইল, বোধহয় কি ভাবলে, তারপর আমার পাশে এসে চুপ করে শুয়ে পড়ল। সর্বনাশ, এখন করি কী? কিন্তু ঠিক সেই সময় আমার পুষি-বেড়ালটা ম্যাঙ শব্দে ডেকে উঠতেই সে তড়াক করে বিছানা থেকে লাফিয়ে পালিয়ে গেল।

পুষিকে কাছে পেয়ে আমার ভয় অনেক ভেঙে গেল। তখন আবার বিনুর ভাবনা এল—তাহলে সত্যিই কি বিনুকে ওরা ঐখানেই—ঐ চৌখুপির মধ্যে নিয়ে গেল! সেখান থেকে সে পালিয়ে আসবে কী করে? এইসব ভাবছি, হঠাৎ কে কানের কাছে মুখ এনে খুব চুপি-চুপি ডাকলে—'মল্লি, ভাই মল্লি! বিনুর কাছে যাবে? বিনুর কাছে?'

আমি ধড়মড় করে উঠে বসলুম, বিনুর কাছে যাবার জন্যে বুকটা লাফিয়ে উঠল। কিন্তু ভারি ভয় হতে লাগল—যদি আর ফিরে আসতে না পারি!

সে তখন বললে, 'ভয় কী? চল না! বিনু তোমার জন্যে বড় কাঁদছে!'

বিনুর কান্নার কথা শুনে আমার বুক ফেটে যেতে লাগল। আমি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলতে লাগলুম, 'ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, বিনুকে এবার ফিরিয়ে এনে দাও! বিনুর জন্যে আমার বড্ড মন কেমন করছে!'

আমার কান্না শুনে সে চুপি-চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় দেখলুম, একটা মস্ত পাগড়িওয়ালা চেহারা—ঠিক যেন হরতনের গোলাম।

এই হরতনের গোলামটিকে তাসের মধ্যে সবচেয়ে আমি বেশি ভালবাসতুম। আমাদের বাড়িতে যে বুড়ো থুরথুরে দরোয়ান ছিল ঠাকুরদাদার আমলের, তাকে খুব ছেলেবেলায় দেখেছিলুম, অল্প অল্প তার চেহারা মনে পড়ে; কিন্তু বেশ মনে আছে রোজ সকালে সে একটি করে রসমুণ্ডি আমায় খাওয়াত। কী মিষ্টি লাগত সে রসমুণ্ডি! এখনো যেন তার স্বাদ মুখে লেগে আছে। আমার মনে হল, এই হরতনের

গেলাম যেন সেই বুড়ো দরোয়ান—এখন তাসের ছবি হয়ে গেছে। সে বোধহয় আমার কান্না দেখে লাঠি হাতে বিন্নুকে খুঁজে আনতে গেল। আবছায়ার মত মনে পড়ে, ছেলেবেলায় আমার পুষি বেড়ালটা হারিয়ে যেতে আমার কান্না দেখে সে এমনি করে একদিন তাকে খুঁজে আনতে বেরিয়েছিল।

কতক্ষণ গেল, ঘরের ঘড়িটা টক-টক শব্দ করতে করতে কতদূর চলে গেল। মনের মধ্যে কত ভাবনা এল গেল—তবু বিন্নু এল না। হায়, সে কি আর আসবে? ঐ ভয়ঙ্কর চৌখুপি ঘর—যার সামনে দুটো ভীষণ ভূত মাথা ঠোকাঠুকি করছে অনবরত, সেখান থেকে বিন্নুকে কে উদ্ধার করে আনবে? ভাবতে ভাবতে আমার শরীর এলিয়ে আসতে লাগল, চোখের পাতা জড়িয়ে আসতে লাগল, কপালে যেন কে নরম ঠাণ্ডা হাত বুলিয়ে দিলে। আর অমনি এক নিমেষে মনে হল, আমি যেন একখানা তাসের উপর শুয়ে কোথায় চলেছি হাওয়ার সঙ্গে ভেসে ভেসে!

তাসখানা ভাসতে ভাসতে এসে আমায় একটা চারিদিক-আঁটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে নামিয়ে দিলে। দেখলুম সেই অন্ধকারে বসে দু-জন একমনে তাস খেলছে। বিন্নু আর একটি ছোট ছেলে—সুন্দর দেখতে, থোকা-থোকা কোঁকড়া চুল চাঁদের মত কপালের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। ঠিক যেন বিন্নুর ছোট ভাইটি। বিন্নু তার সঙ্গে খেলতে লাগল, আমার দিকে একবার চেয়েও দেখলে না। আমার ভারি রাগ হল—হিংসেও হল। এরি মধ্যে এর সঙ্গে এত ভাব! আমি মুখ গোঁ করে রইলুম।

ছেলেটি একবার তাস থেকে মুখ তুলে মিষ্টি সুরে জিজ্ঞাসা করলে, 'এ কে, বিন্নু?'

বিন্নু গম্ভীর গলায় বললে, 'ও মল্লি।'

সে বললে, 'বেশ হল, আমরা তিনটি ভাইয়ে কেমন একসঙ্গে এইখানে থাকব।'

আমি রেগে চিৎকার করে উঠলুম—'না, না—আমি এখানে কিছুতেই থাকব না।'

অমনি হরতনের গোলাম এসে আমায় পিঠে করে তুলে নিলে। বিনু সেটার উপর লাফিয়ে চড়তেই সেখানা ভারি হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। মজা দেখে ছেলেটা খিল-খিল করে হেসে উঠল।

'বিন্দু বললে, 'দাঁড়া আমরা তিনজনেই একসঙ্গে যাব।' বলে সে ছেলেটির কানে কানে কি বললে। ছেলেটি বললে, 'চল, যাই।' কিন্তু উঠে দাঁড়াতে গিয়েই ধুপ করে পড়ে গেল। দিনরাত এক জায়গায় বসে থেকে থেকে তার পা অসাড় হয়ে গেছে। বিনু তাকে কোলে করে তুলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল ঃ তাসগুলোকে কি বললে, তারা সর-সর করে উড়ে এসে পাখির মত ডানা ছড়িয়ে দাঁড়াল। আমরা উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় কড়িকাঠ থেকে দুটো কালো চামচিকে এসে তাসগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর দুই দলে যা যুদ্ধ! আঁচড়া-আঁচড়ি, কামড়া-কামড়ি! আমি ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলুম। চারিদিক থেকে অন্ধকারগুলো ছুটে এসে আমাদের সামনে তালগোল পাকিয়ে পথ আটকে দাঁড়াল—যেন আমরা পালাতে না পারি। ছেলেটি কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললে, 'বিনু, দেখছিস তো, এরা আমায় যেতে দেবে না। তোরা কেন প্রাণে মরবি? পালা।'

বিনু বললে, 'না ভাই, তোকে ছেড়ে কিছুতেই যাব না।' চামচিকেদুটো তাই শুনে ফ্যাঁস করে উঠল। এমন সময় হরতনের গোলামটা ছুটে গিয়ে একটা চামচিকের পেটে সজোরে এক ঘুসি বসিয়ে দিলে; চামচিকেটা তার ধারালো নখ দিয়ে হরতনের গোলাম-খানাকে আঁকড়ে ধরে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল, আর সেই ফাঁকে অন্য তাসগুলো আমাকে নিয়ে উড়ে পালাল। বিনু আর সেই ছেলেটি দেখলুম সেই ঝটাপটির মধ্যে হিমসিম খাচ্ছে। আমি তাদের উপর থেকে হাত বাড়িয়ে বিনুকে ডাকতে লাগলুম—'বিনু আয় আয়!' বিনু আমার দিকে ফিরেও চাইলে না! ছেলেটাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইল। আমার কান্না পেতে লাগল। তাসগুলো উড়তে উড়তে এসে আমাকে

বিছানার ফেলেই উড়ে গেল—বোধহয় বিনুদের উদ্ধার করতে। তারপর কী হল জানি না।

"মল্লি! মল্লি!"

আমি ধড়মড় করে উঠে বসলুম। ঝড়ের মত ধাক্কা দিয়ে কে ঘরের মধ্যে ঢুকল। সকালের আলোয় ঘরটা আলো হয়ে উঠল। মনে হল যেন একটা প্রকাণ্ড দুঃস্বপ্ন কেটে গেল। আমি ছুটে গিয়ে দুই হাতে বিনুর গলা জড়িয়ে ধরলুম—'বিনু, এসেছিস ভাই, এসেছিস!'

সে বললে, 'আসব না তো কী? তুই স্টুপিড এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোচ্ছিস কেন?'

আমি বললুম, 'কখন এলি ভাই?'

সে বললে, 'অনেকক্ষণ। তোকে ডেকে ডেকে আমার গলা চিরে গেল! তোর আজ হয়েছে কী? চোখ অমন রাঙা কেন?'

আমার ধাঁধা লাগল। বিনু তো সবই জানে, তবে এমন আশ্চর্য হচ্ছে কেন?'

আমি আমতা-আমতা করে বললুম, 'কাল রাত্রে তুই খেলতে খেলতে হঠাৎ অমন অন্তর্ধান—'

সে বাধা দিয়ে বললে, 'আমি কেন অন্তর্ধান হতে যাব? তুই তো খেলা ফেলে চোখ মুছতে মুছতে ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেলি!'

আমার আরও ধাঁধা লাগল। এ কি ঘুমের ঘোরে সবই স্বপ্নের মত দেখলুম! কিন্তু এত যে কাণ্ড, এ সবই স্বপ্ন? ইচ্ছা হচ্ছিল আগাগোড়া সব কথা বিনুকে খুলে বলে হেঁয়ালিটা পরিষ্কার করে নিই, কিন্তু পারলুম না। দিনের আলোয় কথাগুলো এমন অদ্ভুত বোধ হতে লাগল যে বলতে লজ্জা হল। আমার ভূতের ভয়ের জন্যে বিনু যা আমায় ঠাট্টা করে!

বিনু বললে, 'কী ভাবছিস? চল্ বাইরে যাই।'

আমরা দুই বন্ধুতে আমাদের সেই বাইরের ঘরে গিয়ে দেখি—ঘরময় তাস ছড়ানো, সমস্ত দেহ তাদের ক্ষতবিক্ষত। তাদের বুকের উপর যেন মনের আনন্দে ধারালো নখ দিয়ে কেবল আঁচড়ের পরে আঁচড়

টেনেছে। বেশ বোঝা গেল রাত্রের মধ্যে খুব একটা মারামারি কাণ্ড হয়ে গেছে। আমি সভয়ে বিনুর দিকে চেয়ে বললুম, 'বিনু, দেখছিস ?'

বিনু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, 'আমারই জন্যে তাসগুলো গেল !'

'অ্যাঁ, তোমারই জন্যে ? তার মানে ?—সেই চৌখুপি ঘর থেকে তোমাকে উদ্ধার করবার জন্যে ? তা হলে তো সবই ঠিক !'

কিন্তু বিনুর মুখ দেখে কিছু বুঝতে পারলুম না। একটু ইশারা পাবার আশায় আমি বিনুকে আবার জিজ্ঞাসা করলুম, 'কী করে এমন হল বিনু ?' বিনু কোন জবাব দিলে না, শুধু আঙুল দিয়ে ভাঙা আলমারিটা দেখিয়ে দিলে।

আমি আলমারি খুলতেই একরাশ আরশোলা ফর-ফর করে ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল। তারপর ডানা মেলে উড়ে অন্ধকার কোণের একটা গর্ত দিয়ে কোথায় চলে গেল—বোধহয় মাটির তলা দিয়ে সেই চৌখুপির মধ্যে। আমি হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইলুম।

বিনু বললে, 'তাসগুলো কুড়ো।'

আমি তাসগুলো কুড়িয়ে, গুছিয়ে দেখি সবই আছে, কেবল একখানা নেই—সেই হরতনের গোলাম।

তবে ?

এই তো ঠিক মিলছে। সেই হরতনের গোলাম—যাকে নিয়ে কাল রাত্রের ঐ সব অদ্ভুত ঘটনার উৎপত্তি—সে নেই কেন ? সে গেল কোথা ?

সে কোথায় আছে, আমি জানি। সে আছে সেইখানে—সেই চারিদিক-বন্ধ চৌখুপির মধ্যে, যেখানে সেই নয় বছরের সুন্দর ছেলেটি চিরদিন একা অন্ধকারে বসে আছে।

কালকের সব কাণ্ড বিনু নিশ্চয় ভুলে গেছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে তার আর কিছুই মনে নেই। তার যে ঘুম ! এমন তো আমারও এক-একদিন হয়। রাতের ঘটনা স্বপ্ন দেখার মত সকালে সব ভুলে যাই। কাল রাত্রে আমি যদি ঘুমিয়ে পড়তুম, তাহলে আমিও হয়ত

সব ভুলে যেতুম ; আজ সকালে উঠে অবাক হয়ে ভাবতুম—তাই তো, হরতনের গোলাম বেচারা গেল কোথায় ?

বাঁশির ডাক

আমার ছেলেবেলার জীবনে আরও একটা আশ্চর্য ঘটনা আছে। শুনলে তোমরা হয়ত বিশ্বাস করবে না। কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি।

তখন বিনুর সঙ্গে আমার ভাব হয়নি। পুঁটুই তখন আমার একমাত্র বন্ধু।

আমরা যে পাড়ায় থাকতুম, সে পাড়ায় সবচেয়ে বড় মানুষ ছিলেন চৌধুরীবাবুরা। মস্ত বড় বাড়ি, মস্ত গাড়ি-জুড়ি, মস্ত তাঁদের নামডাক। তাঁদের নহবতখানায় রোজ সকাল সন্ধ্যায় নহবত বাজত। আমার বেশ মনে পড়ে, সেই বাজনার শব্দে সকালে আমার ঘুম ভাঙত, আর ঘুম থেকে উঠে সকালের আলো সকালের বাতাস ভারি মিষ্টি মনে হত। এঁদের বাড়িতে এক প্রকাণ্ড পেটা ঘড়ি ছিল, কী গম্ভীর তার আওয়াজ —সে আওয়াজ কাঁপতে কাঁপতে কত দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যেত! ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঐ ঘড়ি বাজত—ঠিক সময়টিতে, কোন দিন একটু ব্যতিক্রম হত না। এক-একদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে এই ঘড়ির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আমার ছোট মনটি বুক থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে দূর দূরান্তর চলে যেত—বুঝি আকাশের সেই শেষ কিনারায়।

প্রত্যহ ইস্কুল যাবার সময় এই চৌতালা বাড়ির সামনে দিয়ে আমি যেতুম। মনে হত এ যেন কোন গল্পে শোনা স্বপ্নে দেখা কাদের ইন্দ্রপুরী। প্রকাণ্ড লোহার ফটক—তার সামনে মস্ত পাগড়ি মাথায় এক লম্বা সেপাই। অনবরত এধার থেকে ওধার পায়চারি করছে— বিশ্রাম নেই, বিরাম নেই। তার হাতের চকচকে ধারালো সঙিনটা রৌদ্রের আলোয় থেকে-থেকে ঝক-ঝক করে উঠত। মনে হত, যে ঐ বাড়িতে ঢুকতে যাবে ঐ সঙিনের খোঁচায় সেপাই তাকে গেঁথে ফেলবে।

বাড়ির চারপাশ মোটা মোটা উঁচু গরাদ দিয়ে ঘেরা—যেন কেল্লা বন্দী! সেই গরাদের ফাঁক দিয়ে কোথাও উঠোনের একটুখানি ফালি, কোথাও পাথরে বাঁধানো একটু রোয়াক, কোথাও বাগানের একটু টুকরো দেখা যেত। এক জায়গায় দেখতুম সারি সারি রকম বেরকমের আট দশটা ঘোড়া বাঁধা—যেমন ঝকঝকে তাদের রঙ তেমনি সুন্দর তাদের চেহারা, তেমনি তেজালো। একবার ছাড়া পেলেই যেন তীরবেগে ছুট দেয়! মনে হত অনেকখানি তেজ যেন আটকা পড়ে ছটফট করছে। তাদের সেই ছটফটানি তাদের পায়ের তলাকার মেঝেতে খট্‌খট্ শব্দে বেজে উঠে চারদিকে আগুনের ফিনকি ছড়াত। তারই পাশে ছিল মোটা মোটা বাঁধা লিকালকে সরু-পা ছুঁচোল-মুখ একসার কুকুর। ফোঁস-ফোঁস শব্দে অনবরত মাটি শুঁকছে—একটু রক্তের গন্ধ পেলেই যেন লাফিয়ে পড়বে। এই ঘোড়াশালের ঘোড়া দেখতে দেখতে ভাবতুম হাতিশালটা কোথায়? কিন্তু গরাদের ফাঁক দিয়ে কোথাও খুঁজে পেতুম না; বোধহয় ঐ কোণের দিকে ছিল।

লোহার ফটক পেরিয়ে খানিক দূর গেলেই ছোট্ট একটা বাগান—সুন্দর কেয়ারি করা। চারধারে ফুলের গাছ, তার মধ্যিখানে ময়ূরের প্যাখম-ছড়ানো পিঠ দেওয়া এক সোনালী সিংহাসন। সকালে দেখতুম এই সিংহাসন খালি, কিন্তু বিকেলে যখন পুঁটুদের বাড়ি বেড়াতে যেতুম, তখন দেখতুম এই সিংহাসনে বসে একটি সুন্দর ছেলে—ঠিক যেন রাজপুত্তুর। বয়স তার আমার চেয়ে কম। আমার চেয়ে রোগা, কিন্তু আমার চেয়ে ফর্সা অনেক। বড় বড় দুটি চোখ, কোঁকড়া কোঁকড়া চুল—থোলো থোলো হয়ে চাঁদপানা মুখের উপর এসে পড়েছে।

এই ছেলেটিকে দেখতে আমার বেশ লাগত। মনে হত ঠিক যেন গল্পের রাজপুত্তুর। পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়ে এ কোনদিন কোন অচিন দেশে চলে যাবে, সেখানে কত কাণ্ড করবে। তারপর সাত ডিঙা ভরে ধন দৌলত আর রাজকন্যাকে নিয়ে ঘরে ফিরবে। ছেলেটি সন্ধ্যার আকাশের দিকে চেয়ে কি ভাবত। বোধহয় সেই অচিন দেশের কথা।

রেলিঙের ধারে রোজ আমায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমার সঙ্গে বোধহয় তার ভাব করবার ইচ্ছে হত। এক-একদিন সে তার সিংহাসন ছেড়ে আমার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসত। বোধহয় সে আমাকে তার রাজ্যের পাত্তরের পুত্তুর, কি মিত্তরের পুত্তুর মনে করত—যাকে সঙ্গে নিয়ে সে কোন দেশদেশান্তর চলে যাবে। আমি কিন্তু তাকে আসতে দেখেই ছুট দিতুম। তার সঙ্গে আলাপ করতে আমার কেমন ভয় হত—যদি সে আমায় নিয়ে আমার মা-বাপকে কাঁদিয়ে কোন অজগর বনে চলে যায় মৃগয়া করতে! সে যদি আমাদের পুঁটুর মত হত তাহলে তখনই আমি তার সঙ্গে আলাপ করে ফেলতুম। কিন্তু সে যে ছিল একেবারে অন্য রকম—রাজপুত্তুরের মতন! আমি ছুটে পালাবার সময় দেখতুম, সে লোহার রেলিং ধরে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে যেন অত্যন্ত কাতরভাবে। তার সেই চাহনি দেখে আমার কেমন মায়া করত। আমি যদি তার কেউ আপনার জন হতুম, তাহলে তার ঐ চোখের দুঃখ হাত দিয়ে মুছিয়ে দিতুম। আহা, ওর কি কেউ বন্ধু নেই?

ছেলেটা নিশ্চয় ছিল মায়াবী। নইলে রোজ পুঁটুদের বাড়ি যাবার সময় তাকে দূর থেকে একবার না দেখে থাকতে পারতুম না কেন? রোজ ভেবেছি আর যাব না, কিন্তু যাবার সময় কেমন করে যে গিয়ে পড়তুম, নিজেই বুঝতে পারতুম না। কিন্তু রেলিং-এর এ-পাশ থেকে তাকে দেখতেই আমার আনন্দ ছিল, ওপাশে যাবার লোভ আমার কোন দিনই হয়নি, বরং বিতৃষ্ণাই ছিল।

কিন্তু হঠাৎ একদিন সব ওলোট-পালোট হয়ে গেল। সেদিন চড়কের মেলা। চৌধুরীবাবুদের বাড়ির উত্তর কোণে চৌমাথায় মেলা বসেছে,—নানারকম খেলনা বিক্রি হচ্ছে। এক জায়গায় একটা লোক ফানুস বিক্রি করছিল। আমি সেইখানে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলুম। কত রঙের ফানুস—লাল, নীল, সবুজ, হলদে, একসঙ্গে তাড়া করা। পেট-ফুলো সেই ফানুসগুলো সরু সরু সুতোয় বাঁধা; সেই বাঁধনটুকু ছিঁড়ে নীল আকাশে উড়ে পালাবার জন্যে তারা ছটফট করছিল; কেবলই

মাথা দোলাচ্ছিল। আমি ভাবছিলুম এদের একটা যদি কোনরকমে ছাড়া পায়, তাহলে দেখি কতদূর সে উড়ে যায়—কতদূর—কতদূর। আমার হাতে যদি তখন কেউ একটা ফানুস দিত, আমি ঘরে না নিয়ে গিয়ে সেটাকে আকাশে ছেড়ে দিতুম। সে কেমন দুলতে দুলতে বাতাসে ভাসতে ভাসতে কোথায় কোন্ স্বপ্নলোকে চলে যেত।

হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে পিছন থেকে কে আমায় কোলে তুলে নিলে। হাতদুটো তার খুব কড়া ঠেকল বটে, কিন্তু তুলে নেবার ধরনে জোর নেই; যেন আদর আছে। সে আমাকে একেবারে সেই চৌধুরীবাবুদের কেয়ারি-করা বাগানের মধ্যে এনে হাজির করলে। আমার মন থেকে তখনও সেই রঙিন ফানুসের নেশা কাটেনি। আমার কেমন বোধ হতে লাগল, ঐ ফানুসগুলোই যেন আমাকে এখানে উড়িয়ে এনেছে।

একটা ফুলগাছের ঝোপ থেকে গুঁড়ি মেরে সেই ছেলেটি বেরিয়ে এল। বুঝি এতক্ষণ সে লুকিয়ে ছিল! তাড়াতাড়ি ছুটে এসে আমার হাত ধরে সে বললে, 'তোমার নাম কী ভাই?'

কী মিষ্টি গলার সুর! আমার সর্বাঙ্গের অস্বোয়াস্তি মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। কিন্তু আমি কোন কথাই কইতে পারলুম না। সে আস্তে আস্তে আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে তার সেই সোনালি সিংহাসনে আমায় বসালে। তারপর সে আমার পায়ের কাছটিতে মাটিতে গা হেলিয়ে পা ছড়িয়ে বসে পড়ল। আমি তন্ময় হয়ে তার সেই সুন্দর মুখখানি, টানা টানা চোখদুটি একদৃষ্টে দেখছিলুম, হঠাৎ সে বলে উঠল, 'অমন করে কী দেখছ? আমার সঙ্গে ভাব করবে না?'

ভারি ইচ্ছা হতে লাগল ছুটে গিয়ে এই মিষ্টি আদরের জবাব দিই, কিন্তু গলা কেমন আটকে গেল, চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল, চোখের কোণে জল আসতে লাগল।

সে তার পাতলা টুকটুকে ঠোঁটদুখানি একটু কাঁপিয়ে বললে, 'রাগ করেছ ভাই ধরে এনেছি বলে? নইলে তুমি যে আসতে চাও না। কী করব? তোমার সঙ্গে যে বড্ড ভাব করতে ইচ্ছে হল—

তাই তো ধরে আনলুম। রাগ কর তো আবার ছেড়ে দিই।' বলে আস্তে আস্তে তার সেই সুন্দর মুখখানি আমার মুখের কাছে এগিয়ে আনলে। ইচ্ছে হতে লাগল সেই মুখখানি দু-হাতে ধরে বলি, না না রাগ করিনি। কিন্তু পারলুম না।

সে হতাশ দৃষ্টিতে আমার নির্বাক মূর্তির দিকে খানিক চেয়ে রইল। দেখতে দেখতে তার মুখখানি শুকিয়ে এল, চোখের পাতা ভারি হয়ে উঠল। একটি ছোট্ট নিশ্বাস ছেড়ে সে বললে, 'আমার সঙ্গে ভাব করবে না? আমার বন্ধু হবে না? আচ্ছা বেশ, তোমায় ছেড়ে দিলুম।' বলে সে আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে। আমি আর থাকতে পারলুম না, ছুটে গিয়ে তার মুখখানি দু-হাতে ধরে আমার দিকে ফিরিয়ে নিলুম। সে হেসে বললে, 'তবে তুমি আমার বন্ধু হলে?' আমি ঘাড় নাড়লুম—'হ্যাঁ।'

সে মহা আনন্দে আমার হাত ধরে টানতে টানতে সমস্ত বাগানটা ঘুরিয়ে এক জায়গায় এনে দাঁড় করালে। সেখানে একটা গাছের ডালে বাঁধা লাল, নীল, হলদে রঙের একতাড়া ফানুস—ঠিক তেমনি বাঁধা, যেমন মেলার হাটে বিক্রি হতে দেখেছিলুম। সে সেই ফানুসগুলো নিয়ে এক একটি করে বাঁধন খুলে উড়িয়ে দিতে লাগল,—একটুও মায়া করলে না। মনের আনন্দে কী যে করবে যেন খুঁজে পাচ্ছিল না। ছাড়া-পাওয়া ফানুসগুলো উড়ে উড়ে সন্ধ্যার ঝাপসা আকাশটাকে রঙে রঙে একেবারে রঙিন করে তুললে। সব ফানুস-গুলো যখন ছাড়া শেষ হয়ে গেল, তখন সে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'আমার নাম সুরজিৎ। আমাকে তুমি সুরো বলে ডেকো—কেমন?'

আমাদের দু-জনকার খুব ভাব হয়ে গেল। এর পর থেকে প্রায় প্রতিদিনই এই বাগানের মধ্যে আমাদের দুই বন্ধুর খেলার আসর, গল্পের আসর জমতে লাগল। সুরোর খেলনার অন্ত ছিল না। ঘুড়ি-লাটাই, ফুটবল, ব্যাটবল, মারবেল—এসব তার অগুনতি ছিল। মাঝে মাঝে সে নতুন নতুন রঙিন, বাক্সয়-বন্ধ নানারকম ছবিওয়ালা

বিলিতি খেলা নিয়ে আসত। সেইসব খেলা আমায় শেখাত। আমরা দু-জনে খেলতুম। এ ছাড়া সুরোর একটি কাঠের বাঁশি ছিল, সে চমৎকার বাজাত এই কাঠের বাঁশিটি। আমার ভারি ভাল লাগত। আমি আশ্চর্য হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করতুম, 'কোথা থেকে শিখলি ভাই বাজাতে ?' সে বলত, 'রানীমায়ের কাছে।'

রানীমা ছিলেন সুরোরই মা। সুরো শুধু মা না বলে কেন তাঁকে রানীমা বলত জানি না। কিন্তু তার মুখে ঐ রানীমা ভারি সুন্দর মিষ্টি শোনাত। মায়ের কত কথা সুরো আমার কাছে বলত। শুনতে আমার ভারি ভাল লাগত—ঠিক গল্পের মতন। এই গল্প শুনে শুনে মনে মনে রানীমায়ের একটা ছবি আমি তৈরি করে নিয়েছিলুম। সেই ছবিটিকে ভালবাসতে আমার ভারি ইচ্ছা করত। তাঁকে চোখে দেখিনি, কিন্তু সুরোর বাঁশির সুরে মনে হত যেন তাঁরই মিষ্টি গলা শুনছি।

সুরোর সঙ্গে এত ভাব হয়ে গেলেও আমার মনে হত, যে যেন সামান্য ছেলে নয়—সে সত্যিকার রাজপুত্তুর! বিশেষ, সে যখন বাঁশি বাজাত আর রানীমায়ের গল্প বলত তখন কোন দেশের কোন রাজপুত্র সুরজিৎ আমার চোখের সামনে জ্যান্ত হয়ে উঠত। আর ঐ চৌতালা প্রকাণ্ড বাড়িটাকে মনে হত যেন কোন দূর দূরান্তরের রাজপুরী। আমি দূর আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবতুম, সন্ধ্যাবেলায় বাজানো রাজপুত্র সুরজিতের এই বাঁশির সুর বাতাসে ভাসতে ভাসতে কোন রাজকুমারীর বুকে গিয়ে বাজছে কে জানে!

সুরো হঠাৎ বাঁশি থামিয়ে হেসে আমায় জিজ্ঞাসা করত: 'অমন এক মনে আকাশের দিকে চেয়ে কী ভাবছিস ?'

আমি থতমত খেয়ে যেতুম। সুরো বাঁশি ফেলে আমার হাতখানি তুলে নিয়ে তার গালে মুখে বুলিয়ে দিত।

হঠাৎ একদিন হাসি খেলা গান গল্প সব বন্ধ হয়ে গেল—সুরোর অসুখ হয়ে। আমি যেদিন সেই বাগানে গিয়ে সুরোকে প্রথম দেখতে পেলুম না, যখন দেখলুম সমস্ত বাগানখানা শূন্য, তখন আমার মনে হল রাজপুত্র আমায় যেন একা ফেলে কোন দুর্গম দেশে চলে গিয়েছে;

বাগানের বাতাস আর গাছের পাতা হা হা করে কাঁদছে। এক দিন গেল, দু দিন গেল, সপ্তাহ গেল, তবু সুরোর দেখা নেই। আমাদের খেলার আসর যেমন শূন্য তেমনি শূন্য রয়ে গেল। ইচ্ছে হত, ভারি ইচ্ছে হত—ঐ চৌতালা বাড়িটার মধ্যে গিয়ে সুরোকে একবার দেখে আসি—একটিবার মাত্র, কিন্তু কী করে যাব ঠিক করতে পারতুম না। সুরোর সঙ্গে দেখা হত না, কিন্তু মাঝে মাঝে রাত্রে ঘুমের মাঝে এসে সে যেন আমায় বাঁশি শুনিয়ে যেত। আমি বাঁশির শব্দে জেগে উঠতুম, কিন্তু জেগে সে বাঁশি আর শুনতে পেতুম না। আশায় আশায় কতক্ষণ জেগে থাকতুম। কিন্তু হায়, সে বাঁশি আর বাজত না।

শুনলুম তার জ্বরবিকার হয়েছে। শুনেই বুকটা ধড়াস করে উঠল। কাকার ছোট ছেলে খুতুর জ্বরবিকার হয়েছিল। তার সেই অসুখের ছটফটানি, ধমকানি, আবোল তাবোল গোঙানি—সব আমার দেখা ছিল। সুরোর সেই একই অসুখ হয়েছে শুনে আমার সমস্ত বুকটা আতঙ্কে কাঁপতে লাগল। খুতু পনের দিনের দিন মারা যায়; সুরোর যদি তাই হয়? না, না! একথা মনে আনতেই কান্না আসে! কিন্তু মন থেকে ঐ পনের দিনের আতঙ্কটা কিছুতেই দূর করতে পারতুম না। মনে মনে ঠাকুরকে বলতুম, 'হে ঠাকুর, ঐ পনের দিনটা যেন না আসে!

চৌধুরীবাড়ির সকাল সন্ধ্যায় নহবৎ বন্ধ হয়ে গেল। ঘণ্টায় ঘণ্টায় যে ঘড়ি বাজত তাও আর শোনা যেত না। সেপাইদের ঘরে রাত্রে মাদলেও আর কাঠি পড়ত না। পাড়ার লোকেরা সুদ্ধ যেন পা টিপে টিপে চলত—পাছে শব্দ হয়, পাছে খোকাবাবু চমকে ওঠে, পাছে তার অসুখ বাড়ে।

আমি স্কুল যাবার সময় সুরোদের বাড়ির দিকে চেয়ে ভাবতুম—সে কোনখানে কোন্ ঘরটিতে শুয়ে আছে তার রানীমায়ের কোলে মাথা দিয়ে। ভাবতে ভাবতে মনে হত যেন কেমনতর একটা ঝাপসা কালো ছায়া সেই বাড়ির গায়ে ছড়িয়ে পড়েছে। দেখে আমার ভয় করত। তারপর বিকেলে স্কুল থেকে ফেরবার সময় আমি আমাদের

সেই খেলার বাগানের সামনে চুপি চুপি এসে দাঁড়াতুম। দেখতুম ছেঁড়া ন্যাকড়া পরা ভিখারীর দল চোখ মুছতে মুছতে ফিরে যাচ্ছে। দেখে আমার কান্না পেত।

এইসব ভিখারীদের রোজ সন্ধ্যাবেলা সুরো ভিক্ষা দিত। সে বলত তার রানীমা এই ভিক্ষা দেওয়ার খেলা তাকে শিখিয়েছেন। এই খেলাতে দেখতুম সুরোর সবচেয়ে যেন বেশি আনন্দ। এই ভিখারীর দল এলে সে সব খেলা ফেলে, সবকিছু ভুলে এদের কাছে ছুটে যেত। তার সেই সুন্দর হাতখানি নেড়ে নেড়ে সে কাউকে চাল, কাউকে পয়সা, কাউকে জল বিতরণ করত। আবার কখনও কখনও কোন গরিব মেয়েকে বাগান থেকে বেছে একটি ফুল তুলে দিত। যে যা পেত, খুশি হয়ে হাসিমুখে চলে যেত। এখন আর সুরোর সেই ভিক্ষা দেওয়া খেলা নেই এদের মুখে সে হাসিও নেই। তাদের সেই শুকনো মুখ দেখে আমারও বুকটা শুকিয়ে আসত।

দেখতে দেখতে সেই সর্বনেশে পনেরর দিনটা এগিয়ে এল। সে দিন সকালে উঠেই শুনলুম—সুরোর আজ খুব বাড়াবাড়ি, আজকের দিনটা কাটে কি না। পনের দিনের দিন খুহু যখন মারা যায়, তখনও ঠিক এই কথাই শুনেছিলুম। সেই কথা মনে পড়ে বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। কেবলই মনে হতে লাগল—সুরোকে যদি আজ একটিবার দেখতে পাই, তাহলে তার গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দিই।

সারাদিন সুরোর জন্যে মনটা কেমন ছটফট করতে লাগল। তাদের বাড়ির আশেপাশে দিনের মধ্যে কতবার ঘুরে এলুম। কেবলই মনে হচ্ছিল কে যেন বলবে সুরো ভাল আছে, কোন ভয় নেই। ওদের বাড়িতে কত লোক এল, কত লোক গেল, কিন্তু কেউ সে-কথা বললে না। সবাই যেন মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। খুহু যেদিন মারা যায় ঠিক এমনি ধারাই হয়েছিল।

রাত্রে যখন বুড়ি ঝি বিছানা পেতে দিতে এল, আমার তখন কেমন কান্না পাচ্ছিল। আমি বুড়িকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'বুড়ি, সুরো কি সত্যি বাঁচবে না?'

বুড়ি বললে, 'সবাই তো তাই বলছে ভাই।'

আমি বললুম, 'ওরা তো রাজা, ওরাও কি ইচ্ছে করলে নিজের ছেলেকে বাঁচাতে পারে না?'

বুড়ি বললে, 'ভাই, যম কি আর রাজা প্রজা মানে?'

সুরো তাহলে বাঁচবে না? আমি বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লুম। বুড়ি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। আমি তো কই কাঁদিনি, তবু বুড়ি বললে, 'কেঁদো না ভাই, ঘুমোও।' মনে হল বুড়ি যেন তার ডান হাত দিয়ে তার চোখদুটো একবার মুছে নিলে। রোজ রাত্রে শোবার সময় এই বুড়ির সঙ্গে আমি সুরোর কত গল্পই করতুম। আজ আর কোন গল্প করতে ইচ্ছে হল না।

বুড়ি আমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললে, 'ঘুমুলি ভাই?'

আমি বললুম, 'না, আমার আজ আর ঘুম আসছে না। তুই যা।'

বুড়ি বললে, 'দেখ, চৌধুরীবাবুদের খোকাকে বাঁচাবার এক উপায় আছে—কিন্তু সে কি ওরা পারবে?'

আমি বিছানায় উঠে বসে বললুম, 'কী উপায়, বুড়ি?'

সে বললে, 'তাহলে আমাদের দেশের একটা গল্প বলি শোন।' আমি চুপ করে রইলুম। বুড়ি গল্প বলতে লাগল।

সে অনেক দিনের কথা। আমি তখন খুব ছোট—তোর চেয়েও বোধহয় বয়স কম। আমি তখন দেশে আমার বাপের বাড়িতে থাকতুম। আমাদের দেশের রাজার সবেধন একমাত্র ছেলে। অনেক মানত অনেক পুজো স্বস্ত্যয়ন করে এই ছেলে হয়। এই ছেলের ভাতে রাজবাড়িতে মহা ধুম লেগে গেল। তেমন ধুম আমাদের দেশে কেউ কখনও দেখেনি। যাত্রা, পাঁচালি, তরজা—কত রকমের আমোদ যে হয়েছিল তার ঠিক নেই। সাত দিন সাত রাত্রি গাঁয়ের কেউ ঘুমোয়নি। দিন রাত হৈ-হৈ রৈ-রৈ ব্যাপার। চারিদিক থেকে এত লোক এসেছিল যে গাঁয়ে আর লোক ধরে না,—বোধ হত যেন মস্ত মেলা বসে গেছে। তার উপর রাজা দেশবিদেশ থেকে

যত বড় বড় সাধু সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ, ফকির নিমন্ত্রণ করে আনিয়ে ছিলেন তাঁর ছেলেকে আশীর্বাদ করে যাবার জন্যে। তাদের দেখবার জন্যেই বা ভিড় কত! এই সাধু সন্ন্যাসীরা কেউ বটতলায়, কেউ পঞ্চাননতলায়, কেউ চণ্ডীতলায় আসন পেতে বসলেন। সাজু মোড়া রাজবাড়ির পাল্কি, সামনে সেপাই বরকন্দাজ এবং ভিতরে রাজপুত্তুরকে নিয়ে বটতলা থেকে পঞ্চাননতলা, পঞ্চাননতলা থেকে চণ্ডীতলা সকাল সন্ধ্যা সাধু সন্ন্যাসীদের আশীর্বাদ কুড়িয়ে ফিরতে লাগল। সন্ন্যাসীরা কেউ পায়ের ধুলো দিয়ে, কেউ যজ্ঞের ভস্ম দিয়ে, কেউ বা একটি রাঙা রুদ্রাক্ষ দিয়ে ছেলেকে আশীর্বাদ করলেন। কত দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ, কত বাউল ফকির যে কত রক্ষা কবচ, সিদ্ধ কবচ, সিদ্ধকবচ এবং হরেক রকমের মাদুলি দিলেন তার ঠিক নেই। মাদুলির ভারে সেই আট মাসের ছেলের গলা ও ঘাড় ঝুঁকে পড়ল, হাত আড়ষ্ট হয়ে গেল। বেচারা হাত তুলে, ঘাড় নেড়ে যে একটু খেলা করবে, তার উপায় রইল না। সবাই বললে, হ্যাঁ এ ছেলে নীরোগ তো হবেই, চাই কি অমরও হতে পারে।

কিন্তু অদৃষ্ট যাবে কোথায়? আটদিন যেতে না যেতেই ছেলে অসুখে পড়ল। সাধু সন্ন্যাসীরা অনেক চরণামৃত দিলেন, কিন্তু কোন ফল হল না—অসুখ বেড়েই চলল। এত আমোদ আহ্লাদ দুদিনের মধ্যেই কর্পূরের মত উবে গেল। অমন জমজমাট গাঁ হানাবাড়ির মত হাঁ-হাঁ করতে লাগল। রাজাবাবু কেবল সন্ন্যাসীদের ছাড়লেন না। তিনি হুকুম দিলেন ছেলেকে না সারিয়ে কোন সাধু সন্ন্যাসী গাঁ ছেড়ে যেতে পারবেন না। গেলে টের পাবেন! সন্ন্যাসীরা কেউ বটতলায়, কেউ পঞ্চাননতলায় বসে নানারকম ক্রিয়াকাণ্ড শুরু করে দিলেন। রোজ রোজ নতুন নতুন মাদুলি কবচ তৈরি হতে লাগল। শেষে রাজাবাবু বলে পাঠালেন যে ছেলের গায়ে মাদুলি বাঁধার আর জায়গা নেই। উপায় কী?

এত করেও কিছুতে কিছু হল না। ছেলে এখন যায় তখন যায় হয়ে উঠল। রাজবাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। বাড়ির চাকর দাসী

সবাই বলাবলি করতে লাগল, ছেলে বাঁচবে না। তখন ছেলের এক মামা কোন শহর থেকে এক বড় ডাক্তার এনে হাজির। করলে ডাক্তার এসেই আগে তাড়াতাড়ি ছেলের বুক থেকে নিজের হাতে মাদুলি কবচ সব খুলে ফেলে দিলে, কারো কথা শুনলে না,—বললে মাদুলির ভারে এ ছেলে নিশ্বেস নিতে পারছে না, দম আটকে আসছে।

ডাক্তার আসতেই গাঁয়ে আবার হৈ-চৈ পড়ে গেল। লোকজন এদিক ওদিক ছুটোছুটি করতে লাগল—এটা আন, ওটা আন, সেটা আন। গাঁ থেকে শহর পর্যন্ত ঘোড়ার ডাক বসে গেল, সেপাই বরকন্দাজ সবাই ডাক্তারের লেখা কাগজ হাতে ওষুধ আনতে ছুটল, কেউ বরফ আনতে ছুটল, কেউ আরও কত কি আনতে ছুটল। এই গোলমালের মধ্যে সাধুসন্ন্যাসীদের দিকে আর কারও নজর রইল না। তাঁরা সেই ফাঁকে যাঁর যেখানে সরে পড়লেন। বটতলা, পঞ্চাননতলা ফাঁকা হয়ে গেল। কেবল চণ্ডীতলা থেকে জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসী নড়লেন না; তিনি অটল হয়ে বসে রইলেন।

আমার মা ছিলেন এই রাজপুত্রের দাসী। এই ছেলের ভাতে তিনি পরনে পেয়েছিলেন গরদের শাড়ি, হাতে পেয়েছিলেন সোনার অনন্ত। আর আমি পেয়েছিলুম একখানি লাল চেলি, আর আমার ছোট ভাইটি পেয়েছিল একটি রূপোর ঝুমঝুমি।

'আমার ছোট ভাই তখন বোধহয় বছরখানেকের হবে। মা রাজবাড়ি থেকে একবার সকালে, একবার দুপুরে, একবার সন্ধ্যাবেলা এসে তাকে দুধ খাইয়ে যেতেন। সারাদিন সে আমার কাছে থাকত। সে কাঁদলে আমি তাকে কোলে বসিয়ে দোল দিয়ে খেলা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতুম। রাত্রে সে আমার বুকটিতে হাত রেখে আমার পাশে চুপ করে ঘুমিয়ে থাকত। আমার ভাইটি ছিল ভারি লক্ষ্মী, আমাকে একটুও জ্বালাতন করত না। তার সেই কচি কচি নরম হাত দিয়ে আমায় সে জড়িয়ে ধরত, আমার এখনও তা মনে লেগে আছে।

'ডাক্তার আসতে দিন-দুয়েক রাজপুত্রের অসুখ একটু কম্ পড়ল। মা আমার ভাইটিকে দুধ খাওয়াতে এলে তাঁর মুখেই শুনতুম। কিন্তু

ছু-দিন না যেতেই অসুখ আবার বেড়ে উঠল। একদিন সন্ধ্যাবেলা মা এসে আমাকে চুপি চুপি বললেন, 'আজ রাতটা বোধহয় কাটবে না!' বলে মা আমার তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। আমার ভাইটিকে একটুও আদরও করলেন না, একটু দুধও খাওয়ালেন না। দেখে মায়ের উপর আমার ভারি রাগ হল। আমি ঝিনুকে করে একটু গাই-দুধ আমার ভাইটিকে খাইয়ে দিতে গেলুম, কিন্তু সে খেতে চাইলে না, আমার কোলেই ঘুমিয়ে পড়ল। আমি তাকে বিছানায় শুইয়ে দিলুম। সে আজ আর আমার বুকে হাতটি রেখে ঘুমোল না। আমার মনে কেমন অস্বোয়স্তি হতে লাগল। আমার ভাল ঘুম হল না। আমি রাত্রে উঠে উঠে তার গায়ে হাত দিয়ে দেখতে লাগলুম। সে অঘোরে ঘুমতে লাগল।

পরদিন মা রাজবাড়ি থেকে একবারও এলেন না—ছেলেকে দুধ খাওয়াতে। আমার ভাইটিও এমন লক্ষ্মী যে সারাদিন কাঁদলে না, চুপটি করে পড়ে রইল। আমি তাকে দুধ খাওয়াতে গেলুম, সে দুধ গিলতে পারলে না। আহা বেচারার দোষ কী? আমি ছেলেমানুষ কি দুধ খাওয়াতে জানি? বেচারা সারাদিন দুধ না খেয়ে পড়ে রইল, কিন্তু এমনই লক্ষ্মী যে তবু একটুও কাঁদলে না। আহা, ভাইটি আমার! মায়ের উপর ভারি রাগ হতে লাগল। এমন লক্ষ্মী ছেলেকে হেনস্থা করে!

সারা রাত্রির মধ্যেও মা এলেন না। আমি একলাটি ভাইকে নিয়ে পড়ে রইলুম। পরের দিন সকালে এসে মা বললেন, 'বোধহয় মা চণ্ডী মুখ তুলে চাইলেন। রাজকুমার আজ সাত দিন পরে চোখ মেলে চেয়েছে। কাল দিন রাত কোথা দিয়ে কেমন করে কেটেছে, ভগবানই জানেন।' বলে মা আমার ঘরের দিকে ছুটে গেলেন।

'আমার ভাইটি তখনও ঘুমোচ্ছিল। আমার মা গিয়ে তাকে আদর করে ডাকলেন—'খোকন! খোকন! খোকন আমার!' খোকন কোন সাড়া দিলে না। তার সেই রূপোর ঝুমঝুমিটা ধরে মা তার কানের কাছে কত বাজালেন, কিন্তু ভাই আমার আর জাগল না। বলে বুড়ি চুপ করল।

আমি ধড়মড় করে উঠে বসে বললুম, 'কী হল বুড়ি? তোমার ভাইয়ের কী হল?'

সে বললে, 'কী হল ভাই, তা তো বুঝতে পারলুম না। সে আর ঘুম থেকে জাগল না। অনেক অনেকে কথা বললে। কেউ কেউ বললে "ঐ' যে চণ্ডীতলায় সন্ন্যাসী অচল অটল হয়ে বসে ছিল, সে-ই নিশির ডাক দিয়ে আমার ভাইয়ের প্রাণটিকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে।"

আমার পাশ থেকে আমার ছোট ভাই মুটু বলে উঠল, 'নিশির ডাক কী বুড়ি?' সে বোধহয় এতক্ষণ ঘুমোয়নি, শুয়ে শুয়ে বুড়ির গল্প শুনছিল।

বুড়ি বললে, 'নিশির ডাক? সে, ভাই, বড় সর্বনেশে কাণ্ড। তার কথা ভাবতেও বুকে কাঁটা দিয়ে ওঠে!'

মুটু বললে, 'নিশির ডাকে কী হয় বুড়ি?'

বুড়ি বললে, 'জ্যান্ত মানুষের প্রাণপুরুষ মরা মানুষের দেহে চলে যায় আর অমনি দেখতে দেখতে মরা মানুষ বেঁচে ওঠে, আর জ্যান্ত মানুষ ধড়ফড়িয়ে মারা যায়।'

মুটু বললে, 'তাই বুঝি তোমার ছোট ভাই মারা গেল, আর তোমাদের রাজকুমার বেঁচে উঠল?'

বুড়ি বললে, 'আমাদের গাঁয়ের লোকেরা তো তাই বলে ভাই। তাদের কেউ কেউ নাকি দেখেছিল জটাজুটধারী ত্রিশূল-হাতে এক খ্যাপা ভৈরব সেই রাতের অন্ধকারে একটা ডাব হাতে করে আমাদের বাড়ির আশে-পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

মুটু বললে, 'ডাব হাতে করে কেন?'

বুড়ি বললে, 'ঐ ডাবের মধ্যে করেই তো প্রাণপুরুষকে নিয়ে যায়। ঐ ডাব হচ্ছে মন্ত্রপড়া ডাব। কালভৈরবের পুজো দিয়ে, সাত দিন সাত রাত্রি অনাহারে, অনিদ্রায় অনবরত একমনে মারণ-মন্ত্র জপ করে সিদ্ধভৈরবরা ঐ ডাবকে গুণ করে। ঐ ডাব তখন আর ডাব থাকে না,—ওর মধ্যে তখন কালপুরুষের আবির্ভাব হয়। সেই

কালপুরুষ এসে তাঁর হাতের মৃত্যুদণ্ডটি মানুষের বুকে ছুঁইয়ে বুকের ভিতর থেকে প্রাণটিকে খসিয়ে নিয়ে চলে যান।'

মুটু বললে, 'যার প্রাণটাকে নিয়ে যায়, সে কিচ্ছু করতে পারে না?'

বুড়ি বললে, 'তার সাধ্য কী কিছু করে! তার প্রাণ সুড়সুড় করে কালভৈরবের সঙ্গে চলে যায়।'

মুটু বললে, 'ওর কোন উল্টো মন্ত্র নেই? যে মন্ত্র জপ করলে কালভৈরব আর কাছে ঘেঁসতে পারে না?'

বুড়ি বললে, 'না কোন উল্টো মন্ত্র নেই বটে, কিন্তু নিশির ডাকে যদি সাড়া না দাও, তাহলে কালভৈরবের ঠাকুরদাদাও তোমার কিছু করতে পারবে না।'

মুটু বললে, 'নিশির ডাকে সাড়া দেওয়া কাকে বলে?'

বুড়ি বললে, 'তা বুঝি জান না? ঐ মন্ত্রপড়া ডাব নিয়ে ভৈরবরা নিশুত রাতে, যখন চারিদিক ঘুটঘুট করছে, সবাই যখন ঘুমিয়েছে, কেউ কোথাও জেগে নেই, সেই সময় কালো ত্রিশূল হাতে, কালো কাপড় পরে, বাড়ির দরজায় দরজায়, বাড়ির জানলার কাছে কাছে—যেখানে ছোট ছোট ছেলেরা ঘুমোয়, সেইখানে ঘুরে বেড়ায়, আর আস্তে আস্তে মিষ্টি গলায় ছেলেদের নাম ধরে ডাকে। যে ছেলে ঘুমের ঘোরে সাড়া দেয়, কালপুরুষ এসে তার প্রাণটিকে বুক থেকে খসিয়ে নেয়—।'

মুটু বললে, 'যে সাড়া দেয় না?'

বুড়ি বললে, 'তার কিছুই হয় না। সে যেমন ছিল তেমনিই থাকে।'

'আর যে সাড়া দেয়?'

'তার প্রাণপুরুষটি তার ঐ সাড়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুক থেকে বেরিয়ে আসে। তারপর চুম্বক যেমন লোহাকে টানে তেমনি ঐ মন্ত্রপড়া ডাব প্রাণপুরুষকে নিজের দিকে টানতে থাকে। প্রাণপুরুষ ডাবের কাছাকাছি এলেই ভৈরব ঠাকুর ঐ ডাবের মুখটি একবার খুলে ধরেই চট করে বন্ধ করে দেন, তখন প্রাণপুরুষ ঐ ডাবের মধ্যে আটকা পড়ে যায়।'

'তারপর?'

'তারপর ঐ ডাবের মুখটি একটুখানি ফাঁক করে প্রাণ-সুদ্ধ ডাবের জল মরা মানুষকে খাইয়ে দেয়—মরা মানুষ সেই নতুন প্রাণ পেয়ে বেঁচে ওঠে।'

নুটু বললে, 'প্রাণপুরুষ সেখান থেকে ফুড়ুৎ করে পালিয়ে এসে নিজের দেহে ঢুকে পড়ে না কেন ?'

'তা কি আর পারে ভাই ? সে তখন বত্রিশ নাড়ীর বাঁধনে বাঁধা পড়ে গেছে—তার কি আর পালাবার জো আছে ? সে তখন পালাতেও পারে না—থাকতেও তার ভাল লাগে না।'

'থাকতে ভাল লাগে না কেন ?'

'নিজের বাড়িঘর ছেড়ে পরের বাড়িতে থাকতে কি মানুষের ভাল লাগে ? সে তবু বাড়ি, এ নিজের দেহ ছেড়ে পরের দেহে বাস করতে হয়!—এ কি কম কষ্ট! নিজের মা বাপ থাকতে পরের মাকে মা বলতে হয়, পরের বাপকে বাপ বলতে হয়; নিজের ভাই বোন কেউই আর তখন আপনার থাকে না।'

'সব পর হয়ে যায় ?'

'সব পর হয়ে যায়।'

'তোমার সেই ছোট ভাইটি পর হয়ে গেলে, সে তোমায় চিনতে পারত ?'

'পারত বৈকি। সেই রাজকুমারের বড়-বড় চোখের ভিতর থেকে আমায় উঁকি মেরে দেখে সে আমায় খুব চিনতে পারত—এ আমি বেশ টের পেতুম। আমার মনে হত সে যেন মাঝে মাঝে ইসারা করে বলত, "দিদি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে তোমাদের কাছে নিয়ে যাও!" '

নুটু বলে উঠল, 'তুমি তাকে কোলে নিয়ে ছুটে পালিয়ে যেতে না কেন ?'

'কী করে যাব ভাই! সে কি তখন আমার ছোট ভাইটি আছে ? সে যে তখন রাজপুত্তুর—পরের ছেলে!'

'তোমার ভাই তাতে কাঁদত ?'

'কাঁদত বৈকি। আমার দিকে চেয়ে চেয়ে তার চোখ দিয়ে টস-টস করে জল গড়িয়ে পড়ত।'

'তুমি তাকে খুব আদর করতে না কেন?'

'আদর করতুম তো। কিন্তু সে আদর তো আমার ভাই পেত না, সে পেত আমাদের গাঁয়ের রাজাবাবুর ছেলে। যে গায়ে আমি হাত বুলোতুম সে গা তো আমার ভাইয়ের গা নয়। সে যে রাজকুমারের গা, তাতে আমার ভাইয়ের প্রাণ খুশি হবে কেন? সে তাতে আরও কাঁদত। রাজার বাড়ির এত আদর যত্নেও আমার ভাইয়ের প্রাণে কোন সুখ ছিল না—এ আমি তার সেই মুখখানি দেখেই বুঝতে পারতুম। আহা, তার চেয়ে আমার ভাইটি আমাদের গরিবের ঘরে নুন ভাত খেয়ে অনেক সুখে থাকত।'

নুটু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে উঠল, 'এ তোমার গল্প, না? এসব কথা সত্যি না, না বুড়ি?'

বুড়ি বললে, 'না ভাই, এ সব সত্যি। এর একটুও মিথ্যে নয়।'

নুটু বললে, 'এ গল্প ভাল নয়, একটা ভাল গল্প বল বুড়ি।'

বুড়ি বললে, 'না, আজ আর গল্প না, তোরা ঘুমো—রাত হল।' বলে বুড়ি বাসন মাজতে চলে গেল। আমি বুড়ির গল্পের কথা ভাবতে ভাবতে শুয়ে পড়লুম।

নুটু দেখি অনেকখানিকটা আমার কাছে সরে এসে আমার গায়ে হাত দিচ্ছে। আমি বললুম, 'কী রে নুটু?'

নুটু বললে, 'দাদা, বড় ভয় করছে!'

আমি বললুম, 'কিসের ভয়?'

'যদি নিশিতে ডাকে?'

আমি বললুম, 'সাড়া দেব না।'

'যদি দিয়ে ফেলি।'

'তাহলে ভারি মুস্কিল হবে কিন্তু।'

নুটু ভয় পেয়ে বলে উঠল, 'তবে কী হবে!' বলে সে কেঁদে ফেললে।

আমি তার গায়ে হাত বুলিয়ে বললুম, 'তোর কোন ভয় নেই, আমি তোকে পাহারা দেব।'

ঘুটু চোখ মুছতে মুছতে বললে, 'কিন্তু দাদা, তুমি যেন অন্যমনস্কে সাড়া দিয়ে ফেলো না।'

আমি বললুম, 'না রে না, কোন ভয় নেই। এখানে—এই শহরে নিশির ডাক কোথা থেকে আসবে?'

ঘুটু বললে, 'যদি আসে। তুমি দাদা জানলাগুলো বন্ধ করে দাও।'

আমি উঠে জানলাগুলো বন্ধ করে দিলুম। ঘুটু আমার বুকের কাছটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আমার ঘুম আসছিল না, আমি শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলুম—সুরোর কথা।

রাত কত জানি না, বুড়ি হঠাৎ আবার ঘরের মধ্যে হন্তদন্ত হয়ে এসে বললে, 'কিরে, তোরা ঘুমুলি?'

আমি বললুম, 'কেন বুড়ি?"

সে খুব চাপা গলায় বললে, 'ভাই, তোরা আজ খুব সাবধানে থাকিস।'

আমি বললুম, 'কেন কী হয়েছে?'

সে বললে, 'বড় সর্বনেশে কথা শুনে এলুম। চৌধুরীবাবুদের খোকাকে ডাক্তার বদ্যি এলে দিয়েছে—বিষবড়ি খাইয়েও কিছু হল না।'

আমি বলে উঠলুম, 'বুড়ি, কী হবে? আমি তাকে একবার দেখতে পাব না? কত দিন তাকে দেখি নি!'

বুড়ি আঁৎকে উঠে বলে উঠল, 'না, না! এখন তাকে দেখতে ইচ্ছে করিসনি—সর্বনাশ হবে!'

আমি বললুম, 'কেন বুড়ি?'

বুড়ি বললে, 'সে তুই ছেলেমানুষ বুঝতে পারবি না! তুই, ভাই, আজ চুপ করে থাক, সুরোর কথা আজ আর মনে তোলাপাড়া করিসনি।'

আমি বললুম, 'তুই অমন করছিস কেন বুড়ি, কী হয়েছে?'

বুড়ি বললে, 'ভাই, কী হয়েছে বুঝতে পারছি না; আমার ছোট

ভাইটি যে-রাতে মারা যায় সে-রাতেও আমার বুক এমনি ধড়ফড় করেছিল। তখন কিছু বুঝতুম না, তাই ঐ সর্বনাশটা হয়ে গেল। আজ তোরা কারুর ডাকে সাড়া দিস নি—বুঝলি?—কারুর ডাকে নয়!'

আমার বুকটা কেমন ছ্যাঁৎ করে উঠল। আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, 'তবে কি আজ নিশির ডাক হবে?'

বুড়ি বললে, 'সেই রকমই তো মনে হচ্ছে। আজকের রাতটা কিরকম ভয়ানক অন্ধকার হয়ে উঠছে—কেবলই গা-ছম-ছম করছে। গাছপালাগুলো অবধি ভয়ে কাঠ হয়ে আছে! বাড়িগুলো যেন থর-থর করে কাঁপছে! আকাশের বুকের ভিতরটা যেন দুর-দুর করছে! আজ বাতাসের গায়ে যেন প্রকাণ্ড একটা কাল প্যাঁচা কেবলই ডানা দিয়ে ঝাপটা মারছে—ঝপ্-ঝপ্ ঝপ্-ঝপ্!'

আমি বললুম, 'কিন্তু ভৈরব-ঠাকুর কি এসেছে?'

বুড়ি বললে, 'এসেছে বৈকি! শুনলুম চৌধুরীবাবুরা কোথা থেকে এক ভীম ভৈরবকে আনিয়েছে। আমি ছাদে উঠে দেখলুম, ওদের ঐ ঠাকুরবাড়ির দিক থেকে কালো কুণ্ডলী ধোঁয়া উঠছে—বোধহয় কালভৈরবের পুজো হচ্ছে।'

আমি বললুম, 'কিন্তু বুড়ি, মুটু যে ঘুমিয়ে রইল। ও তো কিছু জানলে না।'

বুড়ি বললে, 'ওকে জাগিয়ে দে ভাই, জাগিয়ে দে।'

আমি মুটুকে ধরে ঠেলে দিতেই সে ধড়মড় করে উঠে বসে ঢুলতে লাগল। আমি তাকে ঠেলা দিতে দিতে বললুম, 'মুটু, আজ নিশির ডাক হচ্ছে—চুপ করে বসে থাক!'

মুটু ঘুমের ঘোরে আমার গলা জড়িয়ে ধরে ফ্যাল-ফ্যাল চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল—কোন কথা বললে না। আমি বললুম, 'বুড়ি, তুই আজ আর এখান থেকে নড়িস নি।'

বুড়ি বললে, 'তা আর বলতে! আমি এই সারা রাত জেগে রইলুম।' বলে সে আঁচল পেতে মাটিতে শুয়ে পড়ল। তারপর

বললে, 'দেখ, দু-চোখের পাতা এক করিস নি, তাহলেই ওরা নিছুলি মন্ত্র দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেবে।'

আমি লুটুকে ধরে বসে রইলুম। পাছে ওরা নিছুলি মন্ত্র দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয় এই ভয়ে কিছুতেই চোখ বুজোলুম না। লুটু কিন্তু আমার গায়ের উপরই ঘুমিয়ে পড়ল। একটু পরে দেখি বুড়িরও নাক ডাকছে। আমি ডাকলাম—'বুড়ি! বুড়ি!' সে সাড়া দিলে না। নিশ্চয় ওরা নিছুলি মন্ত্রে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে—এই কথা ভাবছি, এমন সময় কে যেন একটা ঝাপটা দিয়ে ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিয়ে গেল। সব অন্ধকার। আমি চেঁচিয়ে উঠলুম—'বুড়ি! বুড়ি! লুটু! লুটু!' জবাব পেলুম না। সব একেবারে চুপ। আমি একা সেই থমথমে অন্ধকারে অসাড় হয়ে বসে রইলুম। জানলার ফাঁক দিয়ে বাইরের অন্ধকারগুলো ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে আমার আশে-পাশে, চারিদিকে কালো কালো বিকট চেহারার নানা রকম মূর্তি তৈরি করে দেখাতে লাগল। আমি কাঠ হয়ে একদৃষ্টে সেইসব দেখতে লাগলুম। চোখ বুজোতে পারলুম না, পাছে ঘুমিয়ে পড়ি।

কিন্তু নিছুলি মন্ত্রে আমার চোখের পাতা ক্রমেই ভেরে আসতে লাগল। ঝিম-ঝিম করতে লাগল। মাথার ভিতরটায় কে যেন সুড়-সুড়ি দিতে লাগল। হাত, পা, কোমরের খিলগুলো হঠাৎ যেন ফস্ করে খুলে গিয়ে আমার সর্ব শরীর এলিয়ে গেল। তারপর কী হল জানি না।

'নিপু! নিপু!'

আমি ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে বললুম, 'কী ভাই, কী ভাই সুরো?'

'নিপু! নিপু!'

'এই যে ভাই সুরো! এই যে ভাই আমি!'

'নিপু! নিপু!'

'যাচ্ছি ভাই যাচ্ছি!'

বলতে না বলতেই কে যেন আমাকে কোথা দিয়ে কেমন করে একেবারে চৌধুরীবাবুদের বাড়িতে সুরোর ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেললে। আমার যেন হঠাৎ টনক নড়ল—তাই তো, এ কী করেছি! ঘুমের ঘোরে নিশির ডাকে সাড়া দিয়েছি! সর্বনাশ! আমি থর-থর করে কাঁপতে লাগলুম। কে এসে আমার হাত ধরলে। আমি চেঁচিয়ে উঠলুম—'না গো না, আমি এখানে থাকব না, কিছুতেই থাকব না! আমায় বাড়ি রেখে এস!' কিন্তু সে আমার কথা কানে তুললে না। আমি আরও কাঁদতে লাগলুম। কে একজন নরম গলায় বললে, 'ভয় কী তোমার, কিচ্ছু ভয় নেই।' বলে সে আমার গায়ে হাত বুলোতে লাগল।

আমি কেঁদে বললুম, 'ওগো তোমার ছুটি পায়ে পড়ি, আমায় তোমরা বাড়িতে রেখে এস! নইলে আমার মা বড় কাঁদবে।' সে কি বলতে যাচ্ছিল, একজন খুব মোটা গলায় বলে উঠল, 'বোধহয় ছেলেটা টের পেয়েছে। তাই গোল বাধিয়েছে। নইলে এমন তো হবার কথা নয়! দাঁড়াও ওকে ঠাণ্ডা করছি।' বলেই সে লোকটা এসে তার লোহার মতন শক্ত হাত দিয়ে আমার চোখছুটো সজোরে চেপে ধরল। অমনি আমার সমস্ত শরীর যেন হিম হয়ে এল, সর্বাঙ্গ শির-শির করতে লাগল, বুকের ভিতরটা ধুক-ধুক করতে করতে হঠাৎ ধপ্ করে একেবারে থেমে গেল। তারপর কী হল জানি না।......

'নিপু এসেছিস ভাই? নিপু!'

হঠাৎ দেখি সুরো ও আমি একটা যেন হাত-পা-ওয়ালা খুব ছোট খুবরির মধ্যে অত্যন্ত ঘেঁসাঘেঁসি ঠেলাঠেলি করে রয়েছি। এই জায়গাটুকুর মধ্যে যেন কেবল সুরোকেই ধরে। আমি যেন বেশি। তাই আমার কেমন কষ্ট হচ্ছিল—খুব একটা আঁট জামা গায়ে জোর করে পরিয়ে দিলে যেমন অস্বোয়াস্তি হয়, আমার তেমনি বোধ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যে জামাটা যদি ফ্যাঁস করে ছিঁড়ে যায়, যেন একটু আরাম পাই। একটু পরেই বুঝতে পারলুম, ঐ হাত-পা-ওয়ালা ছোট্ট খুবরিটা সুরোর দেহ; আমি তারই মধ্যে এসে প্রবেশ করেছি।

আমি চিৎকার করে বলে উঠলুম,—'এরা জোর করে—ভুলিয়ে আমায় ধরে এনেছে, তুমি আমায় এক্ষুনি বাড়ি পাঠিয়ে দাও।'

সুরো বললে, 'রাগ করছিস কেন ভাই! এরা এনেছে বলেই তো তোর সঙ্গে দেখা হল,—নইলে তো আর দেখা হত না! আমি যে চলে যাচ্ছি।'

'অ্যাঁ, চলে যাচ্ছিস? কোথা যাচ্ছিস ভাই?'

'রাজকুমারীর কাছে।'

'কোন্ রাজকুমারী?'

'সেই যে রাজকুমারী, যে আমার জন্যে বসে মালা গাঁথে।'

আমি বললুম, 'সে তো গল্পের রাজকুমারী।'

সুরো বললে, 'আমিও তো গল্পের রাজপুত্র। সেই গল্পের রাজকুমারীর সঙ্গে এই গল্পের রাজপুত্রের মিলন হবে। তবে তো গল্প শেষ হবে।'

আমি বললুম, 'তুই গেলে কিন্তু রানীমা বড় কাঁদবেন।'

সে বললে, 'তোরা তাঁকে ভুলিয়ে রাখিস। বলিস—"সুরো মৃগয়া করতে গেছে—এই এল বলে, তুমি কেঁদ না।" '

আমি বললুম, 'সুরো, এমন নিষ্ঠুর হলি কী করে? আমাদের ছেড়ে যেতে তোর কষ্ট হচ্ছে না?'

সুরো বললে, 'দেখ দিকিনি আমার বুকে হাত দিয়ে!'

সুরোর বুকে হাত দিয়ে দেখলুম, তার প্রাণটি যেন তার বুকখানিকে সজোরে আঁকড়ে ধরে আছে।

আমি বললুম, 'ভাই সুরো, তবু কেন যাচ্ছিস?'

সুরো বললে, 'তুই যে রাজকুমারীর বাঁশি শুনিস নি, তাই বুঝতে পারছিস না! সে ডাক শুনলে কি আর থাকা যায়! নইলে দেখিস না, এই মানুষ ঘরে, হঠাৎ কাঁদিয়ে কেঁদে সে কোথায় বিবাগী হয়ে চলে যায়।'

আমি বললুম, 'সুরো, তোর জন্যে আমার বড় মন কেমন করবে, কান্না পাবে!'

সুরো বললে, 'আমার খেলনাগুলো তোকে দিয়ে গেলুম, তুই সেগুলো নিয়ে খেলিস, মনে হবে যেন আমার সঙ্গেই খেলছিস। এই দেখ না, আমি অসুখে শুয়ে শুয়ে তোর দেওয়া সেই ছবির বইখানা দেখতুম আর আমার মনে হত, তুই যেন গল্প বলছিস।'

আমি বললুম, 'কিন্তু তোকে দেখতে না পেয়ে রানীমা বড় কাঁদবেন।'

সুরো বললে, 'তুই তাঁকে ভুলিয়ে রাখিস ভাই।'

আমি বললুম, 'আমি কী করে ভুলিয়ে রাখব?'

সে বললে, 'তুই আমার মায়ের কাছটিতে থাকিস। বলিস—"এই যে মা, আমি তোমার সুরো খেলা করে ফিরে এলুম।" আমার বাঁশি শুনিয়ে তাঁকে বলিস—"এই দেখ মা, তোমার সুরো কেমন বাঁশি বাজায়!" আমার মুক্তোর মালাটা গলায় দিয়ে বলিস, "এই দেখ মা, মুক্তোর মালা তোমার সুরোর গলায় কেমন মানিয়েছে!" মা মনে করবে এই তো আমার সুরো! সুরো তো কোথাও যায়নি!'

আমি চিৎকার করে বলে উঠলুম, 'না না, আমি রানীমায়ের ছেলে হতে পারব না—আমার মায়ের জন্যে বড় মন কেমন করবে—আমার মা কাঁদবে, মুটু কাঁদবে!'

সুরো বললে, 'কিন্তু এরা যে আমার বদলে তোকে রানীমায়ের ছেলে হবার জন্যেই নিশির ডাকে ভুলিয়ে এখানে এনেছে।'

আমি কেঁদে উঠে বললুম, 'না না, আমি কিছুতেই তুমি হব না, আমি নিপুই থাকব! তোর দুটি পায়ে পড়ি, তুই আমায় বাড়ি পাঠিয়ে দে!'

সুরো বললে, 'আচ্ছা, তোর ভয় নেই।'

আমি বললুম, 'না, তুই ঠিক করে বল্—আমায় বাড়ি পাঠিয়ে দিবি?'

সুরো বললে, 'দিচ্ছি। কিন্তু আমার কী মনে হচ্ছে জানিস?'

আমি বললুম, 'কী?'

সে বললে, 'সেখানে গিয়ে তোদের জন্যে যদি বড্ড মন কেমন করে?'

আমি বললুম, 'তা কি করবে? ঐ মালাটি গলায় পরলে আমাদের কথা হয়ত আর মনেই থাকবে না।'

সুরো বললে, 'হয়ত সন্ধ্যাবেলা তোর কথা মনে পড়বে, হয়ত রাত্রে শোবার সময় রানীমাকে মনটা খুঁজতে থাকবে, হয়ত সকালে উঠে ভাবতে থাকব—কই আমার চন্দনা পাখি তো ডাকছে না—খোকাবাবু ওঠো।'

আমি বললুম, 'তখন কী করবি?'

সে বললে, 'কী আর করব? হয়ত সমুদ্রের ধারে একা গালে হাত দিয়ে বসে ভাবব—এই সমুদ্র পেরিয়ে যাই কেমন করে? হয়ত রাজকুমারী আমার চোখের জল মুছিয়ে বলবে—কেঁদ না। কিন্তু তবু মন কাঁদতে থাকবে। তোরা হয়ত তখন ভুলে যাবি। কিন্তু আমি তোদের কথাই কেবল ভাবব আর কাঁদব।'

আমি বললুম, 'সুরো, তবে তুই যাসনি।'

সুরো বললে, 'সবাই তো যেতে মানা করছে, সবাই তো ছেড়ে দিতে কাঁদছে। কিন্তু তবু তো থাকতে পারছি না ভাই! রাজকুমারীর ঐ বাঁশির সুর যে প্রাণ টেনে নিয়ে চলেছে! ঐ সেই বাঁশির ডাক! নিপু, বিদায় দে ভাই। মনে রাখিস আমায়!'

আমি চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলুম—'না সুরো, না, যাসনি!'

আমার কান্নার দু-ফোঁটা জল হাতে নিয়ে সে বললে, 'এই আমার রইল—তোর স্মরণচিহ্ন।'

আমি আরও চিৎকার করে কেঁদে উঠলুম—'না না, তোকে আমি কিছুতেই ছাড়ব না।' বলে তার হাত চেপে ধরলুম।

সুরো আমার হাতটি বুকে খানিক চেপে চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে মুখ তুলে বললে, 'ঐ আমার রথ এসেছে।' বলে সে আমার হাত ছেড়ে দিলে। বললে, 'আর তোকে ধরে রাখব না, তুই তোর মায়ের কাছে যা। আমায় বিদায় দে।' বলতে বলতে সুরো কোথায় মিলিয়ে গেল, আমিও যেন সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যেতে লাগলুম। কী হল কিছু বুঝতে পারলুম না। কেবল শুনলুম মা যেন অনেক দূর থেকে ডাকছে—'নিপু! নিপু!'

আমি চোখ মুছে দেখি, মা আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে।

'নিপু! নিপু!'

আমি বললুম, 'কী মা?'

মা বললেন, 'দেখবি আয়।'

আমি বারান্দায় গিয়ে দেখি, সকালের সোনালি রোদে আকাশ ভরে গিয়েছে, আর একখানি সোনালি চতুর্দোলায় ফুলে ফুলে সাজানো, ফুলের মালা গলায় জরির জামা গায়ে বরের বেশে চলেছে রাজপুত্র সুরজিৎ, যেন কোথাকার কোন রাজপুরী থেকে তার বধূ আনতে।

তারপর কত দিন ঐ বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি—কত বর কত বধূ নিয়ে ফিরে এল দেখলুম, কিন্তু সুরো তো কই তার সেই রাজকুমারী বধূকে নিয়ে আর ফিরে এল না!

লাট্টুর ঘুর্নি

এ আমার আরও ছেলেবেলাকার গল্প।

আমার দাদার ভারি লাট্টুর শখ ছিল। তিনি যেখানে যা পয়সা পেতেন তাই দিয়ে লাট্টু ও লেত্তি কিনতেন। এমন করে ছোট বড় কত রকম আকারের এবং লাল নীল প্রভৃতি কত রকম রঙের কত যে লাট্টু তাঁর ভাণ্ডারে জমা হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। সেই সব লাট্টু নিয়ে, মাটিতে একটা প্রকাণ্ড গোল দাগ কেটে, তার মধ্যে একটার পর একটা, একটার পর একটা লাট্টু ঘুরিয়ে তিনি যখন খেলতেন, তখন মনে হত যেন মাটির বুকের উপরে একখানি ছোট্ট মরশুমি ফুলের খেত বিচিত্র রঙের ঝলমলানি নিয়ে গজিয়ে উঠল। লাট্টুর সেই শোভা এখনও যেন আমার চোখে ভাসছে। দাদার মতন তেমনতর লাট্টু ঘোরাতে এ পর্যন্ত আমি আর কাউকে দেখলুম না। আমার চোখে তিনি ছিলেন লাট্টু খেলার ওস্তাদ শিল্পী।

দাদার দেখে দেখে আমারও লাট্টু ঘোরাবার খুব ইচ্ছে হত, কিন্তু উপায় ছিল না। দাদা আমাকে লাট্টুর গায়ে হাত পর্যন্ত দিতে দিতেন না—পাছে লাট্টু খারাপ হয়ে যায়। লাট্টুকে তিনি যেন প্রাণের

চেয়েও ভালবাসতেন। তাদের কত আদর যত্ন ছিল, গায়ে একটু ময়লা লেগে থাকবার জো ছিল না। কোন রকমে তাদের গায়ে একটু চোট লাগলে মনে হত সে চোট বুঝি দাদার বুকেই লেগেছে। আমি বড্ড কাকুতি মিনতি করলে তিনি কখনো-কখনো লাট্টুর গায়ে একটিবার আমাকে শুধু হাত বুলোতে দিতেন। লাট্টুর সেই স্পর্শটুকুতেই আমার যে কী আনন্দ হত!

কিন্তু মন থেকে লাট্টু ঘোরাবার লোভ ছাড়তে পারতুম না। বাবা মা যে কেন আমায় একটা লাট্টু কিনে দেননি তা আমি এখন ঠিক বলতে পারি না, এবং আমিও যে কেন লাট্টুর জন্যে মায়ের কাছে কোনদিন বায়না ধরিনি, তাও আমার মনে পড়ে না। কেবল মনে পড়ে সেই ছেলেবেলায় লাট্টু ঘোরাবার কী ব্যাকুলতাই না বুকের মধ্যে ছটফট করে ঘুরে বেড়াত। দাদা কিছুতেই লাট্টু ছুঁতে দিতেন না, বোধহয় সেইজন্যেই ঐ আকুলতা দিন দিন অত প্রবল হয়ে উঠেছিল—আমায় যেন ক্ষেপিয়ে তুলেছিল।

দাদা স্কুলে গেলে আমি সারা দুপুরটা বাড়িময় তাঁর লাট্টুর গুপ্ত আস্তানা খুঁজে খুঁজে বেড়াতুম; কিন্তু এমন করে লুকিয়ে রাখতেন যে কিছুতেই তা বার করতে পারতুম না। মন আরও ছটফট করত। এমনিতর সারাদিন লাট্টু লাট্টু করে এক-একদিন রাত্রে লাট্টুর স্বপ্ন দেখতুম। কী আনন্দ, রাশি রাশি লাট্টু—লাল, নীল, সবুজ, হলদে, বেগুনি, আরও কত রঙের—যেন শিলাবৃষ্টির মত আকাশ থেকে ঝরে ঝরে পড়ছে। দু-হাতে চেপে, বুক দিয়ে ধরে, সে লাট্টুর রাশি আঁকড়ে রাখা যায় না—উপচে উপচে পড়ে। কিন্তু হায়, স্বপ্নের সঙ্গে সঙ্গে সেই লাট্টু মিলিয়ে যেত, আর তার সেই আনন্দও মুষড়ে আসত।

এমনিতর এবং আরও কতরকম লাট্টুর স্বপ্ন আমি প্রায়ই দেখতুম; এবং স্বপ্নের মধ্যেই মাঝে মাঝে মনে হত যে এ তো স্বপ্ন। কিন্তু তাতে লাট্টু পাওয়ার আনন্দ কিছুমাত্র কম হত না। কেবল এই দুঃখ হত, ঐ লাট্টুগুলোকে কিছুতেই স্বপ্নের আবরণ থেকে ছিন্ন করে আমার নির্জন দুপুরবেলাকার খেলাঘরের মধ্যে এনে ফেলতে পারছি

না। তখন এই পেয়েও না-পাওয়ার জন্যে বুকটা হায় হায় করতে থাকত, আর কেবল মনে হত—স্বপ্ন কি সত্য হয় না? স্বপ্ন কি সত্য হয় না?

এক রাত্রে এক স্বপ্ন দেখলুম—এক পরী এসে আমার কপালে একটি চুমু খেয়ে আমার হাতে এক জোড়া লাট্টু দিলেন। কিন্তু পরী চলে যেতেই ঐ লাট্টুজোড়া দু-জোড়া পাখা বার করে আমার কাছ থেকে পাখির মত উড়ে গেল। আমি এত ডাকলুম, আর ফিরে এল না। কী দুষ্টু! পরীর দেওয়া লাট্টু নিশ্চয় আসল লাট্টু; সে স্বপ্নের মত নিশ্চয় ভেঙে যেত না; কিন্তু তারা ছিল দুষ্টু; তাই আমাকে ছেলেমানুষ পেয়ে ফাঁকি দিয়ে নিজের যেখানে খুশি পালিয়ে গেল।

ছেলেমানুষের মনের দুঃখ দেখে বোধহয় দেবতার দয়া হল। তিনি আমার মনবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। একদিন দুপুরে দাদার পড়বার ঘরে ঢুকে আমি দাদার নতুন-পাওয়া প্রাইজ-বইয়ের ছবি দেখছি, এমন সময় মাথার উপর খস-খস করে একটা আওয়াজ হয়ে ঠিক সেই স্বপ্নে দেখা লাট্টু-বৃষ্টির মত টপ-টপ করে তিন চারটে লাট্টু টেবিলের উপরে এসে পড়ল। আর আমাদের কালো পুষিটা আলমারির ঠিক উপরে যে ছোট ঘুলঘুলিটা আছে তা থেকে লাফিয়ে আলমারির মাথা হয়ে, টেবিলের উপরে পড়ে, ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পুষিটা সোনার পুষি! তাকে সেদিন আমি কত আদর করলুম! মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম আর তার ল্যাজ ধরে টানব না, আমার পাত থেকে একটু করে মাছ তাকে রোজ দেব। যে লাট্টুর সন্ধান আমি এতদিন এত কষ্ট করেও পাইনি, এই পুষি সেই সন্ধান এক মুহূর্তে দিয়ে গেল।

আমি টেবিলের উপর দাদার টুলটা চাপিয়ে সেই ঘুলঘুলির নাগাল পেলুম। নাগাল পেলুম না তো, যেন হাতে স্বর্গ পেলুম! সেই অন্ধকার ঘুলঘুলির মধ্যেই দাদার লাট্টুর ভাণ্ডার। আরব্য উপন্যাসের চল্লিশ দস্যুর গল্পের গুহার মধ্যে লুকোনো গুপ্ত রত্নভাণ্ডারের মতই যেন দাদার এই লাট্টুর ভাণ্ডার—থাকে থাকে সাজানো—লাল, নীল নানা

রঙের লাট্টু—হীরে মণি মাণিক্যের মত জলজ্বল করছে। আর দাদার এই রত্নগুহার এই সুবিধে ছিল যে, চল্লিশ দস্যুর গুহার মতন এর দরজা দিনরাত বন্ধ থাকত না এবং এর মধ্যে থেকে রত্ন লুটে নেবার জন্যে দরজা খুলতে কোন মন্ত্রেরও দরকার হত না। তবে, ধরা পড়লে দস্যু-সর্দারের হাতে কাশিমের মত দাদার হাতে আমার প্রাণটি যাবার ভয় ষোল আনাই ছিল।

সেদিন দুপুরবেলাটা আমার কী আনন্দেই কাটল! এতদিনকার মনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে। লাট্টুর জন্যে দাদার কাছে যত বকুনি খেয়েছিলুম, তার সমস্ত ব্যথা আজ যেন জুড়িয়ে গেল। আমি একটা লেত্তি নিয়ে ঠিক দাদার মত করে লাট্টুর গায়ে জড়িয়ে, ঠিক তেমনি করে হাত ঘুরিয়ে মেঝের উপর লাট্টু ফেলতে লাগলুম। বার কয়েক লাট্টু ঘুরল না। কিন্তু আমি দাদার ভাই তো! পাঁচ সাত বারের পরেই আমার হাতের গুণ বুঝে লাট্টু ঠিক ঘুরতে শুরু করলে। সে যতই ঘোরে আমি ততই মেতে উঠি। এবং তার গুঞ্জনধ্বনি যতই কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে, ততই মন আনন্দে লাফাতে থাকে। হঠাৎ দেয়াল-ঘড়ি থেকে তিনটের ঘা খেয়ে আমি চমকে উঠলুম। তাড়াতাড়ি লাট্টুগুলোর গা থেকে ধুলো ময়লা মুছে সেগুলোকে সেই ঘুলঘুলির মধ্যে লুকিয়ে রেখে দাদার পড়বার ঘর থেকে পিটটান দিলুম। দাদার যে এইবার স্কুল থেকে আসবার সময় হয়েছে!

এর পর থেকে আমার আর লাট্টুর দুঃখ রইল না। এক ছুটির দিন ছাড়া, রোজ দুপুরে দাদার পড়বার ঘরে আমি মনের সাধে লাট্টু ঘোরাতুম। কিন্তু এই দুঃখ হত যে, একলব্যের মত এই নির্জন সাধনায় আমি লাট্টু ঘোরানোতে যে কত বড় ওস্তাদ হয়ে উঠেছি তা দাদাকে দেখাতে পারলুম না। আমার লাট্টু ঘোরানো দেখে দাদা যে কতখানি চমকে উঠবে, তা মনে মনে কল্পনা করেই আমি আনন্দ পেতুম।

কিন্তু চিরদিন সমান যায় না। গ্রীষ্মের ছুটি এসে পড়ল। দাদার স্কুল যাওয়া বন্ধ। আমার লাট্টু ঘোরানোও বন্ধ। মনের মধ্যে আবার

তেমনি ছটফটানি শুরু হল। দাদার কাছে লাট্টু চেয়ে আবার তেমনি বকুনি খেতে লাগলুম, ঘুমের ঘোরে আবোল তাবোল লাট্টুর স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করলুম।

যখন এমনি করে লাট্টুর শোকে মনের দুঃখে দিন কাটছে, তখন একদিন মামার বাড়ি থেকে বিয়ের নিমন্ত্রণ এল। ছোটমামার বিয়ে। সেদিন আমার পেটের অসুখ; মা কেবল দাদাকে নিয়েই সকালবেলায় নিমন্ত্রণ গেলেন; আমি ভুখাই চাকরের কাছে পড়ে রইলুম। নিমন্ত্রণে যেতে পারলুম না বলে সেদিন আমার একটুও দুঃখ হল না। বরং লাট্টু ঘোরাবার এই সুযোগ পেয়ে মনটা আনন্দে নৃত্য করতে লাগল।

মা আর দাদা চলে যেতেই আমি সেই ঘুলঘুলি থেকে একগাদা লাট্টু বার করে এনে মনের সাধে ঘোরাতে শুরু করে দিলুম। আজ আর ভয় নেই। সারাদিন তো নয়ই, রাত্রেও দাদা আজ বাড়ি ফিরবেন না—ফিরতে সেই কাল বিকেল—কী আনন্দ! কী আনন্দ!

আমি সারাদিন লাট্টু ঘুরিয়ে সেদিন আর লাট্টুগুলোকে ঘুলঘুলিতে তুললুম না। শোবার সময় বিছানার চারিদিকে সেগুলোকে সাজিয়ে রেখে তার মধ্যে শুয়ে পড়লুম। এ-পাশে ফিরি লাট্টু, ও-পাশে ফিরি লাট্টু, মাথার শিয়রে লাট্টু, পায়ের তলায় লাট্টু—কী মজা!

লাট্টুর কথা ভাবতে ভাবতে কখন আমি ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না, হঠাৎ ঘুমের ঘোরে একবার মনে হল—চোরে যদি লাট্টু চুরি করে নিয়ে যায়? কী সর্বনাশ! আমি ধড়মড় করে উঠে বসবার চেষ্টা করলুম—লাট্টুগুলোকে লুকিয়ে রাখার জন্যে; কিন্তু পারলুম না কিছুতেই। গা একেবারে এলিয়ে রইল। তারপর আবার কখন ঘুমিয়ে পড়লুম জানি না।

এবার জেগে উঠে দেখি, অন্ধকার ঘরের মধ্যে যেন একটুকরো চাঁদের কুচি এসে পড়েছে। ঠিক মোমে গড়া পুতুলের মত একটি কচি ছেলে আমার বিছানা থেকে একটা লাল রঙের লাট্টু নিয়ে মেঝের উপরে বসে খেলা করছে। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, টানা টানা দুটি বড় চোখ—ঠিক যেন আমার সেই ছোট ভাইটি, যে ভাই আমার মারা

গেছে—যাকে আমি বড় ভালবাসতুম, যে মারা যেতে আমি লুকিয়ে লুকিয়ে কত কেঁদেছিলুম।

বুঝলুম ছেলেটি লাট্টু চুরি করতে এসেছে। কিন্তু সত্যি বলছি, তাকে চোর বলতে আমার ইচ্ছে হল না। অমন সুন্দর ছেলে কখনও চোর হয়? ও যে আমার ছোট ভাইটি! ও যদি লাট্টুগুলো আমার কাছে চায়, আমি এখনই সব দিয়ে দিতে পারি—তার জন্যে দাদা আমায় মেরে ফেলুন আর কেটেই ফেলুন।

আমি বিছানা থেকে নেমে তার কাছে যেতেই সে তার সেই টানা টানা চোখদুটি আমার পানে তুলে মিষ্টি মিষ্টি কথায় বললে, 'দাদা, আমায় একটা লাট্টু দেবে?'

আমিও ঠিক এমনি করে দাদার কাছে লাট্টু চেয়েছি কতবার, আর তার বদলে বকুনি কেবল। সে যে কী কষ্ট! সে কষ্ট আমার মনে এখনও গাঁথা আছে। সে দুঃখ আমার এই নতুন-পাওয়া ছোট ভাইটিকে আমি দিতে পারব না। আমি বললুম, 'নাও ভাই তুমি লাট্টু,—তোমার যেটা খুশি।' হাসিতে তার মুখ ভরে উঠল। সে সেই লাল লাট্টুটি হাত নিয়ে বললে, 'আমায় এটা দিয়ে দিলে—একেবারে?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ ভাই।'

সে বললে, 'জন্মের শোধ?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, জন্মের শোধ।'

সে বললে, 'কী মজা, কী মজা!'—বলে আনন্দে দুই হাত তুলে লাফাতে লাগল; তারপর বললে, 'দাদা তুমি লাট্টু ঘোরাও না, আমি দেখি।

আমি মহা উৎসাহে একটার পর একটা লাট্টু নিয়ে বন্‌বন্‌ করে ঘোরাতে শুরু করে দিলুম। নানা রঙের লাট্টু রাতের অন্ধকারের উপর বিচিত্র রঙ ছড়িয়ে কালো রাত্রিটাকে যেন রঙিন করে তুলতে লাগল; আর তাদের ঘুর্নির ঘন গুঞ্জন স্তব্ধ বাতাসের ফাঁকে ফাঁকে অপরূপ সুরের বাঁশি বাজিয়ে চলতে লাগল।

ছেলেটির কী আনন্দ! আমি ঘুরন্ত লাট্টু মাটির উপর থেকে তার হাতে মাথায় বসিয়ে দিই—তবু তারা ঘোরে দেখে সে অবাক। কখনও সেই লাট্টু নিজের আঙুলের নখের ছোট ঘেরটুকুর মধ্যে বসিয়ে রেখে তাকে ঘোরাই, কখনও মাটিতে না ফেলে শূন্য থেকেই ঘুরন্ত লাট্টু হাতের উপর তুলে নিই, কখনও দু-হাতে দুটো লাট্টু নিয়ে ঘুরিয়ে ফেলতে না ফেলতেই এ-হাতের লাট্টু ও-হাতে ধরে নিই। ও-হাতেরটা এ-হাতে নিই। এমনি করে যত কসরত তাকে দেখাই, ততই সে আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠে—আর আমায় বাহবা দেয়।

তার এই বাহবাতে আমি মেতে উঠতে লাগলুম। যত কিছু বিদ্যা দাদার দেখাদেখি আয়ত্ত করেছিলুম, একবার নয়, পাঁচ দশবার করে তাকে দেখাতে লাগলুম। তারও যেন দেখে আর সাধ মিটছিল না —যতই দেখে ততই তার আনন্দ, ততই তার বিস্ময়। লাট্টু ঘোরানো দেখিয়ে দাদাকে বিস্মিত করে দেব মনে মনে আকাঙ্ক্ষা ছিল, কিন্তু তা পারি নি; আজ এই নতুন-পাওয়া ছোট ভাইটিকে বিস্মিত করে দিয়ে সে ক্ষোভ আমার মিটল।

ছেলেটি বললে, 'দাদা, তুমি কী চমৎকার লাট্টু ঘোরাও! কী সাফ তোমার হাত!'

আমি বললুম, 'তুমি শেখো না, তুমিও ঐরকম পারবে।'

সে ছলছল চোখে বললে, 'কে আমায় শেখাবে?'

আমি বললুম, 'কেন, আমি!'

সে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। আমি তার বাঁ হাতে লাট্টু আর ডান হাতে লেত্তি দিয়ে তার হাতে ধরে তাকে লাট্টু ঘোরানো শেখাতে আরম্ভ করলুম। কী কোমল তার হাত-দুখানি!—কী বুদ্ধিভরা উজ্জ্বল তার চোখদুটি! সে অল্পক্ষণেই আমার কাছ থেকে লাট্টু ঘোরানো শিখে নিলে। তারপর সে ঘরময় ছুটে ছুটে লাট্টু ঘুরিয়ে বেড়াতে লাগল। সে তো ছোটাছুটি নয়—সে যেন আনন্দের ছন্দ-ভরা অপরূপ নৃত্য! আমি অবাক হয়ে দেখতে লাগলুম। দেখতে দেখতে ছেলেটি যেন লাট্টু খেলার ভেল্‌কি শুরু করে দিলে। সে এমনি লাট্টু ঘোরাতে

লাগল যে, কখনো পাঁচ সাতটা লাট্টু মিলে যেন একটি ফুলের তোড়ার মত গড়ে উঠল, কখনও যেন বিভিন্ন রঙে গাঁথা একগাছি ফুলের মালা হয়ে গেল, কখনও তারা এঁকে বেঁকে চলে নদীর স্রোতের মত বহে গেল, কখনও যেন তারা সমস্বরে গেয়ে উঠল, কখনও বা হেলে দুলে নানা ভঙ্গিতে নৃত্য করতে লাগল—আরও কত কী হল আমি বলতে পারি না ; আমি নির্বাক হয়ে সেই অদ্ভুত কাণ্ড দেখতে লাগলুম। এ কি জাদুকর ? না মায়াবী ?

চোখের সামনে নানা আকারে নানা ভঙ্গিতে ক্রমাগত লাট্টু ঘোরা দেখতে দেখতে আমার মাথার ভিতরে যেন একটা ঘুর্ণি জেগে উঠতে লাগল। মনে হতে লাগল—যেন রাত্রি ঘুরছে, রাত্রির অন্ধকার ঘুরছে, আকাশ ঘুরছে, তারা-নক্ষত্র—তারাও ঘুরছে—সেই লাট্টুর সঙ্গে সঙ্গে, তারই তালে তালে ! সে কী মহা ঘুর্ণি ! মাথা ঠিক রাখা যায় না, পা ঠিক রাখা যায় না ! মনে হল যেন আমি ঘুরতে ঘুরতে ঠিকরে বিছানার উপর গিয়ে পড়লুম।

পরদিন দাদা নিমন্ত্রণ থেকে ফিরে বাড়িতে এক কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধিয়ে বসলেন। তাঁর একটা লাল লাট্টু খোয়া গেছে। কে নিয়েছে তাই নিয়ে মহা হৈ-চৈ। আমি চুপ। আমি যে সেই লাট্টুটি গত রাত্রে আমার সেই ছোট ভাইটিকে দিয়ে দিয়েছি, সে-কথা আর সাহস করে দাদাকে বলতে পারলুম না। কিন্তু ধরা পড়ে গেলুম। কুঞ্জ দাসী দাদাকে বলে দিলে যে কাল সে আমাকে লাট্টু নিয়ে খেলতে দেখেছে। দাদা আর কথাটি নয়, একেবারে ধাঁ করে এসে সজোরে একটি চড় আমার গালে বসিয়ে দিলেন। আমি সেই চড় খেয়ে ঘুরে পড়লুম—জ্ঞান হল কতক্ষণ পরে জানি না। জেগে দেখি মায়ের কোলে শুয়ে আছি—কপালে জলপটি বাঁধা। দাদা যে কোথায় দেখতে পেলুম না।

সন্ধ্যার দিকে সমস্ত শরীর আচ্ছন্ন করে আমার খুব জ্বর এল। মা আমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলতে লাগলেন, 'বাবা তুমি ভাল হও, আমি তোমায় অনেক লাট্টু কিনে দেব। 'মায়ের এই কথাগুলো আমার বেশ লাগছিল ; কিন্তু জ্বরের আচ্ছন্নতায় তাঁর

কোন কথারই উত্তর দিতে পারলুম না। মা আমায় লাট্টু দেবেন—অনেক লাট্টু, রাশি রাশি লাট্টু—ভাবতে ভাবতে আমি ঘুমিয়ে পড়লুম।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম জানি না, ঘুম ভেঙে দেখি আমার সেই কালকের ছোট ভাইটি ঘরে এসেছে। কিন্তু আজ তার মুখখানি মলিন, কান্নার ভারে চোখদুটি যেন ভেরে রয়েছে। আমি বলতে গেলুম, তোমার কী হয়েছে ভাই?—কিন্তু কথা কইতে পারলুম না, সর্বাঙ্গ আমার এমনি ঝিমিয়ে ছিল। সে আস্তে আস্তে এসে আমার শিয়রের কাছে দাঁড়াল। মা পাশে শুয়ে ছিলেন, তাঁকে ইশারা করে ডেকে বললুম—'দেখ মা কে এসেছে!' কিন্তু তিনি যেমন ঘুমিয়ে ছিলেন, তেমনিই ঘুমিয়ে রইলেন। আমার তো গলার আওয়াজ বার হয়নি, কেমন করে তাঁর ঘুম ভাঙবে!

ছেলেটি তার সেই ননীর মত নরম হাত দিয়ে অতি আস্তে আস্তে আমার সেই গালটি বুলিয়ে বুলিয়ে দেখতে লাগল—যে গালে দাদা সজোরে এক চড় কসিয়েছিলেন। হাত বুলোতে বুলোতে তার চোখ দিয়ে টস-টস করে জল পড়তে লাগল। সে গুন-গুন করে বলতে লাগল—'আহা, এমন করে মেরেছে! আহা, আমার জন্যেই তোমায় মারলে। না জানি তোমার কত লেগেছে!' কী মিষ্টি তার স্পর্শ! কী মিষ্টি তার গলার স্বর! আমার ভারি ভাল লাগছিল তার সেই হাত বুলোনো, তার সেই কথা শুনতে। কত কথা তাকে বলবার ইচ্ছা হচ্ছিল, কিন্তু কিছুই বলতে পারলুম না।

টুপ করে আবার একফোঁটা চোখের জল আমার গায়ে পড়ল। আমি বললুম, কাঁদ কেন ভাই?' সে শুনতে পেলে না। সে মনে করলে আমি বুঝি ঘুমিয়ে আছি; কিন্তু আমি যে জেগে, সে-কথাও তাকে বোঝাতে পারলুম না। শুধু এইটুকু বুঝলুম, ছোট ভাই না হলে দাদাকে এমনতর ভালবাসে কে? সে আমার মাথায় হাত বুলোতে লাগল, আমি ঘুমিয়ে পড়লুম।

পরদিন সকালে আমার জ্বর সেরে গেল।

ভুখাই চাকর বিছানা রোদে দিতে গেলে দাদার সেই হারানো লাট্টু বেরিয়ে পড়ল। সে বললে, আগের দিন আমি যখন লাট্টু নিয়ে ঘুমোই তখন কি রকম করে একটা লাট্টু গড়িয়ে খাটের গদির পাশে ঢুকে গিয়েছিল।

সকলে সমস্বরে বললে, 'তাই হবে।' কিন্তু আমার মন বললে, সেই ছোট ভাইটি, পাছে দাদা আমায় আবার মারে সেই দুঃখে ঐ লাট্টুটি ফিরিয়ে দিয়ে গেছে।

কিন্তু কেন সে ফিরিয়ে দিলে?

দাদা না-হয় মেরেছে, কিন্তু আমি তো সেজন্যে একটুও দুঃখ করিনি, আমার সেই ছোট ভাইটির উপর অভিমান করিনি, তবে কেন সে লাট্টু ফিরিয়ে দিয়ে গেল? সে কি জানে না, কত আদর করে ঐ লাট্টুটি আমি তাকে দিয়েছিলুম! সে ফিরিয়ে দিতে আমার কত দুঃখ হয়েছে! আমি যদি জানতুম সে লাট্টু ফিরিয়ে দিতে এসেছে, কখনই তাকে ফেরাতে দিতুম না—হাতে ধরে তাকে সেটা আবার ফিরিয়ে দিতুম।

অসুখ সারবার পর মা আমায় অনেক রকমের অনেক লাট্টু কিনে দিয়েছিলেন। সে সব লাট্টু আমি খুব যত্নের সঙ্গে তুলে রেখেছিলুম। যেদিন আবার আমার সেই ছোট ভাইটি আসবে, তাকে সবগুলো দিয়ে দেব। কিন্তু সে তো আর একদিনও এল না! কেন?

কঙ্কালের টঙ্কার

ছেলেবেলায় আমি কবিতা লিখতুম, আমার আত্মীয়েরা আমায় তিরস্কার করতেন, বন্ধুরা ঠাট্টা করতেন, মাস্টারমশাই প্রহার দিতেন এবং কাগজের সম্পাদকেরা না ছেপে ফেরত দিতেন। কিন্তু বলে রাখি, একদিন সমূহ বিপদ থেকে যে আমার প্রাণরক্ষা হয়েছিল, সে শুধু আমার এই কবিত্বশক্তির জোরে। তোমরা আশ্চর্য হচ্ছ, কবিতা

আমার প্রাণরক্ষা করলে কেমন করে? সত্যি বলছি সেদিন কারো সাধ্য ছিল না যে মরণাপন্ন আমাকে রক্ষা করে। ভাগ্যে কবিতা লিখতে শিখেছিলুম, তাই বেঁচে গেলুম। নইলে লোকের অত্যাচারে কবিতা-লক্ষ্মীকে বাল্যবয়সে বিদায় দিলে সেদিন আমার যে কী অবস্থা হত তা আমিই জানি।

গল্পটা তাহলে খুলেই বলি। নানা স্থান ঘুরে আমি যাচ্ছিলুম জয়পুর থেকে দিল্লী। টাইম-টেবল খুলে দেখলুম, টানা দিল্লী যেতে হলে রাত্রের গাড়িটাই সুবিধে। কিন্তু সে-ট্রেন অনেক রাত্রিতে ছাড়ে—প্রায় দুটো। একে জয়পুরের মত জায়গা, তায় মাঘ মাসের শীত, তার উপর রাত্রি দুটো—এই ত্র্যহস্পর্শ ঘাড়ে নিয়ে যাত্রা করতে আতঙ্কে আমার বুক কাঁপতে লাগল। কিন্তু উপায় কী? আমি স্টেশনমাস্টারকে বললুম, 'কী উপায় করা যায় বলুন দেখি! এই দারুণ শীতে ভোর রাত্রে বিছানা ছেড়ে উঠে ট্রেন ধরবার কথা মনে করতেই যে আমার কম্প দিয়ে জ্বর আসছে!'

স্টেশনমাস্টার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি ফার্স্ট ক্লাস প্যাসেঞ্জার?'

তখন বড়দিনের ছুটিতে রেল কোম্পানি আধা ভাড়ায় সর্বত্র যাতায়াতের ব্যবস্থা করায় আমি শস্তায় বড়মানুষি করছিলুম। বুক ফুলিয়ে বললুম, 'হ্যাঁ, আমার ফার্স্ট ক্লাস টিকিট।'

স্টেশনমাস্টার বললেন, 'প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের জন্যে খুব একটা ভাল ব্যবস্থা আছে।'

আমি বললুম, 'কী?'

তিনি বললেন, 'আপনি এক কাজ করবেন। সন্ধ্যা আটটার মধ্যে খেয়ে দেয়ে স্টেশনে আসবেন। আপনার জন্যে একখানা ফার্স্ট ক্লাস গাড়ি ঐ সাইডিং-এ কেটে রেখে দেব। আপনি তাইতে বিছানা পেতে শুয়ে পড়বেন—লেপমুড়ি দিয়ে। তারপর রাত্রে যখন মেল আসবে, তাইতে আপনার গাড়ি লাগিয়ে দেব—আপনি দিব্যি ঘুমোতে ঘুমোতে দিল্লী গিয়ে পৌঁছবেন।'

আমি বললুম, 'বাঃ, এ তো বেশ।'

স্টেশনমাস্টার বললেন, 'হ্যাঁ। শীতের রাতে গাড়ি ধরবার অসুবিধে বলেই তো কোম্পানি বড়লোক যাত্রীদের জন্যে এই ব্যবস্থা করেছেন।'

আমি বললুম, 'খুব ভাল ব্যবস্থা। আমি তাহলে আটটার মধ্যেই আসব—আপনি গাড়ি ঠিক রাখবেন।'

তিনি বললেন, 'গাড়ি ঠিক থাকবে। কিন্তু আপনি দেরি করবেন না। আটটার পর আর ট্রেন নেই বলে আমরা আটটার সময় স্টেশন বন্ধ করে চলে যাই।'

আমি বললুম, 'আটটার মধ্যেই আসব।' বলেই আমি চলে গেলুম।

তারপর সন্ধ্যাবেলায় আহারাদি সেরে পায়ে তিন জোড়া ডবল-মোজা, গায়ে দুটো গরম গেঞ্জির উপর একটা মোটা ফ্লানেলের কামিজ, তার উপর সোয়েটার, তার উপর তুলো-ভরা মেরজাই, তার উপর ওয়েস্ট কোট, ওভারকোট এবং সর্বোপরি একটা মোটা বালাপোস মুড়ি দিয়ে মাথাটাকে কান-ঢাকা টুপি ও পশমের গলাবন্ধ দিয়ে এঁটে কাঁপতে কাঁপতে ঠিক আটটার সময় স্টেশনে এসে হাজির হলুম। আমার মস্ত বড় লোহার তোরঙ্গটা দুজন কুলি এসে ধরাধরি করে নামাতে গিয়ে একজন ফিক করে একটু হেসে ছেড়ে দিলে। আমি বললুম, 'কেয়া হুয়া রে?'

সে বললে, 'বাবুজীর তোরঙ্গ দেখছি ফাঁকা। যা দুটো একঠো ধুতি উতি আছে সেগুলো গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বাক্সটা আমাদের বকশিস করে যান বাবু। আপনার কুলিভাড়া, রেলমাশুল অনেক বেঁচে যাবে।'

আমি বললুম, 'যা যা, তোমকো আর ইয়ে করতে হবে না।' বলেই আমি হন-হন করে স্টেশনমাস্টারের ঘরের দিকে চলে গেলুম। স্টেশনমাস্টার আমায় দেখেই বললেন, 'গুড ইভনিং বাবু। আপনার ভাগ্য খুব ভাল—আজ আর কোন প্যাসেঞ্জার নেই। সমস্ত গাড়িটাই

আপনার একলার। চলুন আপনাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি।' বলে তিনি আমাকে নিয়ে, প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে, পাঁচ ছ-টা রেললাইন টপকে, অনেক দূর চলে চলে একটা ফাঁকা মাঠের ধারে এনে দাঁড় করালেন। সামনে দেখলুম, একখানা ধোঁয়াটে রঙের গাড়ি কাটা পড়ে রয়েছে—ঠিক যেন একটা কন্ধকাটা অন্ধকারের আড়ালে গা লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মাস্টারবাবু গাড়িটার চাবি খুলে দিয়ে বললেন, 'নিন—উঠে পড়ুন। বিছানা পেতে শুয়ে পড়ুন।' বলেই তাড়াতাড়ি তাঁর বাতিটা হাতে তুলে নিয়ে, 'গুড নাইট' বলে ছুট দিলেন। অন্ধকারে তাঁকে আর দেখতে পেলুম না। রেললাইনের খোয়াগুলোর উপর তাঁর জুতোর খস-খস শব্দ কেবল শুনতে লাগলুম। ছ্যাঁৎ করে আমার মনে হল, তাই তো, মাস্টারবাবু অমন করে পালালেন কেন?

ইতিমধ্যে দেখি, কুলিদুটো আমার তোরঙ্গ ও বিছানাটা গাড়ির মধ্যে তুলে দিয়ে বলছে, 'বাবুজী, পয়সা!' আমি তাদের হাতে পয়সা দিতেই তারাও ছুট দিলে স্টেশনের দিকে। ব্যাপার কী? আমি হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে ভাবছি, দেখি, দুটো কয়লা-মাখা কালো ভূত রেল লাইনের বাঁধের নিচে থেকে উঠে অন্ধকারের মধ্যে কেবল চারটে সাদা চোখ দিয়ে আমায় দেখতে দেখতে স্টেশনের দিকে চলে গেল।

তাদের পিছনে একটা কুকুর ল্যাজ তুলে দৌড় দিলে। তারপরেই সব একেবারে নিস্তব্ধ—একেবারে অন্ধকার।

অমাবস্যার রাত্রি—চারিদিকে অন্ধকার ঘুট-ঘুট করছে। সেই অন্ধকারে একা মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি এদিক ওদিক চারিদিক দেখতে লাগলুম আশেপাশে কেউ নেই, দূরে কেবল গাছগুলো অসাড় হয়ে ছায়ার মত দাঁড়িয়ে আছে। গায়ের ভিতরটা কেমন ছম্‌ছম্‌ করতে লাগল।

আমি আস্তে আস্তে গাড়ির মধ্যে গিয়ে উঠলুম। গাড়ির ভিতরটা একেবারে অন্ধকারে ঠাসা। তাড়াতাড়ি দেওয়াল হাতড়ে

বিজলীবাতির চাবি টিপলুম—খুট করে শব্দ হল, আলো হল না। সর্বনাশ, আলো নেই নাকি? আলোর সুইচ নিয়ে অনেক নাড়ানাড়ি করলুম, কোন ফল হল না। যেমন অন্ধকার তেমনিই। পকেট খুঁজলুম, দেশলাই নেই। কেমন করেই বা থাকবে? আমি তো চুরুট খাই না—লুকিয়েও না। হয়ত তোরঙ্গের মধ্যে একটা দেশলাই আছে। চাবি খুঁজতে লাগলুম, পৈতেতে চাবি বাঁধা ছিল; বালাপোশ, ওভারকোট, ওয়েস্টকোট, সোয়েটার, গেঞ্জির গোলকধাঁধাঁর মধ্যে কোথায় যে পৈতেগাছটা হারাল কিছুতেই খুঁজে পেলুম না। বামুনের ছেলে, বিপদে আপদে বিদেশে বিভুঁইয়ে যজ্ঞোপবীতটাই মস্ত সহায়। সেটাকেও শেষে খোয়ালুম।

সেই অন্ধকারে আমার যেন হাঁপ ধরতে লাগল। অন্ধকার যে জাঁতাকলের মত মানুষের বুককে এমন করে পিষতে থাকে—এ আমি জানতুম না। আমি গাড়ির মধ্যে এদিক ওদিক করে ছটফট করতে লাগলুম। মনে হল প্রাণ বেরিয়ে যাবে। মাথা ঘুরতে লাগল—চোখের সামনে নানারকম ছায়া দেখতে লাগলুম, কানে কাদের সব ফিস-ফিস কথা এসে লাগতে লাগল। কোথায় একটু আলো পাই! আমি ছুটে গাড়ি থেকে বেরিয়ে রেলের লাইন থেকে ছুটো পাথর তুলে ঠক-ঠক করে সজোরে ঠুকতে লাগলুম, যদি একটু আলোর ফিন্‌কি পাই। কিন্তু হায় অদৃষ্ট! আলোর বদলে পাথর-কুচির ফিন্‌কি এসে আমার চোখদুটিকে ঝনঝনিয়ে দিলে।

আাম দু-হাতে চোখ রগড়াতে রগড়াতে স্টেশনের দিকে ছুট দিলুম—যেমন করে পারি সেখান থেকে একটা আলো নিয়ে আসব। স্টেশনমাস্টারটা কী পাজি! এই অন্ধকারে মাঠের মধ্যে আমায় একা ফেলে গেল, একটা আলো দিলে না! বললে কিনা দিব্যি ঘুমোতে ঘুমোতে যাবেন! পাজি কোথাকার!

আমি ছুটতে ছুটতে একেবারে স্টেশনের কাছে এসে হাঁপ নিয়ে দাঁড়ালুম—প্ল্যাটফর্মের কিনারায় যে একটা বাঁকা খেজুর গাছ ছিল,—ঠিক তার সামনে। কিন্তু একি? এই তো সেই খেজুর গাছ, এই তো—

এই তো রয়েছে ; কিন্তু স্টেশন কোথায়? আমি এদিক ওদিক চারদিক চেয়ে দেখলুম,—স্টেশন নেই। মনে হল কালো স্লেটের গা থেকে ছেলেরা যেমন তাদের আঁকা ছবিগুলো মুছে ফেলে, ঠিক তেমনি করে অন্ধকারের গা থেকে স্টেশনটাকে একেবারে কে মুছে ফেলেছে।

আমার বুকটা ধ্বক্ করে উঠল। আমি আর তিলমাত্র না দাঁড়িয়ে আবার ছুটলুম—যে পথে এসেছিলুম সেই পথে—আবার গাড়ির দিকে। টপাটপ পাঁচ-ছটা লাইন টপ্‌কে আমি যখন সেই মাঠের ধারে আমার গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালুম, তখন দেখি, অত বড় গাড়িখানা নিয়ে কে উধাও হয়েছে। গাড়ির চিহ্নমাত্র সেখানে নেই। কী সর্বনাশ!

আবার ভাল করে চারিদিক চেয়ে দেখলুম—স্টেশনও নেই, গাড়িও নেই। চারিদিক খাঁ-খাঁ করছে। এখন উপায়? এই রাত্রে আশ্রয় পাই কোথায়? করি কী? একবার মনে হল যাই, আর-একবার গিয়ে ভাল করে স্টেশনটা খুঁজে আসি। কিন্তু স্টেশনের দিকটার সেই খাঁ-খাঁ মূর্তি মনে হয়ে আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। ছেলে-বেলায় গল্প শুনতুম, দৈত্য-দানোরা রাতারাতি বড় বড় বাড়ি উড়িয়ে নিয়ে আবার সকালে যেখানকার বাড়ি সেইখানে রেখে যেত। এ কি তাই হল নাকি? মনে তো বিশ্বাস হয় না, কিন্তু চোখে তো দেখছি তাই।

বুকটা কেঁপে উঠে মনে হল, এমন করে রেললাইনের উপর দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়—আচমকা একখানি গাড়ি এসে চাপা দিয়ে যেতে পারে। যেই এই কথা মনে হওয়া, তাড়াতাড়ি লাইন থেকে সরে অন্য দিকে ছুটে গেলুম। কিন্তু যেদিকে যাই সেই দিকেই লাইন। সামনে পিছনে, ডাইনে বাঁয়ে। যেদিকে ছুটি সেইদিকেই দেখি রেলের লাইন লোহার জাল দিয়ে আমায় ঘিরে ফেলেছে—পালাবার উপায় আর নেই। আমার এই ছুটোছুটি দেখে অন্ধকার থেকে কারা যেন খিল-খিল করে হেসে উঠল। আমি চমকে উঠে

থেমে দাঁড়াতেই টাল সামলাতে না পেরে একেবারে বাঁধের উপর থেকে গড়াতে গড়াতে নিচে এক গাছতলায় এসে পড়লুম। মনে হল প্রাণটা যেন বাঁচল। ট্রেন চাপা পড়বার আর ভয় নেই।

গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে চুপ করে বসে রইলুম। মনে হতে লাগল, কতক্ষণে রাত্রিটা কাটবে। কিন্তু রাত্রির যেন আর শেষ নেই। বসে বসে দেখতে লাগলুম, নিস্তব্ধ রাত্রি ঝিম্‌-ঝিম্‌ করতে করতে আরও নিঝুম হয়ে আসছে। আর রাতের অন্ধকারটা তার কালো গায়ের উপর চামচিকের ডানার মত একটা কালো কুৎসিত কম্বল আস্তে আস্তে টেনে মুড়ি দিচ্ছে। পৃথিবীর গা থেকে একে-একে সব জিনিস যেন মুছে আসছে। দেখতে দেখতে আমি-সুদ্ধ যেন মুছে আসতে লাগলুম। কালো জুতোমোজা-পরা আমার লম্বা পা-দুখানা একটু একটু করে মুছে গেল। কালো ওভারকোট ও নীল বালাপোশ-মোড়া গা—তাও আস্তে আস্তে মুছতে লাগল। এখন প্রায় কোমর অবধি মুছে গেছে, আমি আর সে-দৃশ্য দেখতে পারলুম না—তাড়াতাড়ি চোখ বুজে ফেললুম। চোখ বুজে মনে হতে লাগল—আমি আছি কি নেই—আছি কি নেই?

'আছে আছে—এইখানে আছে'। বলে কানের কাছে কে একজন চিৎকার করে উঠল। আমি চোখ চেয়ে দেখি, মানুষের দেহের মেদ মাংস ছাড়িয়ে নিলে যেমন হয় তেমনিতর একটা কঙ্কাল তার কাঠির মত সরু সরু লম্বা আঙুল নেড়ে ইশারা করে কাছে ডাকছে। দেখতে দেখতে ঠিক তারই জুড়ি আর-একটা কঙ্কাল লাফাতে লাফাতে তার পাশে এসে দাঁড়াল। তারপর আর-একটা।

দ্বিতীয় কঙ্কালটা আস্তে আস্তে সরে আমার খুব কাছে এসে ঘাড় হেঁট করে আমায় দেখতে লাগল। তার চোখের উপর চোখ পড়তে দেখলুম—না আছে পাতা, না আছে তারা, শুধু দুটো গোল গোল গহ্বর কালো কট-কট করছে। সে আমাকে বেশ নিরীক্ষণ করে দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'এই নাকি সে?'

প্রথম কঙ্কালটা বললে, 'সে না তো কে?'

দ্বিতীয়টা বললে, 'বেশ বেমালুম লুকিয়েছে তো। একেবারে চেনবার জো নেই।'

শেষ কঙ্কালটা ছুটে এসে বললে, 'কই দেখি?' বলে, তার হাড় বার-করা আঙুলগুলো দিয়ে টিপতে টিপতে আমায় দেখতে লাগল।

'ও আর দেখছিস কী, ও সে-ই। আমার চোখে কি ধুলো দেবার জো আছে—হাজারই লুকোক না।' বলে প্রথম কঙ্কালটা এতখানি হাঁ করে বিকট শব্দে হেসে উঠল। মুখের ভিতর থেকে তার সেই সাদা সাদা দাঁতগুলো বেরিয়ে অন্ধকারকে যেন কামড়ে ধরলে।

শেষ কঙ্কালটা বললে, 'তবু একটু পরখ করে নেওয়া ভাল। কী জানি যদি ভুল হয়।'

প্রথম কঙ্কাল বললে, 'সে আর পরখ করতে হবে না, ওদিকে লগ্ন বয়ে যায়।' 'বলে সে আমার শিয়রের কাছে এসে দাঁড়াল। আমি বললুম, 'ব্যস এইবার আমার শেষ।'

দেখতে দেখতে বাকি দুটো কঙ্কাল এগিয়ে এসে আমার পা দু-খানা ধরলে প্রথমটা মাথার দিকটা; তারপর তিনজনে মিলে মাটি থেকে চ্যাংদোলা করে আমায় তুলে ফেললে। আমি তাড়াতাড়ি দু-হাত দিয়ে গাছের গুঁড়িটা চেপে ধরে বলে উঠলুম, 'কোথায় নিয়ে যান মশাই?'

তারা বললে, 'বিয়ে দিতে।'

আমি চমকে উঠে বললুম, 'বিয়ে দিতে কী মশাই,—এই বুড়ো বয়সে?' একজন বললে, 'বুড়ো বরই আমরা পছন্দ করি।'

আমি বললুম, 'মশাই, আমার চেয়ে ঢের বুড়ো আছে, তাদের কাউকে নিয়ে যান না। আমায় কেন মিছিমিছি কষ্ট দিচ্ছেন?'

প্রথম কঙ্কালটা চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'তুমি ভেবেছ পালিয়ে এসে লুকিয়ে থাকলে রেহাই পাবে? তোমাকে আমরা জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দেব।'

আমি বললুম, 'আমি তো মশাই পালিয়ে এসে লুকিয়ে নেই। সেই

ছেলেবেলায় একবার পালিয়েছিলুম বটে; তারপর তো জ্যাঠামশাই পুলিশ দিয়ে ট্রেন থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে আমার বিয়ে দেন।'

সে বললে, 'আমরাও পুলিশ এসেছি, ধরে নিয়ে গিয়ে তোমায় বিয়ে দেব বলে।'

আমি কাঁচুমাচু হয়ে বললুম, 'কিন্তু আমি তো আর বিয়ে করতে পারব না!'

'পারবে না কী? বিয়ে তোমায় করতেই হবে। এমন কী তোমার গোঁ?' বলে সেই পয়লা নম্বরের কঙ্কালটা ভীষণ গর্জন করে উঠল।

আমি বললুম, 'রাগ করেন কেন মশাই! আমি ছাড়া কি পাত্র নেই? কত ছেলে হয়ত খুশি হয়ে বিয়ে করবে।'

সে বললে, 'এত রাত্রে এখন ভাল পাত্র পাই কোথা? যার-তার হাতে তো মেয়ে দেওয়া যায় না! চল, লগ্ন বয়ে যায়।'

আমি কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললুম, 'তাহলে নিতান্তই কি আমাকে বিয়ে করতে হবে?'

শেষ কঙ্কালটা আমার কাছে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে নরম সুরে বললে, 'দুঃখ করছিস কেন ভাই ক্যাংলা?'

আমি তড়াক্ করে দাঁড়িয়ে উঠে বললুম, 'ক্যাংলা কে মশাই! আমি তো ক্যাংলা নই, আমি শ্রীমাধবচন্দ্র চক্রবর্তী। আমার পিতার নাম ৺মধুসূদন চক্রবর্তী।'

প্রথম কঙ্কালটা হো-হো করে হেসে উঠে বললে, 'রাধে মাধব! রাধে মাধব!'

আমি বললুম, 'সে কী মশাই!'

সে বললে, 'এই এত রাত্রে, এই শ্মশানের ধারে একটা জ্যান্ত শেয়াল কুকুর থাকে না, আর মাধব চক্রবর্তী আছে? তুই এতই বোকা পেলি আমাদের?'

আমি বললুম, 'এই তো আমি রয়েছি।'

সে বললে, 'আরে ভাই, মাধব চক্রবর্তীর দেহের ভিতর থেকে কথা কইলেই কি তুই মাধব চক্রবর্তী হয়ে যাবি?'

আমি বললুম, 'সে কী মশাই। মাধব চক্রবর্তীর দেহের ভিতর আবার কে এল?'

সে বললে, 'আরে ক্যাংলা, তুই মাধব চক্রবর্তীর শূন্য দেহের মধ্যে সেঁদিয়ে আছিস, সে কি আমি টের পাই নি ভেবেছিস?'

আমি বললুম, 'এসব কী হেঁয়ালি বকছেন মশাই?' মাধব চক্রবর্তীর দেহের মধ্যে যদি ক্যাংলা এল, তো মাধব চক্রবর্তী গেল কোথা?'

সে বললে, 'আরে ভাই, বামুনের ছেলে সে, বৈকুণ্ঠে গেছে।'

আমি বললুম, 'না-মরেই সে বৈকুণ্ঠে গেল?'

সে বললে, 'মরেছে না তো কী?'

আমি বললুম, 'মরেছে কীরকম? সে মরে গেল আর টের পেলে না?'

সে বললে, 'মানুষ কখন জন্মায় আর কখন মরে, সে তা টের পায় নাকি?'

কথাটা শুনে বোঁ করে আমার মাথাটা ঘুরে গেল। আমার অজান্তে আমি মরে গেলুম নাকি—অ্যাঁ? সেই যে দেখলুম পৃথিবীর গা থেকে একে-একে সব মুছে আসছে—সে-ই কি আমার মৃত্যু নাকি? কিন্তু এই তো আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি। তা বটে। কিন্তু তবু কেমন সন্দেহ হতে লাগল। হয়ত এ আমি নই—এ আর কার আত্মা আমার শূন্য শরীর দখল করেছে! নইলে এই কঙ্কালগুলোর সঙ্গে এতক্ষণ কথা কইতে পারতুম? জ্যান্ত মানুষ কি কখনও তা পারে? কিন্তু মারা গেলুম কেমন করে? আমার তো কোন রোগ হয়নি! হয়ত ঐ বাঁধের উপর থেকে গড়িয়ে পড়বার সময় পাথরে মাথা লেগে আমার মৃত্যু হয়েছে—আমি টের পাই নি!

ভাবতে ভাবতে আমার মাথা গুলিয়ে যেতে লাগল। কেমন মনে হতে লাগল, না আমি মাধব চক্রবর্তী নই। এরা ঠিকই বলেছে—কাঙালীচরণের আত্মা আমার শূন্য দেহের মধ্যে এসে আসন পেতে বসেছে। তাইতে আমার দেহের ভ্রম হচ্ছে, মাধব চক্রবর্তীর জের বুঝি এখনও চলছে। কিন্তু কাঙালীচরণ লোকটা কে? আমি যদি কাঙালীচরণ হব,

তবে আমি আমাকে চিনতে পারছি না কেন? এরা তো চিনতেপেরেছে।

প্রথম কঙ্কালটা বলে উঠল, 'কী হে ক্যাংলা, কী ভাবছ? বিয়ে করবার মতি স্থির হল?'

আমি বললুম, 'আচ্ছা মশাই, আমি কি সত্যিই কাঙালীচরণ?'

সে খানিক আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে বললে, 'সে কী রে ক্যাংলা, তুই নিজেকে নিজে চিনতে পারছিস না?'

আমি বললুম, 'না।'

সে বললে, 'সর্বনাশ হয়েছে! তুই আমাদেরও চিনতে পারছিস না?'

আমি বললুম, 'একটুও না।'

সে বললে, 'তোর মনে পড়ছে না—আজ এই অমাবস্যার দিনে ঘুটঘুটে লগ্নে তোর বিয়ে—রাগেশ্বরীর সঙ্গে?'

আমি বললুম, 'কই, আমার তো কোন বিয়ের কথা হয় নি!'

সে বললে, 'সে কী রে? তোর পায়ে-গোবর পর্যন্ত হয়ে গেছে, মনে পড়ছে না?'

আমি বললুম, 'পায়ে-গোবর কাকে বলে?'

সে বললে, 'তুই অবাক করলি! তোর কিচ্ছু মনে পড়ছে না? পায়ে-গোবরের দিন ভোর রাত্রে তালপুকুরে তুই মাছ মারতে যাচ্ছিলি তত্ত্ব পাঠাবার জন্যে, তালপুকুরের মাথায় বসে পা ঝুলিয়ে রাগেশ্বরী মধু-পণের কড়ি বাছছিল; তুই রাগেশ্বরীকে দেখতে পাস নি, তারপর তুই যেমন ঠিক তালগাছের তলাটিতে এসেছিস, অমনি রাগেশ্বরীর পা দুটো দুলতে দুলতে তোর কপালে এসে ঠক্ করে লেগে গেল। রাগেশ্বরী তো লজ্জায় একহাত জিভ কেটে, মাথায় ঘোমটা টেনে দৌড়। আর তুই বাড়িতে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে বললি, "ও মেয়েকে আমি বিয়ে করব না!" "কেনরে, কেন, কী হয়েছে?" তুই বললি, "ওর পা আমার কপালে ঠেকেছে!" "তাতে হয়েছে কী?" তুই বললি, "হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু!" বলে কপাল চাপড়াতে লাগলি। এ-সব তোর মনে পড়ছে না?'

আমি বললুম, 'মনে পড়ছে, এইরকম একটা গল্প যেন কোথায় পড়েছিলুম। তারপর কী হল?'

সে বললে, 'সর্বনাশ করলি! তারপরও তোর মনে পড়ছে না? আবার তো গুরুঠাকুর এলেন, এসে বিধেন দিলেন যে রাগেশ্বরীর পা তোর মাথায় একবার ঠেকেছে, তুই সাত-একে-সাতশোবার তোর পা দিয়ে তার মাথাটা থেঁতলে দে, তাহলেই সব দোষ খণ্ডে যাবে।—তুই বললি, "ওরে বাপরে, রাগেশ্বরীর মাথায় লাথি মারা—সে আমি পারব না!" বলে তুই ছুট দিলি।'

আমি বললুম, 'তারপর?'

'তারপর আজ বিয়ের সময় তোকে খুঁজে না পেয়ে, খুঁজতে খুঁজতে এই শ্মশানঘাটে এসে দেখি, তুই এই মাধব চক্রবর্তীর মড়াটাকে দানো পাইয়ে বসে আছিস।—হ্যাঁরে! এই মাধব চক্রবর্তীকে যারা পোড়াতে এসেছিল তারা গেল কোথায়?' তোকে দেখে ভয়ে পালিয়ে গেছে বুঝি?'

আমি বললুম, 'মাধব চক্রবর্তীকে আবার পোড়াতে আসবে কারা? আমি তো তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

সে বললে, 'তোর কিছুই মনে পড়ছে না? তুই সত্যি বলছিস, না মস্করা করছিস?'

আমি বললুম, 'তোমার দিব্যি, আমি সত্যি বলছি।'

সে বললে, 'তবে সর্বনাশ হয়েছে—তোকে মানুষে পেয়েছে।'

আমি বললুম, ' "মানুষ পেয়েছে" কী গো?'

সে বললে, 'জানিস না বুঝি? আমরা যেমন মানুষের ঘাড়ে চাপি, মানুষেও তেমনি আমাদের কারো কারো ঘাড়ে চাপে। তুই যখন মাধব চক্রবর্তীর দেহে সেঁদিয়েছিলি, তখন বোধহয় তার একটুখানি প্রাণ ছিল, সেইটে তোকে পেয়ে বসেছে!'

আমি বললুম, 'তাতে কী হয়?'

সে বললে, 'মানুষ যেমন তখন নিজেকে চিনতে পারে না, আপনার লোককে চিনতে পারে না, আবোল তাবোল বকে, কটমট করে

চোখ ঘুরোতে থাকে, আমাদেরও ঠিক তেমনি হয়। তাই তো তুই অমন করছিস,—নিজেকে চিনতে পারছিস না, আমাদেরও চিনতে পারছিস না।'

আমি বললুম, 'তাই আমি নিজেকে ক্যাংলা বলে চিনতে পারছি না? ওগো, তবে আমার কী হবে।'

সে বললে, 'যেমন বিয়ে করব না বলে পালিয়ে এসেছিস, তেমনি ঠিক জব্দ।'

আমি বললুম, 'ওগো, আমি রাগেশ্বরীকে বিয়ে করব—আমাকে উদ্ধার কর।'

সে বললে, 'তবে বেরিয়ে আয়—ওখান থেকে।'

আমি বললুম, 'বেরুব কী করে গো?'

সে বললে, 'পথ হারিয়ে ফেলেছিস বুঝি? মুশকিল করলি দেখছি! এক কাজ কর্। মাধব চক্রবর্তীর ঐ কোঁচার খুঁটটা এই গাছের ডালে বেঁধে গলায় একটা ফাঁস দিয়ে তুই ঝুলে পড়্, তাহলেই সুড়ুৎ করে বেরিয়ে আসতে পারবি।'

আমি আঁৎকে উঠে বললুম, 'ওরে বাপ্‌রে! সে যে ফাঁসি! সে আমি পারব না।'

সে বললে, 'ভয় কী? আমি তো কতবার ফাঁসি গেছি! তোর কোন ভয় নেই, তুই ঝুলে পড়্।'

আমি ভয়ে শিউরে উঠে বললুম, 'না গো না—সে আমি পারব না! গলায় ফাঁস দিতে কিছুতেই পারব না।'

যেমন এই কথা বলা, সেই প্রথম কঙ্কালটা তার সেই কালো গর্তের মত চোখদুটোকে বন্-বন্ করে ঘুরিয়ে বললে, 'কী, তুই ফাঁসি যেতে পারবি না! আমরা হলুম গলায়-দড়ে, তুই আমাদের ঘরের ছেলে হয়ে এমন কথা বলছিস যে, ফাঁসি যেতে তোর ভয় হয়—কুলাঙ্গার কোথাকার!'

আমি কাঁচুমাচু হয়ে বললুম, 'কী করব, আমার যে ভয় করছে!'

সে দাঁতের দু-পাটি কড়মড় করতে করতে বলে উঠল, 'এইবেলা ঝুলে পড়্, নইলে তোর ভাল হবে না বলছি!'

আমি বললুম, 'ওগো তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমি ফাঁসিতে ঝুলতে পারব না—আমার ভয় করছে!'

সে আরও রেগে বললে, 'হতভাগা কোথাকার! দূর হ, আমাদের সামনে থেকে দূর হ!' বলে সে তেড়ে আমায় মারতে এল।

দ্বিতীয় কঙ্কালটা এগিয়ে এসে বললে, 'রাগ করেন কেন খুড়োমশাই! হয়ত ক্যাংলা নয়! নইলে ফাঁসিতে ভয় পাবে কেন?'

খুড়োমশাই বললেন, 'কী, ক্যাংলা নয় ও? আমি সাত বছর টিকটিকি পুলিশে কাজ করেছি, কত বড়-বড় ফেরার পাকড়াও করেছি, আমার ভুল হবে?'

শেষ কঙ্কালটা এগিয়ে এসে বললে, 'যখন সন্দেহ হচ্ছে তখন পরখ করে দেখতে ক্ষতি কী দাদামশাই?'

দাদামশাই বললেন, 'আচ্ছা বেশ, পরীক্ষা হোক।' বলে আমার দিকে ফিরে বললেন, 'কী হে, তুমি মাধব চক্রবর্তী, না কাঙালীচরণ?'

আমি বললুম, 'আগে তো জানতুম আমি মাধব চক্রবর্তী, কিন্তু তার পর থেকে মনে হচ্ছে কাঙালীচরণ।'

সে বললে, 'কাঙালীচরণ যদি হও, তুমি আমার অবাধ্য হয়েছ বলে তোমায় শাস্তি নিতে হবে—তোমায় শাস্তি দেব আমরা এই শ্মশানে—এই গাছের ডালে।'

আমি বললুম, 'আচ্ছা আমি তবে মাধব চক্রবর্তী।'

সে বললে, 'বেশ, মাধব চক্রবর্তী বলে যদি নিজেকে প্রমাণ করতে পার, তাহলে তিনবার সেলাম ঠুকে আমরা চলে যাব।'

'আর যদি না পারি?'

'তাহলে এখানে তোমার ঘাড় মটকে রেখে চলে যাব।'

'ঘাড় মটকে দেবেন? সর্বনাশ! এই বিদেশে বিভুঁয়ে, এই অচেনা জায়গায় এত রাত্তিরে নিজেকে কী করে প্রমাণ করব মশাই!'

'না পার, ঘাড়টি মটকে দেব—শ্মশানের ভূত হয়ে থেকো।'

সত্যি বলছি, এই কথা শুনে আমি কেঁদে ফেললুম। তখন সেই দ্বিতীয় কঙ্কালটা এগিয়ে এসে বললে, 'কাঁদছ কেন? তোমার এমন কোন চিহ্ন নেই যাতে প্রমাণ হয় তুমি মাধব চক্রবর্তী?'

আমি বললুম, 'আছে। এই দেখুন, আমার ডান হাতে একটা জড়ুলের দাগ।'

সে রেগে বললে, 'ও প্রমাণ তোমাদের পুলিশের কাছে চলে, এখানে আমাদের কাছে চলে না। কোন ভিতরের প্রমাণ দিতে পার?'

আমি বললুম, 'আমার ভিতরে কী আছে না আছে, আমি তো তা জানি না মশাই! এই দেখুন না, আমার ভিতরে কাঙালীচরণ আছে, কি মাধব চক্রবর্তী আছে, আমি তা-ই ঠিক ঠাহর করতে পারছি না।'

প্রথম কঙ্কালটা গম্ভীর স্বরে বলে উঠল, 'কাঙালীচরণ হলে তোমায় ফাঁসি দেব কিন্তু!'

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলুম, আজ্ঞে না না, আমি মাধব চক্রবর্তী।'

সে বললে, 'শিগগির প্রমাণ কর, নইলে ঘাড় মটকালুম বলে!'

দ্বিতীয় কঙ্কালটি বললে, 'অমন ঘেবড়ে যাচ্ছ কেন? তোমার কি এমন কোন গুণ নেই যাতে বোঝা যায় তুমি মাধব চক্রবর্তী?'

আমি বলে উঠলুম, 'হ্যাঁ, আছে বৈকি! আমার একটা মস্ত গুণ আছে, আমি কবিতা লিখতে পারি।'

প্রথম কঙ্কালটা এগিয়ে এসে বললে, 'তুমি কবিতা লিখতে পার? নিজে লেখ? না পরের কবিতা নিজের বলে চালাও?'

আমি বললুম, 'না মশাই, আমি সেরকম কবি নই।'

সে বললে, 'তোমার কবিতা কাগজে ছাপা হয়?'

আমি বললুম, 'না, সম্পাদকেরা ভয়ে ছাপেন না।'

সে বললে, 'ভয়ে ছাপেন না কী রকম?'

আমি বললুম, 'আমার কবিতা এত উচ্চশ্রেণীর যে, একবার সে কবিতা ছাপালে পাঠকেরা অন্য কবিতা পড়তে চাইবে না। কাগজ ভর্তি করা তখন দায় হয়ে উঠবে। এ কথা এক সম্পাদক আমায় নিজের মুখে বলেছেন।'

সে বললে, 'আচ্ছা! কই দেখি, একটা কবিতা লেখ দিকিন!'

আমি তখনই আমার ওভারকোটের পকেট থেকে আমার পকেট-বইখানা বার করে বললুম, 'আলো একটা চাই যে!'

সে বললে, 'দিচ্ছি আলো।' বলে, খানিকটা ধুলো বালি একত্র করে একটা ফুঁ দিলে, আর অমনি আগুন জ্বলে উঠল। আমি সেই আলোয় বসে লিখতে লাগলুম।

খানিকটা লিখেছি, সে বললে, 'কই, কী লিখলে পড়।'

আমি বললুম, 'এখনও যে শেষ হয়নি মশাই।'

সে বললে, 'কবিতার আবার শেষ আছে নাকি? যা লিখেছ পড়—ফাজলামি করতে হবে না।'

আমি সুর করে পড়লুম—

'পড়িয়ে বিপদে তারা
হয়েছি মা দিশেহারা!
উদ্ধারো এ দুঃখ কারা-
গার হতে মা জননী!
শ্মশানে বসিয়ে ডাকি,
ভয়ে ঘোরে শির চাকি,
খাবি খায় প্রাণ-পাখি,
শূন্য হেরি এ ধরণী।
কোথা মোর গেহ-খাঁচা,
কোথা পিতা, কোথা চাচা,
এসে, মা, আমারে বাঁচা
দিয়ে তোর পা-তরণী!'

এইটুকু শেষ হতেই সে বললে, 'ঢের হয়েছে ঢের হয়েছে! এরকম গান তো আমি অনেক যাত্রায় জুড়িদের মুখে শুনেছি। এ তোমার নিজের লেখা, না পুরোনো গান একটা মুখস্থ ছিল, তাই লিখে শোনাচ্ছ?'

আমি বললুম, 'না মশাই, এ আমার নিজের রচনা। একেবারে

টাটকা! এতে আপনি পুরোনোর গন্ধ কোথায় পেলেন? দেখছেন না, একেবারে আধুনিক ধরনে লেখা!'

সে বললে, 'থামো, তোমায় আর জ্যাঠাপনা করতে হবে না। পুরোনো একটা গান চুরি করে নিয়ে আমায় ফাঁকি দেবে ভেবেছ? তা হচ্ছে না! দেখি তুমি কত বড় ওস্তাদ! আমার নাম দিয়ে একটা কবিতা লিখতে পার?'

আমি বললুম, 'খুব পারি। নাম দিয়ে আমি অনেক কবিতা লিখেছি। তেলের নাম দিয়ে, ওষুধের নাম দিয়ে, অনেক ভাল ভাল কবিতা আমার লেখা আছে। একবার একটা জুতোর দোকানের কবিতা লিখে আমি প্রাইজ পেয়েছিলুম। আপনার নামটা কী বলুন, আমি এখনই লিখে দিচ্ছি।'

সে বললে, 'আমার নাম জাঁদরেল। লিখে ফেল দেখি এই নাম দিয়ে একটা কবিতা চট্ করে! বুঝব কত বড় বাহাদুর তুমি!'

আমি কাগজ পেন্সিল নিয়ে লিখতে শুরু করেছি মাত্র, সে বললে, 'কী লিখলে পড় হে! আমি ও বড় কবিতা দু-চক্ষে দেখতে পারি না!'

আমি বললুম, 'মশাই আর একটু সময় দিন।' বলে আমি ঘস্-ঘস্ শব্দে লিখে যেতে লাগলুম। একবার একটু থেমেছি, সে আমার খাতার দিকে ঝুঁকে দেখে বললে, 'উঃ, অনেকটা লেখা হয়েছে। এইবার পড়।'

অগত্যা আমি পড়লুম—

রেল আছে, জেল আছে,
 আর আছে কদবেল;
পাশ আছে, ফেল আছে,
 আর আছে শূল শেল।
ঢোল আছে, চোল আছে,
 আর আছে সারখেল,
সব্-সে বড়া হ্যায়
জাঁদরেল, জাঁদরেল!'

পড়া শেষ হতেই সে চিৎকার করে উঠল, 'বাঃ বাঃ, বেড়ে লিখেছ তো হে! আর-একবার পড় তো, আর-একবার পড় তো!'

আমি আর-একবার চিৎকার করে পড়লুম—'রেল আছে জেল আছে' ইত্যাদি। সে আবার বললে, 'বেশ হয়েছে! চমৎকার হয়েছে! যাও, প্রমাণ হয়ে গেল, তুমি কবি মাধব চক্রবর্তী।'

আমি বললুম, 'ঠিক বলছেন মশাই? আমি কাঙালীচরণ নই?'

সে বললে, 'কাঙালীচরণের চৌদ্দপুরুষ এমন কবিতা লিখতে পারে না! মাধব চক্রবর্তী না হলে এমন কবিতা লেখে কে?'

আমি বললুম, 'মশাই, আমার আর একটা কবিতা শুনবেন?' এই খাতায় লেখা আছে—এই জয়পুরের শীত সম্বন্ধে।'

সে বললে, 'কই, শোনাও তো দেখি!'

আমি তাড়াতাড়ি পকেট-বইয়ের পাতা হাতড়ে কবিতাটা বার করে পড়তে শুরু করলুম :—

বস্তা-বস্তা পুঞ্জ-পুঞ্জ তীব্র হিম ঢেলে
ব্যোম-মার্গে কে রচিল শীতের পাহাড়?
লেপ-গদি বাংলাপোষ সর্ব বর্ম ভেঙে
কম্প এসে কাঁপাইছে শরীরের হাড়!
ঊর্ধ্বফণা ক্রুদ্ধ শত নাগিনীর প্রায়
কপালে কপোলে ভীম হানিছে ছোবল,
কিংবা কোন্ পিশাচিনী উন্মাদিনী-সমা
তীক্ষ্ণধার ছুরিকায় করিছে কোতল
অথবা কি মেঘ-দৈত্য ছোড়ে শার্প নেল—'

হঠাৎ দূরে একটা বীভৎস কোলাহল উঠল—'ওরে ক্যাংলাকে পাওয়া গেছে!'

আমি চমকে উঠে পড়া থামিয়ে চেয়ে দেখি, আমার সামনের কঙ্কাল-তিনটে লাফাতে লাফাতে ডিগবাজি খেতে খেতে মাঠের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি রাম! রাম! বলতে বলতে সেখান থেকে উঠে পড়লুম। এতক্ষণ রাম নামটা যে কেন মনে আসেনি কে জানে।

আমি রেললাইনের বাঁধ ঠেলে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় ছুটো কুলির সঙ্গে দেখা। তারা বললে, 'বাবু আপনাকে আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি। আপনি গাড়ি ছেড়ে কোথায় গিয়েছিলেন ?'

আমি আর কী বলব। বললুম, 'আমি এখানে ঐ ইয়ে হচ্ছিল কিনা, তাই একটু দেখেছিলুম।'

তারা বললে, 'আপনার গাড়ি ঠেলে আমরা ঐ ওদিকে রেখে দিয়েছি। চলুন আপনাকে দেখিয়ে দি।' বলে তারা আমাকে গাড়িতে তুলে দিলে। আমি গাড়িতে উঠে বললুম, 'হ্যাঁরে গাড়িতে আলো নেই কেন ?'

সে বললে, 'বিজলি বাতি আছে, মেল গাড়ির সঙ্গে লাগিয়ে দিলে তবে জ্বলবে।'

আমি বললুম, 'আমাকে একটা বাতি দিয়ে যেতে পারিস,—বখশিস দেব ?'

তাদের একজন ছুটে গিয়ে একটা বাতি এনে দিলে। আমি সেইটে সামনে রেখে পকেট-বই খুলে নিজের লেখা কবিতা পড়তে লাগলুম।

অতিথির আবদার

আমি কিছুদিন খবরের কাগজের রিপোর্টার হয়ে ছিলুম। অর্থাৎ প্রতিদিন যত রাজ্যের খবর সংগ্রহ করে আমাকে দৈনিক সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ করতে হত। সত্যের সঙ্গে খানিকটা কল্পনা এবং কল্পনার সঙ্গে খানিকটা সত্যের রসান দিয়ে নীরস হাড়-বার-করা খবরগুলোকে নধর এবং সরস করে তোলাই আমার কাজ ছিল। এইটুকু পারি বলেই সাংবাদিক সাহিত্যে আমার এতখানি আদর এবং প্রতিষ্ঠা।

সেদিন সারাদিন সারা শহরটা ঘুরে দু-চারটে ছুটো তুচ্ছ খবর ছাড়া বেশি কিছু সংগ্রহ করতে পারি নি। সেইজন্য মনটা তেমন ভাল ছিল না। একে শ্রান্ত দেহ, তার উপর অবসন্ন মন নিয়ে যখন বাসায় ফিরলুম তখন সমস্ত দেহ-মনে কেমন একটা আচ্ছন্ন ভাব অনুভব করতে লাগলুম। মনে হতে লাগল খাটিয়ায় চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ি।

কিন্তু পারলুম না, সামনে যে কাজ। যে খবরগুলো সংগ্রহ করেছি কোন রকমে গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়ে সেগুলো ছাপাখানায় পাঠিয়ে দেবার মতলবে কলম নিয়ে বসে গেলুম।

একটা খুনের খবর ছিল। কলকাতা থেকে বারো মাইল দূরে এক গ্রামে একটা ভীষণ খুন হয়েছিল। কিন্তু খবরটা এমন প্রহেলিকাময় ধোঁয়াটে যে সেটাকে যথেষ্ট পরিমাণে তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ করে তোলা শক্ত। কে যে খুন করেছে, কাকে খুন করেছে এবং কেনই বা খুন করেছে তার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পুলিশ এ পর্যন্ত দিতে পারে নি এবং আমিও আবিষ্কার করতে পারি নি। যে ঘরে খুন হয়েছে সেখান থেকে একটা জিনিসও চুরি যায় নি। একটা বাক্স-প্যাঁটরাও ভাঙা হয় নি। তাহলে খবর দেবার আর কী আছে? এক লাইনেই খুনের সব খবর শেষ হয়ে যায়। খুন তো প্রত্যহ হয় না, কাজেই এই খবরটাকে এক নিশ্বাসে শেষ করে আমার খবর-রচনার প্রতিভাটাকে ক্ষুণ্ণ করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। তাই বসে বসে ভাবতে লাগলুম।

হঠাৎ মনে হল, চুরি তো হয়েছে! যারা খুন করেছে, তারা আর কিছু চুরি করেনি বটে, কিন্তু যাকে খুন করেছে তার মাথাটা তো কেটে নিয়ে গেছে। নিশ্চয় এর মধ্যে কোন উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু সে উদ্দেশ্যটা কী? খামকা একটা মানুষের মাথা কেটে নিয়ে গিয়ে চোরের যে কী লাভ হতে পারে তার সূক্ষ্ম তত্ত্বটা কিছুতেই মাথায় আনতে পারছিলুম না। কিন্তু তা বলে তো খবরটাকে ছাড়া চলবে না, কোন একটা বিশেষ সূত্র অবলম্বন করে খবরটাকে বেশ রীতিমত লোমহর্ষক করে তুলতে হবেই।

বেশ নিবিষ্ট মনে লিখতে বসে গেলুম। সামনে কেরোসিনের বাতিটা টিম-টিম করে জ্বলছিল, টেবিল-ঘড়িটা টিক্-টিক্ শব্দে চলছিল। রাতের নিস্তব্ধতা ক্রমেই বেশ জমাট হয়ে আসছিল, আমি ঘরের মধ্যে একলাটি বসে খুনের একটা লোমহর্ষক কাহিনী লিপিবদ্ধ করে চলেছিলুম। মুণ্ডচ্ছেদের ব্যাপারটা ক্রমেই এমন ঘোরালো হয়ে উঠছিল যে সেই গভীর রাত্রে একলা ঘরে বসে নিজের লেখা বিবরণে নিজেই

চমকে চমকে উঠছিলুম। শেষে গায়ের ভিতরটা কেমন শির-শির করতে লাগল—কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম। মনে হতে লাগল যেন মাথাটা কেমন আচ্ছন্ন হয়ে আসছে ; ঐ ভীষণ খুনটা যেন নিজের চক্ষে দেখছি। সামনে যেন রক্তগঙ্গা বয়ে যাচ্ছে, একটা দুশমন কার ঘাড়টা ধরে, তার জ্যান্ত মুণ্ডুটা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কেটে নিচ্ছে—উঃ, আমি আর থাকতে পারলুম না, তাড়াতাড়ি খুনের বর্ণনা লেখা কাগজগুলো চাপা দিয়ে চোখ বুজে ফেললুম।

হঠাৎ একটা জোর ফুঁ দিয়ে কেরোসিনের ছোট্ট টিমটিমে বাতিটা কে নিবিয়ে দিলে। মানুষের গলা টিপে ধরলে যেমন ঘড়-ঘড় আওয়াজ হয়, টেবিল-ঘড়িটা তেমনিতর একটা বিশ্রী আওয়াজ করে একেবারে নিসাড় হয়ে গেল—তার বুকের টিক-টিক আওয়াজ আর শোনা গেল না। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা চড়াই পাখি কড়িকাঠের ফাঁক থেকে কি একটা টুপ করে ঠিক আমার সামনেটিতে ফেলে দিলে। মনে হল যেন একটি ছোট মটরদানা।

অন্ধকারে সেই মটরদানাকে দেখতে দেখতে ক্রমে সেটা একটা প্রকাণ্ড মাথার মত হয়ে উঠল। ধড় নেই, শুধু গলা-কাটা মুণ্ডু! মাথা-ভরা মস্ত বড় বাবরি চুল ; বড় বড় দুটো গোল চোখ লাল টকটক করছে। চওড়া কপালখানা মিশকালো—তার উপর রাঙা সিঁদুর দিয়ে একটা ত্রিশূল আঁকা ; এই এত বড় জোড়া কালো গোঁফ—দুদিকে পাকানো, গালপাট্টা দাড়ি। ঠিক যেন মনে হল মা দুর্গার প্রতিমার হাতের অসুরের মুণ্ডুটা আমার দিকে কটমটিয়ে চেয়ে আছে।

আমি ভয়ে একটু পেছিয়ে যেতেই, সে তার বড়-বড় চোখদুটো বোঁ বোঁ করে ঘোরাতে ঘোরাতে বলে উঠল—'ভয় পাও কেন?'

আমি আর কথার জবাব দেওয়া নয়, সাঁ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে একেবারে আমার শোবার খাটিয়ায় এসে বসলুম। সঙ্গে সঙ্গে মুণ্ডুটা টেবিল থেকে তড়াক করে লাফিয়ে একেবারে আমার খাটিয়ায় এসে হাজির হল। বললে, 'শোন না!'

আমি আর বিলম্ব নয়, খাটিয়া থেকে দৌড়ে আবার চেয়ারে এসে বসলুম। সেও লাফাতে লাফাতে খাটিয়া ছেড়ে, টেবিলের উপর ঠিক মুখের সামনেটিতে এসে বসল। বললে, 'একটু স্থির হও না!' বলে ক্রমেই সে আবার কাছে ঘেঁসে আসতে লাগল।

আমি এবার চেয়ার ছেড়ে খাটিয়ায় এসে ধপ করে শুয়ে একেবারে লেপের মধ্যে প্রবেশ করলুম—আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে।

সে বললে, 'অমন করছ কেন? হল কী তোমার?'

আমি লেপের মধ্যে থেকে বললুম, 'আমার কিছু হয় নি। তুমি এখান থেকে বেরোও।'

সে বললে, 'আচ্ছা অভদ্র তো তুমি! তোমার ঘরে অতিথি এল, তাকে তুমি তাড়িয়ে দিচ্ছ? এই তোমার শিক্ষা!'

আমি কোন জবাব দিলুম না। সেই না-ছোড় বান্দা বাবরি চুলওয়ালা মুণ্ডুটা আমার লেপ-মুড়ি দেওয়া দেহের আশে পাশে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আমি চুপ করে পড়ে রইলুম। এমনি থাকলে সে নিরুপায় হয়ে আপনিই পালাবে ভাবলুম।

কিন্তু কী সর্বনাশ! হঠাৎ দেখি, লেপের কোণে একটা ফাঁক আবিষ্কার করে সে সুড়ুৎ করে আমার লেপের মধ্যে ঢুকে পড়েছে—একেবারে আমার বুকের উপর এসে বসেছে। তার সেই কালো গালপাট্টা-ভরা মুখের ভিতরকার শাদা শাদা দাঁতগুলো বার করে সে হেসে বললে, 'কি, বড্ড যে লুকিয়েছিলে?' বলেই সে বিকট শব্দে হেসে উঠল। আমি সেই হাসির শব্দে আঁতকে উঠে হাতের এক ঝাপটায় সেই মুণ্ডুটাকে বুক থেকে টেনে ফেলে দিলুম। সে খানিকটা গড়িয়ে পড়ে আবার হাসতে হাসতে আমার বুকের উপর এসে বসল। কী আপদ!

আমি চোখ বুজে কাঠ হয়ে পড়ে রইলুম। সে বললে, 'ওকি, চোখ বুজলে কেন? শোন যা বলি।' আমি তবু চুপ করে রইলুম। সে কখন আস্তে আস্তে বুক থেকে মুখের কাছে এগিয়ে এসেছে টের পাই নি। হঠাৎ তার গালপাট্টা দাড়িটা আমার গালে ঘষতেই আমি

চমকে উঠলুম। সে আদর করে তার সেই গালপাট্টা আমার গালে ঘসতে ঘসতে আমায় বলতে লাগল, 'রাগ করছ কেন ভাই ? একবার চোখটা খোল।'

আমি জবাব দেব কি, তার সেই দাড়ির ঘর্ষণে বোধ হতে লাগল আমার দেহের ভিতরের অস্থি মেদ মাংসগুলোকে একটা মুড়ো খ্যাংরা দিয়ে কে যেন আগা পাস্তলা ঝেঁটিয়ে দিচ্ছে! সর্বশরীর রি রি করতে লাগল। আমি ঘাড় দিয়ে একটা জোর ঝাঁকানি মেরে সেই মুণ্ডুটাকে মুখের পাশ থেকে সরিয়ে দিলুম। পাছে আবার সে মুখের কাছে মুখ নিয়ে আসে এই আতঙ্কে লেপ ছেড়ে একেবারে সোজা হয়ে বসলুম। সে একটু মুচকে হাসলে।

আমি তখন মরিয়া হয়ে উঠেছি। এই বীভৎস মুণ্ডুটার সঙ্গে এতক্ষণ একলা কাটিয়ে ভয় এবং অস্বোয়াস্তির প্রথম ধাক্কাটা যেন অনেকখানি মোলায়েম হয়ে এসেছিল। আমি তার দিকে চেয়ে বিরক্তির স্বর বলে উঠলুম—'কী চাও তুমি ?'

সে বললে, 'এই কথাটা প্রথমেই জিগগেস করা উচিত ছিল। তাহলে এতক্ষণ ধরে এতখানি ধস্তাধস্তি করতে হত না!'

আমি বললুম, 'আমি কি সাধে ধস্তাধস্তি করেছি ? তোমার যে বিকট রূপ!'

সে বললে, 'তোমারই বা কী এমন মনোমোহন রূপ ? ঐ তো চিমসে চেহারা!'

আমি বললুম, 'থাক, এখন আর রূপের সমালোচনায় কাজ নেই। তুমি কী চাও বল।'

সে বললে, 'আমি কী চাই, তা আবার বলে দিতে হবে ? আমার কী অভাব তা তুমি দেখতে পাচ্ছ না ? তোমার চোখ নেই ?'

আমি বললুম, 'দেখ, তোমার কী অভাব আছে না আছে তা দেখবার আমার ইচ্ছেও নেই, দরকারও নেই।'

সে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললে, 'দেখছ না, আমার ধড় নেই! মানুষের একটা চোখ কি একটা পা না থাকলে তার প্রতি তোমাদের

কত দয়া হয়, আমার সারা ধড়টাই নেই দেখেও তোমার এতটুকু দয়া হচ্ছে না?' বলতে বলতে তার চোখ দিয়ে টস-টস করে জল পড়তে লাগল।

সত্যি বলছি, তার সেই কান্না দেখে আমার কেমন মায়া করতে লাগল। তার যে অমন ভয়ঙ্কর মূর্তি, যা দেখলেই প্রাণ আঁৎকে ওঠে, তা দেখে আর তেমন ভয় করতে লাগল না। বরং ইচ্ছে হতে লাগল তার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিই। সে বোধহয় আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছিল। আদর দিলে বেড়াল-গুলো যেমন গায়ের উপর এসে গা ঘসতে থাকে, তেমনিতর সেই বিকট মুণ্ডুটা আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে আমার পায়ের উপর মুখ-থুবড়ি খেয়ে পড়ে তার গালপাট্টাওয়ালা গালটা বুলোতে লাগল। বেচারার আকুতি-কাকুতি দেখে আমি আর তাকে ঠেলে ফেলে দিতে পারলুম না, তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে জিগগেস করলুম, 'কী হয়েছে তোমার বল তো?'

সে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললে, 'আমার ধড় চুরি গেছে।'

এই চুরির কথা শুনেই হঠাৎ আজকের খুনের কথাটা আমার মনে পড়ল। আমি বলে উঠলুম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আজ একটা ধড় পাওয়া গেছে বটে, তার মুণ্ডু নেই। সে কি তোমারই ধড় নাকি?'

কথাটা শুনে সে গলাটা উঁচু করে বলে উঠল, 'অ্যাঁ! ধড় পাওয়া গেছে? কী রকম? কী রকম? শুনি!'

আমি আমার লেখা রিপোর্টখানা টেনে নিয়ে তাকে আগাগোড়া ঘটনাটা পড়ে শোনাতে লাগলুম। সে একমনে শুনতে লাগল। শোনা শেষ হলে একগাল হেসে বলে উঠল, 'দূর! এ তোমার গল্প! তুমি গল্প লেখ বুঝি?'

আমি বললুম, 'গল্প হবে কেন? এ সত্যি ঘটনা।'

সে তার চোখদুটো ঘুরিয়ে বললে, 'কখ্‌খনো না! সত্যি ঘটনা এরকম হতে পারে না; এ তোমার বানানো গল্প!'

আমি তার কথা শুনে একটু থতমত খেয়ে গেলুম। খুনের ঘটনার

উপরে রসান দিয়ে আমি যে এতক্ষণ একটা ঘোরালো রিপোর্ট তৈরি করলুম, সেটা কি তাহলে, নিতান্ত ছেলেমানুষী গল্প হয়ে উঠল?'

আমি বললুম, 'এ তো একেবারে সত্যি ঘটনার মত। গল্প কোনখানে দেখলে?'

সে বললে, 'কাটামুণ্ডু কী করে চুরি যায়, এই কাটামুণ্ডু আমি—আমি তা জানি; তুমি কী করে জানবে? ও তোমার লেখা ঠিক হয়নি—আগাগোড়াই আজগুবি গল্প হয়েছে।'

আমার কেমন ধাঁধা লাগতে লাগল। এতকাল রিপোর্ট লিখে আসছি, কেউ কখনো নিন্দে করে নি, আজ কি একটা আজগুবি গল্প লিখে ফেললুম? নাঃ, তার কথায় আমার বিশ্বাস হল না। আমি ভাবছি; সে বললে, 'ভাবছ কী? আমার কাছে শুনে যাও, তবে কাটামুণ্ডুর রিপোর্ট সঠিক লিখতে পারবে।'

আমি হেসে বললুম, 'তাহলে সেটা আরও আজগুবি হবে।'

সে বললে, 'কেন?'

আমি বললুম, 'এত রাত্রে একটা কাটামুণ্ডু এসে আমায় রিপোর্ট দিয়ে গেল, একথা শুনলে লোকে বলবে কী—বলবে গাঁজাখুরি গল্প!'

সে রেগে দাঁত কড়-মড় করে বলে উঠল, 'কী, আমি গাঁজাখুরি গল্প? আমি সর্দার গজধর সিংহ, যে এককালে হাতির শুঁড় ধরে চরকি-বাজির মত বিশমণ হাতি ঘুরিয়েছে, সে হল গল্প? আর তোমার ঐ কাগজে লেখা কতকগুলো ফাঁকা কথা, তাই হল সত্যি?'

তার এই ভীষণ রাগ দেখে আমার কেমন ভয় করতে লাগল। আমি বললুম, 'রাগ কর কেন ভাই? এই দুপুর রাত্রে, কেউ কোথাও নেই, একটা কাটামুণ্ডু কোথা থেকে আমার ঘরে এসে আমার সঙ্গে বাক-বিতণ্ডা করছে, এ কথা বললে কেউ কি বিশ্বাস করবে? বলবে ও তোমার বানানো গল্প।'

সে ভুরুদুটো কুঁচকে বললে, 'বিশ্বাস করবে না কেন?'

আমি বললুম, 'কাটামুণ্ডু কখনো কথা কইতে পারে ? না, সে জ্যান্ত মানুষের মত ঘুরে বেড়াতে পারে ?'

সে বললে, 'পারে কি না পারে—এই তো স্বচক্ষে দেখছ ! বল পারে কি না পারে !' 'বলে সে আমায় এক ধমক দিয়ে উঠল।

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, স্বচক্ষে দেখছি বটে যে তুমি এসেছ, কিন্তু—'

সে বললে, 'কিন্তু কী ? কিন্তু আবার কী ?—এই তো দেখছ ! স্বচক্ষে দেখছ সর্দার গজধর সিংহের কাটামুণ্ডু তোমার সামনে স্পষ্ট কথা কইছে !'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ' দেখছি বটে, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছি না।'

সে বললে, 'বোস বুঝিয়ে দিচ্ছি।' বলে সে তার সেই সাদা ঝকঝকে দাঁতগুলো একবার বার করে দেখালে। মনে হল বুঝি বা আমাকে এখনি কামড়ে ধরবে। আমি আঁতকে উঠে একটু পিছিয়ে গেলুম।

সে বললে, 'এইবার বুঝতে পেরেছ তো ? এখন শোন আমার ইতিহাস—তারপর তোমার রিপোর্টটা লিখো। কাটামুণ্ডুর রিপোর্ট কি সোজা জিনিস নাকি ?'

এই রে, আবার যে ইতিহাস আরম্ভ করে ! এমনি করে সারা রাত চলবে নাকি ? আমি বললুম, 'মাথা ধরেছে আমার ; আমি এখন ইতিহাস শুনতে পারব না।'

সে বললে, 'শুনতেই হবে তোমাকে ! না শুনলে তোমার কান ফুঁড়ে জোর করে শুনিয়ে দেব !'

আমি আর কী করি ? প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললুম, 'আচ্ছা তাহলে বল।'

সে আরম্ভ করলে—'আমার নাম সর্দার গজধর সিং। 'আসল নাম পূর্ণ বেহারা। হাতির শুঁড় ধরে ঘোরাতে পারতুম বলে লোকে আমায় খেতাব দিয়েছিল গজধর সিং। কত বছর আগে ঠিক জানি না, আমি ছিলুম বিষ্ণুপুরের বনগাঁয়ের জমিদারের পাইক। যেমন দুশমনের মত চেহারা, তেমনি দুশমনের মত গায়ের জোর ! আমার ডাকে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খেত। আমি বাবুর বাড়ি পাহারা দিতুম।

আমার নাম শুনে বনগাঁয়ের বিশ পঁচিশ ক্রোশের মধ্যে চোর কি ডাকাত আসতে সাহস করত না। আমি রোজই দেউড়িতে পাহারা দিই, একদিন সকালে বাড়িতে মহা হৈ-হৈ পড়ে গেল—গিন্নিমায়ের সিন্ধুক ভেঙে হীরের গয়না চুরি হয়েছে। কর্তা আমায় তলব করলেন, আমি দেউড়িতে পাহারা দিই, অথচ চুরি হল কেমন করে? চুরির কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলুম—আমি সর্দার গজধর সিং হাজির থাকতে চোর এল কেমন করে? আমি বললুম, "হুজুর, বাইরে থেকে কখনই চোর আসেনি।" কর্তা বললেন, "তবে কি আকাশ থেকে চোর পড়ল?" আমি বললুম, "চুরি ভিতরের লোকই করেছে।" কর্তার ছোট ভাই সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সে এই কথা শুনে আমার দিকে কটমট করে চেয়ে উঠল। সে আমার উপর ভারি চটা ছিল। রোজই অনেক রাত্রে লুকিয়ে সে বাড়ি ফিরত বলে আমি তাকে শাসাতুম, কর্তাবাবুকে বলে দেব। সেই রাগ তার আমার উপর ছিল। সে বলে উঠল, "এত বড় আস্পর্ধা! চাকর হয়ে মনিবদের চোর বলে—দাও বেটাকে গলাধাক্কা!" "বলে সে আমার ঘাড় ধরে এক ধাক্কা দিলে। আমি তার হাতখানা মুচড়ে ভেঙে দিতে পারতুম, কিন্তু হাজার হোক মনিব!

'সেইদিনই চাকরির উপর ঘৃণা হল। চাকর বলেই তো মিছামিছি অপমানটা সইতে হল! আমি কাজে ইস্তফা দিয়ে এক ডাকাতের দল খুললুম। মনে করলুম গায়ের জোরে যা পারি রোজগার করব, পরের চাকরি আর করব না। ডাকাতি ব্যাবসা খুব জোর চলতে লাগল। দলের লোকেরা আমার পুরোনো মনিব মস্ত ধনী বলে তাঁর বাড়ি লুট করবার জন্যে প্রায়ই আমাকে জেদাজেদি করত, কিন্তু আমি রাজি হতুম না—একদিন তাদের নুন খেয়েছি তো!

'কিছুদিন পরে একদিন রাত্রে বনগাঁয়ের বনের মধ্যে আমাদের আড্ডায় অন্ধকারে বসে আছি, এমন সময় দেখি আমাদের দলের এক পাহারা একজন লোককে বেঁধে আমার কাছে নিয়ে আসছে। আমি অন্ধকারে লোকটার চেহারা ভাল দেখতে পারছিলুম না। আমি

জিগগেস করলুম, "ও কে রে?" পাহারাওয়ালা উত্তর দিলে, "সর্দার, এই লোকটা আমাদের আড্ডার কাছে ঘুপটি মেরে বসে ছিল, নিশ্চয় পুলিশের চর হবে—তাই বেঁধে নিয়ে এসেছি।" আমি বললুম, "আলো নিয়ে আয়, দেখি লোকটা কে।" আলো আনতে লোকটাকে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলুম। আমি বলে উঠলুম, "প্রণাম হই ছোটবাবু!" ছোটবাবু আমার পায়ের উপর আছড়ে পড়ে বললে, "রক্ষে কর গঙ্গাধর আমায়!" এই ছোটবাবু আমায় একদিন গলাধাক্কা দিয়েছিল। আমি তাকে তাড়াতাড়ি পায়ের কাছ থেকে বুকে তুলে নিয়ে বললুম, "কী হয়েছে ছোটবাবু?" ছোটবাবু বললে, "আমায় পুলিশে তাড়া করেছে!" আমি বললুম, "কেন?" সে বললে, "সেই হীরের গয়না চুরি নিয়ে। তোকে মিথ্যে বলব না—চুরি আমি করেছিলুম। পরে ধরা পড়ি। পুলিশের হাজত থেকে পালিয়ে এখন লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছি। তুই আমাকে আশ্রয় দে।" আমি বললুম, "সেকি ছোট-বাবু! এ তো আপনারই আশ্রয়—আমরা আপনার চাকর মাত্র! তবে শুনে রাখুন, যদি আমরা ধরা পড়ি তবে একসঙ্গে মরতে হবে। কেউ যদি ধরিয়ে দিতে যায়, তার জীবন আমাদের হাতে। আপনি হলেও নিস্তার নেই।"

'ছোটবাবু আমাদের সঙ্গেই রয়ে গেলেন। আমরা যেমন লুকিয়ে ফিরি তার চেয়ে বেশি করে লুকিয়ে তাঁকে ঘুরতে ফিরতে হত—কারণ তিনি দাগী; তাঁর নামে পুলিশের ওয়ারেন্ট আছে। আমরা তাঁকে যখের ধনের মত আগলে আগলে রাখতুম। এমন কারো সাধ্য ছিল না তাঁর গায়ে হাত দেয়।

'একদিন ছোটবাবুকে খুঁজে পাওয়া গেল না। তখন বিষ্ণুপুরে গোটাকতক খুব বড়-বড় ডাকাতি হওয়াতে পুলিশ চারিদিকে হৈ-চৈ লাগিয়ে দিয়েছিল। আশে-পাশে চারিদিকে তাদের গোয়েন্দা ঘুরছিল। ভয় হল ছোটবাবু পুলিশের হাতে পড়লেন নাকি! খবর পেলুম আমাদের আড্ডার খুব কাছাকাছি পুলিশ ছাউনি ফেলেছে, দলের সবাই সে-জায়গা ছেড়ে পালাবার জন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠল। কিন্তু আমি ছোটবাবুকে

ছেড়ে পালাতে পারলুম না—তাঁকে খোঁজবার জন্যে আমাকে দলবল নিয়ে সেইখানে থেকে যেতে হল।

'পরের দিন রাত্রে পুলিশ আমাদের আড্ডা ঘেরাও করলে; আমরা ধরা পড়লুম, হাতে হাতকড়ি পড়ল। পুলিশের সঙ্গে ছোটবাবু ছিলেন, তাঁর কিন্তু হাত খোলা; তিনি আমাকে সনাক্ত করলেন—এই গজধর সিং আমাদের বাড়ির পুরোনো পাইক, এখন ডাকাতের সর্দার।

'আমাদের সকলকার জেল হল—বারো বচ্ছর করে। কিন্তু ছোটবাবুর সকল অপরাধ মার্জিত হল। তিনি নিজের প্রাণের মায়ায় এত বড় একটা ডাকাতের দল ধরিয়ে দিয়ে যে নিমকহারামি করলেন—এ তারই বখশিস। কিন্তু আমি যে এতদিন তাঁর বিপদ নিজের মাথায় নিয়ে তাঁকে খাইয়ে দাইয়ে লুকিয়ে রাখলুম, তার বখশিস কেউ দিলে না।'

এই অবধি বলে সে চুপ করলে। তারপর তুড়ুক করে লাফিয়ে একেবারে আমার বুকের উপর এসে সেই কাটামুণ্ডুটা বলে উঠল—'কী, ঘুমুলে নাকি?'

আমি বললুম, 'না ঘুমুইনি। কিন্তু তোমার মুণ্ডু চুরির ইতিহাস কই? এ তো তোমার জীবন কাহিনী।'

সে বললে, 'তুমি তো আচ্ছা বোকা! গোড়া না শুনলে শেষটা বুঝবে কী করে?'

আমি বললুম, 'আচ্ছা তাহলে বল।'

সে আমার বুক থেকে তুড়ুক করে নেবে বলতে লাগল, 'বারো বচ্ছর তো জেলে কাটল ভালয় মন্দয়। ফিরে এসে আর বিষ্ণুপুর বনগাঁয়ের দিকেই গেলুম না। কিন্তু সেখানকার খবর মাঝে-মাঝে পেতুম। কিছুদিন বাদে শুনলুম ছোটবাবুকে খুন করেছে আমাদেরই সেই ডাকাতের দলের একজন। জিনিস পত্র টাকা-কড়ি কিছুই নেয়নি, শুধুই খুন করেছে। লোকে শুনে অবাক! কিন্তু যখন ধরা পড়ে কবুল করলে তখন লোকে বুঝতে পারলে। সে বলেছে ছোটবাবু নিমক-হারামি করে তাদের ধরিয়ে দিয়েছিল বলেই তাকে খুন করতে হয়েছে।

কারণ মা কালীর সামনে সর্দারের পা ছুঁয়ে সে শপথ করেছিল যে তাদের দলের মধ্যে যে নিমকহারামি করবে সে যদি আপনার মায়ের পেটের ভাইও হয় তবুও তার বুকে ছুরি বসাতে কাতর হবে না। মা কালীর সামনে সর্দারের পা ছুঁয়ে শপথ; সে-শপথ ভঙ্গ করে সে নরকে যাবে ?

'বেচারা ফাঁসি গেল, তাও শুনলুম। গায়ে মাথায় কতবার কত লাঠি পড়েছে, রক্ত ঢেউ খেলে গেছে, কিন্তু চোখ দিয়ে কখনো এক ফোঁটা জল পড়েনি। কিন্তু সেদিন তার ফাঁসির খবর শুনে আমার দু-চোখ দিয়ে ঝর-ঝর করে জল গড়িয়ে পড়ল, কেন কে জানে ?

'আমার বুকটা যেন ভেঙে গেল। আর ডাকাতের দল খুলতে পারলুম না, সে সাহসও ছিল না, শক্তিও ছিল না। এবার একটা চোরের দল গড়লুম। হৈ-হৈ রৈ-রৈ করে, মশাল জ্বেলে, পাড়া জাগিয়ে রাজা-জমিদারের বাড়ি ডাকাতি নয়, এবার চুপি-চুপি, গা-ঢাকা দিয়ে, পা টিপে-টিপে গৃহস্থের বাড়িতে সিঁধ কেটে চুরি।'

এই অবধি শুনে আমি অধৈর্য হয়ে বলে উঠলুম, 'কই হে, মুণ্ডু চুরির ব্যাপারটা কখন আসবে ? এ তো তোমার সিঁধেল চুরির গল্প আরম্ভ হল।' যেমন এই কথা বলা, কাটামুণ্ডুটা একটা উল্কার মত ঘুরতে ঘুরতে আমার মুখের সামনে এসে দাঁত কড়মড় করে বলে উঠল, 'দেখ, ফের যদি আমায় বিরক্ত করবে তাহলে এই দাঁত দিয়ে তোমার জিভ কেটে দেব—চিরদিনের জন্যে বকবকানি থেমে যাবে।'

আমি কাঁচুমাচু হয়ে বললুম, 'আচ্ছা আমি আর কিছু বলব না।'

সে আবার শুরু করলে—'চুরির ব্যাবসা বেশ সজোরে চলতে লাগল। সম্বলের মধ্যে আমাদের ছিল গোটাকতক সিঁধকাঠি আর খানকতক কুড়ুল। কাঠি দিয়ে সিঁধ কাটা হত, আর কুড়ুল দিয়ে সিন্দুক বাক্স এবং দরকার হলে মানুষের মাথা ভাঙা হত। দলে আমরা পাঁচ জন ছিলুম—যেন পঞ্চপাণ্ডব। পাড়াগাঁয়ে দশ ক্রোশ অন্তর থানা-পুলিশ, আমাদের খবরদারি করে কে ? চোরে কামারে দেখা হলে তো ? কাজেই আমাদের ব্যাবসা বেশ ফলাও হয়ে

উঠল—কিন্তু নিয়তি যাবে কোথায়? এক জায়গায় সিঁধ কাটতে গিয়ে ইঁদুরের মত জাঁতা-কলের মধ্যে পড়ে গেলুম। সিঁধটি কেটে গর্তের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে পা দুটি চালিয়ে এদিক ওদিক পরখ করে দেখে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে যেই কোমর অবধি চালিয়ে দিয়েছি, অমনি ভিতর থেকে দুটো লোহার মুগুরের মত দু-খানা হাত দিয়ে কে আমার কোমরটা সজোরে জাপটে ধরে হিড়-হিড় করে টানতে লাগল। আমি বেরিয়ে আসবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলুম, কিন্তু সেই ভীমের সঙ্গে পেরে উঠলুম না। ব্যাপার দেখে আমার সঙ্গীরা বাইরে থেকে আমায় জাপটে ধরে টানতে লাগল। ভিতরে বাইরে দু-দিক থেকে আমার দেহটাকে নিয়ে টানাটানি চলতে লাগল—যেন দেবাসুরে মিলে সমুদ্র মন্থন লাগিয়ে দিয়েছে। আমার প্রাণ যায়-যায় হয়ে উঠল। শেষে যখন আমায় আর ধরে রাখতে পারা গেল না—আমার কাঁধ অবধি প্রায় গর্তের মধ্যে চলে গেছে, তখন আমাদের দলের মধ্যে ঠিক অসুরের মত যার চেহারা সে আর বাক্যব্যয় না করে তার হাতের কুড়ুলটা নিজের মাথা অবধি তুলে একটি কোপ দিয়ে ধড় থেকে আমার মুণ্ডুটা সাফ্ দিলে খসিয়ে। তারপর আমার কাটামুণ্ডু নিয়ে লাফাতে লাফাতে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।'

আমি বলে উঠলুম, 'কেন 'কাটামুণ্ডু নিয়ে পালাল কেন?'

সে বললে, 'তা আর বুঝলে না? মুণ্ডুশুদ্ধ ধরা পড়লে লোকে আমায় চিনে ফেলত। শুধু ধড় দেখে তো মানুষ চেনা যায় না।'

আমি জিগগেস করলুম, 'তাহলে আজকের মুণ্ডু চুরিটাও কি ঐ ব্যাপার?'

সে বললে, 'রোস। 'আগে বল দেখি সিঁধ কাটা হয়েছে কি না?'

আমি বললুম, 'কই সিঁধকাটা তো দেখিনি!'

সে ভুরুদুটো কুঁচকে বললে, 'তবেই তো মুস্কিলে ফেললে। সিঁধ কাটা নেই—চোরকে নিয়ে টানাটানি নেই। খামকা মুণ্ডুটা কেটে নিয়ে গেল? ব্যাটারা এমন বেদস্তুর কাজ করলে!' বলে সে রাগে গম-গম করতে লাগল।

আমি একটু ভেবে বললুম, 'দেখ, ও ঠিক হয়েছে। তোমার ইতিহাস শুনে আমি একটা হদিস পেয়েছি। টাকা কড়ি চুরি যায়নি অথচ একটা খুন হয়েছে এবং তার মুণ্ডুটা পাওয়া যাচ্ছে না, এর একটা হদিস তোমার ছোটবাবুর খুন আর তোমার কাটামুণ্ডুর গল্প থেকে আমি বেশ ধরে নিয়েছি। এবার আমি গুছিয়ে লিখে দিতে পারব।'

সে একগাল হেসে বললে, 'তাহলে আমার বখশিস!'

আমিও হেসে বললুম, 'কী বখশিস চাও?'

সে বললে, 'আমায় একটা ধড় দাও। আমি কি শুধু মুণ্ডুটা নিয়ে ঘুরে বেড়াব?'

আমি বললুম, 'ধড় কোথায় পাব?'

সে ভয়ঙ্কর চেঁচিয়ে বললে, 'কী, রাস্কেল! এতক্ষণ পরে বললে ধড় কোথায় পাব? সাতকাণ্ড রামায়ণের পর সীতা কার ভার্যা! আমি কি তোমার ঘরে যাত্রা শুনতে এসেছি? ধড় আমার চাই।' বলে সে দম-দম করে আমার টেবিলের উপর তার কপালটা ঠুকতে লাগল।

আমি বললুম—'কর কী! কর কী!'

সে বললে, 'বল একটা ধড় এনে দেবে? নইলে এই আমি মাথা ঠুকতে লাগলুম!' বলে আবার দমাদ্দম মাথা ঠুকতে লাগল।

আমি তার এই ব্যাপার দেখে বলে উঠলুম, 'থাম, থাম. আমি তোমার জন্যে নিশ্চয় চেষ্টা করে দেখব।'

সে বললে, 'আচ্ছা, তাহলে এই কথাই রইল। আমি আবার একদিন আসব মনে থাকে যেন।' বলেই সেই কাটামুণ্ডুটা শূন্যের উপর ডিগবাজি খেতে খেতে উঠে গিয়ে কড়িকাঠের কাছে ঘুলঘুলিটার ভিতর দিয়ে ফুড়ুৎ করে বেরিয়ে গেল। আমি ধড়মড় করে বিছানার উপর উঠে বসলুম।

সকালবেলা খুনের খবরটা বেশ বাগিয়ে গুছিয়ে লিখে খবরের কাগজে পাঠিয়ে দিলুম। কিন্তু সম্পাদক ছাপালেন না; বললেন অচল। সেইজন্যে রাগ করে সেটাতে আরো খানিকটা রসান দিয়ে 'কায়াহীনের

কাহিনী'র পাঠক-পাঠিকাদের কাছে এই পাঠিয়ে দিচ্ছি, জানি সেখানে অচল হবে না।

কিন্তু কথা হচ্ছে এই, সত্যই ঐ দেহহীন ভদ্রব্যক্তিটি আবার কোনদিন নিশীথ রাত্রে নিদ্রাচ্ছন্ন আমাকে দেখা দিতে আসবেন নাকি? কে জানে!

খোট্টাই সরবৎ

হাতের লেখা খারাপ, নিজের লেখা দেখে নিজেরই লজ্জা হয়; সেই লজ্জা নিবারণের জন্যই একটা বাংলা টাইপরাইটার কিনেছিলুম।

হাতের কাছে গুড-ফ্রাইডের ছুটি পেয়ে পুরীতে গিয়েছিলুম বেড়াতে। ইচ্ছে ছিল একটা বড় গল্প ঐখানেই আরম্ভ করব, আর ঐখানে থেকেই একেবারে শেষ করে টাইপরাইটারে লিখে এনে কাগজে ছাপতে দেব। কাজেই সঙ্গে টাইপরাইটারও নিতে হয়েছিল।

বেশ সুন্দর টাইপরাইটার, বেশ স্পষ্ট স্পষ্ট হরফ। সেই মুক্তোর মত বাংলা হরফগুলি দেখে আমার মনটা ভারি খুশি হয়ে উঠত। আমি কয়েকদিন আহার নিদ্রা ত্যাগ করে রোজই তার হরফগুলো কাগজের উপর তুলে, লাইনের পর লাইনের মালা গেঁথে চেয়ে চেয়ে দেখতুম, আর তন্ময় হয়ে যেতুম। এমনি আমার নেশা চেপে-ছিল যে অনবরত ঠুকে ঠুকে কলটাকে প্রায় বিগড়ে তোলবার জো করেছিলুম।

পুরীর সমুদ্র থেকে একটু দূরে আমার এক বন্ধুর একটি ছোট্ট বাড়ি আছে; আমি পুরীতে গেলেই সেইখানে আড্ডা গাড়ি; এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বাড়িখানি অনেক দিনের পুরানো, কিন্তু বন্ধুবর সেখানি ঘসে মেজে বেশ ঝকঝকে করে রেখেছেন। বাড়ির তত্ত্বাবধান করে এক উড়ে চাকর; বন্ধুবরের অতিথিরা কেউ গেলে সে-ই ঘর দুয়ার খুলে দিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা করে। এ ছাড়া বাড়িতে আর কেউ লোক থাকে না।

বন্ধুবর এই বাড়ি কাউকে ভাড়া দেন না, তিনি নিজেও খুব অল্পই সেখানে গিয়ে থাকেন, এবং আমার মত দুটি একটি অন্তরঙ্গ বন্ধু অবরে সবরে সেই বাড়িতে প্রবেশ করবার অবসর পায়, কাজেই বাড়িখানা প্রায় সব সময় বন্ধ হয়েই থাকে। বোধহয় এইজন্যেই আশপাশের লোকেরা বাড়িখানাকে পোড়ো বাড়ি বলে। আগে ভাড়া নেবার জন্যে অনেক খোঁজ আসত, কিন্তু এখন কেউ আর খোঁজও করে না—বলে, ওটা হানা-বাড়ি।

আমি অনেক বার এ বাড়িতে এসেছি। কিন্তু বাড়িখানা যে হানা তার কোন পরিচয় কখনো পাইনি। কিন্তু অনেকে নাকি পেয়েছে, তার গল্প মাঝে-মাঝে আমার কানে আসত। আশ-পাশের অভ্যাগতরা আমাকে সকালবেলা সেই বাড়ি থেকে বেরোতে দেখে প্রায়ই খুব আগ্রহের সঙ্গে জিগগেস করতেন, 'হ্যাঁ মশাই, কিছু দেখলেন কি?' আমি বলতুম, 'কই না, এমন আশ্চর্য কিছুই তো দেখিনি।' তাঁরা আমার উত্তরে হতাশ হয়ে আড়ালে পরস্পর বলাবলি করতেন, 'খেষ্টান যে! ওরা কি ওসব দেখতে পায়?' আমি খ্রীষ্টান হলুম কী করে বুঝতে পারতুম না। বোধহয় বাড়িতে মাঝে মাঝে মুরগির যে-সব পালক উড়ত তারাই ঐ খবর রটিয়েছে।

বাড়িতে তিনখানি মাত্র ঘর। আমি দু-খানি ব্যবহার করতুম। একখানি একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধ থাকত। কোথাও এমন ফাঁক ছিল না যে দেখা যায় তার মধ্যে কী আছে। উড়ে চাকরটার মুখে শুনেছি সে-ঘর কখনও খোলা হয় না, তার চাবিও তার কাছে থাকে না, এবং তার মধ্যে যে কী আছে তাও সে জানে না।

বাড়িটাকে নয়, এই ঘরটাকে কেমন আমার হানা বলে মনে হত। বাড়ির আর দু-খানি ঘর বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চুনকাম করা, কিন্তু এই ঘরটার সামনে দাঁড়ালে বেশ বোঝা যেত যে অনেক দিন থেকে এর গায়ে সংস্কারের হাত পড়েনি। নোনা লেগে এর গায়ের বালি জায়গায় জায়গায় একেবারে খসে পড়ে ভিতরের ইঁটগুলি জরজর হয়ে উঠেছে। দেখলে ঠিক মনে হত যেন কোন একটা ভীষণ জন্তু তার তীক্ষ্ণ দাঁত

দিয়ে এর গায়ের মাংস স্থানে স্থানে খুবলে নিয়েছে, সেখানকার ঘা-গুলো দগদগ করছে। রাত্রের অন্ধকারে হঠাৎ এই লাল লাল ক্ষতগুলোর দিকে চোখ পড়লে সর্বাঙ্গ কেমন চমকে উঠত। এই ঘরখানার এমন দুর্দশা কেন বুঝতে পারতুম না, বন্ধুবরকেও কোন দিন জিগগেস করতে পারিনি—কেমন একটা সঙ্কোচ হত—মনে হত যেন এর সঙ্গে যে-কথা জড়িত আছে তা যেন চাপা থাকাই ভাল।

সকালবেলা পুরী পৌঁছে, টাইপরাইটার প্রভৃতি জিনিসগুলি গুছিয়ে নিয়ে, আহারাদি সেরে সারাদিনটা ঘুমিয়েই কাটানো গেল। কারণ গত রাত্রে গাড়ির ভিড়ে মোটেই ঘুম হয়নি। বিকেলে টাইপ-রাইটারে খানিকক্ষণ হাতটা সড়গড় করে নিয়ে সন্ধ্যাবেলা সমুদ্রের ধারে একটু ঘুরে এসে রাত্রে গল্প লেখা আরম্ভ করা যাবে ভেবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়া গেল। সঙ্গে ইকমিক কুকার ছিল, তাতে চাল ডাল আর দুটো ডিম চাপিয়ে দিয়েছিলুম; ও আপনিই তৈরি হয়ে থাকবে, ইচ্ছে মত খাওয়া যাবে। বলা বাহুল্য বিদেশে চাকর-বামুন নিয়ে যাবার সাধ্য আমার নেই—নিজের সব কাজ আমায় নিজেকেই চালিয়ে নিতে হয়।

সমুদ্রের ধার থেকে বেড়িয়ে বাড়ি ফিরছি এমন সময় বিনোদের সঙ্গে দেখা। সে মাসখানেক হল সপরিবারে পুরীতে এসে বসবাস করছে। বিনোদের সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে অনেক দিন একসঙ্গে কাটিয়েছি, তারপর অনেক দিন ছাড়াছাড়ি। সে এখন বেহারের কোন জায়গায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটি করে। বিনোদ আমাকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠল, আমারও খুব আনন্দ হল। দুই বন্ধুতে গল্প করতে করতে আমরা অগ্রসর হতে লাগলুম। বিনোদ বললে, 'তোকে ছাড়তে ইচ্ছে করছে না, বাড়ি গিয়ে এখন কী করবি? আমার বাড়ি চল্ দুই বন্ধুতে খানিকটা গল্প করা যাবে।' অনেক দিন পরে দেখা, বন্ধুর অনুরোধ, তার উপর তার সঙ্গ আমারও ছাড়তে ইচ্ছে করছিল না, কাজেই বিনোদের বাড়ির দিকে চলতে লাগলুম। গল্প লেখার আশা

কিছুক্ষণের জন্য বিসর্জন দিতে হল। টাইপরাইটারটার গায়ে হাত বুলোনোও আজ হবে না দেখছি।

বিনোদের বাড়ি পৌঁছে দেখি একটা মহা ভোজের আয়োজন লেগে গেছে—বাড়ির ছেলেরা গুড ফ্রাইডের উৎসবকে কালিয়া পোলাওর গন্ধে আমোদিত করে তোলবার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেছে। বিনোদ বললে, 'তাহলে তুই খেয়ে যা—অনেক দিন তুই বন্ধুতে একসঙ্গে বসে খাইনি।' আমি বললুম, 'বেশ।' ইকমিক কুকারে চড়ানো আমার ভাত ডালটা নষ্ট হবার কথা একবার মনে পড়ল, কিন্তু তাদের বড়লোক জ্ঞাতিদের সামনে সেই তুচ্ছ কথাটা আর তুলতে পারলুম না।

খানিক বাদে বিনোদের চাকর তুই গ্লাস সরবৎ নিয়ে এসে হাজির। বিনোদ গ্লাসটা হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে বললে 'পশ্চিমে থাকি বলে এই খোট্টাই সরবৎ খাওয়াটা আমার কেমন অভ্যাস হয়ে গেছে—সন্ধ্যাবেলা এক গ্লাস না হলে চলে না। তুমিও খেয়ে দেখ, শরীরটা বেশ ভাল বোধ করবে।' কী সুমিষ্ট সুগন্ধ সরবৎ! আমি প্রায় এক চুমুকেই গ্লাসটা শেষ করে ফেললুম! বিনোদ বললে, 'কেমন খেতে লাগল?' ওমনি বললুম 'চমৎকার' সে বললে, 'খানিক বাদে আরো দেখো চমৎকার বোধ হবে, বেশ খিদে পাবে—শরীরে বেশ স্ফুর্তি বোধ হবে। চমৎকার দাওয়াই।'

তুই বন্ধুতে বসে নানা সুখতুঃখের গল্প চলতে লাগল। বিনোদের চাকর এসে আলবোলাতে অম্বুরি তামাক দিয়ে গেল। আমার তামাক খাওয়ার অভ্যাস নেই; বিনোদ বার-বার করে বলতে লাগল, 'টেনে দেখ হে, বেশ লাগবে! কোন ভয় নেই।' তার পিড়াপিড়িতে নলটা ফুড়ুক ফুড়ুক করে টানতে শুরু করে দিলুম। প্রথমটা তু-এক বার একটু কাশি এল, তারপর কিন্তু টানতে টানতে বেশ মিঠে লাগতে লাগল। তামাক টেনে চলেছি, গল্পের স্রোতও চলছে—ছেলেবেলাকার এক কথা একশো বার বলেও যেন আশা মিটছে না। কেবলই মনে হচ্ছে, আজ যেন কী আনন্দের দিন! কী আনন্দের দিন!

বিনোদের এক একটা কথাতে কখনও মনটা তুলে তুলে উঠছে, কখনও

দিয়ে এর গায়ের মাংস স্থানে স্থানে খুবলে নিয়েছে, সেখানকার ঘা-গুলো দগদগ করছে। রাত্রের অন্ধকারে হঠাৎ এই লাল লাল ক্ষতগুলোর দিকে চোখ পড়লে সর্বাঙ্গ কেমন চমকে উঠত। এই ঘরখানার এমন দুর্দশা কেন বুঝতে পারতুম না, বন্ধুবরকেও কোন দিন জিগগেস করতে পারিনি—কেমন একটা সঙ্কোচ হত—মনে হত যেন এর সঙ্গে যে-কথা জড়িত আছে তা যেন চাপা থাকাই ভাল।

সকালবেলা পুরী পৌঁছে, টাইপরাইটার প্রভৃতি জিনিসগুলি গুছিয়ে নিয়ে, আহারাদি সেরে সারাদিনটা ঘুমিয়েই কাটানো গেল। কারণ গত রাত্রে গাড়ির ভিড়ে মোটেই ঘুম হয়নি। বিকেলে টাইপ-রাইটারে খানিকক্ষণ হাতটা সড়গড় করে নিয়ে সন্ধ্যাবেলা সমুদ্রের ধারে একটু ঘুরে এসে রাত্রে গল্প লেখা আরম্ভ করা যাবে ভেবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়া গেল। সঙ্গে ইকমিক কুকার ছিল, তাতে চাল ডাল আর দুটো ডিম চাপিয়ে দিয়েছিলুম; ও আপনিই তৈরি হয়ে থাকবে, ইচ্ছে মত খাওয়া যাবে। বলা বাহুল্য বিদেশে চাকর-বামুন নিয়ে যাবার সাধ্য আমার নেই—নিজের সব কাজ আমায় নিজেকেই চালিয়ে নিতে হয়।

সমুদ্রের ধার থেকে বেড়িয়ে বাড়ি ফিরছি এমন সময় বিনোদের সঙ্গে দেখা। সে মাসখানেক হল সপরিবারে পুরীতে এসে বসবাস করছে। বিনোদের সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে অনেক দিন একসঙ্গে কাটিয়েছি, তারপর অনেক দিন ছাড়াছাড়ি। সে এখন বেহারের কোন জায়গায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটি করে। বিনোদ আমাকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠল, আমারও খুব আনন্দ হল। দুই বন্ধুতে গল্প করতে করতে আমরা অগ্রসর হতে লাগলুম। বিনোদ বললে, 'তোকে ছাড়তে ইচ্ছে করছে না, বাড়ি গিয়ে এখন কী করবি? আমার বাড়ি চল্ দুই বন্ধুতে খানিকটা গল্প করা যাবে।' অনেক দিন পরে দেখা, বন্ধুর অনুরোধ, তার উপর তার সঙ্গ আমারও ছাড়তে ইচ্ছে করছিল না, কাজেই বিনোদের বাড়ির দিকে চলতে লাগলুম। গল্প লেখার আশা

কিছুক্ষণের জন্য বিসর্জন দিতে হল। টাইপরাইটারটার গায়ে হাত বুলোনোও আজ হবে না দেখছি।

বিনোদের বাড়ি পৌঁছে দেখি একটা মহা ভোজের আয়োজন লেগে গেছে—বাড়ির ছেলেরা গুড ফ্রাইডের উৎসবকে কালিয়া পোলাওর গন্ধে আমোদিত করে তোলবার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেছে। বিনোদ বললে, 'তাহলে তুই খেয়ে যা—অনেক দিন দুই বন্ধুতে একসঙ্গে বসে খাইনি।' আমি বললুম, 'বেশ।' ইকমিক কুকারে চড়ানো আমার ভাত ডালটা নষ্ট হবার কথা একবার মনে পড়ল, কিন্তু তাদের বড়লোক জ্ঞাতিদের সামনে সেই তুচ্ছ কথাটা আর তুলতে পারলুম না।

খানিক বাদে বিনোদের চাকর দুই গ্লাস সরবৎ নিয়ে এসে হাজির। বিনোদ গ্লাসটা হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে বললে 'পশ্চিমে থাকি বলে এই খোট্টাই সরবৎ খাওয়াটা আমার কেমন অভ্যাস হয়ে গেছে—সন্ধ্যাবেলা এক গ্লাস না হলে চলে না। তুমিও খেয়ে দেখ, শরীরটা বেশ ভাল বোধ করবে।' কী সুমিষ্ট সুগন্ধ সরবৎ! আমি প্রায় এক চুমুকেই গ্লাসটা শেষ করে ফেললুম! বিনোদ বললে, 'কেমন খেতে লাগল?' ওমনি বললুম 'চমৎকার' সে বললে, 'খানিক বাদে আরো দেখো চমৎকার বোধ হবে, বেশ খিদে পাবে—শরীরে বেশ স্ফূর্তি বোধ হবে। চমৎকার দাওয়াই।'

দুই বন্ধুতে বসে নানা সুখদুঃখের গল্প চলতে লাগল। বিনোদের চাকর এসে আলবোলাতে অম্বুরি তামাক দিয়ে গেল। আমার তামাক খাওয়ার অভ্যাস নেই; বিনোদ বার-বার করে বলতে লাগল, 'টেনে দেখ হে, বেশ লাগবে! কোন ভয় নেই।' তার পিড়াপিড়িতে নলটা ফুড়ুক ফুড়ুক করে টানতে শুরু করে দিলুম। প্রথমটা দু-এক বার একটু কাশি এল, তারপর কিন্তু টানতে টানতে বেশ মিঠে লাগতে লাগল। তামাক টেনে চলেছি, গল্পের স্রোতও চলছে—ছেলেবেলাকার এক কথা একশো বার বলেও যেন আশা মিটছে না। কেবলই মনে হচ্ছে, আজ যেন কী আনন্দের দিন! কী আনন্দের দিন!

বিনোদের এক একটা কথাতে কখনও মনটা দুলে দুলে উঠছে, কখনও

আবার হো-হো করে হেসে উঠছি। বিনোদের সব কথাই ভাল লাগছে, সব কিছুতেই ফুর্তি হচ্ছে। বন্ধুর সঙ্গে অনেক দিন পরে দেখা কিনা! বিনোদ বললে, 'খিদে বোধ করছ কি? কিছু খাবে?' বিনোদের প্রশ্নে হঠাৎ পেটের দিকে নজর পড়তেই দেখলুম, খিদেটা যেন চনমনে হয়ে উঠেছে। আমি বললুম, 'এত শিগগির কি আর খাবার তৈরি হয়েছে?' বিনোদ বললে, 'খাবারের এখন ঢের দেরি, তুমি ততক্ষণ কিছু জলযোগ করে নাও।' এই বলে সে বাড়ির ভিতর দিকে চলে গেল। তারপর চাকরকে সঙ্গে নিয়ে একটা থালায় একগাদা কচুরি ও রসগোল্লা এনে হাজির করলে। আমি সেই খাবারের ডাঁই দেখে বলে উঠলুম, 'আমি কি রাক্ষস নাকি হে! এত খেলে রাত্রে আর খেতে পারব কেন?' বিনোদ বললে, 'যা পার খাও না।' বলে সে থালা থেকে একটা রসগোল্লা তুলে নিয়ে মুখে পুরে বললে, 'এমনি করে মেসের বাসায় এক থালা থেকে দু-জনে কাড়াকাড়ি করে কতদিন খেয়েছি মনে পড়ে?' আমি বললুম, 'খুব মনে পড়ে! সে সব আনন্দের দিন কি আর ভোলবার হে?'

কচুরি আর রসগোল্লা মনে হতে লাগল যেন অমৃত। অনেক রসগোল্লা খেয়েছি কিন্তু এমনতর জীবনে কখনও খাইনি। যতই খাই ততই মনে হয় আর-একটা খাই। দেখতে দেখতে সেই রসগোল্লার ডাঁই শেষ হয়ে গেল। আমার নিজের খাওয়া দেখে আমি নিজেই অবাক হয়ে গেলুম। তবু যেন মনে হতে লাগল, যেমন পেটের খিদে তেমনি আছে—এ কি ভেলকি নাকি? বিনোদ বললে, 'আজ ভারি একটা মজা হয়েছে!' আমি হো হো করে হেসে উঠলুম, 'তাই নাকি?' মজা—এই কথাটা শুনেই আমার যতগুলো মজার কথা জানা ছিল যেন সবগুলো একসঙ্গে মনে পড়ে কেবলই হাসি পেতে লাগল। বিনোদ বিরক্ত হয়ে বললে, 'আঃ, শোন না মজার কথাটা!' আবার ঐ মজা! শুনেই আবার পেট থেকে খিল-খিল করে হাসি বেরিয়ে আসতে লাগল—বিনোদের মজার কথাটা যে কী তা আর শোনা হল না। বিনোদ আমার হাসির ছটা দেখে শেষে নিজেই হাসতে

শুরু করে দিলে। তুই বন্ধুতে একসঙ্গে খুব খানিক হেসে যখন থামলুম, ছাঁৎ করে কে যেন মনে করিয়ে দিল তখন—এ কী ব্যাপার! এত হাসছি কেন?

রাত অনেকখানি এগিয়ে চলে গেল—খিদেটাও খুব প্রচণ্ড বোধ হতে লাগল, কিন্তু তখনও খাবার আসে না। মনটা একবার খুঁত-খুঁত করে উঠল—গল্প লেখাটা আজ আর আরম্ভ হয় না দেখছি। তার পরেই মনে হল, গল্পটা কী? কী তার প্লট? দেখলুম প্লটটা একেবারে ভুলে গেছি—কে যেন মাথা থেকে একেবারে চেঁছে বার করে নিয়ে গেছে। সেটাকে খুঁজে বার করতে গিয়ে বিড়-বিড় করে অনেকগুলো নতুন প্লট চোখের সামনে বেরিয়ে এল। তার মধ্যে কোন্‌টা আমার এবারকার গল্পের প্লট তাই খুঁজে খুঁজে ঠিক করছি, এমন সময় বিনোদ আমার পিঠে একটা থাবড়া মেরে বলে উঠল, 'কী রে, হঠাৎ অমন গম্ভীর হয়ে গেলি কেন?' আমি চমকে উঠে বললুম, 'না, গম্ভীর হব কেন?' সে বললে, 'নেশা হয়েছে বুঝি?' আমি বললুম, 'নেশা কিসের?' 'ঐ যে সরবতের।' বলতে বলতে মাথাটা কেমন যেন বোঁ করে একবার ঘুরে গেল। বিনোদ বললে, 'সরবতে একটু সিদ্ধি ছিল রে।'

কথাটা শুনে আমার কেমন সন্দেহ হল। বোধ হল যেন একটু নেশা হয়েছে। আমি কখনও সিদ্ধি খাই নি, সিদ্ধির নেশা কী রকম তাও জানি না; এই কি সিদ্ধির নেশা? আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না। আমি যেমন মানুষ ঠিক তেমনিই তো আছি; ঠিক-ঠিক কথা কইছি। তবে আবার নেশা কোথা থেকে হল! এইসব কথা ভাবছি, বিনোদ বলে উঠল, 'তুই বড্ড গম্ভীর হয়ে উঠছিস, নিশ্চয় তোর নেশা হয়েছে! কী ভাবছিস বল্ তো?' আমি চেঁচিয়ে উঠে বললুম, 'দূর, ভাবনা আবার কিসের?' বললুম বটে, কিন্তু সত্যি নানারকমের আবোল-তাবোল ভাবনা মাথার ভিতর ক্রমাগতই আসতে লাগল। বিনোদ বললে, 'তবে বুঝি তোর খিদে পেয়েছে।' আমি বললুম, 'তা ভাই পেয়েছে।' বিনোদ বললে, 'রোস। খাবার জায়গা করতে বলি।' বলে সে উঠে গেল। আমি একলা বসে রইলুম। বসে

বসে ভাবছি, হঠাৎ মনে হল, বিনোদ তো অনেকক্ষণ গেছে। বোধ হয় ঘণ্টা-দুই হবে, এখনও ফিরল না কেন? তবে কি আমার খাবার দিতে ভুলে গেল? ওরা বাড়িসুদ্ধ সবাই খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল নাকি? তাহলে এখন উপায়? আমি তবুও বসে বসে বিনোদের অপেক্ষা করতে লাগলুম; কিন্তু বিনোদ ফিরে এল না। বসে বসে দেখতে লাগলুম ঘরে যে আলো জ্বলছে তার প্রদীপের তেল একটু একটু করে কমে আসছে, ক্রমেই আলো মিটমিটে হয়ে আসতে লাগল—এই নিবে যায় যায়। নিবে গেলেই তো একেবারে অন্ধকার হয়ে যাবে। সর্বনাশ! জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দেখলুম ঘুট-ঘুট করছে অন্ধকার, আকাশে একটুও আলো নেই—বোধহয় মেঘ করেছে। না, মেঘই তো করেছে।

বিনোদ ধাঁ করে এসে বললে, 'চল্ খাবার তৈরি।' খাবারের জায়গায় গিয়ে বসলুম। চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়—নানা জাতীয় খাবার প্রস্তুত; দেখে জিভে জল আসতে লাগল; তার সুগন্ধটা নাকের ভিতর দিয়ে একেবারে পেটের মধ্যে প্রবেশ করে পাকস্থলীকে নানা ভঙ্গিতে নাচিয়ে তুলতে লাগল। বিনোদ বললে, 'খিদেটা কেমন বোধ করছ হে?' আমি, বললুম, 'খুব!' সে বললে, 'দেখলে খোট্টাই সরবতের গুণ!' সত্যি বটে, এমন রাক্ষুসে খিদে কখনও বোধ করিনি।

এক মনে খেয়ে চলেছি, হঠাৎ মনে হল, চোরে যদি নতুন টাইপরাইটারটা চুরি করে নিয়ে যায়? বাড়িতে তো কেউ নেই, একটা সামান্য তালা দিয়ে দরজা বন্ধ করে এসেছি—সে তালা ভাঙতে কতক্ষণ! এই কথাটা মনে হতেই মাথার ভিতরের রক্তটা চন-চন করে উঠল। অনেক সাধের এই টাইপরাইটারটা আমার! অনেক কষ্টে সংগ্রহ, তাকে বড় ভালবাসি আমি। শেষে সেটা চুরি যাবে? এই কথাটা মনে হতেই আহারের সমস্ত স্বাদ যেন একেবারে চলে গেল। বিনোদ বললে, 'কী রে, হাত গুটিয়ে বসলি কেন?' আমি আবার খেতে শুরু করলুম বটে, কিন্তু তেমন উৎসাহ আর রইল না। ঘুরে ফিরে কেবলই টাইপরাইটারটার জন্যে একটা উৎকণ্ঠা মনের মধ্যে জাগতে লাগল।

মনে হতে লাগল বিনোদের খাওয়ার পালা যেন আর ইহজন্মে শেষ হবে না! এখনও গেলে বোধহয় টাইপরাইটারটাকে চোরের হাত থেকে রক্ষা করা যায়, কিন্তু বিনোদ স্টুপিড কি তা হতে দেবে! সে খাবারের পর খাবারই আনছে, আর খাবারগুলো চিবোচ্ছে তো চিবোচ্ছেই—যেন আর গিলতেই পারে না! খেতে আমার আর মোটেই রুচি হচ্ছিল না, আমি হাত গুটিয়ে নিয়ে বললুম, 'আমার উদরে আর তিল ধারণের স্থান নেই ভাই!' বিনোদ তবুও 'খা খা' করে আরও একটু খাওয়ালে। শেষে আমার পিড়াপিড়িতে খাওয়া শেষ করে বিনোদ যখন বললে আর এক ছিলিম তামাক খেয়ে যা—আমি আর সে কথায় কর্ণপাত না করে বাড়ি থেকে হন্‌হন্‌ করে বেরিয়ে পড়লুম। টাইপ-রাইটারের জন্যে আমার মন ভারি ছটফট করছিল। একটু অগ্রসর হতেই একটা লোক একটা লণ্ঠন হাতে করে পিছন থেকে ছুটে এল। অন্ধকার রাত্রি দেখে আমার জন্যে বিনোদ আলো পাঠিয়ে দিয়েছে।

কালো কালির মত অন্ধকার রাত্রি—লণ্ঠনের আলোয় হাত-দুই মাত্র জায়গা একটু একটু দেখা যায়, আর বাকি সমস্ত পৃথিবীটা মিশ-অন্ধকারে ডুবে আছে; মনে হতে লাগল যেন সেই অন্ধকার-সমুদ্র পেরিয়ে তবে বাড়ি পৌঁছতে পারব। চলেছি তো চলেছি। অনেক-খানি চলে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে মনে হল, এখনও বাড়ি পৌঁছলুম না কেন? বিনোদের বাড়ি থেকে আমাদের বাড়ি এক-রশি পথও তো নয়। চাকরটাকে জিগগেস করলুম, 'হ্যাঁ রে, পথ হারালুম নাকি?' সে বললে, 'না বাবু, এই তো সোজা পথ; হারাব কেন?' আবার চলতে লাগলুম—কতদূর চলে এলুম—পা দুটো যেন ভেঙে পড়তে লাগল, তবুও বাড়ি পৌঁছলুম না। এ কী হল? এইটুকু পথ আজ এতখানি হয়ে গেল কেমন করে? ভেবে যেন কিছুই ঠিক করতে পারছিলুম না। চাকরটাকে জিগগেস করতেও যেন লজ্জা হতে লাগল। কেবলই মনে হতে লাগল আজ সারারাত হেঁটেও বুঝি বাড়ি পৌঁছতে পারব না। কিন্তু কী আশ্চর্য! যেমন এই কথা মনে হওয়া অমনি চক্ষের নিমিষে কে যেন আমাকে সটান তুলে নিয়ে সোঁ সোঁ করে

আকাশ-পথে উঠতে লাগল। কত উঁচুতে যে তুলে নিয়ে গেল তা বলতে পারি না—যেখানে নক্ষত্রগুলো আছে বোধহয় ততটা উঁচুতেই হবে। তারপর ঐ অতটা উঁচু থেকে আমায় টুপ্ করে ফেলে দিলে। আমি ভোঁ ভোঁ করে ঘুরতে ঘুরতে নিচের দিকে পড়তে লাগলুম। যেমন মাটিতে এসে পা দিয়েছি অমনি বিনোদের চাকরটা লণ্ঠনটা উঁচু করে তুলে ধরে বলে উঠল, 'এই যে বাবু আপনার বাড়ি।' চেয়ে দেখি, সত্যিই তো বাড়ি।

আমি বাড়ি পেয়ে যেন বর্তে গেলুম। তাড়াতাড়ি চাবি খুলে ভিতরে ঢুকে পড়লুম; বিনোদের চাকরটা চলে গেল। অতখান উঁচু থেকে পড়াতে আমার মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরছিল, আমি চোখে কানে যেন দেখতে পাচ্ছিলুম না। সেইজন্যে রোয়াকে উঠবার সিঁড়িটা কোথায় যে হারিয়ে গেল, অনেকক্ষণ খুঁজে পেলুম না। তারপর হাতড়ে হাতড়ে সিঁড়ি বার করে রোয়াকে উঠলুম। এই রোয়াকে উঠে প্রথমেই সেই হানা-ঘরটা, যাতে দিনরাত চাবি বন্ধ থাকে, সেইটে সামনে পড়ে। আমি তার কাছে আসতেই মনে হল দরজা যেন এতক্ষণ খোলা ছিল, আমি আসতে খুট্ করে কে বন্ধ করে দিলে। বুকের ভিতরটা যেন একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় ধ্বক করে উঠল। আমি দরজার গায়ে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে একবার ঠেললুম—দরজাটা ফুস্ করে খুলে গেল। এ কী ব্যাপার! যে দরজা আজ দশ বচ্ছর খোলা হয়নি, যাকে কেউ কখনও খুলতে দেখেনি, সেটা আজ হঠাৎ এভাবে খুলে গেল কেমন করে! আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলুম ঘরের মধ্যে প্রবেশ করব কি না। গা-টা ছম-ছম করতে লাগল. পকেট হাতড়ে দেখলুম একটা দেশলাই নেই যে আলো জ্বালি। অন্ধকারে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতরটা দেখতে লাগলুম। ভাল করে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না—সব জিনিসগুলো শুধু আবছায়ার মত বোধ হচ্ছিল।

এই চিরদিনের বন্ধ ঘরের ভিতর না-জানি কী অদ্ভুত জিনিস আছে, তাই দেখবার জন্যে ভারি একটা কৌতূহল হচ্ছিল, অথচ ঢুকতে কেমন

ভয়ও করছিল, কাজেই যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলুম সেখানে দাঁড়িয়েই দেখতে লাগলুম। দেখতে দেখতে অন্ধকারটা চোখে অনেকখানি সরে এল, তখন ঘরের ভিতরের জিনিসগুলো একটু একটু স্পষ্ট হয়ে দেখা যেতে লাগল। ঘরের একধারে একখানি ছোট্ট খাটিয়া—তাতে চাদর, বালিশ দিয়ে সুন্দর বিছানা পাতা রয়েছে। সেই বিছানার উপর কেউ শুয়ে আছে কি না ঠিক ঠাহর করতে পারলুম না। একবার মনে হল কে যেন ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরলে। একটা কোণে একটা তোরঙ্গ রয়েছে তার গায়ে একখানা সাদা টিকিট মারা। তার পাশেই একটা আলনা তার গায়ে কাপড়, চাদর, তোয়ালে, গামছা ঝুলছে—একটা আঁকড়িতে একটা ছাতা ও একটা লাঠি, নিচে একজোড়া চটিজুতো। একটু দূরে একটা কুঁজো, তার মুখে একটা গ্লাস চাপা। আরও টুকরো টাকরা কি সব জিনিস রয়েছে, ঠিক বুঝতে পারলুম না।

ঘরের ভিতরটা দেখে মনে হল, নিশ্চয় এখানে কেউ বাস করে। নইলে দশ বছর যে-ঘর দিনরাত বন্ধ থাকে সে-ঘর লোকের প্রতিদিনের ব্যবহার্য এইসব জিনিস দিয়ে পরিপাটি করে সাজানো হবে কেমন করে? কিন্তু কে বাস করে? সে গেলই বা কোথায়? এর চাবিই বা সে পেলে কেমন করে? আজ দিনের বেলায় তো এ-ঘর দেখেছি, তাতে তো একবারও মনে হয়নি এর মধ্যে কোন জ্যান্ত মানুষ আছে বা থাকতে পারে! এ ঘরের চেহারা দেখলে বোধ হয় যেন একেবারে গালা-মোহর করা ঘর; তবে এর মধ্যে মানুষ ঢুকল কেমন করে? এ কী ভৌতিক কাণ্ড!

এই বাড়ির সম্বন্ধে আশপাশ থেকে যত ভুতুড়ে গল্প শুনেছিলুম, সব একে-একে মনে পড়ে বুকটা কেমন দুর-দুর করতে লাগল। মনে হতে লাগল চোখের সামনে বোধহয় এখনই একটা বিকট আকৃতির পুরুষ দেখতে পাব; কিংবা ধবধবে সাদা কাপড় পরা এতখানি ঘোমটা-দেওয়া একটা মেয়ে ছায়ার মত পাশ দিয়ে চলে যাবে; হয়ত কারা এখনই বিকট অট্টহাসি হেসে উঠবে, নয় তো খোনা গলাতে কেউ বলতে থাকবে আমাকে—'এঁখানে কী করতে এঁসেছিস, দূঁর হঁ। বেঁরোঁ!'

কিন্তু ভয় পাওয়া নয়। ভয় পেলেই ভূতের ভয় আরও চেপে বসে। সেইজন্যে বুকে সাহস নিয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলুম, কিন্তু তবু পা-দুটো আমার কেমন কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

হঠাৎ কেমন একটা শিরশিরে বাতাস এসে গায়ে লাগল, তারপর দেখি, একটা বিশ্রী কিঁ-ই-চ্ শব্দ করে দরজাটা কে বন্ধ করে দিলে। সে কে রে বাপু! অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম; কোন সাড়া পেলুম না। তারপর আস্তে আস্তে দরজাটাকে ঠেলে আবার খুলে দিলুম। ঘর যেমন ছিল ঠিক তেমনই আছে, দরজা যে বন্ধ করেছিল তাকে কই দেখতে পেলুম না। ভূতই হোক মানুষই হোক, নিশ্চয়ই কেউ ঘরের মধ্যে আছে, নইলে দরজা বন্ধ করে কে? আমি একটু গলা বাড়িয়ে দেখবার চেষ্টা করলুম—ঐ কোণের দিকটায় কাউকে দেখা যায় কি না। কাউকে দেখতে পেলুম না। কিন্তু চোখে পড়ল আমার টাইপরাইটারটা। একটা টেবিলের উপর সেটা বসানো রয়েছে। আমাকে দেখে সেই অন্ধকারে তার ধবধবে সাদা দাঁতগুলো হাসিতে ঝক-ঝক করে উঠল। মনে হল বেচারা যেন কি-একটা সঙিন বিপদে পড়েছিল, আমায় দেখে বাঁচল।

তখনই আমি বুঝতে পারলুম, এ ভূত নয়, ভেলকি নয়—এ চোরের কাণ্ড। আমি গোড়াতে যা ভয় করেছিলুম এ তাই। চোর ব্যাটা টাইপরাইটার চুরি করে পালাচ্ছিল, আমার সাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি এইখানে রেখে হয় পালিয়েছে, নয় লুকিয়েছে। আমি জোর গলায় চিৎকার করে বলে উঠলুম, 'কে ঘরের ভিতর লুকিয়ে আছিস, এখনই বেরিয়ে আয়! নইলে আমি খুন করব—খুন করব!'

আমি অনেক চেঁচালুম, কিন্তু কেউ ঘর থেকে বেরিয়ে এল না। আমার হাতে খুন হবার জন্যে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রইল। তবে করি কী? কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারলুম না। একবার ভাবলুম নিজের ঘর থেকে একটা আলো জ্বেলে নিয়ে আসি, কিন্তু তখনই মনে হল, সেই ফাঁকে চোর যদি টাইপরাইটার নিয়ে পালায়! না, তা হবে না। টাইপরাইটারটাকে বাঁচাতেই হবে। আমি আচ্ছা

করে মালকোঁচা এঁটে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লুম। মনে হল গায়ের কাছ দিয়ে হাওয়ার মত কি-একটা সরে গেল! যাক, চোরটা তাহলে চুপি চুপি পালিয়েছে। আমার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল! আমি ধুঁকতে ধুঁকতে খাটিয়ার উপর গিয়ে বসে পড়লুম।

খাটিয়ার ওপাশে ছোট্ট একটা টেবিল—তার উপর টাইপরাইটারটা বসানো, তার সামনে একখানি ছোট্ট টুল। আমি সেইদিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলুম। যাক, টাইপরাইটারটা তাহলে বাঁচল।

শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ হচ্ছিল। খাটিয়ার উপর নরম বিছানা পেয়ে মনে হচ্ছিল এইখানেই চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ি। কিন্তু কার এ বিছানা কে জানে! সে হয়ত শেষ রাত্রে ফিরে এসে আমায় চ্যাংদোলা করে তুলে কোথায় ছুঁড়ে ফেলে দেবে! তা দিক গে। আর এখান থেকে উঠতে পারি না—সর্বশরীর ঝিমিয়ে আসছে।

খট্ খট্ খট্ খট্! খট্ খট্ খট্! খট্ খট্! টুং! আমি ধড়মড় করে সোজা হয়ে গেলুম। খট্ খট্ খট্! খট্ খট্ খট্! একি, টাইপরাইটারটা আপনি-আপনি এরকম হরফ লিখে চলেছে কী রকম? তাকে ভূতে পেলে নাকি? আমি চোখদুটো বড় করে টাইপরাইটারের এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখছি, হঠাৎ নজরে পড়ল, টাইপরাইটারের সামনে টুলের উপর কে যেন বসে রয়েছে। ঠিক মানুষ নয়, ছায়াও নয়, ছবিও নয়, তাকে দেখাও যাচ্ছে না, তবু স্পষ্ট বোধ হচ্ছে সে বসে রয়েছে টাইপরাইটারের উপর ঝুঁকে টুলের উপর। এত বড় সাদা দাড়ি বুকের উপর লুটিয়ে পড়েছে, মাথায় প্রকাণ্ড টাক, বেশ বড় বড় উজ্জ্বল কালো দুটি চোখ, দুজোড়া খুব ঘন ভুরু—একেবারে সাদা হয়ে গেছে; খুব প্রশস্ত কপাল, তা থেকে একটি শ্বেত পাথরের স্নিগ্ধ আভা যেন বেরিয়ে আসছে। দেখলে ভক্তি হয়। আমি কথা কইবার চেষ্টা করলুম, পারলুম না। মনে মনে প্রশ্ন করলুম, 'কে আপনি?' সেই বুড়োর হাত চলল আর টাইপরাইটার বলে উঠল—খট্ খট্ খট্ খট্! আমি আবার বললুম, 'কে আপনি?'

বুড়োর হাতের টিপুনিতে এবার আরো জোরে টাইপরাইটার শব্দ

করে উঠল : খট্ খট্ খট্ খট্ !

মানুষ যেমন টাইপরাইটারের হরফ দেখে লেখা পড়তে পারে, সেই অন্ধকারে শুধু তার শব্দ শুনে হঠাৎ আমি তার লেখা বুঝতে পারলুম। চোখ বুজে হরফ না দেখে টাইপরাইটারে আমি স্বচ্ছন্দে লিখতে পারতুম। এখন বোধ হল, না দেখে শুধু শব্দ শুনে পড়তেও পারি।

আমার প্রশ্নে টাইপরাইটার মারফত বৃদ্ধ জবাব দিলেন, 'আমি ব্যোপদেব।'

আমি বললুম, 'ও, যিনি ব্যাকরণ লিখেছেন, সেই ব্যোপদেব আপনি ?'

খট্ খট্ খট্ খট্—'না, না, না।'

'তবে আবার কোন্ ব্যোপদেব ?'

'তুমি লেখাপড়া শিখেছ, ব্যোপদেবকে চেনো না ?—যিনি গল্পলেখকদের আদি পুরুষ !'

আমি বললুম, 'ব্যোপদেব ঠাকুর কী গল্প লিখেছেন ?'

'তুমি কথাসরিৎসাগরের নাম শুনেছ ? সে ব্যোপদেবেরই লেখা।'

আমি বললুম, 'সে কী মশাই, সে যেন-না আর কার লেখা শুনেছি !'

'সে ভুল, ভুল ! তোমাদের মূর্খ অর্বাচীন ঐতিহাসিকের ভুল !'

আমি বললুম, 'এ তো ভারি অন্যায় ; আপনার খ্যাতি চুরি করে অন্য লোকে যশস্বী হবে ?'

'তা হোক গে। তার জন্য আমি ভাবি না, আমার ভাণ্ডারে এখনও অনেক গল্প আছে, তা দিয়ে আমি দশটা কথাসরিৎসাগর তৈরি করতে পারি। যা গেছে তার জন্যে আমি দুঃখ করি না।'

এই কথা শুনে সত্যি বলছি ব্যোপদেব ঠাকুরের উপর আমার একটা অসীম ভক্তি এল, আমি তাঁকে প্রণাম করে বললুম, 'হে গল্পলেখকদের আদি পুরুষ, এই সামান্য গল্পলেখকের প্রণাম গ্রহণ করুন।'

হঠাৎ দেখলুম, বৃদ্ধের চোখদুটি আর কপালটি আরও কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তিনি তাঁর দীর্ঘ হাতখানি উপর দিকে তুলে আমায় যেন আশীর্বাদ করলেন।

টাইপরাইটার আবার খট্ খট্ করে উঠল, 'তুমি গল্প লেখ? বেশ। বেশ ভাল। তুমি তাহলে আমার কদর বুঝবে।'

আমি বললুম, 'আপনি বুঝি এই বন্ধ ঘরে আস্তানা নিয়েছেন? এইখানেই বুঝি থাকেন?'

'রামঃ! আমি এখানে থাকতে যাব কেন? তবে, একজন গল্পলেখক যখন পেলুম তখন হয়ত দিনকতক তোমার কাছে এখানে থেকে যেতেও পারি। কী বল, থাকব নাকি?'

আমি বললুম, 'তা বেশ তো। কিন্তু সচরাচর আপনি কোথায় থাকেন?'

'কেন, তুমি জান না, আমরা সবাই গল্প-গোলকে থাকি—যত সব ভাল গল্প-লিখিয়ে—একদিন তুমিও সেখানে আসবে নিশ্চয়। কী বল?'

আমি বললুম, 'সে আপনার আশীর্বাদ। গল্প-গোলকে আর কে আছেন?'

বুড়ো বললে, 'আরে, কত লোক আছে! কত নাম করব, সবাইকে আমি আবার চিনিও না। তুমি যখন আমাকেই চিনতে পারলে না, তখন আর কাকে চিনবে?'

আমি জিগগেস করলুম, 'ঈশপ সাহেবকে আপনি চেনেন?'

'ঈশপ! ঈশপ কে?'

'যিনি কথামালা লিখেছেন!'

'ও, আমাদের ইউসুফ? চিনি বৈকি, খুব চিনি! এক সময় সে আমার শত্রু ছিল, এখন আমার পরম বন্ধু। আহা বড় রসিক লোক, ওস্তাদ লিখিয়ে!'

আমি বললুম, 'আরব্য উপন্যাস যিনি লিখেছেন তাঁকে জানেন?'

'আরব্য উপন্যাস? আরবি গল্প? খাসা গল্প হে, খাসা গল্প! অমন গল্প আর কেউ লিখতে পারলে না—পড়ে আমারও হিংসে হয়!'

'তাঁকে দেখেছেন?'

'দেখেছি বৈকি। খুব দেখেছি। ইয়া লম্বা সাদা দাড়ি, চোখে সুর্মা, গালদুটি যেন পাকা দাড়িম ফেটে পড়ছে। মুখের বুলি—আহা,

যেন মিঠে সরবৎ। আর খোশগল্প যা করতে জানেন!'

আমি বললুম, 'এখনকার গল্পলেখকদের মধ্যে কারো সঙ্গে আপনার আলাপ হয় নি?'

'হ্যাঁ একজন ছোকরার সঙ্গে আলাপ হয়েছে বটে। শুনেছি সে নাকি "শকুন্তলা" বলে একখানা খুব চমৎকার বই লিখেছে। চারিদিকে নাকি তার প্রশংসা। একদিন আমাকে প্রণাম করতে এসেছিল। দেখে মনে হল, হ্যাঁ শক্তিমান পুরুষ বটে। তবে, কী জান, ওরা সব নিতান্ত ছেলেছোকরার দল।'

কবি কালিদাসই যখন নিতান্ত ছেলেছোকরার দলে পড়লেন, তখন তারপরে আর কারও কথা তুলতে আমার সাহস হল না। আমি চুপ করে রইলুম।

টাইপরাইটার আবার খট্‌খট্ করে উঠল, 'তোমার এ কলটি তো বড় চমৎকার হে, যা খুশি তাই লেখা যায়!'

আমি বললুম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, ভারি সুন্দর কল বেরিয়েছে। আর গল্প লেখার কষ্ট নেই।'

'অ্যাঁ, এই কল থেকে কি আপনিই তৈরি গল্প বার হয় নাকি? যেমন কাপড়ের কল, আটার কল, গানের কল?'

আমি বললুম, 'আজ্ঞে না, এতে শুধু লেখা হয় মাত্র, গল্পটা মনে মনেই তৈরি করতে হয়।'

বৃদ্ধ বললেন, 'তবু ভাল। আমি মনে করেছিলুম হাতে লেখা গল্প উঠে গিয়ে বুঝি কলের গল্প চলতে আরম্ভ হয়েছে।'

আমি বললুম, 'আজ্ঞে না, সে কল এখনও বার হয় নি।'

বৃদ্ধ বললেন, 'দেখ বাপু, তোমার এই কল দেখে আমার আবার গল্প লেখবার সাধ হচ্ছে। আমাদের তো আর কলম নিয়ে লেখার উপায় নেই,—এ দিব্যি টিপে যাব, আর লেখা হয়ে যাবে।'

আমি বললুম, 'বেশ তো, আপনি লিখুন না, আমি প্রকাশ করে দেব।'

বুড়োর চোখদুটো আবার যেন প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। তিনি আমার

দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'দেবে বাবা, দেপে—প্রকাশ করে দে? তোমায় আশীর্বাদ করি তুমি দীর্ঘজীবী হও, যশস্বী হও।'

বৃদ্ধ একটু থেমে আবার বললেন, 'এই তো আমার দুঃখ—আমিই গল্প লেখার সৃষ্টি করলুম, আর আমাকে সবাই ভুলে গেল! আমি আবার পৃথিবীকে দেখাতে চাই আমি কত বড় গল্প-লিখিয়ে! এখনও আমার সে শক্তি আছে।'

কথাগু: বলতে টাইপরাইটারের চাবিগুলো যেন লাফিয়ে উঠতে লাগল। এমন করে আওয়াজ করতে লাগল, যেন বুক ঠুঃক ঠুঃক এই কথাগুলো বলছে।

আমি বললুম, 'স্বচ্ছন্দে আপনি গল্প লিখে যান, প্রকাশ করার ভার আমার রইল।'

বৃদ্ধের মুখখানি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বুঝতে পারলুম, কতখানি ব্যথা তার বুকে লুকানো আছে। তাঁর সেই ব্যথার ভারে আমার বুক সমবেদনায় ভরে উঠল। মনে হল, এ তো আমারই কর্তব্য। বৃদ্ধের এ দুঃখ লাঘব করবার দায় আমার। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে এই দায় নিজের মাথায় তুলে নিলুম।

বৃদ্ধ বললেন, 'তাহলে আমি লেখা আরম্ভ করি?'

আমি বললুম, 'নিশ্চয় আরম্ভ করবেন।'

টাইপরাইটার দ্রুত গতিতে চলতে লাগল—খট্‌ খট্‌ খট্‌! খট্‌ খট্‌ খট্‌। আমি শুনতে লাগলুম—অবন্তীপুরের রাজা দিগ্বিজয় করে নিজ রাজ্যে ফিরে আসছেন, সঙ্গে লক্ষ পদাতিক, দশ সহস্র অশ্বারোহী; তারা অর্ধচন্দ্রাকারে রাজাকে বেষ্টন করে অগ্রসর হচ্ছে। বাদ্যকররা উৎফুল্ল উদ্যমে বাদ্যধ্বনি·········

শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়লুম জানতেই পারলুম না।

সকালে উঠে দেখি, নিজের ঘরে, নিজের খাটিয়ার উপর শুয়ে রয়েছি। অনেক বেলা হয়েছে, অনেকখানি রোদ ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। আমি সামনের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলুম, সেই বন্ধ ঘর যেমন বন্ধ ছিল তেমনি বন্ধই রয়েছে। আমি বসে বসে ভাবতে

লাগলুম—ও ঘর থেকে আমাকে তুলে নিয়ে আমার নিজের বিছানায় শুইয়ে দিলে কে ? তবে কি আমি নিজেই ঘুমের ঘোরে উঠে এসেছি ? আর আমার টাইপরাইটার ? পাশ ফিরে দেখি, টেবিলের উপর যেমন বসিয়ে রেখেছিলুম ঠিক তেমনই আছে। কিন্তু তার হরফের চাবিগুলো একেবারে তেউড়ে মেউড়ে একাকার হয়ে গেছে। চাবি টিপলুম, কল চলল না। টাইপরাইটারের অবস্থা দেখে আমার কান্না আসতে লাগল। বুড়ো শেষে এই করলে! হয়ত ও-ঘর থেকে তুলে আনবার সময় হাত থেকে ফেলে এই অবস্থা করেছে! হঠাৎ মনে হল, বুড়ো কী গল্প লিখেছে দেখি! টাইপরাইটারের গায়ে যে কাগজ আঁটা ছিল সেখানা খুলে নিয়ে দেখলুম মাত্র একটা লাইন লেখা—সি চ ক মী র হ। এর মানে কী, কিছুই বুঝতে পারলুম না। হয়ত বা কোন ভুতুড়ে সঙ্কেত হবে!

বসে বসে ভাবছি, এমন সময় বিনোদ এসে হাজির—'কী রে, এখনও বেড়াতে বেরুস নি ?' আমি বললুম, 'না, আজ বেড়াতে যাব না, বোধহয় বিকেলের গাড়িতেই বাড়ি ফিরব।'

বিনোদ আশ্চর্য হয়ে বললে, 'কেন ? কেন ?'

আমি টাইপরাইটারটা তাকে দেখিয়ে বললুম, 'দেখ না কী করেছে! আমার ভারি মন খারাপ হয়ে গেছে।'

বিনোদ টাইপরাইটারটা নেড়ে-চেড়ে বললে, 'তাই তো রে! কেমন করে এমন হল ?'

আমি কাল রাত্তিরের সমস্ত ঘটনা তাকে বলতে সে হো-হো করে হেসে উঠে বললে, 'ওরে, ও খোট্টাই সরবতের গুণ।'

আমি বললুম, 'কাল রাত্রে যে আমি ও-ঘরে গিয়েছিলুম. সে কি তুমি বলতে চাও স্বপ্ন—খেয়াল ?'

বিনোদ বললে, 'নিশ্চয়! ওপাশের সিঁড়ি দিয়ে না উঠে এই পাশের সিঁড়ি দিয়ে রোয়াকে উঠেছিস আর মনে করেছিস ঐ দিক দিয়েই উঠলি, তাইতে মনে হয়েছে এ-ঘরে না এসে ঐ-ঘরে গেছিস। এ বাবা খোট্টাই সরবতের গুণ না হয়ে যায় না।' বলে সে হাসতে লাগল।

আমি চটে বলে উঠলুম, 'আমি যে সিঁড়ি ভুল করেছিলুম তার প্রমাণ?

সে বললে, 'তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ, তুমি ও-ঘরে ঘুম থেকে না উঠে এ-ঘরে ঘুম থেকে উঠেছ। আর ও-ঘরের যে আসবাব-পত্রের বর্ণনা করলে, মিলিয়ে দেখ দেখি এ ঘরের সঙ্গে ঠিক মেলে কি না! এই আলনা তোরঙ্গ!'

এতক্ষণ যেন নিজের ঘরের কথা ভুলেই ছিলুম। বিনোদ দেখিয়ে দিতে মনে হল, জিনিসগুলো মেলে বটে। 'কিন্তু ও-ঘরেও যে এমনি জিনিস নেই তার প্রমাণ কী?' বিনোদ বললে, 'প্রমাণ করে দিতে পারি, যদি ও-ঘরের চাবিটা কোনরকমে খোলা যায়।'

আমি বললুম, 'আর এই টাইপরাইটার? এর এমন অবস্থা কেমন করে হল? দেখছ না, বুড়ো ব্যাটা আনাড়ি হাতে টিপে টিপে এর দফা রফা করে দিয়েছে!'

বিনোদ গম্ভীর মুখে আর একবার টাইপরাইটারটার দিকে এগিয়ে গেল। ঠিক সেই সময় টেবিলের নিচে থেকে একটা মস্ত সাদা বেড়াল হাই তুলে পালাল। বিনোদ নেড়ে-চেড়ে টাইপরাইটারটাকে পরীক্ষা করতে লাগল। খানিক পরেই বললে, 'এই হয়েছে, দেখ; চাবির গায়ে বেড়ালের রোঁয়া সব জড়িয়ে রয়েছে— এ ঐ বেড়ালেরই কাজ! ও টাইপরাইটারের চাবি নিয়ে খেলা করেছে, আর তুই ব্যোপদেবের খেয়াল দেখেছিস।'

বিনোদ বললে বটে বেড়ালের রোঁয়া, কিন্তু আমার মনে হল এ যেন ব্যোপদেব ঠাকুরের সেই সাদা দাড়ির একটু টুকরো।

যাই হোক, এখন এর ঠিক জবাব দেওয়া যাবে না, আগে টাইপরাইটার মেরামত হোক, তারপর বুঝে নেব, ব্যোপদের ঠাকুর গল্প লিখতে আসেন কি না।

টাইপরাইটার মেরামত না হলে আমার মন স্থির হচ্ছে না। কাজেই গল্প লেখাও এখন হবে না। অতএব এইখানেই শেষ।